Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারীঃ ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.

(Women in the Politics of East Bengal: 1947-1971 C.E.)

গবেষক

আনোয়ারা আক্তার

সহকারী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

আগস্ট-২০২১

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারী: ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.

(Women in the Politics of East Bengal: 1947-1971 C.E.)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

আনোয়ারা আক্তার

সহকারী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি: নং- ৩৪, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট-২০২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক জনাব আনোয়ারা আক্তার (সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারী: ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি. (Women in the Politics of East Bengal: 1947-1971C.E.)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি আমি সম্পূর্ণ পড়েছি। আমার বিবেচনায় এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এতে ব্যবহৃত তথ্য উৎসসমূহ নির্ভরযোগ্য। আমার জানা মতে, গবেষক আনোয়ারা আক্তার তার প্রণীত এই অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি লাভ বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করেননি। পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাদানের জন্য গবেষক আনোয়ারা আক্তারকে অনুমতি প্রদান করা হলো।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আনোয়ারা আক্তারের অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

তারিখ, ঢাকা
আগষ্ট, ২০২১ খ্রি.

(প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারী: ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.** (**Women in the Politics of East Bengal: 1947-1971 C.E.**) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি লাভের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে কোনো Plagiarism নেই।

তারিখ, ঢাকা
আগষ্ট, ২০২১ খ্রি.

(আনোয়ারা আক্তার)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি. নং- ৩৪, শিক্ষাবর্ষ ২০১৭-২০১৮
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা	i-iii
ভূমিকা	১-২২
প্রথম অধ্যায় রাজনীতি ও নারী: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	২৩-৩৬
দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলার রাজনীতি ও নারী: ঐতিহাসিক পটভূমি	৩৭-৮৩
তৃতীয় অধ্যায় পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও নারী	৮৪-১২৮
চতুর্থ অধ্যায় ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ও নারীসমাজ	১২৯-১৫৩
পঞ্চম অধ্যায় পূর্ব বাংলার এক দশকের (১৯৫৫-৬৫ খ্রি.) রাজনীতি এবং নারীসমাজ	১৫৪-২০২
ষষ্ঠ অধ্যায় ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার নারীসমাজ	২০৩-২২৩
সপ্তম অধ্যায় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নারী	২২৪-২৬০
অষ্টম অধ্যায় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও নারী সমাজ	২৬১-২৯০
নবম অধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী	২৯১-৩৫১
উপসংহার	৩৫২-৩৬৪
পরিশিষ্ট: ১-১৯	৩৬৫-৩৮৬
গ্রন্থপঞ্জি	৩৮৭-৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের ইতিহাসে **১৯৪৭-১৯৭১** কালপর্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময় পূর্ব বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) ছিল পাকিস্তানের একটি অন্যতম প্রদেশ। পাকিস্তান যুগে আলোচ্য সময়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতি এবং এতে তৎকালীন বাঙালি নারীসমাজের ভূমিকা বিষয়ে আমি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পিএইচ.ডি গবেষণা ফেলোশীপের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে **পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারীঃ ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি. (Women in the Politics of East Bengal: 1947-1971 C.E.)** শিরোনামে বর্তমান গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করি। আমার এ গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। তাঁর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে আমি উপর্যুক্ত শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভের কাঠামো বিন্যাস এবং বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও জ্ঞানগর্ভ দিক-নির্দেশনা আমার গবেষণা কাজকে বোধগম্য করতে বিশেষভাবে সহায়ক এবং অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজতর করেছে। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান আমার গবেষণাকর্মের প্রতিটি অধ্যায়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে সেগুলো সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। বস্তুত আমার নিজের সীমাবদ্ধতাকে তিনি বারবার তাঁর সানুগ্রহ প্রশ্রয় দিয়েছেন। অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা এবং সর্বোপরি নিজের অমূল্য সময় ও শ্রম দিয়ে গবেষণা কাজটি সুসম্পন্নকরণে তিনি যে ভূমিকা রেখছেন তা নিঃসন্দেহে আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। বলতে দ্বিধা নেই যে, তাঁর উপর্যুপরি তাগিদ এবং সার্বিক সহযোগিতার ফলেই আমার গবেষণা কর্মের সমাপ্তি ও অভিসন্দর্ভ রচনা সম্ভব হয়েছে। একজন স্নেহধন্য গবেষক হিসেবে তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইলো। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্য আমার অনিঃশেষ শুভ কামনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি গবেষণার নীতিমালার শর্তপূরণের জন্য আমাকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একাডেমিক কমিটিতে “১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ও নারী সমাজ” এবং “১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন ও নারী সমাজ” শিরোনামে দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হয়েছে। প্রবন্ধ দু'টি উপস্থাপনের সুযোগ দানের জন্য আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান যথাক্রমে অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, অধ্যাপক ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উপস্থাপিত এ দু'টি প্রবন্ধের ওপর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়েছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিভাগীয় অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম, অধ্যাপক মো. মাহফুজুল ইসলাম, অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ড. আব্দুল বাছির, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ

হুমায়ূন কবির, ড. আবুল কালাম আজাদ, ড. মো: নুরুল আমিন, ড. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, ড. এ টি এম সামছুজ্জোহা, জনাব এ কে এম ইফতেখারুল ইসলাম ও জনাব মাহমুদুর রহমানসহ বিভাগীয় সকল শিক্ষকের কাছ থেকে। আমি তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার গবেষণাকর্মকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে যারা তথ্য-উপাত্ত প্রদানসহ নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার কর্মক্ষেত্র জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আতিয়ার রহমান ও সহযোগী অধ্যাপক মো: কামাল হোসেনসহ অনেক সহকর্মী। গবেষণার শুরু থেকে শেষাবধি গবেষণা সহায়ক তাঁদের পরামর্শ, অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাকে উদ্দীপনা জুগিয়েছেন। তাঁদের প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। প্রসঙ্গত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম ও সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন-এর অনেক তথ্য ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা দানের কথা কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করছি। বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক ড. মোহাম্মদ হান্নান তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কিছু তথ্য এবং বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক আমার অগ্রজ ও সুহৃদ আলো আরজুমান বানু (গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের সহধর্মিনী)। গবেষণা কাজের প্রয়োজনে সময় অসময়ে বাসায় আসলে তাঁর আন্তরিক অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তা ভুলবার মতো নয়। এ সুযোগে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণার প্রয়োজনে সময় দিয়ে সাক্ষাৎকার প্রদানের মাধ্যমে আমার কাজকে সহজতর করেছেন বিশিষ্ট নারী নেত্রী জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক মমতাজ বেগম, কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা, ডাকসু'র সাবেক ভিপি ও বর্তমান বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক মাহফুজা খানম, নাসিমুন আরা হক মিনু , মালেকা খান, রাফিয়া আক্তার ডলি, সদ্য প্রয়াত ভাষা সৈনিক রওশন আরা বাচ্চু প্রমুখ। গবেষণা সহায়ক অনেক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বিশিষ্ট নারী নেত্রী অধ্যাপক ড. মালেকা বেগম। তাঁদের সকলের প্রতি আমার সবিনয় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ রইলো।

সুষ্ঠুভাবে গবেষণা সম্পাদনে ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ স্টাডিজ লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও লাইব্রেরি, ন্যাশনাল আর্কাইভস বাংলাদেশ, নারী প্রগতি সংঘ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বেগম পত্রিকা অফিস (ঢাকা), সওগাত অফিস, কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছাত্র

ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় অফিস ও লাইব্রেরি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য তাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আন্তরিক সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব মোঃ রাশিদুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মকর্তা জনাব মোঃ ছরোয়ার হোসেন ও সাজেদা সুলতানাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে।

গবেষণা কাজটি সুসম্পন্নকরণের জন্য ফেলোশীপ প্রদান করায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানচ্ছি কমিশনের সহকারী পরিচালক জনাব মামুন পাটোয়ারীকে।

আমার গবেষণা এবং অভিসন্দর্ভ প্রণয়ণে যার অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় তিনি হলেন আমার বন্ধু, সতীর্থ ও ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত সাথী জনাব মো. হোসাইন আহমেদ শামীম। একই ডিসিপ্লিনের হওয়ায় তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশিই প্রাপ্তি ঘটেছে আমার। ব্যাংকার জীবনের অতি ব্যস্ততার মাঝেও গবেষণাকর্ম সম্পাদনে তিনি উৎসাহ অনুপ্রেরণাই দেননি, অভিসন্দর্ভ পাঠ করে সংশোধন-পরিমার্জনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। আমার ব্যস্ততার সময় আমাদের সন্তানদের সময় ও পরিচর্যা করেছেন। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কে কারণে তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দায়িত্ব শেষ করতে চাই না। তাঁর জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা। আমাদের দুই মেয়ে মিফতাহুল জান্নাত মেঘলা ও আরুফা তানজিবা রোদেলা আমার গবেষণাকর্মে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে আমার কাছ থেকে তাদের কাঙ্ক্ষিত অনেক প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আজকে এই শুভক্ষণে তাদের জন্য রইল আমার অনেক অনেক দোয়া ও শুভ কামনা।

গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা মরহুম ইয়ার আহমেদ ভূঁইয়া ও মা ফাতেমা বেগমকে। আমার এ অর্জনে তাঁরাই সবচেয়ে খুশি হতেন। তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই সালেহ আহমেদ ভূঁইয়া ও সেজ ভাই সদ্য প্রয়াত সাকের আহমেদ ভূঁইয়াকে- যারা সবসময় আমার গবেষণা কর্মের অগ্রগতির খোঁজ-খবর নিতেন। আমার শ্বশুর জনাব জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া ও শাশুড়ি মিসেস জোছনা বেগম এবং বোন নুরুন্নাহার ভূঁইয়া রিতাসহ অন্যান্য ভাই-বোন ও পরিবার-পরিজন সকলের প্রতি রইলো অশেষ কৃতজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারী ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি. শীর্ষক আলোচ্য গবেষণাকর্মটি তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রদেশ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও আন্দোলন সংগ্রামে বাংলার নারীসমাজের অংশগ্রহণ, ভূমিকা নির্ণয়, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের প্রয়াস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সভ্যতার ঊষালগ্নে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমুক্ত সমক্ষমতা সম্পর্কের পরিবেশ বিরাজমান ছিল বলে সমাজতত্ত্ববিদগণ মনে করেন। কিন্তু পরবর্তীতে নানামুখী সামাজিক বিরূপ পরিস্থিতিতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সম্পদ ও সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার চিন্তা, পতিত্ব ও পিতৃপরিচয় নির্ভর পারিবারিক ধারার বিকাশের প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যের সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হতে থাকে এবং নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক সম্পর্কের শক্তভিত্তি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে জ্ঞাতি সম্পর্ক, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রশক্তি অসম সম্পর্ককে শুধু লালন করেনি বরং নারীর উপর পুরুষের শাসন ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেয়। এমনকি কালের পরিক্রমায় নারীর উপর পুরুষের নির্যাতন ও অত্যাচার সমাজের চোখে অনেকটাই স্বাভাবিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অনেক দেশে এমনকি ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, সর্বগুণে গুনান্বিত নারীও অধম পুরুষের চাইতে হীন। এরূপ সমাজ বাস্তবতায় নারী জাতি কেবল ভোগ্য ও সন্তান উৎপাদকে পরিণত হয়। বাংলা অঞ্চলেও দীর্ঘকাল ধরে নারীসমাজ এরূপ অধঃপতিত অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মুসলিম শাসনামলে নারী তাঁর মানবিক অধিকার লাভ করে। তবে নারীসমাজ মানবিক পরিচয় লাভ করলেও সাধারণভাবে সমাজ বা রাজনীতিক পরিমণ্ডলে তো নয়ই, এমনকি পারিবারিক জীবনেও নারী তাঁর যথাযথ অবস্থান তৈরি করতে পারেনি।

বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতক হলো একটি যুগসন্ধিক্ষণ। এ কথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে, উনিশ শতকে বাংলায় এক নতুন যুগের সুচনা হয় এবং রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ক্ষয়িষ্ণু ও রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে এ যুগেই এক নবজাগরণের সূচনা হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব জনজীবনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনাচারণেও পরিবর্তন ঘটে। জীবনদৃষ্টিতে পরিবর্তন ও আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি নব্য শ্রেণির মধ্যে নতুন জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য উনিশ শতককে অনেকেই বলে থাকেন নবজিজ্ঞাসার যুগ।[১] গোলাম মুরশিদ লিখেছেন যে, খানিকটা নতুন সেক্যুলার মূল্যবোধের উন্মেষ ও বিকাশ, খানিকটা পাশ্চাত্যের জীবনধারার অনুকরণবশত এবং খানিকটা নগরায়নজাত সচলতার ফলে উনিশ শতকের বাংলায় নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।[২] উনিশ শতকের সামাজিক পরিবর্তনের নানা প্রসঙ্গের মধ্যে নারী জাগরণ অন্যতম।

উনিশ শতকে ইউরোপে নারী জাগরণের প্রভাব বঙ্গ-ভারতীয় সমাজেও অনুভূত হয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষগণ অনুভব করেন যে, বাংলার সামাজিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা রোধে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি পুনর্জাগরণ। আর এ বহুমুখী পুনর্জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে নারীদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার। এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ। উনিশ শতকের বাংলায় সৃষ্ট একটি নবতর পরিস্থিতিতে বাংলায় নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটে। আর এর ফলে প্রথমে পরিবার এবং পরবর্তীতে সামাজিকও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীসমাজ তাদের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়। বিশ শতকে বাঙালি নারীসমাজের পদাচারণা রাজনৈতিক অঙ্গনেও বিস্তৃতি লাভ করে। শিক্ষিত নারীগণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্রমশ স্বদেশ চেতনায়ও উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে বৃহত্তর জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটায় বাঙালি নারীরা ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত হয়।

বস্তুত বিশ শতকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নারীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয় এবং নারীসমাজ ক্রমান্বয়ে অধিক হরে রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হতে শুরু করেন। তবে উনিশ শতকের শেষার্ধেই রাজনৈতিক অঙ্গনে বাঙালি নারীদের পদচারণা শুরু হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে দু'জন বাঙালি নারী স্বর্ণকুমারী দেবী (কংগ্রেস নেতা জানকীনাথ ঘোষালের স্ত্রী) এবং কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী) অংশগ্রহণ করেন। এদের মাধ্যমেই বাংলার রাজনীতিতে নারীদের প্রথম প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ঘটে। ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে সংঘটিত আন্দোলনে কবি কামিনী রায়, লেডি অবলা বসু, সরলা দেবী প্রমুখ ছাত্রীরা অংশ নিয়েছিলেন। যদিও তাদের এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ ছিল না; বরং সমর্থনসূচক ছিল।[৩]

---

১. স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নব চেতনা: উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি*, পরিবর্ধিত সুবর্ণ সংস্করণ, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৭
২. গোলম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৪
৩. রেজিনা বেগম, *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬, ভূমিকা, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সংঘটিত স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালি নারীরা প্রথম সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ আন্দোলনে সরলা দেবী ও আশলতা সেন প্রমুখ নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। পূর্ব বাংলার সিরাজগঞ্জের কংগ্রেস সমর্থক খায়রননেসা খাতুন (১৮৮০-১৯১২ খ্রি.) বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের একজন জোরালো সমর্থক ছিলেন। তাঁকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনীতি সচেতন প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪] স্বদেশী যুগে বাংলায় যে পাঁচজন সদস্য নিয়ে 'জাতীয় বিপ্লব সমিতি' গঠিত হয়েছিল তাঁদের অন্যতম ছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.) ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের আশ্রয় দান, তাদের অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ ও সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে নারীদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়। একাজে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে ১৯১৭ সালে বীরভূমের দুকড়ি বালা এবং দুঃখময়ী কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। ননীবালা দেবী নামেও আরেকজন রাজবন্দি নারীর কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।[৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পরাজিত উসমানী তুরস্কের সুলতান-খলিফার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের আচরণের প্রতিবাদে ভারতীয় মুসলিম সমাজ খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন। একই সময়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও সামরিক আইনের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী (প্রকৃত নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী: ১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রি.) ১৯২০ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। খিলাফত আন্দোলনে বি আম্মা নামে পরিচিতি আবাদি বেগমের (খিলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর মা) নেতৃত্বে অনেক মুসলিম নারী অংশ নিয়েছিলেন। তবে এ আন্দোলনে বাঙালি নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। মহাত্মা গান্ধীর পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে সরলা দেবী বাংলার নারীসমাজের মুখপাত্র হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন। গত শতকের বিশের দশক থেকে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী রাজনীতিতে বাঙালি নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। এ আন্দোলনে সক্রিয় হিসেবে লীলা নাগের (১৯০০-১৯৭০ খ্রি.) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমএ ডিগ্রি অর্জনকারী ছাত্রী লীলা নাগ ঢাকায় 'দীপালী সংঘ' নামে যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাংলার নারী সমাজকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা।[৬] এ সময় বাংলায় বিপ্লবী দল যুগান্তর ও অনুশীলনের সাথে অনেক নারী যুক্ত হন। কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর আক্রমণের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত স্কুল ছাত্রী সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো বীণা

৪. আলো আরজুমান বানু, 'ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলিম নারী', *ইতিহাস*, আটচল্লিশ বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৪২১ বঙ্গাব্দ, ২০১৪-২০১৫ খ্রি., বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪৫

৫. রেজিনা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৬. *ঐ*, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

দাসও যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন। ময়মনসিংহের রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুনও যুগান্তরের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তবে বাংলার বিপ্লবী রাজনীতিতে যে নামটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত তিনি হলেন চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২ খ্রি.)। তিনি স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের (১৮৯৪-১৯৩৪ খ্রি.) ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামে প্রীতিলতাকে প্রথম আত্মোৎসর্গকারী নারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকের সূচনায় মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত লবণ আইন (The Salt Act) ভঙ্গের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। গান্ধীজি এ আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য নারীসমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সারা দিয়ে বাংলার নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এ আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীদের মধ্যে ছিলেন বিক্রমপুরের আশালতা সেন, সিলেটের সরলা বালা দেবী, দিনাজপুরের প্রভা চ্যাটার্জী, বরিশালের মনোরমা বসু, ইন্দুমতি গুহঠাকুরতা, প্রফুল্ল কুমারী বসু, ভোলার সরযুবালা সেন, নোয়াখালীর সুশীলা মিত্র, খুলনার স্নেহশীলা চৌধুরী, সিরাজগঞ্জের বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার হেমপ্রভা মজুমদার, কুমিল্লার লাবণ্যলতা চৌধুরী, ময়মনসিংহের ঊষা গুহ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বোন ঊর্মিলা দেবী এবং জোতির্ময়ী দেবী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। শামসুন্নাহার বেগম, রওশন আরা বেগম, রাইসা বানু ও বদরুন্নেসা বেগম প্রমুখ মুসলিম নারীগণও এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।[৭] এভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবার মধ্য দিয়ে বাঙালি নারীসমাজের সামাজিকীকরণের সূত্রপাত ঘটে এবং তারা ক্রমশ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে সোচ্চার হন এবং ক্রমান্বয়িক দাবি ও আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৩৫ সালে নিজেদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (১৯৩৯-৪৫ খ্রি.) 'ভারত ছাড়' আন্দোলনেও বেশ কয়েকজন বাঙালি নারীর অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। এদের মধ্যে ইলা মিত্র ও মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাতঙ্গিনী হাজরা একটি শোভাযাত্রায় নেতৃত্বদানকালে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। চল্লিশের দশকে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনেও নারীদের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

ব্রিটিশ শাসনামলের শেষের দিকে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলার ১৯টি জেলায় সংঘটিত কৃষক আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। তেভাগা আন্দোলন, টংক আন্দোলন, নানকার আন্দোলন এবং নাচোলের কৃষক আন্দোলনে নারীসমাজের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। এসব

৭. রেজিনা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮; মোঃ আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, অবসর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭৩-৭৮

আন্দোলনগুলোতে নারী ও পুরুষ একযোগে শোষণ, অত্যাচার ও বঞ্চনার প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে। পূর্বের আন্দোলনগুলোতে বেশিরভাগ শিক্ষিত নারীরা জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে কৃষক আন্দোলনগুলোতে গ্রামীণ নারীরা বেশি অংশগ্রহণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়। তেভাগা আন্দোলনে পর্দানশীল মুসলিম নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। পাকিস্তান আমলে আলোড়ন সৃষ্টিকারী আন্দোলন নাচোল এলাকার কৃষক বিদ্রোহে (১৯৪৮-৪৯) সাঁওতাল নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। এ আন্দোলনে ইলা মিত্র হয়ে উঠেন জীবন্ত কিংবদন্তী।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয় এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলাও বিভক্ত হয় এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। পূর্ব বাংলার সাথে পাকিস্তানের ভৌগলিক দূরত্ব এবং তাদের সাথে এতদঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতির বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও কেবল ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই পাকিস্তান সম্পর্কে বাঙালি জাতির মোহমুক্তি ঘটে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পূর্ব বাংলার বিরোধ বাঁধে। পশ্চিমাদের এ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামে। ৫২'এর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এটি ছিল পকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদী আন্দোলন। বিশ শতকের সুচনা থেকে বাঙালি নারীসমাজের মধ্যে যে রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ তৈরি হয়েছিল এবং বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁরা রাজনীতিতে নারীসমাজের অংশগ্রহণের যে ঐতিহ্য তৈরি করেছিলেন এর ধারাবাহিকতায় স্বাধীন পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার নারীসমাজ সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়। শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু ও দমননীতি উপেক্ষা করে নারীসমাজ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান যুগে পূর্ব বাংলায় নারীসমাজের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বৌদ্ধিক পটভূমি বিনির্মাণ থেকে শুরু করে ১৯৪৮ সাল থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পরিচালিত প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নারীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।[৮] উল্লেখ্য যে, ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হলেও এর জের চলে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। আর এর প্রতিটি স্তরে নারীসমাজের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বাঙালির জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে এর সূচনা হলেও পরবর্তীতে

---

৮. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারীসমাজের ভূমিকা সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *ভাষা-আন্দোলন ও নারী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

এটি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এ আন্দোলনের প্রেরণা তাদের স্বাধিকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং এ চেতনা শেষপর্যন্ত তাদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হলো ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন। এটি স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার চারটি রাজনৈতিক দল যুক্তফ্রন্ট নামে একটি নির্বাচনি জোট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহারের ভিত্তিতে এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিপুল বিজয় অর্জন করে। যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ব বাংলার নারীসমাজেরও উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা ছিল। তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৪ সালের প্রদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে বেগম বদরুন্নেছা আহমদ, মিসেস দৌলতননেছা খাতুন, মিসেস নুরজাহান মোর্শেদ, মিসেস সেলিনা বানু, মিসেস আমেনা বেগম, মিসেস রাজিয়া বানু, মিসেস মেহেরুন্নেসা খাতুন এবং মিসেস তফাতুন্নেসা প্রমুখ আইন পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এককালের মুসলিম লীগ নেত্রী (সিলেট মুসলিম মহিলা লীগের সভানেত্রী) জোবেদা খাতুন চৌধুরী এ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নির্বাচনে নারীসমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রচারসহ অন্যান্য কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। কাজে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকে এ দলের সাথে বেশ কয়েকজন নারী নেত্রী সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগ করা হয়। এ সময় দলের কাউন্সিলে যে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছিল এতে আইন পরিষদ সদস্য মিসেস সেলিনা বানুকে কেন্দ্রীয় মহিলা সম্পাদিকা নির্বাচিত করা হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে দলীয় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল। এজন্য প্রথম থেকেই তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অবশেষে মুখমন্ত্রী ফজলুল হকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে ১৯৫৪ সালের ২৯ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে ৯২ (ক) ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করে। ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি বাতিল করা হয়। এর প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় যে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল এতে পুরুষদের পাশাপশি নারীদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।[৯] এ আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার অপরাধে দৌলতননেছা খাতুন, সেলিনা বানু, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য জ্যোৎস্না নিয়োগী, নিলুফার আহমেদ ডলিসহ অনেক নারীনেত্রী ও ছাত্রীদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল।

৯. নাসিম আখতার হোসাইন ও পারভীন জলী সম্পাদিত *বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারী*, সংবেদ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ.৩৮৯

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধানের একটি খসড়া প্রকাশিত হলে পূর্ব বাংলায় প্রবল ক্ষোভ দেখা দেয়। পূর্ব বাংলায় ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন একত্রে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি 'সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ' গঠন করে। এ পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রী সংসদও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিসেস আমেনা খাতুন ছিলেন এ কর্ম পরিষদের অন্যতম একজন প্রভাবশালী সংগঠক।

১৯৫৬ সালে প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানে একটি সংসদীয় ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তবে এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাকিস্তানে খুবই স্বল্পায়ু হয়েছিল। মাত্র দু'বছরের মধ্যেই এ সংবিধান উৎখাত ও অকার্যকর করে দিয়ে ১৯৫৮ সালেই পাকিস্তান সামরিক শাসনের কবলে পড়ে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দর মীর্জা (১৮৯৯-১৯৬৯) পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলোকে বরখাস্ত এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ বিলুপ্ত করে পাকিস্তানের সেনা প্রধান জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খানকে (১৯০৭-১৯৭৪) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী আইয়ুব খান আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ২০ দিনের মধ্যেই ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জাকে উৎখাত করে তাঁকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন।[১০] ২৮ অক্টোবর এক সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে আইয়ুব খান প্রধানমন্ত্রী পদ বিলুপ্ত করেন এবং নিজে প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করে পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করে নিজ চিন্তা-চেতনাপ্রসূত রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো নির্মাণের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দ্রুত কতগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সামরিক শাসনের গণভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেন। তাই আইয়ুব খানের সময়কালে প্রথম দিকে প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময় আইয়ুব সরকারের রোমান হরফে বাংলা লেখার অপচেষ্টা, নজরুলের কবিতার শব্দ পরিবর্তন এবং রবীন্দ্র বিদ্বেষ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের পরোক্ষ প্রতিবাদ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এসব কর্মযজ্ঞে নারীদেরও ভূমিকা ছিল। উদাহরণ স্বরূপ সরকারের রীব্রন্দ্র বিদ্বেষের প্রতিবাদে 'ছায়ানট' নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় ড. সন্‌জীদা খাতুনের ভূমিকা স্মরণীয়।

১৯৬২ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার, নতুন সংবিধান জারি এবং শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ ব্যাপক আন্দোলনমুখর হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীদের

১০. S A Akhand, The 1962 Constitution of Pakistan and the reaction of the People of Bangladesh, *The Journal of the Institute of Bangladesh studies, Vol. III*, 1978, p. 71

উৎসাহব্যাঞ্জক অংশগ্রহণ ছিল। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাহফুজা খানম, মালেকা বেগম, রাফিয়া আক্তার ডলি, রাশেদা খানম রীনা, সালমা আক্তার, দীপা দত্ত, শেখ হাসিনা, মমতাজ বেগম ছিলেন নেতৃস্থানীয়। এছাড়া মতিয়া চৌধুরী, নাজমা রহমান, লিলি রহমান ইডেন কলেজের ছাত্রী থাকাকালীন ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। শুধু ১৯৬২ সাল নয় ১৯৬৪ সালেও পাকিস্তানে প্রবল ছাত্র অন্দোলন পরিচালিত হয়। ৬২ এর মতো এ আন্দোলনেও নারী শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল 'কপ' ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী করেছিল। কপ প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা ও কর্মকাণ্ডে পূর্ব পাকিস্তানের নারী শিক্ষার্থী ও রাজনীতিবিদগণ সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।

১৯৬৬ সাল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক বছর। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের মুক্তির জন্য ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপনের মাধ্যমে পূর্ব পকিস্তানের পরিপূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান। তাঁর এ ছয় দফা পূর্ব পাকিস্তানের জনমানুষ তাদের মুক্তির সনদরূপে গ্রহণ করে। ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে যে গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতেও নারী সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। ছয় দফা কর্মসূচির আন্দোলনের সাথে যুক্ত প্রথম কাতারের নারী রাজনীতিবিদদের মধ্যে মিসেস আমেনা বেগম (১৯৬৬ -৬৮ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক), সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, বদরুন্নেছা আহমেদ, মমতাজ বেগম, ডাকসুর ভিপি মাহফুজা খানম প্রমুখ ছিলেন প্রধান। বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে আন্দোলন পরিচালনাসহ দল সংগঠিত করতে ভূমিকা রাখেন।

ছয় দফা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, পিডিএম গঠন, পিডিএম এর ৮ দফা এবং একই সময়ে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির এগার দফা ভিত্তিক পরিচালিত আন্দোলন ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। গণঅভ্যুত্থানে পূর্ব পাকিস্তানের নারীসমাজ প্রশংসনীয় সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র নেতা আসাদ শহীদ হন। এর প্রতিবাদে ২৪ জানুয়ারি কবি সুফিয়া কামালের বাসায় অনুষ্ঠিত এক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১০ ফেব্রুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। কবি সুফিয়া কামালকে এর সভানেত্রী এবং মালেকা বেগমকে আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে মিসেস তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), জোবেদা খাতুন চৌধুরী, বদরুন্নেছা আহমেদ, জোহরা তাজউদ্দিন, আমেনা বেগম, নূরজাহান মোর্শেদ, সেলিনা বানু, নুরজাহান কাদের, রাজিয়া বানু, রেবেকা মহিউদ্দিন, সারা আলী, আজীজা ইদ্রিস, রোকেয়া রহমান কবীর ও বেলা নবীসহ অনেক মহিলা রাজনীতিবিদ এমনকি সাধারণ গৃহবধু এর সাথে যুক্ত হন।

অগ্নিকন্যা বলে খ্যাত মতিয়া চৌধুরী সরকারি চাপ উপেক্ষা করে গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় থাকেন। ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের দিনগুলোতে বাঙালি ছাত্রীও নারীসমাজের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তারা বিভিন্ন মিছিল মিটিং এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়, দেশের ছাত্র হত্যার নিন্দা ও এর বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি, রাজবন্দিদের মুক্তিসহ ১১ দফা দাবি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিসহ সর্বপ্রকার গণমুখী দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পশ্চিমা শাসক চক্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে। নেতৃস্থানীয় নারী ও ছাত্রীনেত্রীবৃন্দ রাজধানীসহ বাংলাদেশের সর্বত্র সফর করে মহিলা সংগ্রাম পরিষদের শাখা গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান। ৪ এপ্রিল ১৯৭০ বেগম সুফিয়া কামালকে সভাপতি ও মালেকা বেগমকে সাধারণ সম্পাদিকা করে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' গঠন করা হয়। মিসেস জোবেদা খাতুন চৌধুরী, বেগম আবুল হাসিম, মিসেস রহিমা হারুন, মিসেস আনোয়ারা বাহার, আমেনা আহমেদ, সারা আলী, হামিদা হোসেন, নূরজাহান কাদের, আজিজা ইদ্রিস প্রমুখ এর সদস্য ছিলেন। এ সংগঠনের উদ্যোগে দেশে সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা ও মহিলা সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করা, রাজবন্দিদের মুক্তি, মহিলা শ্রমিকদের সমমজুরী, পর্যাপ্ত সংখ্যক মাতৃসদন, শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করা জিনিসের দাম কমানো ও নারী নির্যাতন বন্ধসহ নারী সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হয়েছিল।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুবী স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। এ বছর ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ফলে পাকিস্তানে দ্বিতীয় বারের মতো সামরিক শাসন জারি হয়। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন দেন। এ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ নির্বাচনে রাফিয়া আখতার ডলি, মিসেস নুরজাহানসহ বেশ কয়েকজন নারী নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা করা হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানে সরকার গঠন করার সুযোগ দিয়ে গণরায়ের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করা হবে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ও তার সহযোগী পশ্চিমা রাজনীতিবিদগণ তা করেন নি। ফলে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় গণআন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের শেষ পরিণতিই হলো পূর্বপাকিস্তানের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং পরিশেষে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম থেকে শুরু করে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে এ অঞ্চলের নারীসমাজ যে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে এসেছে এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচন পরবর্তীতে সূচিত রাজনৈতিক আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধেও তারা বিশেষ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন।

ইতোমধ্যে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ ভোটের রায় মেনে না নেওয়ায় শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের নারীসমাজকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে। ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী মতিয়া চৌধুরী মার্চ মাসে পরিচালিত প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে প্রথম কাতারে থেকে নেতৃত্ব দেন। শুধু রাজনীতিবিদ নয় এসময় নারী সংস্কৃতিকর্মীগণও নানাভাবে মুক্তি সংগ্রামে বাঙালিদের উদ্বুদ্ধকরণ কাজে সক্রিয় হন। এসব সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে লায়লা আরজুমান্দ বানু, আফসারী খানম, ফেরদৌসী রহমান, লায়লা হাসান, বিলকিস নাসিরুদ্দিন প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে হাজার হাজার নারী এ যুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হন। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মিসেস রাফিয়া আখতার ডলি, মিসেস নুরজাহান, মাহফুজা খানম, বেবী মওদুদ, জাহানারা ইমাম প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। রণক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে, মুক্তি শিবিরে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানসহ তাদের আশ্রয় এবং খাবার জোগান দিয়ে নাম জানা এবং না জানা অজস্র নারী মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদান রেখে এদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টির অব্যবহিত পর থেকে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরমানসিকতার বিরুদ্ধে যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তার প্রতিটি স্তরে নারীসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং আত্মত্যাগের ফলেই পাকিস্তান সৃষ্টির ২৪ বছরের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয় এবং বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র ও পরিসীমা

আলোচ্য গবেষণাকর্মটির ক্ষেত্র হলো পূর্ব বাংলা এবং এর রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, এর প্রকৃতি নিরূপন, বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। গবেষণাকর্মের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। বলা বাহুল্য যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সাল গুরুত্বপূর্ণ কাল বিভাজক বছর। ১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ভারত বিভক্তির ধারাবাহিকতায় বাংলাও বিভক্ত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ব-বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনাচারের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার সাথে পাকিস্তানের অপরাপর প্রদেশের বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কেবল ধর্মীয় ঐক্যবোধের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়েছিল শোষণমুক্ত এবং বৈষম্যহীন উন্নত জীবনের প্রত্যাশায়। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছর যেতে না যেতেই পূর্ব বাংলার মানুষ বুঝতে পারে যে, জাতীয়তাবাদের অন্যান্য উপাদান উপেক্ষা করে কেবল

ধর্মের ভিত্তিতে আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসী ও কর্তৃত্ববাদী স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ পরিদৃষ্টেই বাঙালি জাতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিসীমায় তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুধাবণ করতে সক্ষম হয়। ফলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে তারা তাদের অবস্থানের জানান দেয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি যে স্বাধিকার চেতনা লাভ করেছিল এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী দু'দশক নানা রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষের শাহাদাতবরণ ও বীর বাঙালির সুমহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিতাড়িত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি কালপর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ও বাংলা বিভক্তির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ইতিহাসের নব ধারার সূচনা এবং ১৯৭১ সালে এর পরিসমাপ্তির এ সময়কালের রাজনীতি এবং এতে নারীসমাজের ভূমিকা আলোচ্য গবেষণার নির্ধারিত পরিসীমাভুক্ত। তবে এতে প্রাসঙ্গিক কারণেই বাংলার রাজনীতিতে নারীসমাজের অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কিত আলোচনা যুক্ত করা হয়েছে। একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে রাজনীতি ও নারী বিষয়ক একটি আলোচনাও অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান সৃষ্টির শুরুতে আলোচ্য অঞ্চল 'পূর্ব বাংলা' প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। ১৯৫৫ সালে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' প্রদেশ করা হয়। তবে বর্তমান গবেষণায় আলোচনার সুবিধার্থে পূর্ব পাকিস্তান নয়; বরং পূর্ব বাংলা নামটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

বর্তমান সময়কে বলা হয় নারীর ক্ষমতায়নের যুগ। বর্তমান সময়ে পরিবারের বাইরে নারীদের বিচরণ ক্ষেত্র কেবল শিক্ষা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বৈশ্বিক পরিসরে রাজনীতিতেও তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী, সংসদ উপনেতা, প্রধান বিরোধী দলের চেয়ারপার্সন ও জাতীয় সংসদের স্পীকার সকলেই নারী। বর্তমান সরকারের মন্ত্রী পরিষদে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও নারী সদস্যের সংখ্যা ০৪ জন। বর্তমান জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত ৫০ জন ছাড়াও সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ২১জন মহিলা সংসদ সদস্য রয়েছেন। তবে আজকের এ অবস্থানে আসতে নারীদেরকে অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অনেক নারী রাজনৈতিক কর্মীর সন্ধান মেলে। যদিও রাজীতির পুরোভাগে থাকা মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছিল না। তবে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম সফল করতে সাধারণ কর্মী-সমর্থক হিসেবে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টিকে কোনোভাবেই খাটো করে

দেখার অবকাশ নেই। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়লগ্ন থেকেই রাজনীতিতে পূর্ব বাংলার নারীদের সক্রিয় পদাচারণা দেখা যায়। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটির রজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে বাঙালি নারীসমাজ গৌরবময় ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করেন। পাকস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে নারীসমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকার অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করা অতীব প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিক্রমায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনসহ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে বাঙালি নারীসমাজের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বিচ্ছিন্ন গবেষণাকর্ম ও আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কেও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাসহ গ্রন্থাকারে কিছু রচনা পরিদৃষ্ট হয়। তবে অবিভক্ত পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসে পূর্ব বাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে নারীসমাজের তাৎপর্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে কোনো সমন্বিত গবেষণা আমার জানা মতে, এ যাবত হয়নি। অথচ এরূপ একটি সমন্বিত গবেষণা সময়ের দাবি। কেননা এর মাধ্যমে আজকের প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সুদীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামে তাদের পূর্বসূরি নারীদের অবদান স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। আর এ থেকে প্রেরণা এবং দিক নির্দেশনা পেয়ে বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্ম আরো বেশি করে দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হবে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে নিজেদের সম্পৃক্ত করবে।

গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্নে সাধারণভাবে মানবিক ও সমাজবিদ্যা গবেষণায় অনুসরণীয় পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান (Analytical & Empirical) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এতে বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনাকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্যসূত্রসহ দ্বৈতায়িক তথ্যসূত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক জ্ঞাত বিষয়কে নতুন যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা ও বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণা কাজের প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে আলোচ্য সময়ে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও পর্যালোচনা করে নারীদের অবদান নিরূপণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণায় ব্যবহৃত দ্বৈতায়িক তথ্য উৎসের পর্যালোচনা

বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে প্রাথমিক (Primary Source) ও দ্বৈতায়িক উৎস (Secondary Source) থেকে তথ্য-উপাত্তসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। সমকালীন সরকারি-বেসরকারি দলিলপত্র, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িকী এবং সে সময়কার রাজনীতিতে সক্রিয় কয়েকজন বিশিষ্ট নারীর সাক্ষাৎকার এই গবেষণায় প্রাথমিক তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যসূত্র হিসেবে আলোচ্য গবেষণায় হাসান

হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ১৫ খণ্ড, (তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২) গ্রন্থটিতে পরিবেশিত তথ্য ও দলিলাদি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বর্তমানে নারী বিষয়ক গবেষণা ও আলোচনা ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে। এসব গবেষণার কিছু কিছু ইতোমধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ যাবৎ বাংলাদেশের নারীসমাজের উপর যে সব গবেষণা হয়েছে এর বেশির ভাগই নারী শিক্ষা, নারীসমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর। রাজনীতিতে নারীসমাজের সংগ্রামী ভূমিকা ও অবদান এবং তাদের নেতৃত্বের পর্যায়ে উত্তরণের বিষয়ে গবেষণা এবং রচনার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। বর্তমান গবেষণার পরিসীমার মধ্যে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারীসমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকলেও এ ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা বিষয়ক গবেষণা ও রচনাসমূহে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিশ্লেষণ অনেকটা ইতিহাসের মূল স্রোতের বিচ্ছিন্ন ধারা বলে মনে হয়। তবে এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এসব রচনার গুরুত্ব কম নয়। আলোচ্য গবেষণায় এসব রচনার বহুল ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নে বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত কিছু উল্লেখযোগ্য দ্বৈতায়িক তথ্যসূত্রের পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করা হলো।

জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী (বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এটি উনিশ শতকের শেষ থেকে ব্রিটিশ শাসনের ভারত বিভক্তি পর্যন্ত সময়কালে ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালি নারীসমাজের অংশগ্রহণ বিষয়ে একটি মূল্যবান রচনা। বর্তমান গবেষণার পটভূমি বিনির্মাণে এ গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রায় একই সময়কালে বাঙালি মুসলিম নারীদের রাজনৈতিক ভূমিকা আলোচিত হয়েছে Anowar Hossain এর *Muslim Women's Struggle for Freedom in Colonial Bengal 1873-1940* (Chittabarta Palit, Kolkata, 2008) গ্রন্থটিতে। সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থটিতে মুসলিম নারী শিক্ষা এবং পরিবর্তিত অবস্থায় অন্দরমহল থেকে রাজপথের রাজনীতি ও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

G.W. Choudhury রচিত *The Last Days of United Pakistan,* (Reprint, The University Press Limited, Dhaka, 2014) গ্রন্থটি আইয়ুব খানের পতনের পর থেকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সময় পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কিত একটি মূল্যবান রচনা। এতে পর্যালোচনাধীন সময়ে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা বিষয়ে কোনো স্বতন্ত্র আলোচনা নেই। তবে ১৯৬৯-১৯৭১ সাল সময়কালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপ্রবাহ বিষয়ে জানার জন্য এ গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রখ্যাত রাজনীতিবিজ্ঞানী Nazma Chowdhury তাঁর *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58* (The University Press Limited, Dacca, 1980) নামক গ্রন্থে পূর্ব বাংলার দু'টো প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ও

এর কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সেসময়কার রাজনীতির গতিধারা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ দু'টো নির্বাচনে বিশেষ করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নারীদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার কথা সুবিদিত। তবে আলোচ্য গ্রন্থে এতদবিষয়ে কোনো পৃথক বা বিস্তারিত আলোচনা নেই। এ বিষয়ে বিক্ষিপ্তভাবে যৎসামান্য তথ্য পাওয়া যায় এ গ্রন্থে। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ১৯৪৭-১৯৫৮ সালের পূর্ব বাংলার রাজনীতি সম্পর্কে গবেষণার জন্য এ গ্রন্থটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

Rounaq Jahan তাঁর *Pakistan: Failure in National Integration* (The University Press Limited, Dacca, 1973) গ্রন্থে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাকিস্তানে সামরিক, বেসামরিক বুর্জোয়া শ্রেণির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে দেশ পরিচালনা করা এবং এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট নানাবিধ বৈষম্য চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির পক্ষে অন্তরায়গুলো যৌক্তিকভাবে চিহ্নিত করেছেন। এ গ্রন্থে নারী রাজনীতির বিষয়ে আলোচনা অপ্রতুল হলেও বর্তমান গবেষণার সামগ্রিক রাজনৈতিক অধ্যয়নে এটি তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অলি আহাদ রচিত *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫* (বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ঢাকা, ২০১৫) গ্রন্থটি বর্তমান গবেষণায় পর্যালোচনাধীন সময়কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক ঘটনাবলি গ্রন্থাকার তাঁর এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেনে। আর এসব অধিকাংশ ঘটনার সাথেই তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। স্বতন্ত্রভাবে নারী বিষয়ক আলোচনা এ গ্রন্থে না থাকলেও ঘটনার পরম্পরা বর্ণনায় এতে কিছু মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে এবং বর্তমান গবেষণায় এসব ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলার নারী: সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুসন্ধান (স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৮) অদিতি ফাল্গুনী রচিত গবেষণাগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে বাংলার নারীদের সংগ্রামী জীবন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন প্রাচীন বাংলা থেকে নারীরা কীভাবে তাদের দীর্ঘ সংগ্রামী অভিযাত্রার পথ পাড়ি দিয়েছেন। তিনি এতে নারীদের রাজনৈতিকায়ন, ভোটাধিকার আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, '৫৪-এর প্রাদেশিক নির্বাচন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণের একটি চিত্র উপস্থাপন করেছেন। খুব বিশদভাবে না হলেও স্বল্পপরিসরে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে তাঁর গ্রন্থটির প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো এটি মূলতঃ বর্ণনাধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী নয়।

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির রচিত *ভাষা-আন্দোলন ও নারী* (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪) পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা বিষয়ক একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এটি লেখকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েকৃত

এমফিল গবেষণার পরিমার্জিত গ্রন্থরূপ। ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটির প্রথম তিনটি অধ্যায়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পটভূমি, সংগঠন ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আন্দোলনে নারীসমাজের ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে গ্রন্থটির চতুর্থ অধ্যায়ে। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে লেখক ২২জন নারী ভাষা সংগ্রামীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন এবং গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিপিবদ্ধ করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারীসমাজের ভূমিকা আলোচনা ও মূল্যায়নে গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশে নারীবিষয়ক গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে মালেকা বেগম অগ্রণী ও পথিকৃথের ভূমিকা পালন করছেন। তিনি নিজেও একজন নারী আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী ও নেত্রী। বর্তমান গবেষণার সময়কালে সংঘটিত পূর্ব বাংলার অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কৃত গবেষণা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি নারী বিষয়ক বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। নারী বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংখ্যাও অনেক। মালেকা বেগমের রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো *বাংলার নারী আন্দোলন* (ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ২০১০)। গ্রন্থটি ভূমিকা ছাড়া ১১টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে লেখক প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে গ্রন্থ রচনার সময়কাল পর্যন্ত বাংলার নারীসমাজের অবস্থা, নারী জাগরণ ও তাদের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন। কৃষক আন্দোলনে নারীসমাজের অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি এতে নারীসমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতাবোধ তৈরির লক্ষ্যে গড়ে উঠা বিভিন্ন নারী সংগঠন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৪৭ সাল থেকে সূচিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশেষকরে সামরিক শাসনামলে নারী আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সূচনায় নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো তিনি তাঁর গ্রন্থে সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এসব বিষয় বর্তমান গবেষণার পরিধিভুক্ত হওয়ায় মালেকা বেগমের এ গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

মালেকা বেগম রচিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো *নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক* (অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২)। গ্রন্থটিতে লেখক ১৯৪৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত নারীদের অধিকার আদায় তাদের মধ্যে সমাজ-সচেতনতা তৈরিতে যারা কাজ করেছেন, এতে নারী আন্দোলনের প্রগতিশীল স্রোতধারার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি ও নারীদের ভূমিকার বিশদ আলোচনা রয়েছে। *মুক্তিযুদ্ধে নারী* (দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫) মালেকা বেগম রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি তাঁর *একাত্তরের নারী: রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি* (মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা ২০০১) গ্রন্থের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ। মালেকা বেগম নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি তাঁর নিজের লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং মুক্তিযুদ্ধে

অংশ নেওয়া নারীদের স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার ও এতদবিষয়ে বিদ্যমান তথ্যসূত্র ব্যবহার করে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। নয়টি অধ্যায় বিভক্ত এ গ্রন্থটিতে মুক্তিযুদ্ধের তত্ত্বকাঠামোসহ এর প্রস্তুতিপর্ব ও মুক্তিযুদ্ধের নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি পর্যায়ে নারীদের গৌরবময় ভূমিকা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা রয়েছে এ গ্রন্থটিতে। মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান সম্পর্কিত পাঠের জন্য এটি একটি অনবদ্য গ্রন্থ।

মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক রচিত *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস* (দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৪)। গ্রন্থটি ১৮ থেকে ২০ শতক -এই তিনশ বছরের বাঙালি নারীর জীবন-সংগ্রামের ইতিহাসের একটি আলেখ্য। ইতিহাসের সুদীর্ঘ কালপরিক্রমায় বাঙালি নারীর জীবন বাস্তবতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। হাজার বছরের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতার অচলায়তন ভেঙে বাঙালি নারীসমাজ কিভাবে আজ দেশের ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুকে স্পর্শ করতে পেরেছে তার এক ধারাবাহিক বিবরণ রয়েছে এ গ্রন্থটিতে। নারী মুক্তি, নারী জাগরণ, নারী শিক্ষা, নারী আন্দোলন, নারী রাজনীতি ও নারী ক্ষমতায়নের সমন্বিত আলোচনায় ঋদ্ধ *আমি নারী* গ্রন্থটি নারী বিষয়ক যে কোনো গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উৎস হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে।

মালেকা বেগম সংকলিত ও সম্পাদিত, *নির্বাচিত বেগম: অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০*, তিন খণ্ড (পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬)। এটি মালেকা বেগমের শ্রমনিষ্ঠ একটি বিস্ময়কর কাজ। *বেগম* পত্রিকাটি ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই কলকাতার ১২ ওয়েলসলি স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। *বেগম* পত্রিকাটিকে বলা হয় খণ্ড ইতিহাসের প্রকাণ্ড আকর। পঞ্চাশ বছর বা তার কিছু বেশিকাল ধরে বাংলাদেশে নারীসমাজের যে-ধীর অগ্রগতি হয়েছে, পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে নারীসমাজ যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ধারণ করে রেখেছে *বেগম* পত্রিকা। অন্য কথায় বলা যায় যে, *বেগম* পত্রিকাটি ছিল বাঙালি নারীসমাজের জাগরণের অনুপ্রেরণার ভাণ্ডার। এ *বেগম* পত্রিকার নির্বাচিত প্রবন্ধ নিবন্ধের আলোকে তিনখণ্ডে বাঙালির সমাজচিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে। এতে *বেগম* পত্রিকার সচিত্র প্রতিবেদন, সংবাদ, সম্পাদকীয় ও আলোচনার আলোকে অবরোধ ও অন্তঃপুরের বেড়াজাল থেকে বাঙালি নারীসমাজের জাগরণ, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বাঙালি নারীদের অংশগ্রহণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-৫২) এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে (১৯৬৯-৭১) নারীসমাজের অংশগ্রহণের বিবরণ, যুদ্ধ-নির্যাতন, যুদ্ধ-শিশু এসব বিষয় নিয়ে নারীসমাজের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ সংকলনে সংযুক্ত নারী মুক্তি ও নারী আন্দোলনের যে ধারাবাহিক বিবরণ রয়েছে তা বর্তমান গবেষণাকর্মের আকর উৎস হিসেবেও বিবেচ্য।

হারুন-অর-রশিদ রচিত একটি গবেষণা গ্রন্থ *‘আমাদের বাঁচার দাবী’ ছয় দফা’র ৫০ বছর* (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬)। ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটিতে পটভূমিসহ ছয় দফা এবং একে কেন্দ্র করে পরিচালিত আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ গ্রন্থটিতে ছয় দফা আন্দোলনে নারীসমাজের ভূমিকা একবারেই স্থান পায়নি। তবে ছয় দফা আন্দোলনের ঘটনাক্রম সম্পর্কিত বর্ণনার জন্য গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এতদবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক কাজ হলো লেনিন আজাদের *‘ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান: রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি’* (দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭) গ্রন্থটি। এটি তাঁর পিএইচডি গবেষণাকর্মের গ্রন্থরূপ। এখানে তিনি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এ অভ্যুত্থানকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করে এর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করছেন। তাছাড়া এখানে পাকিস্তানের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জাতিগত দাবিসমূহ তুলে ধরে গণঅভ্যুত্থানের কার্যকরণ সম্পর্কে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটিতে গণঅভ্যুত্থানে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টিও আলোচনায় স্থান পেয়েছে-যা বর্তমান গবেষণার জন্য সহায়ক হয়েছে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের উপর আরেকটি প্রামাণ্যগ্রন্থ হলো মাহফুজ উল্লাহর *‘অভ্যুত্থানে ঊনসত্তর’* (ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩)। এখানে তিনি ১৯৬৮ সালের নভেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া সকল রাজনৈতিক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। এর সমর্থনে তিনি বেশ কিছু প্রামাণ্য দলিল ও চিত্র সন্নিবেশিত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন একটি অসংগঠিত রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে থেকেও ঊনসত্তরের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এমন এক ব্যাপক অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে যে, তাদের অভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খানের মতো একজন শক্তিশালী শাসকেরও পরাজয়বরণ করতে হয়েছিল। তবে এ গ্রন্থে নারীদের ভূমিকা প্রত্যাশিতভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদীর যৌথ রচনা *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী* (ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১২)। মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের বিচিত্র ভূমিকা ও অবদানকে এক মলাটের মধ্যে উপস্থাপনের সচেতন প্রয়াস রয়েছে এ গ্রন্থে। তবে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ যেমন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, তেমনি এতে সব নারীর অংশগ্রহণও হঠাৎ করে হয়নি। এর একটি দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে এ রাজনৈতিক পরম্পরা এবং প্রাক মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনীতিতে নারী সমাজের ভূমিকা আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় এ গ্রন্থটি একটি সহায়ক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, দুই খণ্ড (বাংলাদেশ, নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৯)। এই গ্রন্থে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে জড়িত নারীদের জীবনী সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে। যা আলোচ্য গবেষণায় রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট নারীদের পরিচয় জ্ঞাপক তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

অধ্যাপক মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম রচিত *স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারী* (হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮) গ্রন্থটি মূলত মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া কতিপয় নারীর জীবনী গ্রন্থ। মমতাজ বেগম নিজেই ছিলেন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে। এতে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিসহ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে অংশ নেওয়া নারীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি নারীদের ভূমিকাও উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে স্বাধীনতা পরবর্তী মুক্তিযোদ্ধা নারীদের অবস্থান ও তাদের মূল্যায়ন এবং দেশ ও সরকার কর্তৃক তাদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা হয়েছে এতে। মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান বিষযক অধ্যয়নের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র।

রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-৪৭), (বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬) রেজিনা বেগম রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরকৃত পিএইচডি গবেষণার পরিমার্জিত গ্রন্থরূপ। সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থটিতে বিশশতকের সূচনা থেকে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ এবং এতে নারীসমাজের তাৎপর্যময় ঐতিহাসিক ভূমিকার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ঠাঁই পেয়েছে। পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারী ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি. শীর্ষক আলোচ্য গবেষণাকর্মের পটভূমি নির্মাণে রেজিনা বেগমের এ গবেষণা গ্রন্থটি মূল্যবান সহায়ক সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭) একটি গবেষণা গ্রন্থ। এটি তাঁর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত পিএইচডি গবেষণার পরিমার্জিত রূপ। পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থটিতে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের ন্যায় নারীরাও বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করে অনবদ্য ও গৌরবময় ভূমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তাদের অংশগ্রহণ ছিল বহুমাত্রিক। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল নারীরা সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের জীবন বাজি রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় প্রদানপূর্বক বিভিন্ন দায়িত্ব স্ব-ইচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। প্রয়োজনের সময় যে বাঙালি নারী অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে পারে তার অন্যতম প্রমাণ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি গণবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়ে রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরাই দলের নেতৃত্ব দিয়ে পাক-বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে সফলতা অর্জন করেন। এ সময় নারীরা পুরুষের সমান কৃতিত্ব রাখতে না পারলেও তাদের সার্বিক ভূমিকা অস্বীকার করা চলে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের নিরীহ বাঙালি নারীরা পাক-বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত ও নির্যাতিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের সহযোগী শক্তি হিসেবে নারীরা যে ভূমিকা পালন করেছিল তার কিছুটা স্বীকৃতি দেখি দু'জন নারী মুক্তিযোদ্ধাকে বীর প্রতীক খেতাব প্রদানের মাধ্যমে। মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে এ দেশের নারীদের সাহসী তৎপরতা, উৎসাহ,

উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণার গুরুত্ব অপরীসীম। মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান বিষয়ক অধ্যয়নের জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র। বর্তমান গবেষণার একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী রচিত *নারী ও রাজনীতি*, অবসর, ঢাকা, ২০১২ গ্রন্থে নারীবাদ, উদার নারীবাদ, বাংলায় নারী আন্দোলনে ব্রিটিশ আমল (১৭৫৭-১৯৪৭), জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমলে রাজনীতিতে নারীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীদের ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে নারী, উন্নয়ন ও রাজনীতি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য, তত্ত্ব ও বিশ্লেষণকে সমন্বিত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরা যে বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছে তার বিবরণী সুস্পষ্টভাবে আছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের অংশগ্রহণ ছিল প্রশংসনীয়। আন্দোলন সংগ্রামে নারীদের সরব উপস্থিতি থাকলেও জাতীয় নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীসমাজের প্রতিনিধিত্ব ছিল একেবারেই নগণ্য। সরকারি চাকরিতে কতিপয় নারী ব্যক্তিগত যোগ্যতাবলে উচ্চ সরকারি চাকরি লাভ করেছেন। কিন্তু সরকারি চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীরা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে পুরুষদের চেয়ে পশ্চাৎপদতার কারণে নারীসমাজ চাকরি ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা নিয়ে নানা ঘটনাবলি সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা আধুনিক গবেষকদের মনে নানা প্রশ্নের যোগান দিয়েছে।

শ্যামলী ঘোষ, (অনু. হাবীব-উল-আলম) *আওয়ামী লীগ* ১৯৪৯-১৯৭১ (দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৭) একটি গবেষণা গ্রন্থ। এটি ড. শ্যামলী ঘোষের, *"The East Pakistan Awami League, 1956-1971"* শীর্ষক অভিসন্দর্ভের রূপান্তরিত গ্রন্থরূপ। ১৯৯০ সালে বইটির ইংরজি সংস্করণ *"The Awami league 1949- 1971"* ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি জন্মলগ্ন থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ের আওয়ামী লীগের রূপান্তর পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি আওয়ামী লীগের ইতিহাস বিষয়ক আলোচনার জন্য তথ্যবহুল এবং গবেষণার এক অমূল্য উৎস। অবশ্য এতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নারী সমাজের ভূমিকা সেই অর্থে স্থান পায়নি। তথাপি পাকিস্তানের রাজনীতির বিকাশ ও এতে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য গ্রন্থটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস হিসেবে বিবেচ্য।

নারী নেতৃত্ব বিষয়ক গবেষকদের মধ্যে আরেকজন বিখ্যাত গবেষক হলেন মফিদা বেগম। তাঁর গ্রন্থ *আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব (১৯৪৯-২০০৯)* (হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০)-এ আওয়ামী লীগের জন্ম, বিকাশের ধারা, সাংগঠনিক কাঠামো, মুক্তিযুদ্ধ, এ দেশের রাজনৈতিক দল ও নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক

আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থে আলোচিত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক বিকাশের বিবর্তন ধারায় নারীর সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত তথ্যমূলক আলোচনা বর্তমান গবেষণায় সহায়ক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার, (অনু. নুরুল ইসলাম খান, সম্পাদনা, আফতাব হোসেন), *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১) এ গ্রন্থে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও কার্যক্ষমতা, সামাজিকীকরণ ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কিত আলোচনা রাজনীতিক পরিমণ্ডলে নারীর অভ্যুদয় রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে কোনো সন্দেহ নেই। রাজনীতিতে নারীরা কালে কালে এবং যুগে যুগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এ গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে, বিভিন্ন দেশে নারীরা কোন কোন প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন। অনবদ্য এ গ্রন্থটির মাধ্যমে নারীদের রাজনীতিতে প্রবেশের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায় যা আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গরূপে না হলেও আংশিকভাবে সহায়ক হয়েছে।

প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমেদ, মোনায়েম সরকার ও ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)* (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩) গ্রন্থটি বাংলাদেশের মহান মুক্তিসংগ্রাম এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা সংকলন। আলোচ্য গ্রন্থটিতে পর্যালোচনাধীন সময়ের রাজনীতিতে নারীসমাজের ভূমিকা সম্পর্কিত কোনা স্বতন্ত্র আলোচনা নেই, তবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের জন্য এটি তথ্যবহুল এবং বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের উৎস। বর্তমান গবেষণার একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ড. মোহাম্মদ হান্নান রচিত *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১* (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩) গ্রন্থে উল্লেখিত সময়ে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ পরিধিবহুল গ্রন্থটিতে ছাত্র আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীদের ভূমিকা যথাযথভাবে উঠে আসেনি। এতদবিষয়ে গ্রন্থটির আলোচনা বিক্ষিপ্ত ও অপ্রতুল।

অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস

পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারীঃ ১৯৪৭-৭১ খ্রি. শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

ভূমিকাঃ অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় আলোচ্য গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র ও পরিধি নির্ধারণসহ বিষয়বস্তু এবং গবেষণার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে বিদ্যমান দ্বৈতায়িক সহায়ক তথ্য-উপাত্তেরও একটি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সংযোজন করা হয়েছে ভূমিকায়। প্রাসঙ্গিক কারণে এতে অভিসন্দর্ভের গঠন কাঠামো বা অধ্যায় বিন্যাসও স্থান পেয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'নারী ও রাজনীতি: একটি তাত্ত্বিক আলোচনা'। নারীবিষয়ক গবেষণার জন্য নারীবাদ, নারী জাগরণ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান গবেষণার বিষয়টির যথার্থতা নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: 'বাংলার রাজনীতি ও নারী: একটি ঐতিহাসিক পটভূমি' শিরোনামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দীর্ঘ পরিক্রমায় নারী জাগরণ ও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নির্ণয়ের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে নারীসমাজের রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠেছে এবং ঔপনিবেশিক যুগে অবিভক্ত বাংলায় নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ হয়েছে এ অধ্যায়ে সে বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও নারী'। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। এ পর্যায়ে বাংলা বিভক্ত হয়ে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। তবে যে প্রত্যাশা নিয়ে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়েছিল তা পূরণ হয়নি। বরং পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরই পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলায় তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অংশ হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানে অস্বীকৃতি জানায়। এ ভাষা বিতর্ককে কেন্দ্র করে শুরু হয় পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮-৫২ সাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে বাঙালি নারীসমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদান আলোচনা-পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের প্রয়াস রয়েছে এ অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়: '১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে নারীসমাজ' শিরোনামে এ অধ্যায়টিতে পূর্ব বাংলায় তথা পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনি জোট হিসেবে যুক্তফ্রন্ট নামক রাজনৈতি মোর্চা গঠনসহ এ নির্বাচন সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এ নির্বাচনে নারীসমাজের বহুমুখী তৎপরতা ও ভূমিকা নিরূপণ ও বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ের আলোচনায়।

পঞ্চম অধ্যায়: পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'পূর্ব বাংলার এক দশকের (১৯৫৫-৬৫ খ্রি.) রাজনীতি এবং নারীসমাজ'। এ এক দশক ছিল পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত ঘটনাবহুল। এসময় সংবিধান বিরোধী আন্দোলন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি এবং পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৩ ও ৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন এবং ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতো অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। এসব রাজনৈতিক ঘটনাক্রম ও এতে নারীসমাজের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: 'ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন ও নারীসমাজ' অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম। এ অধ্যায়ে 'আমাদের বাঁচার দাবি' খ্যাত ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পটভূমি, ছয় দফা দাবি, এবং ছয় দফাকে কেন্দ্র করে সূচিত রাজনৈতিক আন্দোলন এবং এতে নারীসমাজের সক্রিয় ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

সপ্তম অধ্যায়: সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নারী'। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত ও নিপীড়িত বাঙালি জাতির ক্ষোভের চরম বিস্ফোরণ এ গণঅভ্যুত্থান। ছয় দফা পরবর্তীকালে ছাত্র সমাজের উপস্থাপিত ১১ দফা কর্মসূচির প্রতিক্রিয়ায় সরকারের দমন নিপীড়নের ফলে যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়, এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হলো ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। এতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে নারী সমাজেরও উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। এ অধ্যায়ে এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়: '১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও নারী সমাজ' অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার ফল। এ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং নির্বাচনের ফলাফল বানচালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রেক্ষাপট তৈরি করে। সার্বিক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এ নির্বাচনের ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭০ সালের এ গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন এবং এতে নারী সমাজের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনা এ অধ্যায়ের মূল উপজীব্য।

নবম অধ্যায়: নবম অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী'। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘ দু'যুগের শাসন-শোষণের প্রতিবাদে বাঙালির দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের উল্লেখযোগ্য ও বহুমুখী অবদান রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের প্রায় সর্বক্ষেত্রে সশস্ত্র যোদ্ধা, প্রশিক্ষণে ও বহুমাত্রিক অংশগ্রহণ করেছে নারীরা। এ অধ্যায়ে নারীসমাজের এ অবদান মূল্যায়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

উপসংহার: অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সার নির্যাস স্থান পেয়েছে উপসংহারে।

অভিসন্দর্ভের শেষদিকে একধিক পরিশিষ্টে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকচিত্রসহ কিছু দলিলাদি যুক্ত করা হয়েছে। সবশেষে রয়েছে এ গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত সহায়ক তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জির একটি তালিকা।

প্রথম অধ্যায়

রাজনীতি ও নারী: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

ভারতীয় উপমহাদেশে নারী আন্দোলন এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাস প্রাচীন, সংগ্রামমুখর ও বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণে নারীদের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক নারী স্বীয় প্রতিভা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, যোগ্যতা ও অসম সাহসিকতার অক্ষয় স্বাক্ষর রেখেছেন রাষ্ট্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীসমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাচীন, মধ্যযুগ এমনকি আধুনিককালেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর পরিচয় কেবল কারো মা, স্ত্রী, কন্যা অথবা বোন। অধিকাংশ পুরুষই নারীকে মানুষ বা আপন পরিচয়ে না দেখে উপর্যুক্ত পরিচয়েই দেখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। মিশরের ক্লিওপেট্রো (খ্রি.পূর্ব ৬৯-৩০ খ্রি. পূর্বাব্দ), বাইজেন্টীয় সম্রাজ্ঞী আইরিন (৭৫২-৮০৩খ্রি.), ইতালির কাউন্টেস ম্যাটিল্ডা (১০৪৬-১১১৫ খ্রি.), দিল্লির সুলতান রাজিয়া (১২০৫-১২৪০খ্রি.) ও মিশরের মামলুক সুলতান শাজার আল-দার (১২১৫-১২৫৭খ্রি.), ফ্রান্সের বীর নারী জোয়ান অব আর্ক (১৪১২-১৪৩১ খ্রি.)-এর কথা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তাঁদের কর্মগুণে। মুঘল ভারতে রাজমুকুট পরিধানকারী কোনো নারী শাসক ছিলেন না, কিন্তু সম্রাজ্ঞী নূরজাহানসহ সমকালীন রাজনীতিতে সক্রিয় বেশ কয়েকজন নারীর নাম ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে। নবাবী যুগে বাংলায়ও রাজনীতিতে সক্রিয় নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসনামলেও এ ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে উপমহাদেশের মানচিত্রে পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিভক্ত হয়। পূর্ব বাংলা পাকিস্তান এবং পশ্চিম বাংলা ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হিসেবে যুক্ত হয়। পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারী সমাজের ভূমিকা অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বর্তমান গবেষণার মূল উপজীব্য।

আধুনিককালে নারী বিষয়ক কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে নারীবাদ সম্পর্কিত ধারণা উপস্থাপন ও আলোচনাকে জরুরি হিসেবে গণ্য করা হয়। আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রেও মূল আলোচনার পূর্বে নারীবাদ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হলো। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে[১] যাযাবর সমাজ জীবন ছিল নারী নির্ভর এবং মাতৃতান্ত্রিক। কিন্তু যখন

১. এ যুগে মানুষ ছিল গুহাবাসী, যাযাবর এবং তাদের স্থায়ী আবাস ছিল না। তারা খাদ্য সংগ্রহ করত কিন্তু খাদ্য উৎপাদন করতে জানত না। বিস্তারিত মাহমুদা ইসলাম, *নারী: ইতিহাসে উপেক্ষিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা,২০১২ ,পৃ. ২১

আর্যরা প্রাক-আর্যদের কাছ থেকে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত্ব করে, তাঁবুর পরিবর্তে পোড়ামাটির গৃহে বাস করা শুরু করে, কৃষি উৎপাদনে লাঙলের ব্যবহার শুরু হলো এবং জমিতে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলো, তখনই কদর শুরু হলো পেশিশক্তির। আর এ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নারীরা পরিবার ও সমাজে তাঁর অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য হারালেন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে নারীরা গৃহে আবদ্ধ এবং পুরুষের অধস্তন হয়ে পড়লেন। এভাবেই নারীরা সমাজের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শ্রেণিভুক্ত হয়ে পড়লেন।[২] নারীদের অনুৎপাদনশীল গৃহস্থালির কাজে সম্পৃক্ত হওয়া এবং অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় নারীরা পরিবার ও সমাজে তাদের কর্তৃত্ব হারায় বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সাথে সাথে পুরুষরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়সহ সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। আর এভাবেই নারীরা সর্বক্ষেত্রে পুরুষের অধীন হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে এ অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে উঠে নারীরা এবং এটাই যেন হয়ে ওঠে তাদের বিধিলিপি, অন্য কথায় সামাজিক রীতি।[৩]

১.১: নারীবাদ

নারী জাতিকে উপর্যুক্ত পরাধীন অবস্থা থেকে সমাজের মূল স্রোতোধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ, দর্শন ও তত্ত্বের প্রচলন হয়েছে- এসব মতবাদ ও দর্শন সাধারণভাবে 'নারীবাদ' নামে খ্যাত। নারীবাদ শব্দটি ইংরেজি 'Feminism' শব্দের বঙ্গানুবাদ। আর ইংরেজি Feminism শব্দটি এসেছে ফরাসি Femmenisme শব্দ থেকে। ফরাসি Femme শব্দের অর্থ নারী এবং এর সাথে isme মতাবাদ শব্দযোগে তৈরি হয়েছে নারীবাদ কথাটি। ফ্রান্সে শব্দটির প্রথম ব্যবহার শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষায় এর প্রচলন শুরু হয়।[৪]

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, নারীবাদ একটি উনিশ শতকীয় ধারণা বা দর্শন। ফরাসি দার্শনিক ও ইউটোপীয় বা কল্পলৌকিক চিন্তাবিদ ফ্রাঙ্কো-ম্যারি চার্লস ফুরিয়ে (François Marie Charles Fourier, 1772-1837) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 'নারীবাদ' শব্দটির প্রথম আনুষ্ঠানিক ব্যবহার করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।[৫] তিনি এক কল্পিত নারীকে বুঝানোর জন্য নারীবাদ কথাটি ব্যবহার করেছিলেন- যে নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও মুনাফার ওপর নয় বরং পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ওপর ভিত্তিশীল সমাজের দ্বারা

---

২. সঞ্চারী রায় মুখার্জী, *নারীবাদী আন্দোলন*, রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পাদিত), প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, ২০০৮, পৃ. ৬৩

৩. কনক মুখোপাধ্যায়, *নারী আন্দোলনের কয়েকটি কথা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৭৫, পৃ.৫

৪. মাহমুদা ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, ১০৫

৫. Goldstein, L. "Early Feminist Themes in French Utopian Socialism: The St.-Simonians and Fourier", *Journal of the History of Ideas,* vol.43, No. 1. 1982, p. 92

পরিবর্তিত হবে এবং অন্যকে পরিবর্তন করবে।[৬] তবে বৈশ্বিক আন্দোলন হিসেবে ১৮৮০ সালে ফ্রান্সে, ১৮৯০ সালে যুক্তরাজ্যে এবং ১৯১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নারীবাদ শব্দটির প্রচলন হয়। বস্তুত, নারীবাদ কোনো একক, একচ্ছত্র মতবাদ নয়, বরং নানা মতের সম্মিলিত ও সমষ্টিগত তত্ত্বে এর উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। বস্তুত, নারীবাদ সম্পর্কে রয়েছে নানাবিদ তত্ত্ব ও মতবাদ। আর এ কারণেই নারীবাদের কোনো একক, সর্বজনস্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নিরূপণ দুরূহ। জেন্ডার বিশ্বকোষে নারীবাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে -নারীবাদ একটি সামাজিক আদর্শ ও আন্দোলন, যা লিঙ্গ সাম্যে আস্থাশীল এবং লিঙ্গ বৈষম্যবাদী প্রাধান্যবশ্য পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙ্গে লিঙ্গ সাম্য ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দায়বদ্ধ এবং যা নারীর দৈহিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, যৌনতাকেন্দ্রিক, ক্ষমতাকেন্দ্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সচেতন ও সম্মিলিত প্রয়াস।[৭] বাংলাদেশের প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী মাহমুদা ইসলাম এর ভাষ্য মতে:

> Feminism is a belief in sexual equality between man and woman combined with a commitment to eradicate domination of man over woman and to transform society into a safe haven for men and women to live as equal human beings having equal rights and obligations. Feminism is the idea that women should have political, social, sexual, intellectual and economic rights equally with those of men.[৮]

Helen Tierney সম্পাদিত *Women's studies Encyclopedia* গ্রন্থে Feminism এর যে সংজ্ঞাটি দেয়া হয়েছে তা হলো "Feminism affirms the value of women and womens contributions to social life anticipates a future where barriers to womens full participations in public life will be removed"[৯] এ সংজ্ঞা বিশ্লেষণে বলা যায় নারীবাদ একদিকে নারীর বিবিধ ভূমিকার মূল্যায়ন করে, অন্যদিকে সমাজে নারীর সর্বোচ্চ ভূমিকা পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পথনির্দেশ করে। Judith Astellara (জুডিথ অ্যাস্টেলারা) তাঁর *Feminism and Democratic Transition in Spain* গ্রন্থে লিখেছেন- "নারীবাদ হচ্ছে সামাজিক রূপান্তর ও আন্দোলনের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা, যা নারী নিপীড়ন বন্ধ করার চেষ্টা করে।[১০] কারো কারো মতে, নারীবাদ হলো এমন একটি দর্শন–যা সভ্যতায় মানুষ হিসেবে পুরুষের সাথে সর্বার্থে নারীর সমতা ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। নারীবাদ সমাজে নারীর সমতা অর্জন,

---

৬. Sheila Rowbotham, *Women in Movement: Feminism and Social Action*, Routledge, New York and London, 1992, p.4

৭. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, *১ম খণ্ড*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬, পৃ. ৭৬০

৮. Mahmuda Islam, 'Feminism', *Banglapedia*, *https://en.banglapedia.org/index.php?title=Feminism*, Accessed on 28 June, 2021)

৯. Helen Tierrey (ed.) , *Womens studies encyclopedia* ,(Revised and Expanded Edition) ,vol-1 New Delhi, Rawat publications, 2008, p.476

১০. মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, ঢাকা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা ২০০৬, পৃ. ৪

বিশেষ করে পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের যৌক্তিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। নারীবাদ দাবি করে নারী পুরুষের তুলনায় একদিকে সক্ষম, অন্যদিকে সামাজিক অবদানের দিক দিয়ে পুরুষ থেকে কম নয়।

১.২: নারীবাদের উদ্ভব ও বিকাশ

একটি আন্দোলন হিসেবে নারীবাদের উদ্ভব ও বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। গ্রিক দার্শনিক প্ল্যাটোসহ অনেক মনীষী নানা যুগে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নারী সম্মানজনক অবস্থানের সপক্ষে কথা বলেছেন। দার্শনিক প্লেটো তাঁর বিখ্যাত *Republic* গ্রন্থে নারীর প্রশ্নে আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নারীর অবস্থান সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেন সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য একই শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকবে এবং উভয়ের সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য একই রকম হবে।[১১] প্লেটোর মতবাদ থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হচ্ছে তিনি প্রত্যেক মানুষের (নারী পুরুষের আলাদা নয়) মেধা বিকাশের জন্য সমান সুযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেয়েছেন, একইভাবে সমাজে কার্যবণ্টনের ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, নারী-পুরুষের জন্য পৃথক কর্মকাণ্ডকে প্লেটো অযৌক্তিক মনে করেছেন।[১২] তবে বাস্তবে গ্রিক, এমনকি রোমান সাম্রাজ্যের পতনোত্তরকালে খ্রিস্টীয় মতবাদের প্রাধান্যের যুগেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে তার ন্যায্য মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।

অনেকেই বলে থাকেন যে, নারী অধিকারের সর্বপ্রথম প্রবক্তা ছিলেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)। কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁকে 'বিশ্বের প্রথম নারীবাদীদের অন্যতম' আখ্যা দিয়েছেন। সপ্তম শতাব্দীতে তিনি আরবদেশের নারীকে বিবাহ, তালাক এবং উত্তরাধিকারের যে অধিকার প্রদান করেছিলেন, তাঁর সময়কালে বিশ্বের কোথাও নারীর এসব অধিকার ছিল না। তবে একথাও সত্য যে, ইসলাম ধর্ম নারীর মানবিক ও আর্থ-সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি দিলেও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারীকে সমাজ ও রাষ্ট্রে তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয়নি। পুরুষ অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিমান, সাহসী ও উৎকৃষ্টতর; অন্যদিকে নারী দুর্বল, অসম্পূর্ণ, যুক্তিবর্জিত ও নিকৃষ্ট- এসব অপযুক্তি দিয়ে নারীসমাজকে সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অধিকার বঞ্চিত করা হয়।

তবে সতেরো শতকের শেষ ভাগে ও আঠারো শতকের শুরুতে নারী সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের পরিবর্তন হতে থাকে। ইউরোপের নবজাগরণ (রেনেসাঁ), ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, শিল্পবিপ্লব, পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার উদার ও গণতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ-ব্যক্তিস্বাধীনতার তত্ত্ব ইত্যাদি সামাজিক পরিবর্তনগুলোর সাথে সাথে নারীর সামাজিক অবস্থান ও অধিকারের বিষয়গুলোর পরিবর্তন

---

১১. মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
১২. *ঐ*

আসে। পরিবর্তিত বাস্তবতায় নারীসমাজ নিজেরাই তাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ১৬৬২ সালে নারীদের অধিকার অর্জনের দাবিতে ওলন্দাজ নারী মার্গারেট লুকাস 'Female Orations' শীর্ষক এক প্রবন্ধে নারীর অধিকারের দুর্দশা ও বৈষম্যের কথা তুলে ধরেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন যে,

> পুরুষ আমাদের বিরুদ্ধে দারুণ বিবেচনাহীন ও নিষ্ঠুর আচরণ করে, ওরা সব ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে কিন্তু আমাদের বেলায় অবরোধ সৃষ্টি করে মেয়েদের সঙ্গেও মিশতে দেয় না। আমরা বাঁদুড় বা পেঁচার মতো বাস করি, পশুর মতো ভারবাহী জীব যেন আমরা। আমরা প্রতিনিয়ত পোকামাকড়ের মতো মৃত্যুবরণ করি।[১৩]

বিশ্বের নারী জাগরণের ইতিহাসে নারীর পরাধীনতা ও অসম অধিকারের বিষয়ে প্রথম লিখিত তথ্য হিসাবে এই প্রবন্ধটি পরিচিত। ১৬৭৫ সালে Mrs Hannah Woolley নামে একজন স্কুল শিক্ষিকা তাঁর রচিত *Gentlewomen's Companion* নামক গ্রন্থে পুরুষতান্ত্রিকতা, নারী-পুরুষের বৈষম্য, নারী-পুরুষের সমান মেধাও নারীকে উচ্চশিক্ষার অধিকার থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত রাখার বিষয়টি খোলাখুলিভাবে সবার সামনে উপস্থাপন করেন।[১৪]

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত রয়েছে, প্রথমত ১৭৭৬ সালে আমেরিকায় প্রণীত 'Declaration of Independence ও দ্বিতীয়টি ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে প্রণীত The Declaration of the Right of Man and of the Citizen. ১৭৭৬ সালে আমেরিকার 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' এর প্রণেতা John Adams এর কাছে তাঁর স্ত্রী Abigail Adams 'Remember the Ladies শীর্ষক একটি পত্র লিখেছিলেন। একে নারীর অধিকার দাবির গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। মিসেস এডামসের এ চিঠিটিকে স্বামীর কাছে লেখা স্ত্রীর চিঠি না বলে একজন আইন প্রণেতার কাছে নারীজাতির পক্ষ থেকে পেশ করা দাবিনামা বলাই সঙ্গত। এতে মিসেস এডামস স্বামীদের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদানের বিষয়ে নিষেধ করেন। কারণ পুরুষ সুযোগ পেলেই নৃশংস ও জুলুমবাজ হয়ে উঠে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "যদি নতুন আইন নারীদের প্রতি যথার্থ যত্নবান না হয়, তাহলে তাঁরা বিদ্রোহ করবেন এবং যে আইনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে না বা নারীদের বলবার কোনো সুযোগ থাকবে না, তেমন আইনের শাসন তারা মেনে নিবেন না।"[১৫] বলা বাহুল্য যে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী নিয়ে ফরাসি বিপ্লবে রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে নারীদের ও অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। এ আন্দোলনে নারীরা শুধু রাজতন্ত্র নয়, তারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অত্যাচারের অবসান এবং নারীর অধিকারও দাবি করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লব পরবর্তী কালে দেখা যায় ফরাসি আইনসভায় গৃহীত হয় The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen

---

১৩. মালেকা বেগম, *নারী মুক্তি আন্দোলন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ১৭

১৪. Dale Spender (ed.), *Feminist Theories*,The Women's Press Ltd, London,1983, p.28

১৫. Alice S. Rossi (ed.), *The Feminist Paper: From Adams to be bahavoir* , Boston: Northeastern University press, 1944, p. 10-11

এ তাদের প্রত্যাশা পূরণ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, ১৭৮৯ সালে অক্টোবর মাসে ফরাসি নারীরা জাতীয় পরিষদের কাছে আবেদন করেন নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে। কিন্তু সংবিধান সভা যখন মানুষের অধিকারের সনদ ঘোষণা করল সেখানে নারীদের অধিকারের কোনও কথা ঘোষণা করা হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নারীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং জাতীয় পরিষদের সামনে সমাবেশ করে বলেন, আপনারা অতীতের সকল কুসংস্কার দূর করলেও সবচেয়ে ব্যাপক ও প্রাচীনতম কুসংস্কারটি বহাল থাকতে দিয়েছেন, এর ফলে গোটা দেশের অর্ধেক মানুষ রাষ্ট্রীয় পদ, অবস্থান, সম্মান ও সর্বোপরি আপনাদের মাঝে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।[১৬] এর প্রতিবাদে এ সময়ে ফরাসি নারী নেত্রী অলিমপি দ্যা গোজ রচনা করেন The Declaration of the Rights of Women and of the Female Citizen. এর ফলে তাঁকে ফরাসি সরকার গিলেটিনে মৃত্যুদণ্ড দেন। প্রতিবাদ করার জন্য দ্যা গোজ ছাড়াও আরো অনেক নারীকে মৃত্যুদণ্ড দেন ফরাসি সরকার।

আমেরিকার স্বাধীনতা এবং ফরাসি বিপ্লব নারীদের মনে এ বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যে, এর মাধ্যমে নারীমুক্তির বিষয়টি ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু আমেরিকার স্বাধীনতার সনদ এবং ফরাসি আইন সভায় গৃহীত অধিকার বিষয়ক আইনে তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়। তারা অনুধাবন করেন যে, কেবল পুরুষদের ওপর নির্ভরতার মাধ্যমে তাদের মুক্তি সম্ভব নয়। এমন একটি পরিস্থিতিতে ১৭৯২ সালে ইংরেজ লেখিকা Marry Wllstone Craft-এর যুগান্তকারী গ্রন্থ *A Vindication of the Rights of Women* প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে মেরী নারী সম্পর্কে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সকল কুসংস্কার, বিশ্বাস ও রীতিনীতি চ্যালেঞ্জ করেন এবং নারী শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নারীর সার্বিক উন্নয়ন মেরীর একান্ত কাম্য হলেও এর জন্য তিনি নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তাঁর উত্তরসূরি অনেক ব্রিটিশ নারী শিক্ষাকে নারী উন্নয়নের প্রধান দাবিতে পরিণত করায় ব্রিটেনে নারী শিক্ষার সুযোগ ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়। শিক্ষিত নারীরা পূর্বের তুলনায় অধিকার সচেতন হওয়ায় নারী আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ নেয়।

১৮৪৮ সালে ইংল্যান্ডে দাসপ্রথা বিরোধী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্রিটিশ নারী এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন তাঁর স্বামীর সাথে যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অন্য একজন নারী বিখ্যাত কোয়েকার প্রচারক লুক্রেসিয়া মট। সম্মেলনে তাদের দু'জনকে পিছনের সারিতে বসতে দেয়া হয়। তাঁরা লক্ষ করেন এ সম্মেলনে নারীদের কার্যত কোনো অবস্থান নেই। এ দু'জন নারীর পক্ষে সেদিনের সম্মেলনের বৈষম্য মেনে নেওয়া কষ্টকর হয়েছিল। এই অপমান তাদেরকে মহৎ এক কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর উপলব্ধি করে নারীকে নিজস্ব শক্তি ও সংগঠন বলে নিজেদের অধিকার আদায় করতে হবে। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে,

---

১৬. রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার (অনুবাদ: নূরুল ইসলাম খান), রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৩৯

একটি নারী অধিকার সম্মেলন করবেন। ১৮৪০ সালের জুলাই মাসে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের ‘সেনেকা ফলস’ নামক শহরে “নারীর সামাজিক, নাগরিক এবং ধর্মীয় অবস্থা ও অধিকার” বিষয়ক এক সম্মেলন আয়োজন করেন। দু’শো জন সাহসী নারী ও পুরুষ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে এলিজাবেথ স্ট্যান্টন “নারীর অধিকার” নিয়ে একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান, আমাদের সামাজিক জীবনে অনেক সমস্যা রয়েছে, আমাদের রাজনৈতিক অধিকার নেই। পুরুষদের মতো আমরা আইনসভায় আবেদন করতে পারিনা। আমরা স্বাধীন হতে চাই। তিনি এই বক্তৃতায় মূলত (ক) স্বাধীনতা (খ) সাম্যতা (গ) মর্যাদা (ঘ) ভোটাধিকার (ঙ) সমানাধিকার কথা বলেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় তার বক্তৃতায় জানিয়েছিলেন নারীকে তার চিরন্তন অধিকার থেকে কিছুতেই কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। নারীর কণ্ঠে আজ তাই একটি কথাই সোচ্চার হয়ে উঠেছে ‘অধিকার’।[১৭] সম্মেলনে এলিজাবেথ Declaration of Sentiments একটি উপস্থাপন করেন। এতে ১৮টি দাবি ও অভিযোগনামা পেশ করা হয়েছিল। ভোটাধিকারসংক্রান্ত দাবিটি ছাড়া বাকি সবকয়টি দাবি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ভোটাধিকার প্রশ্নে নারীরা তখনো নিজেরাই একমত হতে পারেননি। একদল মনে করেন যে, যেহেতু সরকার ও সমাজ পুরুষের হাতে, তাই তারা নারীদের ভোটাধিকারের দাবিটি সুনজরে দেখবেন না। ফলে তারা অন্য দাবিগুলো পূরণেও গড়িমসি করবে। তাই বৃহত্তর স্বার্থে এটি পরিহার করা উচিৎ। অবশ্য এরূপ দ্বিধাবিভক্ত সত্ত্বেও এ দাবিটিও গ্রহণ করা হয়েছিল।[১৮]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ নারী নেত্রী হ্যারিয়েট টেইলর মিল এবং তাঁর স্বামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিল নারীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার হন। হ্যারিয়েট টেইলর মিল *Enfranchisement of Women* নামক গ্রন্থে প্রচলিত নারী আইনের বিরোধিতা করেন এবং রাজনৈতিক নিয়মের পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। তিনি ব্রিটিশ নারীদের পূর্ণ আইনগত ও রাজনৈতিক নাগরিকত্বের দাবি করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিল ১৮৬৯ সালে *The Subjection of Women* নামক গ্রন্থে নারীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়ে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন।[১৯] এ গ্রন্থে মিল তৎকালীন সমাজে পুরুষের অধীনে নারীর জীবনের শোচনীয় বাস্তবতা উপস্থাপন করেন। তিনি নারীর অধীনতাকে তুলনা করেছেন দাসত্ব প্রথার সাথে। তিনি বলেন, “এখন যাকে নারী প্রকৃতি বলা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম বিষয়। একদিকে তা পীড়নের, আরেক দিকে তা অস্বাভাবিক প্ররোচনার ফল।” তার মতে,

---

১৭. তামান্না, ‘নারীর লড়াই জারি আছে, থাকবে’, https://sksew.com/welcome/singlepost/international-womens-day-patriarchy-india, (Accessed on 18 July, 2021)

১৮. মাহমুদা ইসলাম, *নারী: ইতিহাসে উপেক্ষিতা*, পৃ. ১০৮

১৯. John Stuart Mill, *The Subjection of Women*, London, 1969, মিল-এর এ গ্রন্থটিকে নারী অধিকার সম্পর্কে লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নারীর মেধা বা শক্তি কম নয়, নারী কোনো কিছুতেই পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট নয়, নারী পুরুষের সমান। তাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার পরিপূর্ণ সাম্য। মিল নারী-পুরুষের সাম্য চেয়েছেন শুধু নারীর কল্যাণের জন্য নয়, বরং মানবজাতি ও সভ্যতার সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে।[২০]

উপর্যুক্ত ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে নারীর অধিকার বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক ও ভোটাধিকার লাভের দাবি জোরালো হলেও বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে তা অর্জিত হয়নি। কেবল ব্রিটেন নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নারীরা রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের স্কুল শিক্ষক সুজান বি. অ্যান্থনি বুঝতে পেরেছিলেন, নারীদের ব্যাপারে শাসকরা কখনই সচেতন হবেন না। যদি নারীদের ভোটাধিকার প্রচলন হয়, তবেই শাসকরা নারীদের প্রতি নজর দেবেন। সেই কারণে নিজের এই ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে, রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি ও সম্মান পেতে তিনি নারীদের ভোটাধিকার নিয়ে কাজ করা শুরু করেন। তিনি ১৮৬৯ সালে জাতীয় নারী ভোটাধিকার সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৭২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিয়ম অমান্য করে সুজান এবং তাঁর তিন বোন প্রথম নারী হিসেবে ভোট দেন। এ অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে তাঁকে ১০০ ডলার জরিমানা করা হলে তিনি জরিমানা দিতে অস্বীকার করেন। ১৮৭৩ সালে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় সুজান বলেন, “আমি কোনো অপরাধ করিনি। আমি শুধু আমার অধিকার প্রয়োগ করেছি।” তিনি আরো বলেন, “কেবলমাত্র পুরুষেরা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেনি, আমরা সমস্ত মানুষ মিলে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি। শুধুমাত্র অর্ধেক জনগোষ্ঠী কিংবা অর্ধেক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। নারী-পুরুষ সকলের জন্য গড়ে তুলেছি।”[২১]

বিশ শতকের শুরুতে ভোটাধিকার দাবিতে আন্দোলন আরো ব্যাপক ও জোরালো রূপ পরিগ্রহ করায় ১৯১৮ সালে ইংল্যান্ডে নারীদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তবে এক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের বৈষম্য বহাল রাখা হয়। ভোটাধিকার প্রদানের যোগ্যতা হিসেবে নারীর বয়স ৩০ বছর নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে এ যোগ্যতা অর্জনের জন্য পুরুষদের বয়সসীমা ছিল ২১ বছর। এ বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারীদের প্রতিবাদের মুখে ১৯২৮ সালে নারী-পুরুষের মধ্যকার বয়সের সমতা নির্ধারণ করা হয়। ১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করে নারীর ভোটাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।[২২]

নারীদের ভোটাধিকার অর্জনের পর নারীমুক্তির আন্দোলন কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। কারণ তখন অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে, ভোটের অধিকার অর্জনের মাধ্যমে কালক্রমে নারীরা অন্যান্য সকল অধিকার লাভ করবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা সত্য হয়নি ভোটাধিকার লাভের কয়েক যুগ পরেও নারী তার কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছতে পারেনি। এমনকি বিশ শতকের মধ্যভাগে এসেও দেখা গেল যে, ভোটাধিকার নারী-

২০. John Stuart Mill, *op. cit,* উদ্ধৃত হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, নদী প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৯০-৯৬
২১. তামান্না, *প্রাগুক্ত*
২২. মাহমুদা ইসলাম, *নারী: ইতিহাসে উপেক্ষিতা*, পৃ. ১০৯

পুরষের বাঞ্ছিত সমতা বা সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি; রাজনৈতিক এবং এবং আর্থ-সামাজিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নারী পিছনে পড়ে আছে। নারীর প্রতি বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পেলেও নারীসমাজের সামগ্রিক অবস্থার কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি। কাজেই ভোটাধিকার অর্জনই নারীমুক্তির শেষকথা নয়। তাই নারীসমাজকে আরও বিস্তর পরিসরে আন্দোলনে নামতে হয়। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে নারীসমাজকে আবারো আন্দোলনে নামতে হয়। এ পর্যায়ে নারী আন্দোলন দেশ বা জাতির সীমানায় আবদ্ধ না থেকে বৈশ্বিক রূপ পরিগ্রহ করে। নবজাগ্রত এ নারী আন্দোলনের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং তত্ত্বগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। অতীতের নারীবাদ সংস্কার সংশোধনের স্তরেই ছিল। তখনকার নারীবাদে গ্রহণযোগ্য তাত্ত্বিক ভিত্তির অভাব ছিল। এ পর্যায়ে নারীবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা জোরদার হয়।

১.৩: নারীবাদের প্রধান প্রধান তাত্ত্বিক ধারা বা মতবাদ

নারীবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা মতবাদ সম্পর্কে নারীচিন্তকদের মতভিন্নতার কারণে এতদবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারার উপস্থিতি দেখা যায়। অর্থাৎ সকল নারীবাদী চিন্তক, গবেষক, লেখক, সংগঠক সকলেই নারীর অধস্তন অবস্থানের মূল কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টারত এবং তারা প্রত্যেকে নারীর পূর্ণ মানবাধিকারের স্বীকৃতি ও নারী পুরুষের সমান সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের কথা বলেছেন, নারী বিষয়ক মূল প্রসঙ্গটি (অর্থাৎ মানব সন্তান হিসেবে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকার) একই সূত্র থেকে উৎসারিত হলেও এর প্রকাশ পদ্ধতি ও ব্যাখ্যায় ভিন্নতার কারণে নারীবাদ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে ওঠেছে। নারীবাদী মতবাদের মধ্যে প্রধান চারটি মতাবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো হলো: ১. উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal Feminism), ২. মার্কসীয় নারীবাদ (Marxixt Feminism), ৩. সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Sociolist Feminism) এবং ৪. র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ (Radical Feminism) ।[২৩]

উদারপন্থী নারীবাদ: এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন, ফ্রান্সিস রাইট, মেরী উলস্টোনক্রাফট, জন স্টুয়ার্ট মিল এবং হ্যারিয়েট টেইলর মিল প্রমুখকে মূলত উদারপন্থী নারীবাদের প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। ষষ্ঠাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে নবজাগরণ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রভাবে এসব উদারপন্থীদের সচেতন আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় নারীদের সমস্যা ও অধিকারহীনতার প্রতি মানুষের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁরা ইউরোপের রেনেসাঁ এবং ফরাসি বিপ্লবজাত স্বাধীনতা, সমতা এবং ন্যায়বিচারের উদারনৈতিক নীতি ও অধিকারতত্ত্ব নারীদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রয়োগের কথা বলেন। এজন্য তারা মূলত সংস্কারের কথা বলেন। উদারপন্থী নারীবাদীরা মনে করতেন সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠিত আইন কানুনই নারীদের পশ্চাৎপদতার কারণ। তাদের আশা, বিদ্যমান সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন কানুন বিধি ব্যবস্থা সংস্কার ও সংশোধন করে নারী ও পুরুষে বৈষম্য ও অসমতা দূর করা সম্ভব। তারা বিদ্যমান

---

২৩. মাহমুদা ইসলাম, *নারী: ইতিহাসে উপেক্ষিতা*, পৃ. ১১১;

প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখেই সংস্কারের মাধ্যমে নারীর অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনে বিশ্বাসী। উদারনৈতিক নারীবাদীদের উত্থাপিত দাবির মধ্যে ছিল নারীর শিক্ষার অধিকার, নারীর ভোটাধিকার, আইনি অধিকার এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার অধিকার। তাদের মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দাবি বা অধিকার আদায়ের জন্য কোনো বৈপ্লবিক পথ নয়, বরং যুক্তি ও শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। তাঁরা শিক্ষাকে মানব সমাজের সকল সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখেছেন। তাদের বিশ্বাস শিক্ষা ও যুক্তির যথার্থ চর্চাই নারী পুরুষ উভয়কে প্রকৃত মুক্তি দিতে পারে। এ ধারার নারীবাদীরা দাবি করেন যে, সমাজের কল্যাণার্থে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে পারলে নারীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সমান্তরালে সফলতা অর্জন করতে পারবে।[২৪] বলা হয় যে, উদারনৈতিক নারীবাদীদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সর্বপ্রথম আইনগত স্বীকৃতি লাভ করলেও তাদের আন্দোলন মূলত পুঁজিবাদী কাঠামো অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমতা অর্জনের দাবির মধ্যেই সীমিত থেকে যায়।[২৫]

মার্কসীয় নারীবাদঃ মার্কসীয় নারীবাদ মূলতঃ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের মতবাদের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠেছে। মার্কসবাদী ভাবনা উদারনৈতিক নারীবাদের বিপরীতে মার্কসবাদ নারীদের অধস্তনতার বস্তুগত ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং নারীর পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য কেবল উপরিকাঠামোগত সংস্কার নয়, মূল কাঠামোর বৈপ্লবিক রূপান্তরের কথা বলে। বস্তুত, উনিশ শতকের মধ্যভাগে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস নারীদের দাসত্বের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে নারীবাদী তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন তাই মার্ক্সীয় নারীবাদ হিসেবে পরিচিত। মার্ক্সবাদ অনুসারে শ্রেণি ও শোষণভিত্তিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠা পরিবারে নারীকে পুরুষের অধীনে থাকতে হয়, এভাবে মার্ক্স শ্রেণি শোষণের সাথে নারী শোষণের যোগ স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ মাবর্সবাদীদের মতে, শ্রেণি বৈষম্যই নারী নির্যাতন ও শোষণের প্রধান কারণ। কাজেই তা অবসানের মধ্যে দিয়ে নারীমুক্তির পথ নিহিত। মার্কসবাদীদের মতে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্বৃত্ত মূল্য, উৎপাদন, সর্বহারাকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া শোষিতের অংশ হিসাবে পুরুষের ন্যায় নারীরাও অবদমিত অবস্থা সৃষ্টি করে। তাই একমাত্র ধনিকতন্ত্র অর্থাৎ Capitalism উচ্ছেদ করে শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই নারীমুক্তি সম্ভব বলে মার্কসবাদীরা দাবি করেন। মার্কস-এঙ্গেলসের মতানুসারে, পুঁজিবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিবার ব্যবস্থা তার বৈশিষ্ট্য হারাবে, নারী-পুরুষ সমান অধিকার পাবে, তাদের দাম্পত্য জীবন হবে সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থনৈতিক দাসত্বমুক্ত। এভাবে নারী হবে পুরুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত।[২৬] এই মতবাদ অনুসারে, সর্বহারা শ্রেণির সঙ্গে নারীর মুক্তির বিষয়টি জড়িত। মার্কস-এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, পুঁজির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা

---

২৪. মো. আব্‌দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

২৫. রোখশানা রফিক, *রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারী অধিকার আন্দোলন*, নন্দিতা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৯

২৬. কনক মুখোপাধ্যায় *মার্ক্সবাদ ও নারীমুক্তি*, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৩২

বিলুপ্তির মাধ্যমে অবসান ঘটবে শ্রেণি শোষণের, আর শ্রেণি শোষণের অবসানের মাধ্যমে অবসান হবে নারী শোষণ ও পীড়নের। মার্ক্সীয় নারীবাদ পুঁজিতন্ত্রের অবসান ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে নারী মুক্তির উপায় হিসেবে নির্ণয় করেছে।[২৭]

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদঃ সমাজতন্ত্রী নারীবাদকে মার্ক্সীয় প্রগতি নারীবাদ ও মনোবিশ্লেষণ নারীবাদী চিন্তার সংমিশ্রণ বলে মনে করা হয়। মার্ক্সীয় মতবাদের মূল বিষয়গুলো গ্রহণ করে তাতে সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জন করে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের উদ্ভব। সমাজতাত্ত্বিক জিলা আইজেনস্টাইন, জুলিয়েট মিশেল, এলিসন জাগার ও হার্টম্যান প্রমুখ এ মতবাদের প্রবক্তা। নারী সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের মতে, নারীরা হলো পিতৃতান্ত্রিক বর্ণবাদী সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, ধনবাদী সমাজ তার অস্তিত্ব টিকে রাখতেই শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করে। সমাজতন্ত্রী নারীবাদীদের মতে, বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতার শোষণমূলক ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নারী নিপীড়নের মূল কারণ নিহিত। অর্থাৎ ধনিকতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের জটিল মিথস্ক্রিয়া নারীর প্রতি বৈষম্যের মূল কারণ। তাদের মতে, পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্র-এ দুটি কাঠামো যখন পরস্পর সংযুক্ত হয় তখন চূড়ান্ত নারী নিপীড়ন ঘটে।[২৮] কাজেই ধনিকতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র উভয়ের বিলোপ সাধন না করলে নারীমুক্তি সম্ভব নয় বলে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীগণ মনে করেন।

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদঃ র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে Kate Millet, Shulamith Firestone, Marilyn French প্রমুখ নারীবাদী গবেষক অন্যতম। চিন্তা ধারায় এরা বিপ্লবী। এ ধারার নারীবাদীরা নারীপীড়নের সমস্ত দিক ব্যাখ্যা করে একটি মূল ধারণা দিয়ে এবং সেটি হচ্ছে নারীর 'দৈহিক পীড়ন'। তারা মনে করেন যে, নারীর দুরাবস্থার মূল কারণ জৈবিক, গর্ভধারণ করতে গিয়েই নারী মেনে নিতে বাধ্য হয় পুরুষের অধীনতা। তাদের মতে পুঁজিবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই গৌণ ব্যাপার, মূল লড়াই হচ্ছে লিঙ্গবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ মতে, নারী অধীনতা মূলত জৈবিক, তাই নারীমুক্তির জন্যে দরকার জৈবিক বিপ্লব। এ মতের প্রবক্তাগণ মনে করেন, গর্ভধারণ নারীর জন্যে অবধারিত নয়, মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্বও নারীর একার নয়। কাজেই তারা আর গর্ভধারণ করবে না, শিশুপালন করবে না, কৃত্রিম উপায়ে জন্ম দিতে হবে সন্তান এবং সমাজ বহন করবে তার লালন-পালনের দায়িত্বভার।[২৯] র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, পিতৃতন্ত্র ও তার অনুসারী সমাজব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত করে নারী ও পুরুষে সমতা ও ন্যায্যতাভিত্তিক আদর্শ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। সংস্কার করে নারীর মুক্তি আনা যাবে না।

---

২৭. মো. আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

২৮. বাসবী চক্রবর্তী, *নারীবাদ: বিভিন্ন ধারা;* রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা*, উর্বী প্রকাশনা, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫১

২৯. দ্রষ্টব্য, হাফিজা বেগম, 'নারীবাদী চিন্তা ও মার্কসবাদ: পরিবর্তীত ধারণা বিস্তৃকরণের প্রয়াস প্রসঙ্গে', *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা, পৃ. ১৭-৩৫

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, র‌্যাডিক্যাল নারীবাদীরা নারীর হীন অবস্থার ব্যাখ্যায় জেন্ডার ও সেক্স প্রত্যয় দুটিতে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ধারার নারীবাদীদের মতে, নারীকে তাঁর অধস্তন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে সর্বপ্রথম প্রয়োজন যৌনতা বিষয়টির পুনঃসংজ্ঞায়ন ও পুনঃনির্মাণ এবং এ বিষয়ে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।[৩০]

নারীবাদের উপর্যুক্ত চারটি ধারা বা মতবাদ ছাড়াও ইতোমধ্যে এতদবিষয়ে আরো কয়েকটি মতবাদ বা ধারা বিকশিত হয়েছে এবং এগুলো হলোঃ ক. সাংস্কৃতিক নারীবাদ (Cultural Feminism), খ. বর্ণবাদী নারীবাদ (Racist feminism), গ. অর্থনৈতিক নারীবাদ (Economic Feminism), ঘ. পরিবেশবাদী নারীবাদ (Environmental feminism) ঙ. লেসবিয়ান নারীবাদ (Lesbian Feminism), চ. তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদ (Third World feminism) এবং ছ. উত্তরাধুনিক নারীবাদ (Post-modern feminism)।[৩১] পর্যালোচনাধীন গবেষণায় নির্ধারিত বাংলা অঞ্চল এবং নির্ধারিত কালপর্বে নারীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা এমনকি নারীমুক্তি আন্দোলন উপর্যুক্ত নারীবাদী সকল মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তাই এ সম্পর্কে আর সবিস্তার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীদের অবদমিত ও অধস্তন অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি এবং মানবিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা ভাবনা ও চিন্তা দর্শন থেকে নারীবাদ সম্পর্কিত নানা মতবাদের উন্মেষ ঘটেছে। নারীবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে সত্য। তবে সব ঘরণার নারীবাদের মূল ভাবনায় একটি মূলসুর বিরাজমান–যা নারী আন্দোলন, নারীমুক্তি ও নারী স্বাধীনতার আন্দোলন সংগ্রামকে একটি ঐক্যসূত্রে গেঁথেছে। অন্য কথায় বলতে গেলে নারীবাদ সম্পর্কিত সকল মতবাদেরই লক্ষ্য একটি আর সেটি হলো নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তার মনুষত্ব্যের পূর্ণ স্বীকৃতি নিশ্চিত করা, তাকে পুরুষদের অধস্তন দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা, নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যের বেড়াজাল চিহ্ন করে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা সুনিশ্চিত করা। আর এ অর্জনের পথ-মত নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদ, দার্শনিক ও চিন্তকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও তা ইতিহাসের নানা স্রোতধারা অতিক্রম করে নারী মুক্তির একই মোহনায় মিলেছে।

১.৪: বঙ্গ-ভারতে নারীবাদ

ওপরের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীবাদ মূলত একটি পাশ্চাত্য বা পশ্চিমা বিশ্বের চিন্তাজাত ধারণা বা মতবাদ। তৃতীয় বিশ্ব বিশেষ করে যারা একসময় উপনিবেশিক শাসন-শোষণে ছিল উপনিবেশ-উত্তর এসব দেশগুলোতে সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান, নারীর অধিকার এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা এবং আলোচনা-পর্যালোচনা দেখা যায়। এতদ বিষয়ে কোনো কোনো লেখক ও সমাজচিন্তকের কিছু চিন্তাভাবনাও পাওয়ায় যায়। তবে তৃতীয়

---

৩০. মো. আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

৩১. এতদবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, রেজিনা বেগম, *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-১৯৪৭)*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪৮-৫৫

বিশ্বের নারীবাদী চিন্তনের সাথে পশ্চিমা নারীবাদী চিন্তা ও মতবাদের পার্থক্য রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদ মূলত উপনিবেশবাদ, উপনিবেশবাদ-উত্তর সমাজ-রাষ্ট্রসমূহে ক্ষমতা, ক্ষমতার ভূমিকা, সাম্যবাদী শাসন-শোষণ নারী-পুরুষের সম্পর্ক বর্ণবাদ এবং এসবের ভিত্তিতে শাসন শোষণ ও নারী পুরুষের যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তা আলোচনা করে। এসব আলোচনায় ওঠে আসা চিন্তা-দর্শনের সাথে পাশ্চাত্য নারীবাদীদের চিন্তার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষে অবিভক্ত বাংলায় নারীসমাজ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পুরুষের অধস্তন এক সনাতন অবস্থার মধ্যেই ছিল। সামাজিক রীতি এবং ধর্মীয় আবহ দিয়ে পুরুষসমাজ এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছিল যে, নারীসমাজ তাদের অবস্থাকে অনেকটাই বিধিলিপি হিসেবে গ্রহণ করে সনাতন ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অভিঘাতে বাংলার চিরায়ত সমাজব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরে। উনিশ শতকে বাঙালি সমাজমানসে পরিবর্তনের ফলে বাঙালি নারীর চিরন্তন ভূমিকা নিয়ে সংশয় ও প্রশ্ন দেখা দেয়। সমাজের প্রাপ্রসর চিন্তাবিদগণের ভাবনায় আসে যে, একজন নারী কন্যা, পত্নী, মাতা এবং ভগ্নী একথা যেমন সত্য, এ কথাও অনেক বেশি সত্য যে, নারী একজন মানুষ। পুরুষ যদি পিতা, স্বামী ও পুত্রের ভূমিকা পালন করে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে তাহলে একজন নারী ও পারবে। নারীকে এগিয়ে যেতে দিতে হবে, নারীকে পিছনে রাখা মানে দেশ ও জাতি পিছিয়ে পড়া।[৩২]

নারীমুক্তির ভাবনাটি ভারতবর্ষ তথা বাংলায় প্রথমে করেছিলেন পুরুষরাই। ইউরোপ ও আমেরিকায় যখন নারীবাদী তথ্য প্রচার হচ্ছিল তখন বাংলাও এর দ্বারা তাড়িত হয়েছিল। তবে এখানে নারীমুক্তির যে দর্শন তৈরি হয়েছিল তার সাথে পাশ্চাত্যের নারীবাদী চিন্তা দর্শনের খুব বেশি মিল পাওয়া যায় না। কারণ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রথা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার নারীরা পাশ্চাত্য নারীদের চেয়ে পরস্পর ভিন্ন এবং পাশ্চাত্য নারীর অবয়ব বাংলাদেশী নারীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কাজেই পাশ্চাত্য নারীবাদ বাংলার নারীদের জন্য প্রযোজ্যও নয়। এ জন্যই বলা হয় যে, পাশ্চাত্যকে যদি নারীবাদের উৎপত্তিস্থল হিসেবে দাবি করা হয়; তবে বাংলাদেশে সহজাত নারীবাদের সৃষ্টি হয়েছে-যা পাশ্চাত্যের নারীবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[৩৩] জন স্টুয়ার্ট মিল যখন *The Subjection of Women* গ্রন্থটি রচনা করেন এর কিছু আগে ভারতের অবিভক্ত বাংলায় রাজা রামমোহন রায় নারীমুক্তির লক্ষ্যে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভা ও ব্রাহ্মসমাজ বাঙালি নারীসমাজের অধস্তন অবস্থা নিরসনে নারী শিক্ষা প্রবর্তনে ভূমিকা পালন করে। রাজা রামমহোন রায়ের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সমাজে প্রচলিত অমানবিক সতীদাহ প্রথা আইনের মাধ্যমে উচ্ছেদ সাধন করা হয়। রামমোহন রায়ের অনুসারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইনগত ভিত্তি পায়। কৌলিণ্য প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে বাংলায় আন্দোলন গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ দিকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাঙালি সমাজে নারী জাগরণ ও

৩২. শাহানারা হোসেন, *উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪ পৃ.২০-২১

৩৩. Mahmuda Islam, 'Feminism', *Banglapedia, op.cit.*

মুক্তির বিশেষ দূত হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি মনে করতেন নারী সামাজিক জীব; নারীকে নিজের কথা নিজেকে সমস্বরে বলতে হবে, অন্য কেউ নারীর হয়ে বলবে না। রোকেয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না এবং পশ্চিমা নারীবাদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না; শ্বেতাঙ্গ নারীবাদীদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর *সুলতানার স্বপ্ন* (১৯২৪) গ্রন্থে নারী পরিচালিত বৈচিত্র্যপূর্ণ, সমতাভিত্তিক কাল্পনিক এমন নারীবিশ্বের চিত্র তুলে ধরেছেন-যা হবে শোষণ থেকে মুক্ত। অস্তিত্বের জন্য সুলতানার সংগ্রাম এবং নারীমুক্তির জন্য তার কাজ প্রভৃতি ছিল নারীবাদের উদাহরণ। রোকেয়া তার লেখনীর মধ্য দিয়ে সমাজের কুসংস্কার, অবরোধ প্রথার অতিরিক্ত প্রভাব, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, নারী শিক্ষা, নারীর প্রতি সামাজিক অবমাননা, নারীর অধিকার এবং নারী জাগরণের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছেন।

এভাবে দেখা যায় যে, উনিশ শতকে যখন পাশ্চাত্য জগতে নারীবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতবাদ প্রচার শুরু হয় এবং সে সবের সমর্থনে আন্দোলন ও বৌদ্ধিক পর্যায়ে তর্ক-বির্তক চলে, তখন ব্রিটিশ শাসিত ভারতেও বিশেষ করে বাংলায় চলছিল সামাজিক সংস্কার আন্দোলন। এসব সংস্কার আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ছিল নারীমুক্তি সংক্রান্ত। বাংলায় নারীবাদী বাংলায় নারীবাদীর কার্যক্রমকে পাশ্চাত্য কোনো মতবাদের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় না। তবে সার্বিক বিচেনায় উদারনৈতিক নারীবাদী মতবাদের সাথে এর কিছুটা সঙ্গতি ছিল বলে মনে হয়। এমনকি বিশশতকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীরাও উদারনৈতিক নারীবাদী চিন্তাচেতনাই বহন করতেন বলে মনে হয়। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ব্রিটিশ ভারতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসারের ফলে বাংলায় নারী সমাজের মধ্যে মার্ক্সীয় চিন্তা চেতনারও বিস্তার লাভ করে। পাকিস্তান যুগে সমাজকাঠামোতে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা আরোপের অপচেষ্টা করা হয়। তবে পূর্ব বাংলার নারী সমাজকে ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজ ও রাজনীতির অঙ্গন থেকে বিযুক্ত রাখা সম্ভব হয়নি। পাকিস্তান যুগের শুরুতে নারীসমাজের কর্মতৎপরতা সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিবদ্ধ হয়েছিল। গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি, ওয়ারি মহিলা সমিতি, এমনকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের স্ত্রী রানা লিয়াকতের উদ্যোগে এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা All Pakistan Women's Association (APWA)ও চরিত্রগত দিক থেকে সমাজ সংগঠনমূলক ছিল। তবে পাকিস্তানের পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য ও শোষণমূলক নীতির কারণে অচিরেই এখানে যে স্বাধিকার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তখন বাঙালি নারীসমাজও এতে সক্রিয় হন। আওয়ামী লীগ এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমুহ ছাড়াও ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যানারে নারীরা সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নেন। এর বাইরেও নারীদের নিজস্ব সংগঠন ছিল। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কথা বলা যেতে পারে। ১৯৭০ সালে গঠিত এ নারী সংগঠনটি নারীসমাজের জন্য কল্যাণমূখী কর্মতৎপরতা ছাড়াও সমকালীন রাজনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এতদবিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলার রাজনীতি ও নারী: ঐতিহাসিক পটভূমি

বর্তমান যুগ নারীর ক্ষমতায়নের যুগ। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা পালন করছে অগ্রণী ভূমিকা। কিন্তু বর্তমান অবস্থানে নারীরা একদিনে আসেনি, এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের প্রয়াস-প্রচেষ্টার ইতিহাস। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সভ্যতার ঊষালগ্নে নারী পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য ছিল না। জীবন ও জীবিকা ধারণের জন্য তখন পুরুষ ও নারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই খাদ্য আহরণে নারীদের সক্রিয় তৎপরতার কথা জানা যায়। এ সময় পুরুষরা শিকার করতেন।[১] প্রাচীন যুগে (খ্রি. পূর্ব ২৫০০ অব্দ-৫০০ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম কৃষক ছিলেন নারী। এ সময় পুরুষরা পশুপালন ও পশু চারণের কাজ করতেন। সে সময় সমাজ ও পরিবারে নারীদের কর্তৃত্বের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তাছাড়া প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় (খ্রি. পূর্ব ৩০০-৩২ অব্দ) নারীরা পুরোহিত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতেন বলে জানা যায়।[২] এভাবে দেখা যায় সভ্যতার শুরু থেকে সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এবং নারীকে পুরুষের পদাবনত করে রাখার অপকৌশল শুরু হয় মূলত যখন থেকে পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়। এক সময়কার একগামী পরিবার যখন পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে রূপান্তরিত হয়, তখন থেকে নারী- মর্যাদার অবনমন শুরু হয় এবং নারীর গৃহভিত্তিক শ্রম ব্যক্তি শ্রমে রূপান্তরিত হয়। তখন থেকেই নারীকে বলতে গেলে প্রধান গৃহভৃত্যে পরিণত করা হয়। নারী অধিকার হরণের যাত্রাটিও শুরু হয় তখনই।[৩] মধ্যযুগে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র জোরালো আকার ধারণ করে। এর সূত্র ধরে নারীসমাজ ক্রমশ উপেক্ষার পাত্রে পরিণত হয়। রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তো দূরের কথা পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতিতেও নারীর জন্য সমাজের অধস্তনের ভূমিকাটি নির্ধারিত হয়ে যায়। পরিবর্তিত বাস্তবতায় পতি সেবা, পারিবারিক ও গৃহস্থালির দায়িত্ব পালন করা এবং উত্তম স্ত্রী হওয়াই নারী জীবনের পরম আরাধ্যে পরিণত হয়। বাংলার বাস্তবতাও ছিল তাই। এ সময় বাংলার নারীর প্রতিকৃতি দাঁড়িয়েছিল শ্যামলে-কোমল, শান্ত-সংহত, মমতায় মানবিক। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবাদে প্রতিরোধে ইস্পাতসম কঠিন হওয়ার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে কবি-

১. মাহমুদা ইসলাম, *নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২১
২. *ঐ*, পৃ. ৩৯
৩. *ঐ*, পৃ. ৪৯

সাহিত্যিকদের রচনায় এভাবেই বাঙালি নারীর প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে।[৪] পুরুষের জীবনে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। নারী মা, নারী স্ত্রী, নারী ভগ্নি ও নারী কন্যা। নারীর এ বহুরূপ ভূমিকা সত্ত্বেও পুরুষ প্রধান রাষ্ট্র ও সমাজ নারীকে তাঁর যথার্থ মর্যাদা প্রদান করেননি। বাঙালি নারী জন্মানোর পর থেকে অবদমন ও নির্যাতনের শিকার হয়। ভ্রুণাবস্থা থেকে গৃহবধু হওয়া পর্যন্ত নানারূপ শোষণ-বঞ্চনা বাঙালি নারীর যেন বিধিলিপিতে পরিণত হয়। কন্যাভ্রূণ হত্যা, কুমারীবলি, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও সতীদাহের মতো নির্বতনমূলক ব্যবস্থা ছিল বাঙালি সমাজের রুঢ় বাস্তবতা।

বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের মতো উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসেও নবজাগরণের যুগ হিসেবে বিশেষায়িত হয়ে আছে। এ যুগকে নারীজাগরণের যুগও বলা হয়। এ সময় ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উদ্ভব হয়। এ শ্রেণির মধ্যে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণ ঘটে। এ সময় সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়–যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নারীজাগরণ ও মুক্তি আন্দোলনে। পরিবর্তিত সমাজ বাস্তবতায় নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে না দেখে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হতে থাকে। নারীর ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করে।[৫] এ সময় নারীরাও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ক্রমসচেতন হতে থাকে। প্রথমে তারা সামাজিক অধিকার আদায় করে নেয় এবং বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলার নারীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় কঠিন শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতার বিজয়াভিযানে যোগ দেয়। এ সময় পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাইরে বাঙালি নারীদের রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা শুরু হয়। আত্মোপলব্ধি, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন নারীসমাজ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুরুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে শুরু করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি নারীদের কেউ কেউ বিপ্লবী রাজনৈতিক তৎপরতায়ও যুক্ত হন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিপ্লবী আন্দোলনে এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আত্মজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধানে উদ্বুদ্ধ নারীসমাজ বৃহত্তর পরিমণ্ডলে স্বগোত্রীয়দের জন্য ইতিবাচক কিছু করার অভিপ্রায় নিয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। এভাবেই বাংলার নারীসমাজ গৃহাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে প্রথমে সামাজিক পরিমণ্ডলে এবং পরিশেষে ক্রমান্বয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়। পূরবী বসু বাঙালি নারীদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার পিছনে তিনটি কারণের কথা বলেছেন– (ক) দেশপ্রেম (খ) আত্মোপলব্ধি, আত্মজাগরণ বা আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধান এবং (গ) গতানুগতিক রাজনীতির কোন্দল ও স্বার্থপরতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন পথের অনুসন্ধান।[৬] যাহোক বাংলার নারীসমাজের বাস্তব অবস্থা, রূপান্তরের ক্রমধারায় তাদের রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের

৪. বেবী মওদুদ, *বাংলাদেশের নারী*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ৯
৫. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, কলকাতার পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৬-৭
৬. পূরবী বসু, *আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলার নারী*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৪৪-২৪৫

ঐতিহাসিক পটভূমি এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা আলোচ্য অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

রূঢ়, সূক্ষ্ম, তাম্রলিপ্তি, হরিকেল, গৌড়, বঙ্গ ও সমতটের মতো জনপদ নিয়ে গড়ে উঠা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের রূপায়ন ঘটেছিল অ্যালপাইন, আদি-অস্ট্রিক (শবর, নিষাদ, কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা) ও দ্রাবিড় জাতিসমূহ দ্বারা। এদের সমাজব্যবস্থা ছিল মূলত মাতৃতান্ত্রিক।[৭] দ্রাবিড়দের মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থাতেও নারীর প্রাধান্য ছিল। দ্রাবিড়দের মধ্যে নারীরা স্বেচ্ছায় পুরুষ নির্বাচন করে বিয়ে করতে পারতেন। এমনকি দ্রাবিড়দের উচ্চতর অংশ বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসধর্মকে নারীর ভূষণ বলে মনে করতেন।[৮] ঋগ্বেদের যুগে নারীর সমমর্যাদার কথা জানা যায়। বেদ সাহিত্যেও নারীদের অবরোধের কথা দেখা যায় না। তবে আর্যদের আগমনে এদেশে সামাজিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। বৈদিক আর্যসমাজে প্রাথমিক অবস্থায় নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকলেও আস্তে আস্তে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বৈবাহিক বন্ধন প্রথার মাধ্যমে নারীকে এক রকমের পরিবারের গৃহভৃত্যে পরিণত করা হলো। নারীর দাস শ্রমের উপর বাঙালি সমাজে গড়ে উঠলো পরিবার প্রথা।[৯] বাঙালির জীবনে ধীরে ধীরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠায় নারীরা তাদের সম্মানজনক অবস্থানচ্যুত হয়, ক্রমান্বয়ে তারা তাদের সামাজিক এমনকি মানবিক অধিকার বঞ্চিত হয়। *মনুসংহিতায়*[১০] নারী জাতির বিধিলিপি নির্দেশ করা হয় এই বলে– “শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী ও স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলের অধীনেই নারীকে থাকতে হবে, স্ত্রীকে ত্যাগ করার অধিকার পুরুষ পেলো কিন্তু স্ত্রীর জন্য নিষিদ্ধ করা হলো”।[১১] মনুর পরবর্তী সময়কালেও তাঁর আইনই হিন্দুসমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং পরবর্তী আইন প্রণেতারাও মনুর আইনকেই আদর্শ মডেল হিসেবে গ্রহণ করে এবং আরো নারী নিপীড়নমূলক আইন প্রণয়ন করে। যার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো ‘বাল্যবিবাহ’ ও ‘সতীদাহ’ প্রথার মতো নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা।

গৌতম বুদ্ধ (আনু. ৫৬৩-৪৮০ খ্রি.পূ.) হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে বাঙালির জীবনে নতুন চেতনা সৃষ্টি করেন। জন্ম- জন্মান্তরবাদ থেকে মুক্তির দর্শন প্রচার করে অপুত্রক হওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে বৌদ্ধধর্ম নারীকে মুক্তি দেয়। বৌদ্ধধর্মে বাবার সম্পত্তি ও বংশ রক্ষায় মেয়ের অধিকার স্বীকৃতি

---

৭. অদিতি ফাল্গুনী, *বাংলার নারী সংগ্রামের ইতিহাস*, অন্বেষা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২০

৮. ক্ষিতিমোহন সেন, *প্রাচীন ভারতে নারী*, বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৭, পূনঃমুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, পৃ. ৮২-৮৫

৯. জ্ঞানেশ মৈত্র, *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য*, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭, ২০৩ বিধাণ সরণি, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২৭

১০. *মনুসংহিতা* বা মনুস্মৃতি বৈদিক সনাতন ধর্মাবলম্বী অনুসারীদের অনুশাসনে ব্যবহৃত মুখ্য এক স্মৃতিগ্রন্থ। এর রচনাকাল সম্ভবত ২০০০ খ্রি.পূ.

১১. Shahanara Hussain, *The Social Life of Women in Early Medieval Bengal*, Asiatic Society of Banlgadesh, 1985, p. 40

পায়।[১২] তবে বৌদ্ধধর্মের নারী-পুরুষের সমতার বাণী বাঙালি হিন্দুদের খুব কমই প্রভাবিত করতে পেরেছিল। বরং বাঙালি হিন্দু সমাজ মনুর স্মৃতিশাসনই অনুসরণ করায় নারীদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। হিন্দুধর্মের সংস্কারক চৈতন্যদেবের আবির্ভাব (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রি.) এবং তাঁর প্রবর্তিত বিধিব্যবস্থায় বাংলায় নারীদের মধ্যে নতুন জাগরণ ঘটেছিল। বৈষ্ণববাদ নারীর স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দেওয়ায় বৈষ্ণবসমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল। বৈষ্ণবসমাজে নারীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শাস্ত্র আলোচনা করার অধিকার পেয়েছিলেন। আধুনিক যুগে বাঙালি সমাজে নারী শিক্ষাব্যবস্থা চালুর পূর্বে বৈষ্ণব নারীরা মেয়েদের শিক্ষার একটা ধারাও চালু করেছিলেন।[১৩]

প্রাচীনকাল থেকে বাংলা বার বার বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর পদাবনত হয়েছে। একের পর এক বিদেশি শাসক এসে বাংলা শাসন করেছেন। শাসকগোষ্ঠীর সাথে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম এদেশে এসেছে এবং এসব নতুন ধর্ম ও সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতির সাথে একীভূত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের সূচনালগ্নে বাংলা তুর্কি মুসলমানদের পদাবনত হয়। নবাগত শাসকগোষ্ঠীর ধর্ম ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতি ঐতিহ্য বাঙালি সমাজে বিস্তার লাভ করে। ইসলামধর্ম নারীর মানবিক ও সামাজিক মর্যাদায় বিশ্বাসী। এ ধর্ম নারীকে কন্যা-জায়া-জননীরূপে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। শিক্ষা গ্রহণ, পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার, বিবাহ ও তালাকদানে নারীর ক্ষমতা, পুনর্বিবাহ ও সন্তানের অভিভাবকত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মে নারীদের অধিকার প্রদান করা হয়। ইসলামের এ রীতি-ঐতিহ্য অনুসরণের ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীদের অবস্থার উন্নতি হয়। ইসলামে নারীদের পর্দাপ্রথা সম্পর্কে বিশেষ বিধান রয়েছে। এ বিধান অনুযায়ী মুসলিম শাসনামলে (১২০৪-১৭৬৫ খ্রি.) বাংলায় মুসলিমসমাজে নারীদের জন্য পর্দা বা অবরোধ প্রথা কঠোরভাবে অনুশীলন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এসময় কেবল মুসলিম নারী নয়, বরং হিন্দু বিশেষ করে অভিজাত হিন্দুসমাজেও অবরোধ প্রথা চালু ছিল। নারীদের অবরোধের মধ্যে থাকতে হলেও মুসলিম শাসনামলে সামগ্রিকভাবে নারীদের জীবনমান যে কিছুটা হলেও উন্নত হয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। মুসলিম শাসনামলে নারীশিক্ষার যেটুকু অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে সেটুকু অধিকারও বাংলার সাধারণ নারীদের জন্য অবারিত ছিল একথা বলার অবকাশ নেই।

ইসলাম ধর্ম নারীকে যেসব মর্যাদা এবং অধিকার দিয়েছে শাসকগোষ্ঠী ও সমাজপতিরা তার অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত করে রেখেছিল। বঙ্গ-ভারতীয় সমাজ বাস্তবতার নিরিখে এর বহু নজির রয়েছে। দিল্লিতে সুলতান রাজিয়া মসনদে বসে (১২৩৬-১২৪০ খ্রি.) দেশ শাসন করেছেন। এটি ছিল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইসলামি অনুশাসন অনুযায়ী নারীসমাজ যতটুকু অধিকার ও মর্যাদাভোগ করার কথা তা তারা

---

১২. জ্ঞানেশ মৈত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
১৩. ঐ, পৃ. ১৫

ভোগ করতে পারেনি। ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) ও সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫৭৭ খ্রি.) নারীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন। এ সময় বোরকা এবং ঢাকা গাড়ি ছাড়া মেয়েদের চলাফেরা নিষিদ্ধ ছিল। বাড়িতে নারীদের জন্য জেনানা মহল তৈরি করা হয়েছিল।[১৪] পাঠান ও মুঘল শাসনামলেও বাংলার নারীসমাজের সামগ্রিক অবস্থা বলতে গেলে একই রকম ছিল। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় মুঘল রাজশক্তির অবক্ষয় ও ক্রমাবনতির সুযোগে বাংলায় নবাবি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাবি শাসনামলে নারীদের সামাজিক জীবনে পূর্বের তুলনায় কিছুটা তরাঙ্গায়িত হয়েছিল। আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাংলায় নবাবি শাসনের অবসান ঘটে ১৭৬৫ সালে দিউয়ানি শাসনলাভের মধ্য দিয়ে বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হয়।[১৫] ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে নারীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা অনেকাংশেই পূর্ববৎ ছিল। এ সময় নারীদের মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়ে বিশেষ কোনো তারতম্য ঘটেনি। উনিশ শতক থেকে অবস্থার ক্রমপরিবর্তন শুরু হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক কাল-পর্বের প্রাচীন যুগের শুরুতে বাংলায় নারীদের সামাজিক অবস্থান কিছুটা ভালো থাকলেও ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তন, নিয়মকানুন নারীদের পুরুষের অধস্তনে পরিণত করে এবং নারীসমাজ অনেকটা হীন পর্যায়ে নিপতিত হয়। মধ্যযুগে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে নারীদের অবস্থা ও তাদের জীবনমানের কিছুটা উন্নতি ঘটলে ধর্ম হিসেবে ইসলাম নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে, শাসকগোষ্ঠী ও সমাজপতিদের স্বার্থান্ধতা ও নারীকে পদাবনত করে রাখার পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারীসমাজ সে অধিকার ও মর্যাদা পুরোপুরি ভোগ করতে পারেনি।

এ পর্যায়ে নারীসমাজের রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ ও এর গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের সূচনালগ্নে বাংলায় নারীদের রাজনীতিতে সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা সুবিদিত। তবে নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও ভারতবর্ষে এর আগেও সমাজ ও রাজনীতিসচেতন কিছু নারী চরিত্রের কথা জানা যায়। এরূপ এমন নারীর দৃষ্টান্ত হলেন লোপা। রাহুল সাংকৃত্যায়নের *ভোলগা থেকে গঙ্গা* নামক সুবিখ্যাত নৃ-তাত্ত্বিক উপন্যাসে এ লোপা চরিত্রের উল্লেখ আছে। এখানে বলা হয়েছে যে, লোপা ছিলেন ৭০০ খ্রি. পূর্ব সময়ের পঞ্চাল (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) রাজ্যের গার্গ্য রাজবংশের কন্যা ও বেদজ্ঞ পণ্ডিত প্রবাহমানের স্ত্রী। তিনি প্রবাহমানের জন্মান্তরবাদ নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরেন।[১৬] আর্যদের সময়ে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ ব্রহ্মবাদিনী বিজ্ঞজনের সভা-সমাবেশে যোগ দিতেন।[১৭] ঋগ্বেদে মুদুগলিনী বলে এক যোদ্ধা নারীর কথা উল্লেখ আছে, মহাভারতের মূল নারী চরিত্রসমূহ অর্থাৎ কুন্তী, গান্ধারি, দ্রৌপদী, দময়ন্তী অম্বা-

---

১৪. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯, পৃ. ৭

১৫. প্রকৃতিগতভাবে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি শাসন এবং ১৮৫৮-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজকীয় শাসন।

১৬. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

১৭. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

এরা প্রত্যেকে ছিলেন চলাচল, যৌনতা এবং রাজনৈতিক মতামতের ক্ষেত্রে স্বাধীন। জৈনধর্মের ইতিহাসেও মল্লী বাই নামে এক নারী জৈনদের নারী নিন্দাত্মক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১২৬তম শ্লোকটি রচনা করেছিলেন রোমাসা নামের এক নারী এবং ১৭৯তমটি রচনা করেছিলেন লোপামুদ্রা। এছাড়া সে সময়ের উল্লেখযোগ্য বিদুষী ও শাস্ত্রজ্ঞ নারী ছিলেন গার্গি, মৈত্রেয়ী, অপালা, বাক্, ঘোষা, সূর্যা, অদিতি, ইন্দ্রাণী–যারা দর্শন রচনা ও চর্চা করতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এবং কেউ কেউ তীর ধনুকে পারদর্শী যোদ্ধা এবং কেউ কেউ আবার জাদুবিদ্যা পাণ্ডিত্যের অধিকারী।[১৮] চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যরা জ্ঞানময় সত্ত্বা বা নৈরাত্মা দেবীকে ডোম্বিনী কল্পনা করেছেন। তাছাড়া একাদশ শতকের গ্রামীণ সমাজের কিছু নারীর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অপরসায়ন বা অ্যালকেমি চর্চা করতেন বলে জানা যায়। এদের ডাকিনী বা ডাক বলা হতো। ডাকের বচন নামে এক শ্রেণির প্রবাদ প্রবচন মধ্যযুগীয় সাহিত্যে লক্ষণীয়–যেখানে নারীদের পারিবারিক বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়সমূহের আলোচনা আছে।[১৯] খনার বচন রচনাকারী খনার আবহাওয়া, কৃষি ও জ্যোতিষবিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।[২০] চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতকে গ্রামীণসমাজের মধ্যে নারী দেবতার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায় যেমন মনসা, চন্ডী, শীতলা।[২১] দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী (১৫৭৫) রামায়ণ অনুবাদ করেন, চন্ডীদাসের প্রেমিকা রজকিনীও কিছু পদ রচনা করেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই প্রাচীন কালে বঙ্গ-ভারতে নারী স্বাধীনতা না থাকলেও কিছু বিদুষী নারী তাদের স্ব স্ব অবস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যায়।

সুলতানি ও মুঘল যুগে ভারতবর্ষে বহু বিদুষী এবং রাজনীতি সচেতন ও রাজনীতিতে সক্রিয় নারীর নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সুলতান ইলতুৎমিশের (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) কন্যা দিল্লির সুলতান রাজিয়ার (১২০৫-১২৪০ খ্রি.) কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করে ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত শাসন করেন।[২২] তিনি ছিলেন মুসলিম ভারতের একমাত্র নারী শাসক।[২৩] তাছাড়া সুলতান ইলতুৎমিশের স্ত্রী শাহতুরকান, সুলতান জালালউদ্দীনের (১২৯০-১২৯৬ খ্রি.) স্ত্রী (নাম জানা যায় না) এবং সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.) স্ত্রী কমলা দেবী, পুত্রবধু দেবল দেবী এবং শাশুড়ি মালিকা-ই-জাহান সমকালীন রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। সমকালীন রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী অন্য নারীদের মধ্যে সুলতান বাহালুল লোদীর (১৪৫১-১৪৮৯ খ্রি.) প্রধান মহীয়সী শামস খাতুন ও সুলতান সিকান্দার লোদীর (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রি.) মা বিবি আম্বা ছিলেন অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য।[২৪] মুঘল আমলে কোনো নারী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে

---

১৮. পূরবী বসু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২
১৯. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪-২৫
২০. Shahara Hussain, *op. cit.*, p. 97
২১. *Ibid.* p. 104
২২. আনোয়ার হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৪৭)*, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৮
২৩. তিনি ছাড়াও মিশরে একজন মুসলিম নারী শাসকের কথা জানা যায়। তার নাম ছিল সাজার উদ দার। তিনি ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে মিশরে মামলুক নামক একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
২৪. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ৩-৪

পারেননি বটে, তবে এ সময় পূর্বের তুলনায় নারীদের অধিক মাত্রায় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার কথা জানা যায়। মুঘল যুগে ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সম্রাট বাবুরের (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.) পত্নী মাহাম বেগম ও বিবি মুবারিকা ইউসুফজাই। বাবুরের বোন খানজাদা বেগম, তাঁর কন্যা গুলবদন বেগমের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কথা বিশেষভাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, গুলবদন বেগম সমকালে একজন বিদুষী নারী হিসেবেও খ্যাতিমান। ষোড়শ শতকের ভারতে তিনি একমাত্র নারী ইতিহাসবিদ ছিলেন। তাঁর রচিত 'হুমায়ুননামা' গ্রন্থটি মুঘল ইতিহাস অধ্যয়নের একটি আকর উৎস হিসেবে গণ্য হয়। সম্রাট হুমায়ুনের শাসনামলে রাজনীতি ও হেরেমের কর্তৃত্বও ছিল তাঁর হাতে। সম্রাট হুমায়ুনের (১৫৩০-১৫৫৬ খ্রি.) স্ত্রী ও সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) মাতা মহীয়সী হামিদা বানু বেগম এবং আকবরের ধাত্রীমাতা মাহম আনগা, আকবরের স্ত্রী মরিয়ম-উজ-জামানী সলিমা সুলতানা বেগম, রোকাইয়া সুলতানা বেগম প্রমুখের রাজনৈতিক তৎপরতা ইতিহাসে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.) স্ত্রী সম্রাজ্ঞী নুরজাহান কার্যত সম্রাটকে সামনে রেখে নিজেই রাজ্য শাসন করতেন। রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না হলেও তিনিই ছিলেন সিংহাসনের অধিশ্বরী। তাঁর নিজের নামে মুদ্রা পর্যন্ত প্রচলন করা হয়েছিল। রাজকীয় আদেশ-নিষেধাবলিতে স্বামী সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষরের সাথে তাঁর নিজের নাম স্বাক্ষর যুক্ত করার রীতিও তিনি প্রচলন করেছিলেন।[২৫] সম্রাট শাহাজাহানের (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.) স্ত্রী মমতাজ মহল, শাহজাহানের কন্যা জাহান আরা ও রওশন আরাও সমকালীন রাজনীতির অন্যতম কুশীলব ছিলেন। বিশেষ করে জাহান আরা ও রওশন আরা শাহাজাহানের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন বলে জানা যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) স্ত্রী দিলরাস বেগম, কন্যা জেব-উন-নিসা ও জিনাত-উন-নিসাও রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে যুক্ত ছিলেন। মুঘল যুগে বিজাপুর ও আহমদ নগরের রিজেন্ট চাঁদ সুলতানা (চাঁদ বিবি), চিতোরের রাণী কর্ণাবতী, মালওয়ার দূর্গাবতী, মারাঠা সাম্রাজ্যের রিজেন্ট তারাবাঈ প্রমুখের রাজনীতি ও রাজ্যশাসনে স্বামী ও পুত্রদের সাথে তাদের রাজ্যশাসনে ভূমিকা পালন ইতিহাসের পাতায় বিশেষভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে।[২৬]

সর্বভারতীয় পর্যায়ে নারীদের একাংশের রাজনীতি সচেতন অবস্থা ও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কথা জানা গেলেও আঠারো শতকের পূর্বে বাংলায় এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বাংলার ইতিহাসে এ সময়কালেও নারীর অবস্থান ছিল গৃহাভ্যন্তরের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমিত। এসময় বাংলায় কতিপয় বিদুষী নারীর উপস্থিতি দেখা যায়। তবে তাঁদের পদচারণা রাজনীতি ও রাজ্যশাসনের গণ্ডিতে তখনও বিস্তৃত হয়নি। নারী সমাজের অবস্থার উন্নতি হলে পুরুষ শাসক ও অভিজাত মহলের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নারীসমাজ রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পায়নি।

---

২৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, মুঘল ভারতের ইতিহাস, পরিমার্জিত প্রথম সং, ইতিবৃত্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ২৬-২৭

২৬. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে এসব মহীয়সী নারীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য– Soma Mukharjji, Royal Mughal Ladies and Their Contributiron, Gyan Publishing House, New Delhi, 2001.; Rekha Misra, *Women in Mughal Indea*, Munshiram Monoharlal, Allahabad, 1967

তবে আঠারো শতকে নবাবি শাসনামলে (১৭০৪-১৭৫৭ খ্রি.) অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সর্বভারতীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণে এ সময় বাংলার রাজনীতিতে সংখ্যায় স্বল্প হলেও কতিপয় নারীর তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। নবাবি শাসনামলে বাংলার রাজনীতি ও প্রশাসনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনকারী নারীদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন জিনাত-উন-নিসা। জিনাত-উন-নিসা ছিলেন বাংলায় নবাবি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খানের (১৭১৭-১৭২৭ খ্রি.) কন্যা এবং নবাব সুজাউদ্দিন খানের (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.) স্ত্রী। সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি স্বামী নবাব সুজাউদ্দিনের প্রশাসনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। পুত্র নবাব সরফরাজ খানের (১৭৩৯-৪০ খ্রি.) স্বল্পকালীন শাসনামলেও তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন।[২৭] নবাব সুজাউদ্দিন খানের কন্যা ও দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান পরিচিত নবাবি শাসনের প্রভাবশালী অমাত্য অভিজাত মির্জা লুৎফুল্লাহ খানের স্ত্রীর নাম দুর্দানা বেগম। সিয়ার-উল-মুতাখখিরিনের ভাষ্য মতে, 'দুর্দানা বেগম একজন তেজস্বিনী নারী ছিলেন'।[২৮] সমকালীন বঙ্গীয় রাজনীতিতে তাঁকেও অত্যন্ত সক্রিয় ও তৎপর ভূমিকায় দেখা যায়। এছাড়া আলীবর্দী খানের স্ত্রী শরফ-উন-নিসা ও তাঁর কন্যা মেহের-উন-নিসাও (যিনি ঘসেটি বেগম নামে অধিক পরিচিত) রাজনীতি ও প্রশাসনে সক্রিয় ছিলেন। ঘসেটি বেগম ছিলেন জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম নওয়াজিস মুহম্মদ শাহমাত জং-এর স্ত্রী। স্বামীর প্রশাসনিক অধিক্ষেত্রে তাঁর প্রভাবের কথা সমকালীন ইতিহাসে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। নবাব সিরাজ উদ্দৌলাহর (১৭৫৬-৫৭ খ্রি.) বিরোধীচক্রের সাথে যুক্ত হয়ে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার এবং শওকতজঙকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতকরণের ষড়যন্ত্রে ঘসেটি বেগম সক্রিয় তৎপরতা চালিয়েছিলেন। এমনকি সিরাজ বিরোধী পলাশি ষড়যন্ত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল বলে ইতিহাসবিদদের দাবি। উপরেউল্লিখিত নারীরা উল্লেখযোগ্য যারা নবাবি বাংলার সরকার ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[২৯]

নবাবি যুগে উল্লেখযোগ্য আরেক নারী হলেন নাটোরের রাণী ভবানী (১৭১৫-১৮০২ খ্রি.)। তাঁর স্বামী রামাকান্ত ছিলেন রাজশাহীর জমিদার। নবাবি যুগে ঘটনাচক্রে তিনি জমিদারি হারা হলে স্ত্রী ভবানী তাঁকে প্রভাবশালী বণিক অভিজাত জগৎ শেঠের সহায়তায় ও আলীবর্দী খানের পৃষ্ঠপোষকতায় জমিদারি ফিরে পেতে সাহায্য করেন। ১৭৪৮ সালে তাঁর স্বামী মারা যাবার পর তিনি জমিদারির শাসনভার গ্রহণ করেন। সে সময় তাঁর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল মুর্শিদাবাদ, ঘোড়াঘাট, ভূষণা, আকবরনগর, জাহাঙ্গীরনগর, কড়াইবাড়ী, বর্ধমান,

---

২৭. এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও আলো আরজুমান বানু, "নবাবী বাংলার সরকার ও রাজনীতি: কয়েকজন বিশিষ্ট নারীর ভূমিকা", *Journal of Sociology, Vol. 4,* ISSU-2, July-December, 2012, p. 219

২৮. গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *সিয়ার-উল মুতাখ্খিরিন*, বাংলা অনুবাদ আ কা মো যাকারিয়া, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৯০

২৯. এতদ বিষয়ে বিশদ বিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, *নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণি: রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ২২৭-২২৮, ৩৩১-৩৩৬

যশোহর ইত্যাদি। এ জমিদারির প্রধান কর্মস্থল ছিল নাটোর। এ কারণে ভবানী নাটোরে রাণী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এ সময় সমগ্র বাংলায় বর্গীদের উৎপাত বেড়ে গিয়েছিল। তিনি সুকৌশলে তাঁর রাজ্যকে বর্গীদের হাত থেকে রক্ষা করেন। এছাড়া তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে বিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। যদিও সে সময়ে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন খুব বেশি ছিল না।[৩০] তাঁর সম্পর্কে বলা হয়:

> She was the most celebrated personage in the whole family and her administration of the Raj, during the last half of the last century, was memorable... Moharani Bhabhani was pious, liberal and actively benevolent. She was not slow in performing the duties of her stations, as she understands them according to the lights of her age and country.[৩১]

সমকালীন বঙ্গীয় রাজনীতিতে রাণী ভবানীর বিশেষ প্রভাব ছিল বলে জানা যায়। এমনকি পলাশির যুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলার ভূ-অভিজাত শ্রেণির অন্যতম মধ্যমণি হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলেন। সিরাজবিরোধী পলাশি ষড়যন্ত্রে তাঁর ভূমিকা বিষয়ে সমকালীন ঐতিহাসিক তৎসূত্রে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।[৩২]

পলাশি যুদ্ধের পর বাংলায় বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা পরিবেশে বীরভূমের জমিদার আসাদুজ্জামানের স্ত্রী রাণী লালবিবির (১৭৩৫-১৭৯০ খ্রি. মা চাঁদ বিবি ও বাবা বাহারাম খান) রাজনৈতিক ভূমিকার কথা জানা যায়। লালবিবি তাঁর স্বামী জমিদার আসাদুজ্জামানকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তাদের ক্রীড়ানক নবাব মীর জাফরের (১৭৫৭-৬০ এবং ১৭৬৪-৬৫ খ্রি.) বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে সেনা সংগ্রহে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশবিরোধী কাজ পরিচালনার জন্য বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। মীর জাফরের স্ত্রী মুন্নি বেগমও রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, মুন্নি বেগম যখন ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে বাংলার এক অংশ ইংরেজদের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন, তখন বীরভূমের জমিদার পত্নী লালবিবি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিদ্রোহী ফকির নায়কদের হাতে প্রচুর অর্থ ও তাঁর স্বর্ণালংকার তুলে দিয়েছিলেন।[৩৩] এভাবেই ফকির মজনু শাহের ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে লালবিবি হয়ে উঠেছিলেন প্রেরণার উৎস।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে যে সকল বিদ্রোহ হয়েছিল এর মধ্যে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলন (ওহাবী আন্দোলন নামে সমাধিক খ্যাত), ফরায়েজী আন্দোলন,

---

৩০. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *রাণী ভবানী*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৫৮-৬৩

৩১. Kishori Chand Mitra, *Rajas of Rajshahi*. উদ্ধৃত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩-৬৪

৩২. নবাবী যুগে রাণী ভবানীর রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, *নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণি, পৃ. ১৮১, ৩০, ৩৪৯-৫০, ৩৫৭*

৩৩. এম. আব্দুর রহমান, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরঙ্গণা*, প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৪

তিতুমীরের বিদ্রোহ, চোঁয়ার বিদ্রোহসহ কৃষক বিদ্রোহ ছিল অন্যতম। এ বিদ্রোহগুলোতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকার কথাও জানা যায়। ওহাবী নেতা আমির খাঁর কন্যা জেবুন্নেসা এ আন্দোলনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন। তিনি ওহাবী আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থভাণ্ডারের অধ্যক্ষা ছিলেন।[৩৪] ১৭৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলজুড়ে যে আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ দেখা যায় তা 'চোঁয়ার বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।[৩৫] এ বিদ্রোহে নারীরা গোপনে খবরাখবর বিদ্রোহীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি চোঁয়ার বিদ্রোহের নেতা গোবর্ধন সরকারের প্রধান সহায়ক ছিলেন। এছাড়া নীল বিদ্রোহে তিতুমীরের মা আয়েশা বেগমের সংশ্লিষ্টতার কথা জানা যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যায় রাজস্ব সংগ্রহের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভের প্রকাশে সংগঠিত ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে স্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন দেবী চৌধুরাণী।[৩৬]

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, আঠারো শতকের নাবাবি শাসনযুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার রাজনীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থায় কতিপয় নারীকে বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যায়। তবে এর কেউ সাধারণ পরিবারের নারী ছিলেন না। এ সময়কালে রাজনীতিতে যুক্ত নারীরা প্রায় সকলেই ছিলেন শাসক পরিবারের অথবা শাসকগোষ্ঠীর সহযোগী উচ্চ অভিজাত পরিবারের সদস্য। বিপুল নারীসমাজে তাঁদেরকে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য করা সঙ্গত।

১৮৫৭-৫৮ সালে ইংরেজ কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে পরিচালিত বিদ্রোহ একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ইংরেজ সরকার ও তাদের অনুসারী ইতিহাসবিদগণ একে 'সিপাহী বিদ্রোহ' (the sepoy mutiny) বলে আখ্যায়িত করলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে এটি ছিল 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।' কোম্পানি সরকার সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হলেও তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। বিদ্রোহ পরবর্তী ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রণীত *The Government of India Act 1858* বলে ব্রিটিশ সরকার ভারতে কোম্পানি শাসনের সমাপ্তি ঘটায় এবং ব্রিটিশ রাজকীয় ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা করে।[৩৭] ১৮৫৮ সালের সিপাহী বা মহা বিদ্রোহ ভারতের রাজনীতিতে উন্মাতাল পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেও তুলনামূলক বিচারে বাংলায় এ বিদ্রোহের প্রভাব কম পরিলক্ষিত হয়। সর্বভারতীয় পর্যায়ে বিবেচনায় নিয়ে দেখা যায় যে, সিপাহী বিদ্রোহে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁর সহচরী যোতীবাঈ,

৩৪. আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬
৩৫. আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৩২
৩৬. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
৩৭. এই আইন বলে ব্রিটিশ রাজা বা রাণীর প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত গভর্নর জেনারেল একই সাথে দেশীয় রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে রাজা বা রাণীর 'ভাইসরয়' বা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপালনের কর্তৃত্ব লাভ করেন।

অযোধ্যার বেগম হযরতমহল, নর্তকী আজিজান, মধ্যপ্রদেশের রামগড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনের বিধবা স্ত্রী মহারানী অবন্তীবাঈ লোধী, উত্তর প্রদেশের মুজাফফর নগর জেলার কাজি আব্দীল রহীম খানের মা আসগারী প্রমুখ অনেক নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।[৩৮] কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে সে রকমটা দেখা যায় না। বাংলায় এ বিদ্রোহ যতটুকু হয়েছিল তাতে নারীদের সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতের একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যের উত্তরাধিকারিণী ছিলেন মাতাজী মহারাণী বা গঙ্গাঁবাঈ। এ মহীয়সী নারী বাংলায় এসে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত বিপ্লবী হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, হেম ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রেখে বিদ্রোহের সমর্থনে কাজ করেন বলে জানা যায়। সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তীকালে এ মহীয়সী নারী বাংলাদেশকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করে এখানে নারীশিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন।

উপর্যুক্ত কিছু ব্যতিক্রমী নারীচরিত্র ছাড়া উনিশ শতক অবধি বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীদের পদচারণা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো ছিল না। বলা হয় যে, প্রাচীন যুগে বাংলায় নারীসমাজ মূলত ধর্মীয় ও সামাজিক শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে মধ্যযুগ এমনকি আধুনিক যুগের প্রারম্ভিক সময় পর্যন্ত বাঙালি নারীরা শাসকচক্র তথা রাষ্ট্রীয় শাসন-শোষণে যাঁতাকলে পিষ্ট ছিল। নৃতত্ত্ববিদদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সভ্যতা, সমাজ ও পরিবারের গঠন ও বিকাশে নারীর ভূমিকা ছিল অগ্রণী, সাহসী এবং আদর্শ। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গ-ভারতের সমাজ ও রাজনীতিতে নারীকে সে রকম সক্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যায় না বরং এ সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল একেবারেই গৌণ।।[৩৯]

এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে বিশেষ দ্বি-মত নেই যে, উনিশ শতক ছিল বাংলার ইতিহাসে নবজাগরণের যুগ। আর এ নবজাগরণের অন্যতম প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নারীজাগরণে। অনেকেই মনে করেন যে, বাংলার নবজাগরণের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল নিয়ামকগুলোর অন্যতম ছিল ইউরোপে সংঘটিত শিল্পবিপ্লবের প্রভাব। শিল্পবিপ্লবের ফলেই শ্রম বাজারে পাশ্চাত্য মেয়েদের অনুপ্রবেশের সুযোগ ঘটে। তদুপরি এ সময় নারীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদির ফলে নারীসমাজের মধ্যে আত্মজাগরণ ঘটে। শোষণ ও নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নিজেদের মানবিক অন্যান্য অধিকার বিষয়ে নারীসমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রে বাংলার সাথে ইউরোপের যোগাযোগ বৃদ্ধি, ইউরোপের নব্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সদিচ্ছা প্রভৃতি বাংলার নারীসমাজেও রূপান্তর দেখা দেয়। বাল্যবিবাহ, বর্ণভেদ, এবং সামাজিক রীতি ঐতিহ্য ও লৌকিক ধর্মাচারের নামে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালি নারীরা ক্রমশ সোচ্চার হয়ে ওঠে। নারীজাগরণের এ পর্যায়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নারীরা অধিকারের প্রশ্নে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলন মুখ্যত দুটি ধারায় পরিচালিত হয়। (ক) সমাজ সংস্কারমূলক ধারা এবং (খ) উপনিবেশবিরোধী জাতীয় রাজনৈতিক মুক্তি

---

৩৮. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩১
৩৯. বেবী মওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

আন্দোলনের ধারা। পাশ্চাত্যের সামাজিক আন্দোলন, নারীশিক্ষা আন্দোলন, ভোটাধিকার আন্দোলন দ্বারা এ বাঙালি নারীসমাজ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে বঙ্গ-ভারতীয় নারীসমাজ নিজেদের মানবীয় অধিকার, সামাজিক অবরোধ মুক্তি আন্দোলনের পথ অতিক্রম করার পাশাপাশি রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলন, বিশেষ করে স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে।[৪০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, বাংলায় নারী মুক্তি ও অধিকার আদায়ে উনিশ শতকে যে সংস্কার আন্দোলন হয় তার সূত্রপাত হয় পুরুষদের হাত ধরেই। এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬ খ্রি.), রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭ খ্রি.), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১খ্রি.) ও ইয়ং বেঙ্গল[৪১] নামক সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। বাংলায় সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন, বিধবা বিবাহ প্রচলন আন্দোলন, বহুবিবাহ প্রথা রদ আন্দোলন এবং বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের মতো নারী বিষয়ক আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন পূর্বোক্ত ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠন। উপর্যুক্ত আন্দোলনগুলোর সাথে উনিশ শতকে নারীশিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা লাভ করে।[৪২] মূলত রাজ রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রি.), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ নারীশিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে নারীমুক্তি ও জাগরণের লক্ষ্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বলা হয় যে, পূর্বোক্ত মনীষীগণ যখন নারীমুক্তির জন্য সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন, সে সময় সে অর্থে বাঙালি নারী মানসেই মুক্তির চেতনা বিকশিত হয়নি।[৪৩]

১৮১৫ সালে কলকাতায় এসে ইংরেজ সরকারের সাথে যোগাযোগ করে রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮১৭ সালে তা চূড়ান্ত রাজবিধি হিসেবে প্রচারিত হয়।[৪৪] ১৮৫৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় তাঁর 'আত্মীয় সভায়' খসড়া কর্মসূচিতে নারী অধিকার ও শিক্ষা বিষয়টি যুক্ত করেন। এরপর ডিরোজিওর ইয়ংবেঙ্গল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবোধনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ নারী স্বাধীনতার পক্ষে মত প্রকাশ করে। উল্লেখ্য যে, ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৪৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ। এ সংগঠনের মূল উদ্যেক্তারা নারীজাগরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব

---

৪০. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, প্রিপট্রাস্ট প্রকাশক ধানমন্ডি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪

৪১. হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১ খ্রি.) শিষ্যগণ ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত। এ কলেজের ছাত্ররা ডিরোজিওর পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে মুক্ত-বুদ্ধির চর্চা ও ভালো-মন্দ বিচারের শিক্ষা এবং জ্ঞান লাভ করেন। তারা কালিদাসের স্থলে সেক্সপিয়ারকে (১৫৬৪-১৬০৬ খ্রি.) মর্যাদা দেন, বেদ-বেদান্তের পরিবর্তে বাইবেলের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এরা রামায়ণ ও মহাভারতের নীতি উপদেশকে অত্যন্ত সেকেলে বলে উপহাস করতেন। তাদের আন্দোলনই 'ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন' নামে পরিচিত। মো. আব্দুল্লাহ আল মাসুম, *বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৮৫-১৯২১)*, বাংলা একাডেমী, ২০০৭, পৃ. ৮-৯

৪২. মো. আব্দুল্লাহ আল মাসুম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

৪৩. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৬

৪৪. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

দিতেন। মূলত ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে বাংলার সর্বত্র নারীজাগরণের সূচনা ঘটে।[৪৫] উনিশ শতকের সূচনাতে খ্রিস্টান মিশনারিরা বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে এগিয়ে এসেছিলেন। তবে নারীশিক্ষার ব্যাপক বিস্তারে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। ১৮৪৯ সাল বাংলার নারীশিক্ষা ও জাগরণের একটি মাইলফলক বছর হিসেবে গণ্য হয়। এ বছর প্রতিষ্ঠিত বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই মূলত শুরু হয় বাঙালি নারীদের ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।[৪৬] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজসচেতন কতিপয় বাঙালি নারীর আবির্ভাব বাংলার নারীজাগরণ আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল। এ সময় স্বামীদের উৎসাহে শিক্ষিত নারীদের মধ্যে রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০ খ্রি.), সারদা সুন্দরী দেবী (১৮১৯-১৯০৭ খ্রি.), কৈলাস কামিনী দেবী (১৮২৯-১৮৯৫ খ্রি.) ও নিস্তারিনী দেবী (১৮৩০-১৯১৯ খ্রি.) প্রমুখ আত্মকথা লিখে সমকালীন নারীদের অবস্থান তুলে ধরেন। অনেক নারী স্বজাতীয়দের আত্মসচেতন করার পাশাপাশি নিজেদের অধিকার আদায়ে করণীয় নির্দেশ করেন। ব্রহ্মময়ী দেবী, সৌদামিনী রায়, হেমাঙ্গিনী দেবী, স্বর্ণলতা ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ স্বনামখ্যাত কতিপয় নারীসমাজের কল্যাণার্থে কিছু নারী সংগঠন ও সমিতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছিলেন।[৪৭]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীর দুরবস্থার অবসান এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে বিভিন্ন নারী সংগঠন ও পত্রপত্রিকা কাজ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংগঠন ছিল– বামাবোধিনী সভা (১৮৬৩), 'বামাহিতৈষিণী সভা' (১৮৭১), 'ভারত আশ্রয়' (১৮৭২), 'বঙ্গ নারী সমাজ' (১৮৭৯) ও 'আর্য নারী সমাজ' (১৮৭৯) প্রভৃতি। এ সব সংগঠন গঠিত ও পরিচালিত হতো মুখ্যত ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক। এসব প্রতিষ্ঠান মূলত স্ত্রী শিক্ষা, নারীদের বৈধ অধিকারসমূহের সামাজিক স্বীকৃতি, দুঃস্থ ও অনাথ স্ত্রী লোকদের সহায়তা দান এবং শিশুপালন ও হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে বাইরের জগতের সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বর্ণকুমারীর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন, সরলা দেবীর মাতা) নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'লেডিস থিওসফিক্যাল সোসাইটি'। পরে তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারীদের সংগঠিত করে দেশ ও জনহিতকর কাজে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'সখী সমিতি' (১৮৮৬) গড়ে তোলেন।[৪৮] ১৯১০ সালে বাংলার প্রথম নারীবাদী বলে খ্যাত সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫ খ্রি.) গড়ে তোলেন 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' যা বাংলার বাইরেও নারী আন্দোলনের শিখা ছড়িয়ে দেয়। বাংলার নারীদের চিন্তা ও চেতনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে 'অবলাবান্ধব' (১৮৬৯) নামক সংগঠনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তাছাড়া 'ভারত আশ্রয়' (১৮৭২), 'নারী শিল্প সমিতি' (১৯০৭), 'নারী শিক্ষা সমিতি'র (১৯১৭) মতো প্রায় উনিশটি সংগঠন বাংলার নানাপ্রান্তে নারীশিক্ষা ও নারীর

৪৫. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
৪৬. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
৪৭. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
৪৮. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

অধিকার নিয়ে কাজ করেছিল।[৪৯] এসব সংগঠন ছাড়াও ‘বেঙ্গল সোস্যাল অ্যাসোসিয়েশন’, ‘শ্রীহট্ট সম্মিলনী’ (১৮৭৬), আমির আলীর ‘ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন’ (১৮৭৭), ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতি’ (১৯০৩) মুসলিম নারীসমাজের জাগরণে ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯১৭ সালে ডরোথি জিনারাদেশা, মার্গারেট কুসিন্স ও অ্যানি বেসান্ত প্রমুখের প্রচেষ্টায় প্রথম সর্বভারতীয় নারী সংগঠন ‘উইমেন্স ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (WIA) প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটি নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মন্দিরে যৌনদাসী বা সেবাদাসী প্রথা বিলোপ করতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কাজ করে।[৫০] নারীশিক্ষা প্রসারসহ নারীজাগরণের লক্ষ্যে লেডি অবলা বসু (আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর স্ত্রী) জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর সহায়তায় ১৯১৯ সালে ‘নারী শিক্ষা সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কবি কামিনী রায় ও অবলা বসুর প্রতিষ্ঠিত ‘বঙ্গীয় নারী সমাজ’ নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করেছিল। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বোন উর্মিলা দেবী (১৯২১-১৯৫৬ খ্রি.– পিতা ভুবন মোহন দাশ, মাতা নিস্তারিনী দেবী) গড়ে তোলেন ‘নারী কর্ম মন্দির’। এর লক্ষ্য ছিল নারীদের স্বরাজ্যের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত করা।[৫১] আশালতা সেন স্বদেশি চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘গেন্ডারিয়া নারী সমিতি’ (১৯২৩)। সরযুবালা গুপ্ত (১৮৮৮-১৯৪৫ খ্রি.) ও সরমাগুপ্ত (১৮৮২-১৯৪২ খ্রি.) ছিলেন এ সমিতির নেত্রী।

লীলা রায় (১৯০০-১৯৭০ খ্রি.–পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ, মাতা কুঞ্জলতা) ১৯২৩ সালে ঢাকায় গড়ে তোলেন ‘দীপালি সংঘ’ নামে একটি সংগঠন। এ সংগঠনের মুখপত্র ‘*জয়শ্রী*’ পত্রিকা নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছিল। দীপালি সংঘকে বাংলার প্রথম নারীবাদী রাজনৈতিক সংগঠন বলে অভিহিত করা হয়। মূলত এ সংগঠনটি নারীদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় চেতনাই জাগ্রত করতে সচেষ্ট ছিল।[৫২] ১৯২৫ সালে ব্রিটিশ সহায়তায় সর্বভারতীয় নারী সংগঠন ‘National Council of Women in India’ (NCWI) প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ছিল এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য। সে সময় প্রতিটি জেলার কালেক্টরদের স্ত্রীরা এর প্রধানরূপে কাজ করতেন। এ সংগঠনের নেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯ খ্রি.), কমলা চৌধুরাণী, এ্যানি বেসান্ত, অনুসুয়া কালী, হানসা মেহ্তা, অরুনা আসফ আলী, রমেশ্বরী নেহেরু, মথুলক্ষী রেঞ্জী, সরলা দেবী চৌধুরাণী, হাজরা বেগম, রেনু চক্রবর্তী, পেরিন রমেশ চন্দ্র প্রমুখ। এছাড়াও এ সংগঠনের সাথে যুক্ত জাহানারা শাহ্ নেওয়াজ ও মাসুমা

---

৪৯. আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

৫০. https://www.encyclopedia.com/international/encyclopedias-almanacs-transcriptsmap (Accessed 30 December 18, 10:05)

৫১. Barbara Southard, *The Women's Movement and Colonial in Bengal: The Quest for political rights, education and social reform legislation 1921-1936*, The University Press ltd, Dhaka, 1996, p.10

৫২. পলাশ মণ্ডল, ‘ঢাকার ‘দীপালি সংঘ থেকে ‘শ্রী সংঘ’: লীলা রায়ের (১৯০০-৭০ খ্রিস্টাব্দ) চিন্তা ও কর্মের বিবর্তন’, *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা সংখ্যা ৩৫-৩৬*, ১৪১৯-২১ বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, পৃ. ১৪০

বেগম নামক দু'জন মুসলিম নারীর নামও পাওয়া যায়।[৫৩] নেতাজি সুভাষ বসুর মা প্রভাবতী বসু কর্তৃক ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নারী রাষ্ট্র সংঘ', ১৯২৮ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'ছাত্রী সংঘ' ইত্যাদি সংগঠনেরও লক্ষ্য ছিল নারীদের মধ্যে স্বদেশি চেতনা প্রসার। ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন'। নারী পাচার রোধ এবং যৌন শোষণ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করতে বঙ্গীয় আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়নের জন্য এ সংগঠন কাজ করেছিল।[৫৪] এ সংগঠনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন সুনীতি দেবী, সুচারু দেবী এবং রোমেলা সিনহা প্রমুখ।

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় নারীদের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বঙ্গীয় নারী আত্মরক্ষা সমিতি'। সেবামূলক ও সংস্কারমূলক কর্মসূচি ছাড়াও রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও তারা শামিল হন। ১৯৪৩ সালের ৮ মার্চ এক সম্মেলনের মাধ্যমে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক নারী আত্মরক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। কমলা চ্যাটার্জী, মনিকুন্তলা সেন, যুঁইফুল রায়, লতিকা সেন প্রমুখ। ছাত্রী নেত্রীদের মধ্যে ছিলেন কনক দাশগুপ্ত, কল্যাণী মুখার্জী প্রমুখ ছিলেন এ সংগঠনের মূল উদ্যোক্তা। পরবর্তীতে গীতা রায় চৌধুরী ও রেণু রায় (চক্রবর্তী) তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।[৫৫]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে বলা হয় বাংলার মুসলিম নারী শিক্ষা ও জাগরণের অগ্রদূত। ১৯১৬ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে-খাওয়াতিনে-ইসলাম' (কলকাতা মোহামেডান লেডিস অ্যাসোসিয়ন) নামক সংগঠন নারীর অধিকার আদায় ও তাদের জাগরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এ সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে Usha Chakrabarty তাঁর *Condition of Bengali Women Around the 2nd Half of the 19th Century* গ্রন্থে লিখেছেন:

> The Muslim Community under the patronage of Rokeya Begum founded in a society called by the name Anjumane Khawatin in Calcutta in 1916 for the upliftment of Bengali girls, cottage industry training was given by it along with literary instruction, women used to attend there mostly from bustees.[৫৬]

বেগম রোকেয়ার পূর্বসূরি হিসেবে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা ও জাগরণে উৎসাহিতকরণে মন্নুজান (১৭৩২-১৮০৩ খ্রি.), বিবি তাহেরুন নেসা, নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩), করিমুন্নেসা খানম (১৯৫৫-১৯২৬ খ্রি.), প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। রোকেয়ার উত্তরসূরিদের মধ্যে শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪ খ্রি.), ফজিলতুন নেসা (১৯০৫-১৯৭৭ খ্রি.) একই ভূমিকা পালন করেন।[৫৭]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে ব্যক্তি ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় বাংলায় নারীশিক্ষার ক্রমপ্রসার ঘটে। এ শিক্ষা বাঙালি নারীদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলে এবং তাদেরকে

---

৫৩. https://www.indianetzone.com/50/national_council_women_india.htm (Accessed 30.12.18)
৫৪. https://em.wikipedia.org/wiki/All_Bengal Women Union. (Accessed 30 December 18)
৫৫. হেনা দাস, *নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১২-১৩
৫৬. Usha Chakrabarty, *Condition of Bengali Women Around the 2nd Half of the 19th Century*, Calcutta: Published by the Author, 1961 p. 62
৫৭. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সক্রিয় হওয়ার প্রেরণা জোগায়। নারীসমাজ শোষণ নিপীড়নের বেড়াজাল ছিন্ন করে তাদের মানবীয়, আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণে রাজনীতিতে যুক্ত হয়। নানা আন্দোলন সংগ্রামে পুরুষদের পাশাপাশি তারাও সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

বাংলায় ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঔপনিবেশিক শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য পরিচালিত ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, বিভিন্ন আঞ্চলিক কৃষক বিদ্রোহ, তথাকথিত ওহাবী আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ এবং এসব বিদ্রোহে নারীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৮৩ সালে 'ইলবার্ট বিল'[৫৮] কে কেন্দ্র করে সূচিত রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। এ আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি কামিনী রায়, লেডি অবলা বসু বেথুন কলেজের শিক্ষার্থী সরলা দেবী প্রমুখ।[৫৯] ১৮৮৫ সালে 'সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (All Indian National Congress) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের আন্দোলন সংগ্রাম তথা রাজনীতি ইউরোপের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে। তবে এর পাশাপাশি বিপ্লবী ধারার এমনকি উগ্র সন্ত্রাসবাদী ধারার রাজনীতি ও গুপ্ত আন্দোলনের ধারাও প্রবাহমান ছিল। এ দু'ধারার রাজনীতিতেই পুরুষদের পাশাপাশি বাংলার নারীসমাজ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৮৮৫ সালে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের পৃষ্ঠপোষকতায় 'Indian National Congress' নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথমদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি উদারনৈতিক মধ্যমপন্থি রাজনৈতিক দল ছিল।[৬০] কংগ্রেসের শুরু থেকেই নারীদের জন্য সদস্যপদ গ্রহণ উন্মুক্ত ছিল। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন:

> Political reformers "of all shades of opinion" never forget that unless the elevation of the female element of the nation proceeds pari passu (with an equal pace) with their work, all their labour for the political enfranchisement of the country will prove in vain.[৬১]

স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী দেবী পণ্ডিত রামাবাঈ প্রমুখ শুরুতেই কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে জানকীনাথ ঘোষালের স্ত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী এবং

---

৫৮. ব্রিটিশ ভারতের বিচার ব্যাবস্থায় বিদ্যমান ভারতীয় বিচারকদের প্রতি জাতিভেদমূলক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপনের পরামর্শে তাঁর কাউন্সিলের আইন বিভাগের সদস্য স্যার কোর্টনে পেরেনিজ ইলবার্ট (Sir Courtenay Peregrine Ilbert) ১৮৮২ সালে "Bill to amend the Code of Criminal Procedure, 1882" নামে একটি খসড়া বিল প্রণয়ন করেন– যা ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। ১৮৮৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি এটি আইন হিসেবে গৃহীত ও প্রকাশিত হয়। বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে জাতি বৈষম্য দূর হওয়ায় ভারতীয়রা এর সমর্থন করলেও ইউরোপীয়রা এর বিরোধিতা করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিলটির সমর্থনে ভারতীয়রা আন্দোলন শুরু করেছিল।

৫৯. মাসুমা খানম, *নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩

৬০. আ. ফ. ম সালাহউদ্দিন আহমদ, *উনিশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড*, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ২৮০

৬১. Anowar Hossain, *op.cit*, p. 212

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৯০ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনেও এ দু'জন বাঙালি নারীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এতে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে অধিবেশন সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।[৬২] ১৯০১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণী একটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করেন এবং ৫০ জন মেয়েকে সমবেত কণ্ঠে এ সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য প্রশিক্ষণ দেন। ১৯০২ সালে কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিলেন লেডী বিদ্যাগঁরী নীলকান্ত এবং তাঁর বোন সারদা মেহতা। জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নারী নেত্রী ছিলেন ম্যাডাম কামা, এ্যানি বেসান্ত, মার্গারেট কাজিন্স এবং সরোজিনী নাইডু।[৬৩] এভাবেই উনিশ শতকের শেষ দশকে এসেই বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে নারীর প্রথম অংশগ্রহণ ঘটে।

বিশ শতকের সূচনালগ্নে স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ সারা বাংলাকে উদ্বেলিত করে তুলে। এ আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণও ছিল উল্লেখযোগ্য। মূলত একটি অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসেবে ১৯০৩ সালে স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতে এটি দুর্বার রাজনৈতিক গণআন্দোলনের রূপ নেয়। উল্লেখ্য যে, প্রকাশ্যত প্রশাসনিক সুবিধার কথা বলা হলেও কার্যত বাঙালির ঐক্যে ভাঙন ধরিয়ে নিজেদের স্বার্থ পূরণের নীতিতে বিশ্বাসী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বাঙালি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরাবার দূরভিসন্ধি হিসেবে ব্রিটিশরা বঙ্গভঙ্গের পথ বেছে নিয়েছিল। ১৯০৫ সালে ভাইসরয় লর্ড কার্জন তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে দ্বি-খণ্ডিত করে আসামের সাথে উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে সংযুক্ত করে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। অপরদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে গঠন করা হয় 'বাংলা প্রদেশ' (Bengal Presidency)।[৬৪] সাধারণভাবে মুসলিম সমাজ বঙ্গবিভাগকে সমর্থন জানালেও হিন্দু সমাজ এর তীব্র বিরোধিতা করে বঙ্গভঙ্গ রদের সপক্ষে আন্দোলন শুরু করে। এক পর্যায়ে আন্দোলন উগ্র স্বদেশি আন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলনে পুরুষদের পাশপাশি নারীরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল বলে জানা যায়। এসব নারীদের মধ্যে নবশশী দেবী, সুশীলা সেন, কমল কামিনী গুপ্তা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬৫] আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলন শুরু হলে সরলা দেবী চৌধুরাণী স্বদেশি শিক্ষা চালু করার জন্য 'লক্ষ্মীভাণ্ডার' নামে একটি আড়ত খোলেন। বিদেশি দ্রব্য বিশেষ করে বস্ত্রদ্রব্য বর্জন বা বয়কট আন্দোলন যখন গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয় সে সময় 'বীরাষ্টমী' মেলার মাধ্যমে শক্তিচর্চাব্রত, অরন্ধন ও রাখীবন্ধনের মতো কর্মসূচিতে বাংলার

---

৬২. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড ব্রাদ্রার্স লি. কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৩

৬৩. Kanak Mukherjee, *Women's Emancipation Movement in India,* National Book Centre, New Delhi, 1989, p. 44

৬৪. মুহম্মদ আব্দুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ.বি.এম. মাহমুদ, সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাসে নওরোজ*, কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪০২

৬৫. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

নারীরা অংশ নেন বলে সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। স্বদেশি আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্প, সাহিত্য ও কাব্যচর্চার ক্ষেত্রেও নারীরা সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ 'স্বদেশবান্ধব সমিতি'র সাথেও যুক্ত হন।[৬৬] এছাড়া স্বদেশি আন্দোলনে কুমুদিনী মিত্র (কলকাতার কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা) স্বদেশি দ্রব্য প্রচলনের সংকল্প গ্রহণ ও বিলেতি দ্রব্য বর্জনের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন। তিনি সভা সমিতিতে যোগদান করেন এবং জাতীয় উদ্দীপনামূলক সঙ্গীতাদি রচনা করে জনসাধারণকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। লীলাবতী মিত্র (কুমুদিনী মিত্রের মা), নির্মলা সরকার (ডাঃ নীলরতন সরকারের স্ত্রী), সুবলা আচার্য (ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী), হেমাঙ্গীনি দাস (ডাঃ সুন্দরী মোহন দাসের স্ত্রী) নিজ নিজ গৃহে এবং পল্লীতে পল্লীতে তাঁত ও চরকা প্রবর্তনে তৎপরতা চালান এবং স্বদেশি আন্দোলনকে সার্থক করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।[৬৭] এছাড়া স্বর্ণকুমারী দেবী, মানবকুমারী বসু, কামিনী রায়, বিরাজ মোহিনী দেবী, লজ্জাবতী বসু, প্রমীলা নাগ, বিনয়কুমারী বসু, নগেন্দ্র বালা মুস্তাফি, পঙ্কজিনী বসু, নির্ঝরিনী দেবী, কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরী, হেমন্তকুমারী চৌধুরী, লাবণ্যপ্রভা দত্ত, আশালতা সেন, বনলতা সেন প্রমুখ স্বদেশি আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, 'অন্তপুর' প্রভৃতি সংবাদপত্র নারীদের সংঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। নারীরা স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই বার্তাই বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল যে, বাইরের জগতে তারাও পাশ্চাত্যের নারীদের মত ভূমিকা পালন করতে পারে।[৬৮] *সঞ্জীবনী* পত্রিকায় লিখেছিলেন, স্বদেশি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিন জেলার তিনজন নারী, এঁরা হলেন ময়মনসিংহের দীনমনি চৌধুরী, জলপাইগুড়ির অম্বুজা সুন্দরী দাশগুপ্ত এবং মৌগঞ্জের লক্ষ্মণ চৌধুরীর বিধবা পত্নী।[৬৯] কমলা দাশগুপ্ত তাঁর *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী* গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঢাকা ও ঢাকার গ্রামাঞ্চলে যেসব নারী ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সভা সমিতি করে স্বদেশী ব্রত গ্রহণে নারীদের উদ্বুদ্ধ করতেন তাঁদের মধ্যে মুক্ত কেশী দেবী (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্বশ্রুমাতা), চিন্ময়ী দাস (সোনারং গ্রাম), সুশীলা সুন্দরী সেন (ঢাকার দীননাথ সেনের কন্যা), প্রিয়বালা গুপ্তা, গিরিজা গুপ্তা, সুরমা সেন, কমলকামিনী গুপ্তা, সুশীলা সেন, নবশশী দেবী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।[৭০]

সম্ভবত ব্রিটিশদের ভেদনীতি এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন অনেকটা হিন্দু জাতীয়তাবাদ দ্বারা রঞ্জিত থাকায় মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশই এ থেকে দূরে থাকে এবং এজন্যই এ আন্দোলনে মুসলিম নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ আন্দোলনে বাংলার মুসলিম নারীদেরও যে আলোড়িত করেছিল

---

৬৬. Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal,* Peoples' Publishing House, New Delhi, 1977, pp. 247-288

৬৭. শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৭

৬৮. Aparna Basu, "*The Role of Women in the Indian Struggle for Freedom", in Indian Women: From Purdah to Modernity* (ed.), Banda, Vikas Publishing, New Delhi, 1976, p. 17

৬৯. রেজিনা বেগম, *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-৪৭)*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১১২

৭০. কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২৭৮-৮২

তারও কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সিরাজগঞ্জের মুন্সী মেহেরুল্লাহর কন্যা খায়রুন্নেসা খাতুনের (১৮৮০-১৯১২ খ্রি.) কথা বলা যেতে পারে। খায়রন্নেসাকে সাম্রাজ্যবিরোধী রাজনীতি সচেতন প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে গণ্য করা যায়।[৭১] অখণ্ড বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এ মহীয়সী নারী ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে যুক্ত এবং আমৃত্যু কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। তিনি বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রি.) বিরোধী এবং কংগ্রেস পরিচালিত স্বদেশি আন্দোলনেরও সমর্থক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট ভাষায় কখনো তাঁর স্বনামে কখনো ছদ্মনামে বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে সমকালীন সংবাদপত্রে লিখতেন।[৭২] খায়রন্নেসা বাংলার দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং স্বদেশের উন্নতির জন্য নারীসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করে গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এমন কঠোর ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখার দৃষ্টান্ত সমসাময়িক অনেক পুরুষ লেখকের লেখাতেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।[৭৩]

এতদিন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং রাজনৈতিক সচেতনতার সংস্পর্শ থেকে বাংলার নারীদের দূরে রাখার যে অপচেষ্টা ছিল বঙ্গভঙ্গ ঘোষণায় পর্যায়ক্রমে সে চিত্রের পরিবর্তন ঘটে। অন্য দিকে বাংলার পুরুষরাও অনুভব করেন যে, সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ নারীদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না থাকলে এবং তাঁরা দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত না হলে স্বদেশি আন্দোলন ফলপ্রসূ হবে না। এ কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুরুষরাও নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। আর এভাবেই নারীরা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন।

স্মর্তব্য যে, ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি আরেকটি ধারা ছিল সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম যা অনেকক্ষেত্রে 'সন্ত্রাসবাদ' নামে পরিচিত। উনিশ শতকে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের বিস্তার ঘটে। ১৮৯৩ সালে অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খ্রি.) বিলেত থেকে কলকাতায় ফিরে বাঙালিকে স্বাদেশিকতার নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।[৭৪] তবে তাঁর প্রয়াস তখন সফল হয়নি। ১৯০২ সালে তাঁর দূত হয়ে আসেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯১৫)। ইনি বাঘা যতীন নামেও বাঙালি সমাজে পরিচিত। এদের সূচিত বিপ্লবী আন্দোলনে কতিপয় নারীর সক্রিয় তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়– যাদের পুরোভাগে নেতৃত্ব দেন সরলা দেবী চৌধুরাণী। তাঁর সাথে সহযোগী হিসেবে কাজ করেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ভগিনী

---

৭১. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রন্নেসা খাতুন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৪৬

৭২. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘোরবিরোধী খায়রুন্নেসা 'খয়ের খাঁ মুনশী' নামে সংবাদপত্রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রবন্ধ লিখতেন, সেকালের জনপ্রিয় *নবনূর* পত্রিকায় এতদসংক্রান্ত তার বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭

৭৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৭৪. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *বাংলায় বিপ্লববাদের পালা বদল*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১

নিবেদিতা।[৭৫] বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ বিপ্লবী আন্দোলনকে বাঙালির জীবনের পরম আশির্বাদ বলে আখ্যায়িত করে একে বাঙালি জীবনে এক নতুন চেতনার উদ্ভব হিসেবে গণ্য করেন। তাঁর মতে, এর মাধ্যমে বাঙালি যেন দেড়শত বছরের ঘুমঘোর থেকে জেগে উঠল।[৭৬]

স্বদেশি ও অন্যান্য আন্দোলনে নারীদের যেভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল বিপ্লববাদে নারীদের অংশগ্রহণের প্রকৃতি একটু ভিন্ন ছিল। এতে অংশ নেয়া নারীদের অধিকাংশই ছিলেন বিপ্লবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমাবস্থায় নারীরা বিপ্লবীদের আশ্রয়দান, তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা ও ক্ষেত্র বিশেষে গোপন তথ্য আদান-প্রদান, পুলিশকে বিভ্রান্ত করে বিপ্লবীদের পলায়নের ব্যবস্থা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন। এসব কাজে যারা সক্রিয় ভূমিকা রাখেন তাঁদের মধ্যে বগলা সুন্দরী দেবী, অনুশীলন দলে প্রতুল গাঙ্গুলীর মা (সূত্রাপুর, ঢাকা), ব্রহ্মময়ী সেন (বিক্রমপুর, ঢাকা), চিন্ময়ী সেন (ঢাকা), সৌদামিনী দেবী (ফরিদপুর) এবং প্রিয়বালা দাশগুপ্ত ও মৃণালিনী দাসগুপ্ত (বরিশাল) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭৭] গৌতম চট্টোপাধ্যায় এর তথ্য মতে, চারুশীলা (পিতা রাখাল চন্দ্র অধিকারী) নামে একজন নারী বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।[৭৮] অন্য একটি সূত্র মতে, ক্ষুদিরামকে লুকিয়ে রেখে ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষা করতে যিনি চেষ্টা করেছিলেন তিনি ছিলেন একজন মুসলিম নারী। এই অজ্ঞাতনামা মুসলিম নারী মৌলভী আবদুল ওয়াহেদের ভগ্নি এবং তিনি ওই সময়ে সমগ্র ভারতে 'কিংবদন্তী দিদি' নামে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে ব্রিটিশদের নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য তিনি জার্মানিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[৭৯] প্রভাবতী মির্জা (যিনি পরবর্তীতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়েছিলেন) ক্ষুদিরামের ফাঁসির প্রতিবাদে অনশনে যোগ দিয়েছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে কারা ভোগকারী নারী নেত্রী লীলা মিত্র (স্বামী কৃষ্ণ কুমার মিত্র) বিপ্লবী ছাত্রদের আশ্রয় দিতেন। ১৯০৯ সালে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ কারাগার থেকে মুক্ত হলে লীলা মিত্র তাঁকে আশ্রয় দেন।[৮০] সরোজিনী দেবী (সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা ভগ্নি) বরিশালে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। একইভাবে বিনোদিনী দেবী (যুগান্তর দলের যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দিদি) ও তাঁর ভাইকে এবং রাধারাণী দেবী (অনুশীলন দলের জীবনতারা হালদারের মা) তাঁর ছেলেকে তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নৈতিক সমর্থন দিতেন বলে জানা যায়।[৮১] এ সময়ে বেশ কয়েকজন ভারতীয় আন্তর্জাতিক বিপ্লবীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সিরাজগঞ্জের আম্বিয়া খান লুহানী ছিলেন অন্যতম।[৮২]

---

৭৫. ভগ্নি নিবেদিতার জন্ম আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানসে ১৮৬৭ সালে। পূর্বনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। পিতার নাম স্যামুয়েল নোবেল স্বামী বিবেকানন্দের সাহচর্যে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নিয়ে ভগিনী নিবেদিতা নাম ধারণ করেন। ১৯১১ সালে তিনি কলকাতায় মারা যান।

৭৬. তীর্থা মণ্ডল, *ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বীর বঙ্গনারী (১৯০৫-৩৯)*, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৯

৭৭. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাস অনুসন্ধান-৪*, কপি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩২৮

৭৮. কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

৭৯. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, *ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শ্রী হট্ট*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৪

৮০. রেজিনা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১

৮১. শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১২

৮২. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

হাওড়া জেলার বালীর সূর্যকান্ত ব্যানার্জীর কন্যা ননীবালা দেবী (১৮৮৮ খ্রি.) বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ নেতাদের আশ্রয় দেন। তিনি ছদ্মবেশে জেলে প্রবেশ করে অস্ত্র সংক্রান্ত তথ্য এনে বিপ্লবীদের দেন। পরবর্তীতে তাঁর পরিচয় প্রকাশিত হলে পুলিশ অসুস্থ অবস্থায় পেশোয়ার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে কাশ্মির জেলে এবং পরে ১৯১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুযায়ী স্টেট প্রিজনার হিসেবে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে স্থানান্তর করে। তিনিই ছিলেন বাংলার একমাত্র নারী স্টেট প্রিজনার।[৮৩] দুকড়িবালা (১৮৮৭-১৯৭০ খ্রি.) ছিলেন আরেকজন বিপ্লবী নারী। তিনি ছিলেন অস্ত্র আইনে দণ্ডিত প্রথম ভারতীয় নারী বিপ্লবী।[৮৪] তিনি বিপ্লবী নিবরাণ ঘটকের মাসিমা ছিলেন এবং তাঁর অস্ত্র তিনি লুকিয়ে রাখার অপরাধে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচারের রায়ে তাঁদের শাস্তি হয়। নোয়াখালীর সুশীলা মিত্রের (১৮৯৪-১৯৭৮ খ্রি.) দেবর সত্যেন বসু ও শচীন যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন। তাঁদের সূত্রে তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯১০ সালে দুকড়িবালা দেবী ও সুশীলা মিত্র কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।

১৯০৬ সালে ভারতীয় মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে ঢাকায় 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' (All Indian Muslim League) প্রতিষ্ঠিত হয়। রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে প্রথমদিকে এ সংগঠনে নারীদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ ছিল না। ফলে বিশ শতকের সূচনায় বঙ্গ-ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু নারীদের তুলনায় মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ একেবারেই কম ছিল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ খ্রি) পরবর্তীকালে ভারতে পরিচালিত ব্রিটিশবিরোধী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯১৯-১৯২২ খ্রি.) নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজয়ের পর ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পরাজিত অটোমান সাম্রাজ্যকে খণ্ডিতকরণ এবং সুলতান-খলিফার মর্যাদাহানি করার উদ্যোগ নিলে ক্ষুব্ধ হয়ে ভারতীয় মুসলিম সমাজ খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। এ সময় রাওলাট বিল পাস[৮৫] ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের[৮৬] প্রতিক্রিয়া হিসেবে কংগ্রেস নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রি.) খিলাফত আন্দোলনের সমান্তরালে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন।[৮৭] গান্ধীজির অনুপ্রেরণায় এ আন্দোলনে নারীসমাজও অংশ নেন। বাংলায় এ আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী (১৮৮০-১৯৭৪ খ্রি.)। ঢাকায় আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৮৬

৮৩. কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৪০
৮৪. রেজিনা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩
৮৫. *রাওলাট বিল* ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দমনের জন্য ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিচারপতি রাওলাট এর নেতৃত্বে একটি কমিটি আইনসভায় দুটি বিল উত্থাপন করে। প্রথম রাওলাট বিলে রাজদ্রোহ মামলা বিচারের জন্য একটি নতুন বিচারালয় গঠন এবং এ আদালতের বিরুদ্ধে কোনো আপিল নিষিদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয় বিলটি সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া যে কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ বিচারে দণ্ড দেওয়া যাবে। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১)*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৯১
৮৬. ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত জনসভায় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ডায়ার ও তাঁর সঙ্গীরা নিষ্ঠুর ও পাশবিক আক্রমণ চালিয়ে ২৫০ জন নর-নারী ও শিশুকে হত্যা করে। নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-১৯
৮৭. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

খ্রি.), লীলা রায় (লীলা নাগ নামে সমধিক পরিচিত) এবং কলকাতায় মোহিনী দেবী ও বাসন্তী দেবী প্রমুখ এ আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এছাড়া অন্যরা যারা অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন তারা হলেন উর্মিলা দেবী (চিত্তরঞ্জন দাসের বোন)[৮৮] হেমপ্রভা মজুমদার (১৮৮৮-১৯৬২ খ্রি. পিতা গগণ চন্দ্র চৌধুরী, মাতা দিঘশরী), সুনীতি দেবী, নেলীসেন গুপ্তা,[৮৯] জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী,[৯০] সরলাগুপ্ত, দৌলতননেছা (বগুড়া, পিতা মুহাম্মদ ইয়াসিন মাতা নুরুন্নেসা খাতুন), সরোজিনী নাইডু,[৯১] রাধা দেবী (লালা লাজপৎ রায়ের স্ত্রী), রেনুকা রায় (ডায়াশেসন কলেজের ছাত্রী),[৯২] সিলেটের সরলা বালা দেবী (১৮৯২-১৯৬০ খ্রি.), বালুরঘাট, দিনাজপুরের প্রভা চট্টোপাধ্যায়, ভোলার সরযুবালা সেন, বরিশালের ইন্দুমতি গুহঠাকুরতা, নোয়াখালীর সুশীলা মিত্র, খুলনার স্নেহশীলা চৌধুরী, বর্ধমানের সুরমা মুখোপাধ্যায়, রাজশাহীর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী (১৯০৮-১৯৮১ খ্রি), ময়মনসিংহের ঊষা গুহ, বরিশালের প্রফুল্লকুমারী বসু[৯৩] মনোরমা বসু, চারুশীলা রায়[৯৪] প্রমুখ নারী অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। নারীসমাজকে সংগঠিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঞ্চলে 'নারী মঙ্গল' সমিতি প্রতিষ্ঠা করে বা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত নারী সংগঠনগুলোকে সক্রিয় করে গ্রামে গ্রামে এমনকি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে নারীদের মধ্যে আন্দোলনের সপক্ষে প্রচার কার্য চালাতেন।[৯৫]

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলার নারীদের সংগঠিতকরণে অগ্রণীভাগে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও বোন উর্মিলা দেবী। ১৯২১ সালের ৭ ডিসেম্বর কলকাতার রাস্তায় আইন অমান্য করে খদ্দর বিক্রি করবার সময় বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী ও সুনীতি দেবীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আইন অমান্য আন্দোলনে বাংলায় নারীদের গ্রেপ্তার হবার এটিই ছিল প্রথম ঘটনা।[৯৬] ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রেপ্তার হলে তাঁর অনুপস্থিতিতে ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব

---

৮৮. উর্মিলা দেবী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অনুপ্রেরণায় নারী কর্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করে আইন অমান্য করে সভা-সমিতি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

৮৯. ইংরেজ নারী নেলী গ্রে চট্টগ্রামের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর স্বামীর প্রেরণায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আন্দোলনের অর্থ তহবিলে দু'টি সোনার চুরি দান করেন এবং কারাবরণও করেন; শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২; মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬

৯০. ১৯২০ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী'। সংঘবদ্ধভাবে বাঙালি নারীর প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এই প্রথম; কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

৯১. বঙ্গকন্যা সরোজিনী নাইডু ১৯২১ সালে বিলাত থেকে ফিরে এসে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১ সালে আহমদাবাদে কংগ্রেসে দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর সভাপতির অভিভাষণ সরোজিনী নাইডুই পাঠ করেছিলেন। শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫; B. R Nanda, *Indian Women from Purdah to Modernity,* Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1975, p. 22

৯২. ১৯২০ সালে রেনুকাসহ ডায়োশেসান কলেজের ছাত্রীরা কলকাতায় প্রদত্ত গান্ধীর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আন্দোলনে যোগ দেন। এমনকি আন্দোলনের খরচ নির্বাহের জন্য তাঁদের অনেকেই নিজেদের গহনাদি গান্ধীজিকে প্রদান করেন। রেজিনা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

৯৩. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০১

৯৪. হীরা লাল দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৫৭

৯৫. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০১

৯৬. কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

করেন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী।[৯৭] এ ঘটনার মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের পুরোভাগে একজন নারীর অধিষ্ঠান ঘটে। হেমপ্রভা মজুমদার তৎকালীন বঙ্গীয় রাজনীতির একজন যোগ্য কর্মী ছিলেন। তিনি চাঁদপুর ও গোয়ালন্দের স্টীমার ধর্মঘটে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। তিনি নারায়ণগঞ্জে গিয়ে একটি নারী সংগঠনের সূচনা ঘটান। ১৯২৬ সালে সরোজিনী নাইডু যখন কংগ্রেসের সভানেত্রী হন, তখন হেমপ্রভা তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিলেন। বস্তুত, এ দু'জন স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য সংযোগকারী মাধ্যমরূপে পরিগণিত হন।[৯৮] ১৯৩৭ সালে হেমপ্রভা মজুমদার বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান সভাতে সদস্য নির্বাচিত হন।[৯৯] বরিশালের মনোরমা বসু (যিনি পরবর্তী জীবনে 'মাসিমা' নামে পরিচিতি লাভ করেন) ১৯২০-২১ সালে গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

খিলাফত আন্দোলনে[১০০] মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। এদের মধ্যে বি-আম্মা আবাদি বানু বেগমের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন খিলাফত আন্দোলনের প্রাণপুরুষ মাওলানা শওকত আলী (১৮৭৩-১৯৩৮ খ্রি.) ও মাওলানা মোহাম্মদ আলী (১৯৭৮-১৯৩১খ্রি.) ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী। লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর নারী সমাবেশে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। বি-আম্মার সাথে সে সময়ে বিভিন্ন সভা সমিতি ও আন্দোলনে মুসলিম অভিজাত ঘরের শিক্ষিত নারীরাও যোগ দেন। যেহেতু অসহযোগ আন্দোলনের সাথে খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করা হয়, তাই হিন্দু মুসলিম নারীরা একসাথে খিলাফত ও স্বদেশি আন্দোলনের সভাগুলোতে যোগ দিতেন। মুসলিম নারীরা সভা সমিতির মাধ্যমে আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। তাঁরা পুরুষ সমাজকে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাতেও ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সভায় তিনি প্রথম ভাষণ দেন এবং সে সভাস্থলেই 'বন্দে মাতরম' এবং 'আল্লাহু আকবর' উভয় ধ্বনি উচ্চারিত হয়।[১০১] ১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক সভায় বি-আম্মা তাঁর পুত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন এবং সেখানে ভাষণে তিনি বলেন–

---

৯৭. রেজিনা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

৯৮. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

৯৯. *Bengal Legislative Assembly, 1937,* Vol. L1-No.4, p.xi

১০০. খিলাফত আন্দোলন ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। এ আন্দোলনে মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম উভয় একই মঞ্চে এসে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকার সেভার্সের সন্ধি শর্তে তুরস্ককে খণ্ড বিখণ্ড করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন লাভের আশায় ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় যুদ্ধকালে ও পরবর্তী সময়ে তারা তুরস্ককে বিভক্ত করবে না, কারণ মুসলমানরা ধর্মীয় দিক থেকে তুরস্কের অনুগত ছিল। আর তাই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তারা বিক্ষুব্ধ হয় এবং তুর্কি খিলাফত রক্ষা ও ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় শক্তিগুলোর কাছ থেকে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, শেঠ ছোটানী, নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ ও সৈয়দ আবদুল হাফেজ প্রমুখ ব্যক্তিরা এর নেতৃত্বে ছিলেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য জয়দুল হোসেন, *অবিভক্ত বাংলার অসমাপ্ত বিপ্লব*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬; আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১)*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮; Md. Abdul Wadud Bhuiyan, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League,* Vikas Publishing House Pvt Ltd, Delhi, 1982

১০১ . William Hunter, *The Indian Mussalmans,* Premier Book House, Lahore, 1964, p.78

দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রয়োজন হলে স্বামী-পুত্রদের পাঠাতে হবে জেলে এবং নিজেদেরও ভয় দ্বিধা পরিত্যাগ করে বরণ করে নিতে হবে কারাগার। আমার সন্তানেরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ করেছে। সেজন্য জননী হিসেবে আমি গর্ববোধ করছি।[১০২]

১৯২১ সালে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার কাজে বি-আম্মা এবং তার দুই ছেলে আলী ভ্রাতৃদ্বয় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। বি-আম্মার উদ্দীপনামূলক ভাষণে বাংলার মুসলিম জনগণের মধ্যে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেওয়ার প্রেরণা জাগে। চাকুরি, ওকালতি ছেড়ে বহু ব্যক্তি এই আন্দোলনে যোগ দেন।[১০৩] ১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের খিলাফতের বিলুপ্তি এবং প্রজাতন্ত্র ঘোষণার ফলে বঙ্গ-ভারতের খিলাফত আন্দোলন উপযোগিতা হারায় এবং এক পর্যায়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশ্য এর আগেই ১৯২২ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সহিংসতায় রূপ নেওয়ায় গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তাই বলা যায় যে, খিলাফত ও অসহযোগ উভয় আন্দোলনই পদ্ধতিগতভাবে ব্যর্থ হয়। তবে এ আন্দালন ভারতীয়দের গণআন্দোলন পরিচালনার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করেছিল–যা পরবর্তিতে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধিকার আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

ভোটাধিকার অর্জনের আন্দোলনকে সামগ্রিকভাবে বাঙালি নারীসমাজের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার বড় অগ্রগতি ও অর্জন বলে গণ্য করা হয়। বিশ শতকের প্রথম দশকগুলোতে পরিচালিত স্বদেশি ও স্বাধিকার আন্দোলনের ক্রমধারায় নারীর ভোটাধিকারের প্রশ্নটিও সচেতন রাজনৈতিক দাবি হিসেবে নারীসমাজের মধ্য থেকেই উত্থাপিত হয়। ১৯১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর মন্টেগু-চেমসফোর্ড মিশনের কাছে সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন নারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। ১৪ সদস্যের এ প্রতিনিধিদলে মুসলিম নারীদের প্রতিনিধি হিসেবে বেগম হযরত সোহানী যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিনিধি দল নারীসমাজের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মাতৃমঙ্গলের উন্নত ব্যবস্থার পাশাপাশি পুরুষদের ন্যায় নারীর ভোটাধিকার দাবি করে। তবে নারীদের এই ভোটাধিকারের দাবি গৃহীত হয়নি। আইন পরিষদে নারীদের নির্বাচনের দাবিও তখন অগ্রাহ্য করা হয়।[১০৪] বঙ্গীয় নারীসমাজ ভোটাধিকার দাবিতে যে নারী প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল তাতে নেতৃত্ব দেন লেডি অবলা বসু। অন্য সদস্যরা ছিলেন কবি কামিনী রায়, মৃণালিনী সেন এবং কুমুদিনী বসু।[১০৫] প্রতিনিধি দলে না থাকলেও নারীর ভোটাধিকার দাবিতে বেগম রোকেয়াও অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন।

১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইনসভায় নারীদের ভোটাধিকার অনুমোদনের প্রস্তাবটি নাকচ হলেও নারীদের আন্দোলনের ফলেই ১৯২৩ সালে কোলকাতা পৌর নির্বাচনে নারীর ভোটাধিকার অর্জিত হয়। এতে উৎসাহিত

---

১০২. আনোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

১০৩. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

১০৪. কনক মুখোপাধ্যায়, *ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা*, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৬, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫, পৃ. ২৪-২৫

১০৫. আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩

হয়ে কামিনী রায়, বেগম রোকেয়া এবং বেগম সুলতানা মুয়াজিদজাদার নেতৃত্বে একটি নারী প্রতিনিধিদল লর্ড লিটনের সাথে সাক্ষাত করে নারীদের সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জনে তাঁর সমর্থন কামনা করেন। নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সরলা দেবী এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য স্থানে সংগঠিত ছোট ছোট নারী সমিতিগুলোও পূর্বোক্ত দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম বাংলা নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।[১০৬] এ ভোটাধিকার অর্জন নিঃসন্দেহে এক তাৎপর্যময় ঘটনা ছিল। কেননা এর মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক অধিকার কেবল স্বীকৃতি লাভ করেনি বরং নারীমুক্তি আন্দোলন এক নতুন মাত্রা অর্জন করে।

১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্টের ভারত শাসন আইন ভারতীয়দের মোটেই সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। ফলে তাদের মধ্যে যে, গণঅসন্তোষ দেখা দেয় তা প্রশমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার উদ্যোগ নেয়। ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইনের সংস্কার ও পরিমার্জনের প্রস্তাবনা ও রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ১৯২৮ সালে সরকার 'সাইমন কমিশন' গঠন করে। তবে এতে পরিস্থিতির উন্নতি না হয়ে বরং নতুন করে সংকট দেখা দেয়। সাইমন কমিশন রাজনৈতিক উত্তেজনার উৎস হিসেবে কাজ করে।[১০৭] বাংলাসহ সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভারতজুড়ে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-হরতাল-প্রতিবাদ সভা শুরু হয়। সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে নারীরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কমিশনের প্রতিবাদে কলকাতায় যে সভা হয় এতে সহস্রাধিক নারী উপস্থিত থেকে স্বদেশ সেবায় সংকল্প গ্রহণ করেন বলে যোগেশ চন্দ্র বাগলের সূত্র থেকে জানা যায়। এ প্রতিবাদ সভায় বিপুল সংখ্যক নারীর উপস্থিতির পিছনে কবি মদনমোহন ঘোষের কন্যা এবং শ্রী অরবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী লতিকা ঘোষের (১৯০২-১৯৮৩ খ্রি) ভূমিকা ছিল।[১০৮] সুভাষচন্দ্র বসুর চেষ্টায় এ লতিকা ঘোষ গঠন করেন 'নারী রাষ্ট্রীয় সংঘ' নামক একটি সংগঠন। সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী বসু এর সভাপতি এবং সুভাষচন্দ্রের বড় ভাই শরৎচন্দ্র বসুর সহধর্মিনী বিভাবতী বসু এ সংগঠনের সহ-সভপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।[১০৯]

শুধু নারী সংগঠন ও নারী নেতৃবৃন্দ নন, স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ ছাত্রীরাও সাইমন কমিশনবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। বেথুন কলেজের ছাত্রীরা তাদের কলেজের সামনে পিকেটিং এ অংশ নিয়েছিল। বহিষ্কারের ভীতি উপেক্ষা তারা হরতাল কর্মসূচিতে যোগ দেন। এ কারণে কলেজের অধ্যক্ষ জি. এম. রাইট ছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় ছাত্রীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে। ফলে অধ্যক্ষ রাইট শুধু কলেজ

---

১০৬. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

১০৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ জুলাই, ৩ নভেম্বর ও ৪ ডিসেম্বর ১৯২৭; উদ্ধৃত শওকত আরা হোসেন, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২১-১৯৩৬ অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৩০

১০৮. যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

১০৯. *ঐ*

নয়, বরং ভারতবর্ষ ত্যাগে বাধ্য হন। এ ঘটনাটি সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু এর পরবর্তী প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। বস্তুত, এ সময় থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রীদের ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। ছাত্রীসমাজের এ ভূমিকা তাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে এবং নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে, তথ্যসূত্রে সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হিসেবে যাদের নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে ননীগুপ্ত, বীণা দাস, কমলা দাশ গুপ্ত, উজ্জ্বলা মজুমদার, বনলতা সেন, জ্যোতিকণা দত্ত, পারুল মুখার্জী, ঊষা মুখার্জী, সাবিত্রী দেবী, লীলা নাগ, ইন্দুমতি সিংহ, প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত প্রমুখ অন্যতম।[১১০]

ভারতীয়দের প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাইমন কমিশন এক তরফাভাবে তার রিপোর্ট প্রকাশ করে। তবে এ রিপোর্ট ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে তারা এটি সর্বাত্মকভাবে প্রত্যাখ্যান করে। প্রতিবাদী পদক্ষেপ হিসেবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯২৮ সালে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা সংবলিত 'নেহেরু রিপোর্ট' (মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত কমিশন কর্তৃক প্রণীত) প্রকাশ করে। এ রিপোর্টের হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক হলেও মুসলমানদের মনোভাব ছিল সন্দেহমুক্ত ছিল না। তাই কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখার দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে মুসলিম লীগ প্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর 'চৌদ্দ দফা' (১৯২৯) দাবি উত্থাপন করেন। নেহেরু রিপোর্ট এবং এর বিপরীতে জিন্নাহর চৌদ্দ দফাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম মতানৈক্য বৃদ্ধি পেয়েছিল সন্দেহ নেই। তবে এ সময় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং এ আন্দোলনে উভয় সম্প্রদায় অংশ নেয়। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে কয়েকটি দাবি সংবলিত অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়। একটি আইন অমান্যের প্রস্তাব। আর এ আইন অমান্যের কর্মসূচি ছিল– ১. লবণ আইন ভঙ্গ, ২. বিদেশি বস্ত্র ও পণ্য বর্জন, ৩. ভূমি কর না দেওয়া, ৪. মাদকদ্রব্য ও আফিম বর্জন। ১৯৩০-৩৪ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচির আওতায় আন্দোলন চলে এবং এ সময়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করা হবে। লক্ষণীয় যে, কংগ্রেস সূচিত এবং গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত এ আইন অমান্য আন্দোলনে ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলায়ও নারীরা ব্যাপক হারে অংশ নিয়েছিলেন।

গান্ধীজি লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্য সবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডির উদ্দেশ্যে পদব্রজে যাত্রা করেন। কষ্টসাধ্য এ কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হলে দাদা ভাই নওরোজির নাতনি খোরশেদ বেন ও মৃদুলা সরভাই প্রমুখ গান্ধীর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, "This division of sexes in a non-violent campaing seems to us unnatural and against all the awakened conciousness of

১১০. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

modern womanhood”.[১১১] তবে একমাত্র নারী হিসেবে সরোজিনী নাইডু এই পদযাত্রায় তাঁর সঙ্গী হন।[১১২] লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য ১৯৩০ সালের এপ্রিল গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন। তবে এতে আন্দোলন প্রশমিত হয়নি। বরং পুরুষদের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দিপ্ত বাঙালি নারীরা, এমনকি রক্ষণশীল পরিবারের নারীরাও জনসমক্ষে এসে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। এতে অনেককে কারাবরণ করতে হয়। এদের মধ্যে মেদিনীপুরের অশিক্ষিতা বিধবা সত্যবালা দেবীকে পুলিশের হাতে চরম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়।[১১৩]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯২৮ সুভাষ বসুর প্রেরণায় লতিকা ঘোষ-এর (অরবিন্দু ঘোষের ভাতিজি) নেতৃত্বে বাঙালি নারীদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণের জন্য ‘নারী রাষ্ট্রীয় সংঘ’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সংগঠনটি আইন অমান্য আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লতিকা ঘোষ স্কুল-কলেজে ছাত্রীদের পিকেটিংয়ের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করতেন। অরুবালা সেনগুপ্তের নেতৃত্বে এই সংঘের কর্মীবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন করে কলকাতার শ্যামাবাজার, বউবাজার, বড়বাজার এলাকায় পিকেটিং পরিচালনা করতো।[১১৪]

১৯৩০ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের নারীনেত্রীদের উদ্যোগে কলকাতায় ‘নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’ গঠিত হয়। ঊর্মিলা দেবী, মোহিনী দেবী (১৮৮৩-১৯৫৫ খ্রি.), দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর কন্যা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী (১৮৮৯-১৯৪৫ খ্রি.) নিস্তারিণী দেবী, অশোকলতা দাস, হেমপ্রভা দাসগুপ্ত (১৮৮৮-১৯৬২ খ্রি.) শান্তি দাস, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর কন্যা বিমল প্রভা দেবী (১৯০১-১৯৭৮ খ্রি.), ইন্দুমতি গোয়েঙ্কা, সরলাবালা সরকার প্রমুখ এ সংগঠনটি পরিচালনায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। নারী রাষ্ট্রীয় সংঘের মতো এ সমিতির কর্মচারীরাও বড় বাজারের সদাসুখ কাটরা, মনোহর দাস কাটরা, পচাগলি, সুতাপট্টি, গ্রান্ট স্ট্রিট, চাঁদনী চক, ক্রস স্ট্রিট, বউবাজার, নিউ মার্কেট প্রভৃতি স্থানে বিদেশি বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং করতেন। এছাড়াও তারা সভা ও শোভাযাত্রা পরিচালনা করতেন। এ সমিতির কর্মতৎপরতার ফলে পূর্বোক্ত স্থানসমূহের বিদেশি পণ্যের বিপণন সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।[১১৫]

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের সময় লীলা নাগ ঢাকায় নারীদের নিয়ে ‘ঢাকা নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’ গঠন করেন। ঢাকা শহর ও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সভা সমিতিতে প্রকাশ্যে লবণ তৈরি করে লবণ আইন ভঙ্গ করা

---

১১১. Premlata Pajari and Vijoy Kumari Kasik, *Women Power*, Kaniskka Publisher, Culcutta, 1994, p. 14

১১২. Dr. Awdhes Kumar, *Role of Women in the national Movement, International Journal of Multidisciplinary Research and Development Online ISSN:2349-4182*, Print ISSN:2349-5979, www.allsubjectjournal.com, Volume 4; ISSN:6; June 2017, p. 171

১১৩. রেজিনা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

১১৪. যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

১১৫. কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

হয়। গান্ধীজির ডান্ডি অভিযান ও এর পটভূমি সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিয়ে ৮০টি ছবি ও মহাত্মাজির বাণী এবং চিঠির অনুলিপির গাইড তৈরি করে ম্যাজিক ল্যাটার্ন এর মাধ্যমে নারীগণ ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সত্যাগ্রহের বাণী প্রচার ও সত্যাগ্রহে যোগদানে উৎসাহিত করেন। এই ম্যাজিক ল্যান্টার্ন পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে রেনু সেন (১৯০৯-১৯৪১ খ্রি.) ও বীণা রায়, শকুন্তলা চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।[১১৬] আশালতা সেন ও সরমা গুপ্তা এবং তাঁদের রাজনৈতিক সহকর্মীদের উদ্যোগে ১৯৩০ সালেই ঢাকায় 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল' গঠিত হয়। এ সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ আইন অমান্য আন্দোলন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে সরযুবালা গুপ্তা, সুনীতি বসু, কামিনী বসু ও প্রতিভা সেন প্রমুখ কারাদণ্ড ভোগ করেন।[১১৭] পূর্ব বাংলার সিলেটে প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীহট্ট নারী সংঘ' ও সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিল। এ সংঘের সভানেত্রী ছিলেন জোবেদা খাতুন চৌধুরাণী। তিনি লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন।[১১৮] উল্লেখ্য যে, ১৯২২ সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী এবং বেগম মুহম্মদ আলী প্রমুখের উপস্থিতিতে সিলেটে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে জোবেদা খাতুন চৌধুরাণীর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯২৮ সালে তিনি কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস পরিচালিত প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। আইন অমান্য আন্দোলন, লবণ আইন ভঙ্গকরণ ও বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলনে অংশগ্রহণে তিনি সিলেটে নারীদের উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করেন। বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলনের পক্ষে তিনি পিকেটিং ও মিছিলে অংশ নেন এবং সিলেট অঞ্চলে পুরুষ নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের পর তিনি আন্দোলনকে সচল রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।

১৯৩০-৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী আরেক নারী হলেন বগুড়ার দৌলতননেছা খাতুন। ঢাকা ইডেন হাইস্কুলে পড়ার সময়েই স্বাধিকার ও মুক্তি আন্দোলনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। গাইবান্ধার সংগ্রামী নারী মহামায়া ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণায় তিনি ১৯৩০ সালে 'গাইবান্ধা নারী সমিতি' গঠন করেন। তিনি ১৯৩০ সালের লবণ আইন এবং ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় সংগঠনের নারীরা সরকার বিরোধী সমাবেশ, শোভাযাত্রা এবং পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ করেন। তারা সরকারের ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনার কাজ চালায়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য তাঁর পরিবারকে নানা নিপীড়ন ভোগ করতে হয়। এমনকি অন্যান্যদের

---

১১৬. কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩-৮৫

১১৭. *ঐ*, পৃ. ১০২

১১৮. তাজুল মোহাম্মদ, 'জোবায়েদা খাতুন চৌধুরী', *সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৫

সাথে দৌলতননেছা খাতুনকেও কারাভোগ করতে হয়।[১১৯] তাঁর আত্মীয়দের জিয়াউন্নাহার, রাকিনা খাতুন, শামসুন নাহার, রোকেয়া খাতুনও এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে যুক্ত ঢাকা বিক্রমপুরের সুরামপুরের ফুলবাহার বিবিও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১২০] ব্রিটিশবিরোধী কার্যকলাপে সম্পৃক্ততার অপরাধে তাঁকেও কারাজীবন ভোগ করতে হয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অপরাধে ময়মনসিংহের কংগ্রেসকর্মী রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুনকেও পুলিশি নির্যাতন ও কারাভোগ করতে হয়েছিল। ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর দলের সাথে এদের যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস পরিচালিত ভারত ছাড় আন্দোলনেও তাঁরা অংশ নিয়েছিলেন।[১২১] আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ঢাকার সম্ভ্রান্ত পরিবারের কয়েকজন মুসলিম নারীর সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কংগ্রেস নেতা জিলানীর মা শামসুন্নেসা বেগম ও স্ত্রী রওশনারা বেগম ছিলেন অন্যতম। তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা কর্মীদের আর্থিক সহযোগিতা করতেন। এছাড়াও আসফ আলী বেগের স্ত্রী রাইসা বানু বেগম এবং আকতার উদ্দীন হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী বদরুন্নেসা বেগম প্রমুখের কথাও জানা যায়।[১২২] পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কবি, সমাজসেবী ও স্বদেশপ্রেমী নারী ছিলেন হোসনে আরা বেগম (১৯১৬-১৯৯৮ খ্রি.)। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভ্রাতুষ্পুত্রী কংগ্রেসকর্মী হোসনে আরা বেগম আইন অমান্য ও বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাভোগ করেন। ১৯৩২ সালে স্বাধীনতা দিবসে কলকাতা ময়দানে শোভাযাত্রা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন কবি হোসেন আরা বেগম।[১২৩]

১৯৩১ সালের পর 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' এই দু'টি বিপ্লবী দলে স্কুল কলেজের ছাত্রীরা যোগ দেয়। কমলা দাশগুপ্ত, কল্যাণী দাস (১৯০৭-১৯৮৩,খি.), শান্তিসুধা ঘোষ, সুলতা কর, ও আভা দে প্রমুখ যুগান্তর দলে যোগ দান করেছিলেন। কল্পনা দে যোগ দিয়েছিলেন সূর্যসেনের বিপ্লবী দলে। প্রথম ছাত্রী হিসেবে যুগান্তর দলে যোগ দেন কুমিল্লায় ফয়জুন্নেসা গার্লস স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম (১৯১৪-১৯৩৭ কুমিল্লায়)।[১২৪] এভাবে বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন ও যুগান্তর দলে ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে দু'জন স্কুলছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর গুলিতে কুমিল্লায় ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স নিহত হন। এটি ছিল ত্রিশের দশকে বিপ্লবী রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণের এক বড় দৃষ্টান্ত।[১২৫] এ ঘটনার পর মাত্র দু'মাসের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে

---

১১৯. কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫-২০৬
১২০. আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০
১২১. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২
১২২. কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১
১২৩. যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
১২৪. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
১২৫. রেজিনা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

স্নাতক ডিগ্রিধারী বীণা দাস গুলি ছুঁড়লে অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। তৎক্ষণাৎ বীণা দাসকে গ্রেপ্তার করার হয় এবং পরে বিচারে তাঁকে নয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এ ঘটনার পরে বিপ্লবী কার্যে জড়িত সন্দেহে বা বিপ্লবী কার্য করতে গিয়ে কমলা চট্টোপাধ্যায়, শোভারাণী দত্ত, উজ্জ্বলা দেবী, পারুল মুখোপাধ্যায়, বিমলা প্রতিভা দেবী, মায়া দেবী, জ্যোতিকণা দাস, বনলতা দাস, রেনুকা দাস, প্রফুল্ল ব্রহ্ম, শান্তি সুধা ঘোষ প্রমুখ গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন।[১২৬]

বাংলার বিপ্লবী রাজনীতিতে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২ খ্রি.) এক বহুল পরিচিত নাম। ১৯৩২ সালের ১৪ জানুয়ারি বিপ্লবী মাস্টার দা সূর্যসেনের জীবন রক্ষা করে তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা পালন করেন তিনি। জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার ও প্রতিভাময়ী দেবী দম্পতির কন্যা প্রীতিলতা ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ। বীরকন্যা প্রীতিলতা লীলা নাগের 'দীপালি সংঘ' ও কল্যাণী দাসের 'ছাত্রী সংঘ' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রথম দিকে বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সাথে যুক্ত থাকলেও পরে সূর্যসেনের বিপ্লবী দলে যোগ দেন। দেশমুক্তির চিন্তা এ নারীকে বিপ্লবী হতে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করেছিল। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে মাস্টারদা সূর্য সেনের (১৮৯৩-১৯৩৪ খ্রি.) নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে যেসব বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতে প্রীতিলতা সক্রিয় ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি ছয়জন সহকর্মীকে নিয়ে চট্টগ্রামে ইরোপিয়ান ক্লাবে সফল আক্রমণ চালিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড গ্রহণ করে আত্মহত্যা করেন। প্রীতিলতা আত্মবলিদানের মাধ্যমে মৃত্যুঞ্জয়ী হন।[১২৭] এভাবে বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাসে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার নিজের নাম স্থায়ী করে যান। প্রীতিলতার সাথী ছিলেন কল্পনা দত্ত। ১৯৩৩ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় অভিযুক্ত হন। এছাড়া সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্য উজ্জ্বলা মজুমদারকে ১৯৩৪ সালের ৮ মে বাংলার তদানিন্তন গভর্নর জেনারেল স্যার আন্ডারসনকে গুলি করে হত্যা এবং আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[১২৮] চট্টগ্রামের নবীন চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রী দেবী বিপ্লবী বীর সূর্যসেন ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দকে আশ্রয় দেবার জন্য ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। মুক্তি পাবার পরও তিনি পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাননি, অনেক কষ্ট ও নির্যাতন তাঁকে ভোগ করতে হয়। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর যেসব বিপ্লবী বন্দি হয়েছিলেন তাদের মামলার খরচ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের কাজ করেছিলেন চট্টগ্রামের বিপ্লবী অনন্ত সিংহের বড় বোন ইন্দুমতি সিংহ। তহবিল সংগ্রহের প্রয়োজনে তিনি বাংলার বাইরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি লালবাজারে গিয়ে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলে

---

১২৬. যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮
১২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ জুলাই ১৯৭২
১২৮. চিন্ময় চৌধুরী, *স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারী*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৮২-৮৭

তাঁদের মধ্যে সহানুভূতি জাগিয়ে তাঁদের কাছ থেকেও অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এলাহাবাদে গিয়ে তিনি জওহরলাল নেহেরুর কাছ থেকেও অর্থ সংগ্রহ করেন।[১২৯] ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে অর্থ সংগ্রহের জন্য কুমিল্লায় গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। বিপ্লবী ধীরেন চক্রবর্তীর দিদি চন্দ্রবাণী দেবী এবং তাঁর বৌদি রাজলক্ষ্মী দেবী বিপ্লবী বিনোদ দত্তকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।[১৩০]

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, কংগ্রেস প্রবর্তিত ব্রিটিশবিরোধী আইন অমান্য আন্দোলন ভারতীয় নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথকে আরো সুবিস্তৃত করেছিল। এ আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ যেমন সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে বৃদ্ধি পায়, তেমনি তাদের অংশগ্রহণের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে। বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলন বাঙালি নারীর জন্য বাইরের জগতে প্রবেশের সুযোগ অবারিত করেছিল। ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণের মধ্য দিয়ে বাঙালি নারীরা কেবল জনপরিমণ্ডলে ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ করলো এমনটা নয়, তারা বাঙালি নারীর ঐতিহ্যিক ও প্রথাসিদ্ধ ভূমিকা অস্বীকার করে সমাজ ও রাজনীতির অঙ্গনে নতুনরূপে নতুন ভূমিকায় আবির্ভূত হলো। এর ফল হিসেবে কেবল ভোটাধিকার অর্জিত হলো না বরং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইন পরিষদে নারীদের জন্য ৪১টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হলো। এ আইনে নারীদের ভোটাধিকারের সীমা বর্ধিত করা হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ৫১ জন নারী প্রাদেশিক আইন পরিষদে যোগদান করেন। এর মধ্যে ৪১ জন সংরক্ষিত নারী আসনের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১০ জন নারী অসংরক্ষিত আসনে জয়লাভ করেন। নারী আইন প্রণেতাগণের মধ্যে ৩৬ জন কংগ্রেস সদস্য, ১১জন স্বতন্ত্র সদস্য, ৩ জন মুসলিম লীগ এবং ১ জন ইউনিয়নিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন।[১৩১]

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে অবিভক্ত বাংলায় বামপন্থি আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল। এ আন্দোলনেও বাঙালি নারীর অংশগ্রহণের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য বামপন্থি দল নারী মুক্তির জন্য কাজ করেছিল। ১৯৩০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচিতে বলা হয়:

> The toiling women of India are in semi-enslaved condition under a double burden of the survival of feudalism and economic, cultural and legal inequality. The toiling women have no rights whatsoever to determine their fate and in the veil and without the right not only of participating in public affairs, but even of freely and openly meeting their fellow citizens and moving through the streets .....The Communist Party of India fights for the complete social, economic and legal equality of women.[১৩২]

১৯৩০-৪০ সালের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামে অনেক নারী অংশগ্রহণ করেছিল। তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সর্বাত্মক ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সেখানেও অনেক

---

১২৯. রেজিনা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২
১৩০. চিন্ময় চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১
১৩১. Premlata Pajari and Vijoy Kumari, *op.cit*, p. 18
১৩২. Kanak Mukherjee, *Ibid*, p.58; উদ্ধৃত আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪

ছাত্রী আন্দোলনে যোগ দেয় এবং সভা সমিতি ও বিক্ষোভে অংশ নেয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাংলার কনক মুখার্জী, পাঞ্জাবের পেরিন ডারুচা, বোম্বের নার্গিস কন্টিওয়ালা প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, ত্রিশের দশক ভারতীয় জনপ্রত্যাশা পূরণে কংগ্রেসী নেতৃত্বের ব্যর্থতা, তাদের আপসমুখিনতা, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার পটভূমিতে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রসার ঘটে। এ সময় হাজার হাজার ছাত্র-যুবক, কৃষক ও শ্রমিক বামপন্থি তথা মার্কসবাদী চিন্তা চেতনায় দীক্ষিত হতে থাকে। নারীরা ও এর ব্যতিক্রম চিন্তা করেনি। তারাও তাদের প্রতি বামপন্থিদের সুমহান সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দলে দলে বাম আন্দোলনে যোগ দেন। কংগ্রেস ও বিপ্লবী দলগুলো থেকে এসে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করে যারা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন তাঁদের মধ্যে লতিকা সেন, কমলা চ্যাটার্জী, মনিকুন্তলা সেন, কল্পনা দত্ত (যোশী), ইন্দুসুধা ঘোষ, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ১৯৩৯ সালে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে একটি ছাত্রী সংঘ বা Girls Students Association গড়ে ওঠে।[১৩৩] বামপন্থি আন্দোলনের সাথে মুসলিম নারীরাও চল্লিশের দশক থেকেই যুক্ত হন। এদের মধ্যে জলপাইগুড়ির লায়লা সামাদ, বর্ধমানের মনসুর হাবিবুল্লাহর স্ত্রী মাকসুদা বেগম, সৈয়দ মাহেদুল্লাহের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন এবং কলকাতার কুতুবউদ্দিন আহমেদের কন্যা নাজিমুন্নেসা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। নাজিমুন্নেসা কলকাতার বস্তিতে কাজ করতেন এবং পার্টি কর্মী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[১৩৪] তাছাড়া বর্ধমানের আব্দুল করিমের স্ত্রী সামসুন্নেসা ও একজন পার্টি কর্মী ছিলেন। চব্বিশ পরগণার দুখমত (আলমবাজারে জুটমিলে) ও গুলবাহার বিবি (টালিগঞ্জের রাইস মিলে কাজ করতেন) ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন।[১৩৫] তাছাড়া দৌলতননেছা গান্ধীজির মতাদর্শের বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কমিউনিস্ট পার্টিরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের জন্মের পর বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন গতি লাভ করে। বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের মতো জটিল ও কঠিন আন্দোলনের সূচনায় সন্তোষকুমারী দেবী, ড. প্রভাবতী দাশগুপ্ত, সুলতানা মোয়াজ্জেদা, সুধা রায় প্রমুখ কতিপয় নারী নেত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[১৩৬] তাদের তৎপরতায় ব্রিটিশ ভারতে বাংলা শ্রমিক আন্দোলন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনের অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল বোম্বে। ১৯২০-৪০ সালের মধ্যে ভারতে মোট ৬৭৪টি শ্রমিক ধর্মঘট হয়, তার মধ্যে বাংলা ও বোম্বেতে অনুষ্ঠিত ধর্মঘট সংখ্যা ছিল ৫৪০টি।[১৩৭] বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন সন্তোষ কুমারী দেবী।[১৩৮]

---

১৩৩. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

১৩৪. সরোজ মুখোপাধ্যায়, *ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও আমরা*, *প্রথম খণ্ড*, কলকাতার ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৯৩, পৃ. ১২৪-১২৬, ২৭৭-২৭৯

১৩৫. আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫

১৩৬. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

১৩৭. *ঐ*, পৃ. ৬৬

১৩৮. ১৮৯৭ সালে বার্মার রেঙ্গুনে এক সচ্ছল শিক্ষিত পরিবারে জন্ম। তিনি গান্ধীজির আন্দোলনের সাথে শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৯ সালে বার্মা থেকে তিনি পশ্চিম বাংলার নৌহাটিতে পৈতৃক বাড়িতে চলে আসেন। অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

গৌরীপুর চটকলে শ্রমিকদের দুর্দশা দেখে তিনি গৌরীপুর শ্রমিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন শ্রমিক সমিতির সভানেত্রী। বঙ্কিম মুখ্যার্জী এর সহ-সভাপতি ও কালিদাস ভট্টাচার্য সম্পাদক হন। তিনি বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি-উর্দু মোট ৪টি ভাষা জানতেন। তিনি ১৯২৪ সালে বাংলা, উর্দু, হিন্দি-এ ভাষায় *শ্রমিক* পত্রিকা বের করেন।[১৩৯] সন্তোষ কুমারী দেবী একদশক জুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৭ সালের বেঙ্গল নাগপুর রেল ধর্মঘটে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯২৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি খড়্গপুরের ২৫,০০০ রেল শ্রমিক ধর্মঘট করে। প্রায় ৬ মাস চলে এই ধর্মঘট। পুরো সময়টা তিনি তাদের সাথে সাথে ছিলেন। শ্রমিকরা ভালোবেসে তাঁকে ডাকত 'মাইরাম'।

গত শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে পরিচালিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক আন্দোলন ছিল 'ধাঙর বা মেথরদের ধর্মঘট'। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হাজার বছর ধরে ধাঙর সমাজ অত্যন্ত স্বল্প মজুরিতে কঠিন ও অশুচিবৃত্তির মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। নিরক্ষর ও সামাজিকভাবে একরকমের অস্পৃশ্য এ মানুষগুলো বিশ শতকের ত্রিশের দশকে মানবিক অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করেন এবং চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত তাদের আন্দোলনে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন বারবার প্রকম্পিত হয়েছে। ধাঙরদের এ আন্দোলন সংগঠনে নেতৃত্বের ভূমিকায় ড. প্রভাবতী দাশগুপ্ত এবং বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেদা নামক দু'জন নারীর উপস্থিতি দেখা যায়। প্রভাবতী দাশগুপ্ত ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত তারকানাথ দাশগুপ্তের কন্যা। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে এম.এ ডিগ্রি লাভের পর জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। জার্মানিতে থাকাকালে এম. এন. রায় সহ ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় এবং বিপ্লবী ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯২৭ সালে তিনি দেশে ফেরেন এবং ১৯২৮ সালে কলকাতায় সংঘটিত ধাঙরদের একটি বড় ধর্মঘটে তিনি নেতৃত্ব দেন। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী প্রভাবতী দাশগুপ্ত অসংগঠিত মেথরদের সংগঠিত করতে ২-১ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে অবস্থিত ওয়াকার্স এ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি অফিসে মুজাফ্ফর আহমেদ ও ধরণীকান্ত গোস্বামী প্রমুখের সাথে 'দি স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অব বেঙ্গল' গঠন করেন। ড. প্রভাবতী দাশগুপ্ত এ সংগঠনের সভানেত্রী, মুজাফ্ফর আহমেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ধরণীকান্ত গোস্বামী সম্পাদককের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১৪০] ২৪ জুন ১৯২৮ সালে সংঘটিত ধাঙর ধর্মঘট এবং ১৯২৮-২৯ সালের চটকল ওয়াকার্স ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে তাদের ধর্মঘটেও প্রভাবতী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ধাঙররা ড. প্রভাবতীকে ভালোবেসে 'ধাঙর মা' বলে অভিহিত করেছিলেন।

ধাঙর আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেদা ছিলেন আগা মুয়াইদজ্জাদা ইসলামের দ্বিতীয় কন্যা এবং বাংলার প্রথম মুসলমান নারী গ্রাজুয়েট। বেগম সুলতানা মোয়াজ্জেদার বাবা পারস্যে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবী দলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। পারস্য থেকে বিতাড়িত হয়ে

---

১৩৯. শেখ রফিক (সম্পাদিত), *শত নারী বিপ্লবী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩০৬-৩০৭
১৪০. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮-৬৯

তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং কলকাতা থেকে গোপনে পারস্যের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে যান। সাকিনার চরিত্রে তাই ব্রিটিশ বিরোধিতা ছিল সহজাত। সাকিনার বাবা কলকাতায় *Hablul Matin* নামে একটি উর্দু ও ইংরেজি দ্বি-ভাষিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সাকিনার পারিবারিক পরিমণ্ডল তাঁকে সাংস্কৃতিক জগতের সাথে পরিচিত করে। সাকিনা ফারুক একজন মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। এম এ পাশ করার পর তিনি আইনশ্রাস্ত্রেও ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন আইনশাস্ত্রে ডিগ্রিধারী প্রথম মুসলিম নারী। তিনিই কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম নারী আইনজীবী ছিলেন। ১৯৩৫ সালে আইনজীবী হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস শুরু করেছিলেন। [১৪১] ১৯৪০ সালের মার্চে সুভাসচন্দ্র বসুর ফরোয়ার্ড ব্লক, মুসলিম লীগের সঙ্গে নির্বাচনি মৈত্রী করে কলকাতা কর্পোরেশনে জয়লাভ করে। এ নির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে কমিউনিস্টদের সমর্থনে সাকিনা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। এখানেই তাঁর কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার, জমাদার, মেথরদের সঙ্গে গভীর পরিচয় হয়। মহার্ঘভাতা, ছুটি, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা, বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবিতে ধাঙরা ১৯৪০ সালের ২৬ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত ধর্মঘট করে। এতে প্রায় আঠারো হাজার শ্রমিক শামিল হয়। ধর্মঘট ও আন্দোলন দমনে সরকার ও কর্পোরেশন দমনপীড়নের পথ অবলম্বন করলে বেগম সাকিনা ফারুক এর প্রতিবাদ জানান এবং কর্পোরেশনের মিটিংয়ে ধাঙরদের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য দেন। তিনি পুলিশের নির্যাতনের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন:

> পুলিশ জুলুম করে ধর্মঘটীদের ধর্মঘট ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। শ্রমিককে জোর করছে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য লোকের উপর উৎপীড়ন করছে। আমি জিজ্ঞাসা করি– আমরা কোনো সুস্থ সরকারের অধীনে বাস করছি, না আমাদের দেশে নাৎসী রাজত্ব চলছে?[১৪২]

এ আন্দোলনে শ্রমিকরাই বিজয়ী হয় এবং দশ হাজার সদস্য নিয়ে তাদের নতুন ইউনিয়ন গঠন করা হয়। এ ইউনিয়নের সভানেত্রী হন সাকিনা ফারুক। কিন্তু কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় শ্রমিকরা ১৯৪০ সালের ২৬ আগস্ট পুনরায় ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘটে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে পরের দিনেই পুলিশ বেগম সাকিনা ফারুককে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে তদানিন্তন মেয়র তাঁকে শহর থেকে বহিস্কার করায় তাঁকে কিছুদিন অন্তরীণ অবস্থায় কার্শিয়াং–এ অবস্থান করতে হয়। সাকিনা ফারুকের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ববিহীন হয়ে পড়ায় ধাঙর ধর্মঘট ব্যর্থ হয়। এতে নিরাশ হয়ে বেগম সাকিনাও নিজেকে আন্দোলন থেকে গুটিয়ে নেন।

মার্ক্সবাদী সুধা রায়ও ছিলেন একজন বিশিষ্ট শ্রমিক নেত্রী। তিনি বন্দর শ্রমিকদের সাথে কাজ করতেন। সুধা রায় খিদিরপুর, মেটেবুরুজ, চুনাগলির বস্তিতে নিরক্ষর শ্রমিক ও তাদের পরিবার পরিজনকে সহজ ভাষায় সাম্যবাদ লেলিন ও রাশিয়া কমিউনিজম বিষয় বোঝাতেন। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডক ওয়াকার্স উনিয়নের নেতৃত্বে ১৯৩৪ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন সপ্তাহব্যাপী একটি ধর্মঘট পরিচালিত হয়। এ

১৪১. আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬
১৪২. ঐ, পৃ.২০৭

ধর্মঘটে সুধা রায়ের তেজস্বী ভূমিকা এখনো শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।[১৪৩] দুখমৎ বিবি ছিলেন কলকাতার বরানগরের আলম বাজারস্থ চটকলের এক লড়াকু নেত্রী। তিনিই বাংলার প্রথম শ্রমিক নেত্রী যিনি সাধারণ শ্রমিক থেকে শ্রমিকদের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে ঐতিহাসিক চটকল আন্দোলনে তিনি দক্ষতার সাথে সাধারণ শ্রমিকদের সংগঠিত করেন। এ সময়েই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেন।[১৪৪] শশীপ্রভা দেব ছিলেন সিলেট জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম নারী পার্টি সদস্য। চল্লিশের দশকের সূচনায় সিলেটের চা-বাগান শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১৪৫] শুধু শ্রমিক আন্দোলন নয় সমকালে পরিচালিত কৃষক আন্দোলনেও বাঙালি নারীরা অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, বিশ শতকের তিরিশের দশকে বিশ্বমন্দার কারণে বাংলায়ও বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও কালোবাজারির বিপুল বিস্তার ঘটে। এ সময় ব্রিটিশ রাজের 'ভাগ কর ও শাসন কর' এই ঔপনিবেশিক নীতির প্রতিক্রিয়ায় বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.) অশুভ প্রভাবে বাংলায় দেখা দেয় মহাদুর্ভিক্ষ–যা '৪৩-এর মন্বন্তর নামে পরিচিত। এ সময় একদিকে টলায়মান ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য মরণকামড় প্রদান এবং অন্যদিকে মধ্যমপন্থি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আপসকামী নেতৃত্বের মধ্যকার বিরোধের ফলে বঙ্গ-ভারতের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ঠিক এরকম একটি পরিবেশেই সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে বিদ্যমান সমাজ কাঠামো ও শ্রেণি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত, তবে অসাধারণ কিছু সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। ময়মনসিংহের হাজং বিদ্রোহ (১৯৪৫-৪৬), তেভাগা আন্দোলন রূপে খ্যাত দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, চব্বিশ পরগণা এবং কাকদ্বীপসহ গোটা বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জ্বলে উঠা কৃষক বিদ্রোহ, সিলেটের নানকার বিদ্রোহ ইত্যাদি ছিল এ জাতীয় সংগ্রামের দৃষ্টান্ত। এসব সংগ্রামের অধিকাংশের পিছনেই ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের কলকাঠির সঞ্চালন।[১৪৬] উল্লেখ্য যে, বাংলার বিভিন্ন জেলায় টঙ্ক, নানকার ও তেভাগা আন্দোলনে একদিকে যেমন ছিল জোতদার-জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম। অন্যদিকে এসব আন্দোলনের পিছনে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত এবং স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষাও কাজ করেছিল। তেভাগা, টঙ্ক ও নানকার বিদ্রোহে নারীদের নজিরবিহীন সক্রিয় অংশগ্রহণ, বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ও আত্মদানের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।[১৪৭] ১৯৩৯ সালে প্রাদেশিক কৃষক সভার কিশোরগঞ্জ সম্মেলনে নারী পুরুষ মিলে ৫০০ জন কৃষক মিছিল করে উপস্থিত হয়। এই সম্মেলনে সুসংদুর্গাপুরের জনৈক অক্ষয় সাহার রাশিয়ান স্ত্রী তাতিয়ানা সাহা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।[১৪৮]

---

১৪৩. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭১
১৪৪. *ঐ*, পৃ.৭১
১৪৫. হেনা দাস, *নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৮
১৪৬. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭১-৭২
১৪৭. হেনা দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
১৪৮. মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৬৩

১৯৪৬-৪৭ সালে গ্রাম বাংলার শোষিত, পশ্চাৎপদ দারিদ্র্যপীড়িত কৃষক সমাজের তেভাগা সংগ্রাম সারা দেশকে আলোড়িত করে তোলে। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তি সৃষ্টির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য ভাগ আদায়ের মরণপণ সংগ্রাম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কৃষক সমাজকে শোষক জোতদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। কৃষক সমাজ শোষক জোতদারি প্রথা ভেঙ্গে কাটা ধান জোতদারদের গোলায় না তুলে নিজের কাছে রেখেছিল।[১৪৯] জমিদারি প্রথার অধীনে যে বর্গাচাষ বা আধিপ্রথা চালু হয়, তাতে ফসল উৎপাদনের জন্য লাঙল, বীজ, বলদসহ উৎপাদনের সমস্ত খরচ বহন করতে হতো চাষিকেই। তারাই পরিশ্রম করে ফসল ফলাত, কিন্তু ফসলের অর্ধেক দিয়ে দিতে হতো জমিদার, জোতদারদেরকে। এই অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে তেভাগার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।[১৫০] ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পরিচালিত এ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নারীসমাজের বীরত্বপূর্ণ জঙ্গি অংশগ্রহণ। দিনাজপুর জেলার বিশেষভাবে তৎকালীন ঠাকুরগাঁ মহকুমায় এই আন্দোলন সবচেয়ে ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ঠাকুরগাঁয়ের অটোয়ারি থানায় ফুলঝুরি নামে এক জোতদারের জমিতে প্রথম তেভাগার ধান কাটা হয় এবং নারী বাহিনীর নেত্রী দীপেশ্বরী সিং লাঠি নিয়ে পুলিশকে তাড়া করে। তাছাড়া দিনাজপুর জেলার কালিয়াডাঙ্গি গ্রামে পুলিশ ধান কাটা বন্ধ করতে এলে রোহিনী ও জয়মণি নামক দুজন কৃষাণির নেতৃত্বে লাঠিধারী নারী বাহিনী পুলিশকে বাঁধা দেয়। তবে তেভাগা আন্দোলনে সবচেয়ে বেদনাদায়ক বীরত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল দিনাজপুরের খাঁপুর গ্রামে, একই সময়ে পুলিশের গুলিতে ২২ জন কৃষক শহীদ হন। এই ২২ জন শহীদের মধ্যে বীর নেত্রী যশোদা, কামারানি ও কৌশল্যা ছিলেন অন্যতম।[১৫১]

জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগা আন্দোলনে দেবীগঞ্জ থানার সুন্দর দীঘির রাজবংশীয় বিধবা পুণ্যেশ্বরী দেবী (যিনি বুড়িমা নামে পরিচিত) সবাইকে এই বলে উজ্জীবিত করতেন যে, 'জান দিব, তবু ধান দিব না'। *স্বাধীনতা* পত্রিকা একটি সংবাদসূত্রে জানা যায় যে, সুন্দর দীঘিতে পুলিশি আক্রমণের পাল্টা জবাবে জলপাইগুড়ির কৃষক নারীরা ধৃত স্বামী-পুত্রের স্থান দখল করে মাঠের ফসল ঘরে আনেন। এতে নেতৃত্ব দেন কমরেড বিদ্যার স্ত্রী নগরী, খগেন বর্মণ ও পোহালুর স্ত্রীরা, যাত্রা ও সুখারুন বৃদ্ধা মায়েরা। সবার আগে ছিলেন বুড়িমা, সেই সঙ্গে ছিলেন জেলার নারী আত্মরক্ষা সমিতি এবং তাঁর নেত্রী কল্যাণী দাশগুপ্ত, শিখা নন্দী, দিদি তিলকাতারিণী দেবীর মতো নারীরা।[১৫২] যশোরের নড়াইলে তেভাগা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন নমশুদ্র কৃষাণি সরলাদি। তিনি ২৫০/৩০০ মেয়ের

---

১৪৯. আসমা পারভীন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ*, বিশ্ব সাহিত্যভবন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৮

১৫০. ১৯৪৬ এর সেপ্টেম্বরে কৃষক সভার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল সভায় দাবি করা হয়: ১. ফসলের একভাগ পাবে জমির মালিক, দুইভাগ দিতে হবে ভাগচাষি অর্থাৎ বর্গাদারকে; ২. জমিতে ভাগচাষিদের দখলিস্বত্ব দিতে হবে; ৩. মনকড়া ধানে পাঁচ সেরের বেশি সুদ নেই; ৪. ভাগচাষিদের গোলায় ধান তুলতে হবে। হেনা দাস, *ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা*, সেলিনা হোসেন ও শামসুজ্জামান সম্পাদিত নারীর ক্ষমতায়ন, রাজনীতি ও আন্দোলন, ঢাকা, পৃ. ২৭৯

১৫১. হেনা দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩

১৫২. *স্বাধীনতা পত্রিকা*, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ সাল ;উদ্ধৃত অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৯-৮০

একটি ঝাঁটা বাহিনী সংগঠিত করেছিলেন। অদম্য সাহস, শক্তি ও বীরত্বে তিনি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। পুলিশের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে সরলাদি ও তাঁর নারী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মহকুমা অফিস ঘেরাও করে পুলিশের হাত থেকে কৃষকদের ছিনিয়ে আনার মতো দুঃসাহিক কাজও তারা করেছিলেন।[১৫৩] এছাড়া কৃষক রমণী বিমলা মাজির নেতৃত্বে জঙ্গি কৃষক নারী বাহিনী দা - বঁটি ও ঝাটাসহ কোঁচড়ে ধুলোর সঙ্গে মরিচের গুঁড়ো লবণ নিয়ে প্রতিরোধ করে। সুন্দরবন অঞ্চলের চন্দনপিঁড়ির গ্রামের নারীরাও তেভাগা আন্দোলনে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিলেন। চন্দনপিঁড়ির তেভাগা আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীদের মধ্যে অহল্যা (৭/৮ মাসের গর্ভবতী ছিলেন), উত্তমী, সরোজিনী ও বাতাসী প্রমুখ ১৬/১৭ জনের একটি নারী দলের কথা জানা যায়। এরা দা, বঁটি, ঝাঁটা ও তীর-ধনুক ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ৩৬ জন রাইফেলধারী গুর্খা পুলিশের বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াই পর্যন্ত করেছিলেন এবং এ লড়াইয়ে পূর্বোক্ত চার কৃষাণ নারী নেত্রী শেষ পর্যন্ত শাহাদাৎ বরণ করেন।[১৫৪] উল্লেখ্য যে, পর্দা ও অন্যান্য কারণে মুসলিম নারীরা এসব আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে তারা প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সাহায্য করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নেত্রকোণার মুসলিম অধ্যুষিত সিংহের বাংলা গ্রামের কৃষক পরিবারের নারীদের পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলা যায়।

প্রাপ্ত তথ্যসূত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তেভাগা আন্দোলন বাংলার ১৯টি জেলায় বিস্তৃত হয়েছিল। এর প্রায় সবকটি আন্দোলনেই বাঙালি নারীদের অংশগ্রহণ, বীরত্বপূর্ণ ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন, আত্মদানদৃষ্টান্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে বাঙালি সাধারণ নারীদের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করে।

শুধু তেভাগা নয়, সমসাময়িক টঙ্ক ও নানকার আন্দোলনেও নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রমাণ রয়েছে। টঙ্ক প্রথা ছিল কৃষকদের ওপর সামন্ত শোষণের এক বর্বর নজির। টঙ্ক মানে ধান কড়ারি খাজনা উৎপাদন, হোক বা না হোক কড়ার মত ধান দিতে হবে। টঙ্ক জমির ওপর কৃষকদের কোনো স্বত্ব ছিল না। ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দি থানায় এ প্রথা প্রচলিত ছিল।[১৫৫] টাকায় খাজনা না দিয়ে উৎপন্ন ধান দিয়ে এই প্রথায় কৃষকরা মারাত্মক শোষণের শিকার ছিল। এ ব্যবস্থায় শুধু অর্থনীতিই যে ভূস্বামীদের করায়ত্ত হলো তা-ই নয়, গ্রামীণ সমাজনীতি ও শাসননীতিতেও তাঁদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৫৬] এ প্রথার বিরুদ্ধে এবং উৎপাদিত ফসলের পরিবর্তে নগদ টাকায় খাজনা দেওয়ার দাবিতে টঙ্ক কৃষকেরা বাংলায় রক্তক্ষয়ী মরণপণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বাংলা তথা উপমহাদেশের কৃষক আন্দোলনে টঙ্ক আন্দোলন এক গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল। এ আন্দোলনেও পুরুষের পাশাপাশি নারীরা বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করেছেন। ময়মনসিংহের টঙ্ক আন্দোলনে অসাধারণ বীরত্বের সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাজং নারী

---

১৫৩. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ , *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১
১৫৪. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৩
১৫৫. মণি সিংহ, *আন্দোলনে নারীর সম্পৃক্ততা*, সেলিনা হোসেন ও মাহমুদুজ্জামান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২
১৫৬. মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫-৪৭

রাসমণি। ভূমিহীন নিঃস্ব কৃষক নারী রাসমণি ছিলেন দুঃসাহসের প্রতীক। টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদে তিনি এক বিশাল নারী বাহিনী সংগঠিত করে বীরমাতা রাসমণি সরকারি নিপীড়কদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর ও সুরেন্দ্র হাজংয়ের নেতৃত্বে মাত্র ৩৫ জন বীর হাজং চাষি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত ২৫ জন সৈন্যের সাথে লড়াই করে দু'জন সৈন্যকে হত্যা করেন। অবশ্য পরিশেষে প্রতিপক্ষের দশটি বুলেটে তাঁর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে এবং রাশমণি টঙ্ক আন্দোলনের প্রথম শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।[১৫৭] এ লড়াইয়ে অংশ নেওয়া নারীদের মধ্যে শঙ্খমণি ও অর্শমণি, রাহেলা ও ভদ্র প্রমুখ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

নানকার আন্দোলনের মূল কেন্দ্রভূমি ছিল সিলেট। নানকার শব্দটি সিলেট জেলার ভূমিব্যবস্থায় বহুল পরিচিত একটি শব্দ। উর্দু ভাষায় রুটিকে বলা হয় 'নান'। খাদ্য বা খাই খোরাকির বিনিময়ে দিনমজুর খাটাবার ব্যবস্থাকেই 'নানকার ব্যবস্থা' বলা হতো। এটিও ছিল সামন্ত শোষণের একটি বড় মাধ্যম। এ ব্যবস্থা ভূমি দাসের মতো কৃষকের শ্রমশক্তি শোষণ করা হতো। বস্তুত, নানকার ব্যবস্থাকে আদিযুগের দাস বা ক্রীতদাস প্রথার সংস্কারকৃত রূপ বলা যায়।[১৫৮] সামান্য জমি বা মাথাগোঁজার সামান্য কুঁড়ে ঘরের পরিবর্তে নানকার প্রজাদের সারা বছর জমিদার বাড়িতে খাটতে হতো। জমিদাররা নানকার পরিবারের মেয়েদেরও জোর করে ভোগ করতেন। তাদের ওপর অধিকার খাটাতেন যথেচ্ছাভাবে। বিশ শতকের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রভাবে জনমানুষের মধ্যে যে অধিকার বোধ জাগ্রত হয়েছিল, সে সূত্রে অমানবিক নানকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সংগ্রামের সূচনা হয়।[১৫৯] সিলেট জেলায় নানকার আন্দোলন বিশেষভাবে সাড়া জাগায়। নানকার প্রথায় সবচেয়ে অত্যাচারিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত হতেন নারীরা। এ কারণেই এ নানকার বিদ্রোহে নারীদের সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তেভাগা ও টঙ্ক আন্দোলনে হিন্দু- মুসলমান, আদিবাসী সাঁওতাল, রাজংশী, হাজং, জালু, গারো, বানাই প্রভৃতি নির্যাতিত কৃষক সমাজ ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ করলেও এতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন আদিবাসি উপজাতি ও নিম্নবর্ণের হিন্দু কৃষকরা। নারীসমাজের ভূমিকাতেও এর প্রতিফলন স্পষ্ট ছিল। নানকার আন্দোলন হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হলেও নানকারদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। অর্থাৎ মুসলমানরা ছিল এ আন্দোলনের মূলশক্তি। সিলেট জেলার এ লড়াইয়ে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন নানকার নারী কালই বিবি। তিনি পলাতক পুরুষকর্মীদের গ্রেপ্তারের হাত থেকে বাঁচাতে, নানকার মেয়েদের ওপর আক্রমণ প্রতিহত করতে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে বারবার পুলিশের সাথে মোকাবিলা করেছেন।[১৬০] কালাই বিবির সাথে তাহমিনাসহ অর্পণা পাল, হেনা দাস, অমিতা পাল ও সুষমা দে প্রমুখ পালাক্রমে নানকার এলাকা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে গিয়ে নারীদের

১৫৭. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১
১৫৮. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
১৫৯. হেনা দাস, *ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনে নারী*, সেলিনা হোসেন ও শামসুজ্জামন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫-২৭৬
১৬০. হেনা দাস, *নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

নানকার আন্দোলনে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত ও সংগঠিত এবং এ আন্দোলনের সমর্থনে অন্যান্য কৃষক মেয়েদের সংগঠিত করেছেন।[১৬১]

দেশভাগের পরও তদানীন্তন পাকিস্তানের পূর্ব বাংলা প্রদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল এলাকায় ১৯৪৮-৪৯ সালে রমেন মিত্র ও ইলা মিত্রের নেতৃত্বে আদিবাসী সাঁওতালরা এক সংগ্রাম পরিচালনা করেন।[১৬২] এটি নাচোল বিদ্রোহ নামেও পরিচিত। নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ ছিল তেভাগা আন্দোলনের একটি পরিবর্ধিত অংশ।[১৬৩] নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ আর ইলা মিত্রের নাম যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি ছিলেন এ বিদ্রোহের মূর্ত প্রতিনিধি এবং বিপ্লবী চেতনার প্রতীক। শোষিত, জীবিকা বঞ্চিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত কৃষকদের জন্য তিনি ছিলেন মাতৃসম নারী। জোতদারদের ত্রাস, মুসলিম লীগ সরকারের চক্ষুশূল এবং বাঙালির গর্ব বলা যায় ইলা মিত্রকে। তিনি ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং তাঁর স্বামী রমেন মিত্র ছিলেন চাপাইনবাবগঞ্জের রামচন্দ্রপুর এলাকার কমিউনিস্ট নেতা। স্বামীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবেই নাচোলের কৃষকের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন ইলা মিত্র। পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং দেশভাগের ফলে প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ নাচোল বিদ্রোহের সাফল্য সুদূরপরাহত হলেও নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের জন্য এক বড় রকমের অশনি সংকেত। ফলে সরকার এ আন্দোলন দমনে কঠোর পন্থা অবলম্বন করে। এই অবস্থায় নাচোল বিদ্রোহের প্রাণ ও অবিসংবাদিত নেত্রী ইলা মিত্র পুলিশি আক্রমণের মুখে ছদ্মবেশে আত্মগোপনে যাওয়ার পথে ১৯৫০ সালের ৭ জানুয়ারি গ্রেপ্তার হন। মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশ ন্যায়নীতি উপেক্ষা করে ইলা মিত্রের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। তিনি তাঁর ওপর পরিচালিত নির্যাতনের যে জবানবন্দি দেন, তা ছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে মূলবোধের চেতনার জন্য প্রবল আঘাত। তাঁর জবানবন্দির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো:

> যে কামরাটিতে আমায় নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালালো, দু'টো লাঠির মধ্যে আমার দু'টি পা ঢুকিয়ে চাপ দেয়া হচ্ছিল এবং সে সময়ে চারিধারে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা বলেছিলো যে, আমাকে 'পাকিস্তানী ইনজেকশন' দেওয়া হচ্ছে। এ নির্যাতন চলার সময়ে তারা একটা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিল। জোর করে আমাকে কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুলও উপড়ে তুলে ফেলেছিল ...।"[১৬৪]

ইলা মিত্র কারাগারে যে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও ধর্ষণের মুখোমুখি হন, তা হিটলারের নাৎসি বাহিনীর অত্যাচারকেও ম্লান করে দেয়। ইলা মিত্র তাই এদেশের কবিদের চোখে 'স্ট্যালিন নন্দিনী' বা 'ফুচিকের বোন' অভিধায় অভিহিত হন।

---

১৬১. অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

১৬২. মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, 'ইলা মিত্র ও নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ', সেলিনা হোসেন ও শামসুজ্জামান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৬

১৬৩. মালেকা বেগম, *ইলা মিত্র নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১১

১৬৪. সেলিনা হোসেন, *ইতিহাসের পথযাত্রায় নারীর প্রতিরোধ*, আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ্ স্মারক বক্তৃতা ২০১৬, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৬, পৃ. ৫-৬

ইলা মিত্র নাচোলের কৃষক আন্দোলনকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। জমিদার বাড়ির বউ হয়েও তিনি সাঁওতাল কৃষকদের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের অধিকার আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ আন্দোলনটি সফল না হলেও এর মধ্য দিয়ে ইলা মিত্র অন্যতম নেত্রী হয়ে দাঁড়ালেন এবং পরবর্তী আন্দোলন সংগ্রামের অনুপ্রেরণা উৎস হলেন।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, বিশ শতকের নিয়মতন্ত্রতান্ত্রিক রাজনীতি ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং সশস্ত্রবিপ্লবী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন নয় কেবল, বরং তেভাগা, টঙ্ক ও নানকার আন্দোলনের মতো কৃষক আন্দোলনেও বাঙালি নারীর গৌরবময় অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ছিল। এসব আন্দোলন সংগ্রামে নারীদের আত্মত্যাগ এবং সরাসরি অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আন্দোলনগুলো পূর্ণতা লাভ করে। বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনগুলোতে গ্রামীণ নারীসমাজের যে সংগ্রামী মনোভাবের প্রকাশ ঘটে, তারই বিপ্লবী অভিব্যপ্তি ঘটে পরবর্তী মুক্তি সংগ্রামে।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষত জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও মুসলিম লীগ নিজ দলীয় সমর্থক নারীদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে নারী সমিতি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল। ফলে এর ধারাবাহিকতায় চল্লিশের দশকের মধ্যে কংগ্রেস নারী সংঘ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, মুসলিম লীগ নারী সমিতি, হিন্দু মহাসভা নারী সমিতি, নিখিল ভারত নারী সম্মেলন ও খ্রিস্টান নারী সমিতি প্রভৃতি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১৬৫] এ সব সংগঠনে যুক্ত নারীসমাজ স্বদেশি ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় ভুমিকা পালন করে। এসব আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে নারীসমাজ গণতান্ত্রিক স্বাধিকার ও ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে আরো অধিক পরিমাণ সম্পৃক্ত হওয়ার প্রেরণা লাভ করে। ১৯৩৬ সালে ছাত্রসমাজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের নিজস্ব সংগঠন 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ সংগঠনের ব্যানারে ছাত্ররা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন শুরু করলে ছাত্রীসমাজ এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বেগম শায়েস্তা সোহরাওয়ার্দী ইকরামুল্লাহর[১৬৬] সহযোগিতায় লেডি আব্দুল কাদির, ফাতিমা বেগম এবং মিস এম কোরেশীর উদ্যোগে ১৯৪১ সালে ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রী শাখা গঠিত হয়েছিল। এদের সহযোগিতা ও বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ ও মিস ফাতিমা জিন্নাহর নেতৃত্বে এ সময় মুসলিম লীগ নারী সমিতি গঠিত হয়েছিল। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভারত বিভক্তি এবং মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান নামক পৃথক রাষ্ট্র

---

১৬৫. কনক মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৬

১৬৬. প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী (১৮৮৪-১৯৪৬) কন্যা বেগম শায়েস্তা সোহরাওয়ার্দী ইকরামউল্লাহ (১৯১৫-২০০০) একজন বাঙালি রাজনীতিবিদ,কূটনীতিক এবং লেখিকা ছিলেন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জনকারী প্রথম মুসলিম মহিলা। তিনি ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মরক্কোতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং জাতিসংঘের প্রতিনিধিও ছিলেন। বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহর অন্যতম সন্তান সালমা ইকরামউল্লাহ সোবহান (অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের স্ত্রী) ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম নারী ব্যারিস্টার।

গঠন আন্দোলনের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের নারী সমিতি পাকিস্তান আন্দোলনের সপক্ষে কলেজে কলেজে ঘুরে ছাত্রীদের সংগঠিত করার কাজ করতো।[১৬৭] শুধু ছাত্রীদের নয়, শায়েস্তা ইকরামুল্লাহর প্রগতিশীল চিন্তাধারায় পরিচালিত মুসলিম লীগ নারী সমিতি মুসলিম নারীদের সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ পরবর্তীকালে প্রায় ব্রিটিশবিরোধী প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক সংগ্রামে যুক্ত হয়েছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ শাসনের শেষ এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে পরিচালিত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এ সময় রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামে যুক্ত নারীদের মধ্যে শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪ খ্রি.), জোবেদা খাতুন চৌধুরাণী (১৯০১-১৯৮৬ খ্রি.) ও দৌলতননেছা খাতুন (১৯১৮-১৯৯৭ খ্রি.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

সমাজসেবামূলক কাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক অধিকার ও আন্দোলনে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বাংলায় নারীসমাজকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। ১৯৪৩ সালে সম্মেলনের মাধ্যমে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক নারী সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে লীলা মজুমদার, নেলী সেনগুপ্তা, রানি মহলানবীশ, প্রভাবতী দেবী, আর্যবালা দেবী প্রমুখ স্বনামধন্য নারীগণ এ সংগঠনের সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। এ সংগঠনটি নারী অধিকার আদায়ের পাশাপাশি এ সময় পরিচালিত ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে দৃঢ় ভূমিকা পালন করেছিল।[১৬৮]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয়দের মতামত না নিয়েই ইংল্যান্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের যুক্ত করার ব্যাপারে চাপ তৈরি করলে মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু এবং কংগ্রেস সমমনা নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশদেরকে সাহায্যদানের বিনিময়ে স্বাধীনতা দাবি করে। ব্রিটিশ সরকার এ দাবি না মানায় ১৯৪২ সালে কংগ্রেস 'ভারত ছাড় আন্দোলন' শুরু করে। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে মহাত্মা গান্ধীর মতপার্থক্যের কারণে বাংলায় ভারত ছাড় আন্দোলন ততটা প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও বাঙালিসমাজ একেবারেই এ আন্দোলন থেকে বিযুক্ত ছিল না। লক্ষণীয় যে, এ আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও যুক্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় এ আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে কলকাতায় বীণা দাস ও কমলা দাশগুপ্তসহ অনেক নারী গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করেছিলেন। একই অভিযোগে শান্তি নিকেতনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রাণী চন্দ ও নন্দিতা দেবী। এছাড়া ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিবাদে সারা ভারতে বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধীসহ সকল বন্দি রাজনৈতিক নেতার মুক্তির দাবিতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি মুন্সিগঞ্জ, নওগাঁ, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও,

---

১৬৭. Shaista Ikramullah, *From Pardah to Parliament*, Cressent Press, London, p. 70

১৬৮. রেনু চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট নারীরা (১৯৪০-১৯৫০)*, মনীষা গ্রন্থালয়, ৫৪-এ হরিঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ২১

কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশালের কীর্তিপাশা, মাদারিপুর, ফরিদপুর, প্রভৃতি স্থানে নারী সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি পালন করে। নারী আত্মরক্ষা সমিতির এসব সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নানা রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ও বিভিন্ন ধর্ম-মতের নারীদের সম্মিলন ঘটেছিল। তবে এর পুরোভাগে ছিল কমিউনিস্টপন্থি নারীরা।[১৬৯] সমকালীন বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয় কর্মী ছিলেন আভা মজুমদার। ভারত ছাড় আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকেও কারাবাস করতে হয়েছিল। করুণা ঘোষ (সাহা) নামক অপর একজন রাজনৈতিক কর্মীকে নিরাপত্তা বন্দিরূপে প্রেসিডেন্সি জেলে কারান্তরীণ করা হয়েছিল। ভারত ছাড় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন ময়মনসিংহের রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন। এরা মূলত কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন। ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়।[১৭০] এছাড়া বিক্রমপুরের সরযূবালাও এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্মকুটির (দুঃস্থদের স্বাবলম্বী করার জন্য প্রতিষ্ঠিত) এর কর্মীগণ ও গ্রামের নিম্ন আয়ের শিক্ষার্থীদের স্বল্পব্যয়ে থাকার জন্য পরিচালিত ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীরা সরযূবালার তত্ত্বাবধানে ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে তাঁর স্বামী ও পুত্রকে কারারুদ্ধ এবং সরযূবালাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়েছিল।[১৭১] বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্তও এ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় ১৯৪২-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কারাভোগ করেছিলেন। আশালতা সেনকেও একই অপরাধে আট মাস কারাভোগ করতে হয়েছিল।[১৭২] একই পরিণতি হয়েছিল সিলেটের সরলা বালাদেবের। দীর্ঘ কারাভোগ করে করে ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অপরাধে বিভিন্ন মেয়াদে কারাবরণকারী অন্য নারীদের মধ্যে ছিলেন বরিশালের লাবণ্য দাশ গুপ্ত, ঢাকা জেলার বিক্রমপরের যমুনা ঘোষ ও কিরণ বালা রুদ্র প্রমুখ।[১৭৩] কারাবরণ করতে হয়নি তবে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন এমন নারীদের মধ্যে চট্টগ্রামের কল্যাণী দাস ভট্টাচার্য, বিক্রমপুরের প্রভা চট্টোপাধ্যায়, ঢাকার উজ্জ্বলা মজুমদার, ফরিদপুরের বনলতা সেন, সহোদর বোন নির্মলা রায় ও সুষমা রায়, ঢাকার ছায়াগুহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৭৪]

১৯৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।[১৭৫] এ দুর্ভিক্ষে বাংলাতেই অনুমানিক ২০১ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। দুর্ভিক্ষের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় রোধে বাংলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি খাদ্য আন্দোলন, ভুখা মিছিল, লঙ্গরখানা পরিচালনা, বস্ত্র সংগ্রহ ও চিকিৎসাব্যবস্থা প্রভৃতি নানাভাবে দায়িত্ব পালন করেছিল। এ সময় মুসলিম নারীরা 'মুসলিম মহিলা আত্মরক্ষা লীগ' প্রতিষ্ঠা করে

---

১৬৯. রেনু চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫
১৭০. কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭০-২৭১
১৭১. *ঐ*, পৃ. ১৯৫
১৭২. *ঐ*, পৃ. ৯৬
১৭৩. *ঐ*, পৃ. ১১৫, ১৭৩, ২১১, ২২০
১৭৪. *ঐ*, পৃ. ৮৯, ১৯১, ১৪২, ২৪৬, ২৫১, ২৫৩
১৭৫. বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দুর্ভিক্ষের এ সালটি ছিল ১৩৫০ বঙ্গাব্দে। আর এ কারণে এ দুর্ভিক্ষকে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'ও বলা হয়।

মানবিক কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন। তদুপরি কলকাতার মুসলিম নারী আত্মরক্ষা লীগের নেত্রী নাজিমুন্নেসা আহমেদ মুসলিম নারী শ্রমিকদের নিয়ে গান্ধীজির মুক্তির দাবিতে ও খাদ্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।[১৭৬] নারীদের সমঅধিকারের পক্ষে 'রাও বিল'[১৭৭] উত্থাপিত হলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় নারীদের জন্য একই রকম আইনের দাবি তুলেছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। ১৯৪৩ সালের ২৭ আগস্ট সরলা দেবী চৌধুরাণীর সভানেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে নারীসমাজ সম্মেলন করে উত্তরাধিকার বিষয়ে নারীর অধিকার সম্পর্কিত এ বিলটিকে দ্রুত আইনে রূপান্তরিত করার দাবি জানান। এ দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, নিখিল ভারত নারী কাউন্সিল, মহারাষ্ট্র ভগিনী সমাজ কলকাতার বিভিন্ন স্থানে নারী পুরুষের মিলিত সভার আয়োজন করে। বিপ্লবী ইলা মিত্র এসব সভায় নারী অধিকার সম্পর্কিত সংশোধনী আইনের সপক্ষে এবং নারী প্রগতির বিরুদ্ধে প্রচারিত রক্ষণশীল সমাজপতিদের বক্তব্যের প্রতিবাদে জোরালো বক্তব্য দেন।[১৭৮]

১৯৪৫ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস থেকে ভারতে ব্রিটিশবিরোধী গণসংগ্রাম জোরদার হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস ও রশীদ আলী দিবসে বিক্ষোভ, শ্রমিক, পুলিশ ও নৌবাহিনীর ধর্মঘট ও বিদ্রোহ সব মিলিয়ে আন্দোলন তীব্র হয়। রাজবন্দি মুক্তি আন্দোলন, ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, সাধারণ হরতাল ডাক ও তার ধর্মঘটের ফলে সারাদেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরূপ রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেই ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। এই নির্বাচনের বিধি অনুযায়ী নির্বাচন করার যোগ্যতা হলো ধর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ট্যাক্স দেওয়ার যোগ্যতা। তাই সাধারণ মানুষ নির্বাচনে অংশ নিতে পারতেন না। এমনকি এ পদ্ধতিতে বাংলার শতকরা তের ভাগ মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ ছিল। এত সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ নির্বাচনে দুই জন বাঙালি নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয় লাভ করে। এরা হলেন চট্টগ্রাম থেকে নেলী সেন গুপ্তা এবং ঢাকায় আশালতা সেন।[১৭৯] বেগম শায়েস্তা ইকরামউল্লাহ ১৯৪৬ সালে ভারতের গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগের রাজনীতিকদের মতো তিনিও তাঁর আসনটি কখনো গ্রহণ করেননি। ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এ নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়। এ নির্বাচনে কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মুসলিম লীগ ভারতের

---

১৭৬. আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯

১৭৭. ১৯৪১ সালে বি.এন রাও এর নেতৃত্বে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় নারীদের জন্য নারীর উত্তরাধিকার, সমঅধিকার, বিবাহ বিষয়ে নারীর স্বার্থ সংবলিত সম-অধিকার বিষয়ে ও সম্পত্তির অধিকারের দাবিতে একটি রিপোর্ট প্রণীত হয় যা 'রাও বিল' নামে ১৯৪৩ সালে ভারতের পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। সেলিনা হোসেন এবং মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪১৮

১৭৮. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ , *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯

১৭৯. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৬

মুসলমানদের জন্য পৃথক ও স্বাধীন আবাস ভূমির দাবি নিয়ে অংশ গ্রহণ করেছিল।[১৮০] অবশ্য নির্বাচনের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় কংগ্রেস তার অখণ্ড স্বাধীন ভারতের দাবি থেকে সরে আসে এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির দাবি মেনে নেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পুরুষদের পরিচালিত ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি এতদিন পর্যন্ত বাংলার নারী আন্দোলনকে ততটা প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৪৬ সাল থেকে নারী আন্দোলনেও সাম্প্রদায়িকতার কালো থাবা বিস্তৃত হয়। গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের যে ঐতিহ্য নারী সংগঠনগুলো এতদিন বহন করে আসছিল, অচিরেই তাতে ফাটল ধরে। অনেকেই এর জন্য মুসলিম লীগের আহূত ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ধর্মঘট কর্মসূচিকে দায়ী করেন। এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেঁধে ছিল।[১৮১] কলকাতার এ দাঙ্গার দু'মাস পর পূর্ব বাংলার নোয়াখালীতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে।[১৮২] মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১০ নভেম্বর নোয়াখালীতে দাঙ্গাবিরোধী কাজ করতে আসেন প্রগতিশীল সংগঠনগুলো। আচার্য কৃপালিনী ও সুচেতা কৃপালিণী, মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, মায়া লাহিড়ী, অশোক গুপ্তা, ইলা মিত্র, মনোরমা বসু, কমলা চ্যাটার্জী, বেলা লাহিড়ী, বিভা সেন, পঙ্কজিনী চক্রবর্তী প্রমুখ নারী নেত্রীগণও দাঙ্গাবিরোধী প্রচারণায় উদ্বুদ্ধকরণ কাজে অংশ নিয়েছিলেন।[১৮৩] হোসনে আরা ইসলাম (বেবী) লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজে পড়ার সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ দাঙ্গা দুর্গতদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করলে তিনি সেখানে সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া নিজ বাড়িতে হিন্দুদের আশ্রয়দানসহ তাদের ক্যাম্পে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। এ আশ্রয় কেন্দ্রের অধীনে আরো যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে মিসেস রশিদ, তাহেরা কবির, বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ, নুরজাহান বেগম ও নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসার নাম উল্লেখযোগ্য।[১৮৪] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের সদস্যরা নোয়াখালী ও চাঁদপুরে দাঙ্গাবিরোধী কাজ এবং ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নেন। এছাড়া কংগ্রেস নেত্রী আশালতা সেন ও লীলা রায় এবং যশোরের স্নেহশীলা চৌধুরী এবং ঢাকার উজ্জ্বলা মজুমদার প্রমুখ নোয়াখালীর দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা করেছিলেন।[১৮৫]

ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। অনেকের মতে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ছিল বাঙালিদের রাষ্ট্রিক ধারণা।[১৮৬] বস্তুত পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক

---

১৮০. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক*, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩৮

১৮১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৬৩

১৮২. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতায় কলকাতার মহাদাঙ্গা (১৯৪৬) ও এর প্রতিক্রিয়া, অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড লেকচার, ২০১৮, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯

১৮৩. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭

১৮৪. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২৫০১২ পৃ. ৫০-৫১

১৮৫. হেনা দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪; কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪,১৪২

১৮৬. হারুণ-অর-রশীদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, আগামী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ৯

আন্দোলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতীয়দের তীব্র স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এ আন্দোলনের তীব্রতা এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক রাজনীতির নানা অনুসঙ্গের চাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী ভারত থেকে তাদের শাসন অবসানে বাধ্য হয়। ফলে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আগেই বলা হয়েছে যে, এ পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরিতে পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদ ও জনগণ বিশেষ অবদান রেখে ছিলেন। মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে পূর্ব বঙ্গের মানুষ যে শোষণ, বঞ্চনা ও সর্বক্ষেত্রে অবহেলার শিকার হয়েছিল তার পরিবর্তন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশা থেকেই পূর্ব বাংলা পাকিস্তান আন্দোলনে সমবেত হয়েছিল।[১৮৭] শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন:

> অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না এটা আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতারা ক্ষেপে গেছেন কেন? ভারতবর্ষে মুসলমান থাকবে এবং পাকিস্তানেও হিন্দুরা থাকবে। সকলেই সমান অধিকার পাবে।...........পাকিস্তান আনতে হবে এই একটা শ্লোগান সকল জায়গায়।[১৮৮]

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ নারী সমিতি গঠনের পর পাকিস্তান আন্দোলনে প্রচুর মুসলিম নারী জড়িত হয়। এদের মধ্যে জাহানারা শাহনাওয়াজ, বেগম সালমা তসাদ্দুক হোসাইন, বেগম ফাতেমা এবং বাংলা থেকে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ ও বেগম হাকিম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৮৯] মুসলিম লীগ ও নারীদের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য সংগঠিত করতে থাকে। পূর্ব বাংলার আরেক উল্লেখযোগ্য নারী যিনি পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন জোবায়দা খাতুন চৌধুরাণী। তিনি ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন। ভারত বিভক্তিতে সিলেট পাকিস্তানের সাথে যাবে কি-না এই নিয়ে গণভোট হলে জোবাইদা খাতুন সক্রিয়ভাবে এ গণভোটে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের এ প্রয়াস সফল হয় এবং সিলেটের সাড়ে তিন থানা ব্যতীত বাকি অংশ চলে আসে পাকিস্তানের পক্ষে। এ গণভোটের বিজয় মিছিল বের হলে সেখানে অনেক ছাত্রী ও নারীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৯০] যদিও পরবর্তীতে পাকিস্তান নিয়ে তাঁদের মধ্যে যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল তা জোবায়দা খাতুনের সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট।[১৯১]

উপর্যুক্ত আলোচনার সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায় যে, রাজনীতি বাঙালি নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের পথটি মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় ও পরিক্রমায় নারীসমাজ প্রতিকূলতা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে একটু একটু এগিয়ে আসেন। তাঁদের এ পথপরিক্রমায় কখনো কখনো পুরুষদের সহযোগিতা পেয়েছেন সত্য, তবে

---

১৮৭. শেখর দত্ত, *ষাটের দশকের গণজাগরণ*, *ঘটনাপ্রবাহ*, *পর্যালোচনা*, *প্রভাব*, সমাজ বিকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৫-২৬

১৮৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

১৮৯. https://www.youlinmagazine.com/story/role-of-women-in-pakistan-movement

১৯০. তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

১৯১. দ্রষ্টব্য, 'বাংলাদেশের প্রথম মুসলমান মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরী' *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ম বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা; মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

রাজনীতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠায় নারীদের সংগ্রাম ছিল মুখ্যত তাদেরই প্রয়াস। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার রাজনীতি ও প্রশাসনে কতিপয় নারীর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও একে সাধারণ প্রবণতা হিসেবে বিবেচনার সুযোগ নেই। এসব ছিল মূলত ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। বাংলার রাজনীতিতে নারীদের দীপ্ত পদচারণা ঘটে মূলত উনিশ শতকের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে নারীজাগরণের প্রেক্ষাপটে। এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য ও আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে নারীসমাজ প্রথমে তাদের মানবিক ও আইনগত অধিকার আদায়ে সোচ্চার হন। এসব অধিকার আদায়ের জন্য তাদের সংগঠিত হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়েছিল। এ সংগঠিত নারী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকেই বাংলার নারীসমাজ উনিশ শতকের শেষার্ধেই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হন। সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা নারীদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ভূমিকা রাখার সুযোগ ত্বরান্বিত করে। বিশ শতকে শুরুতেই জাতীয়তাবাদের বিকাশের সাথে রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নারীসমাজের চিন্তাচেতনায় ও পরিবর্তন আসে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নারীদের পদচারণে কেবল নিজেদের আত্মঅধিকার আদায়ের বৃত্তে আবদ্ধ থাকেনি; দেশ ও জাতির স্বার্থে পরিচালিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এর পরিব্যাপ্তি ঘটে। ফলে প্রতিটি স্বদেশি আন্দোলন থেকে শুরু করে চল্লিশের দশকে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়। অবশ্য এ পর্বের রাজনীতিতে অংশ নেওয়া নারীরা সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত তথা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীরা ছিলেন সাধারণ পরিবার থেকে আগত। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রাজনীতিতে অংশ নেওয়া নারীদের অবস্থান বিবেচনায় দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে হিন্দুধর্মাবলম্বী নারীদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। হিন্দু নারীদের তুলনায় মুসলিম নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে পিছিয়ে থাকারও নানা কারণ ছিল। প্রথমত: ধর্মীয় রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিম নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল। পাশ্চাত্য ও উচ্চশিক্ষা লাভে তাদের এ পিছিয়ে থাকার কারণে প্রতিবেশী হিন্দু নারীদের তুলনায় আত্মমর্যাদাবোধ ও অধিকার- সচেতনতার প্রশ্নটিও তাদের মধ্যে জাগরণে বিলম্ব ঘটেছিল। ফলে তারা প্রথম দিকে রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার সেই অর্থে তাগিদ অনুভব করেনি। দ্বিতীয়ত: পর্দাপ্রথার কঠোরতার কারণে তা অতিক্রম করে মুসলিম নারীদের পুরুষদের সাথে আন্দোলন ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার মতো অনুকূল পরিস্থিতি তখনো সে রকম ছিল না। তৃতীয়ত: আলোচ্য কাল পর্বে বিশেষ করে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলার রাজনীতির মূল নিয়ামকদের মধ্যে হিন্দু প্রাধান্য বেশি ছিল। তাদের নেতৃত্বেই অধিকাংশ রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচি পালিত হয়েছে। তাই এসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুসলমান নারীরা অংশ নেওয়ার তাগিদ অনুভব করেননি। এসমস্ত কারণে বাংলায় ক্রমপ্রসারমান বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও কর্মসূচিতে হিন্দু নারীদের তুলনায় মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ কম ছিল। অবশ্য ত্রিশের দশক থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং বঙ্গীয় রাজনীতিতে মুসলিম নারীদের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এরই ক্রম ধারায় ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রদেশ পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারীসমাজের বিপুল

অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রাম এবং পরিশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রতিটি পর্বে বাংলার নারীসমাজ পুরুষদের পাশাপাশি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে ইতিহাসে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করেন। অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এসব বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়াস থাকবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও নারী

পূর্ব বাংলার ইতিহাসে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এদেশের প্রথম জাতিসত্তা সংশ্লিষ্ট গণতান্ত্রিক আন্দোলন–যা পরবর্তীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করেছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রথম যে আন্দোলন করেছিল, তা ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার দাবিতে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা হলেও পরিবর্তিত বাস্তবতায় এটি একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় ছিল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। তবে পাকিস্তানের ভবিষ্যত রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব থেকেই। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই নতুন করে রাষ্ট্রভাষা বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কয়েকজনের শাহাদাৎ বরণের মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় এবং সরকার গঠনের পর বাংলাকে পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা করা হয়। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা অর্জনে বাঙালি জাতির যে আন্দোলন ও আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে এটি এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এক বাঁক পরিবর্তনকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের হাত থেকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে অভ্যুদয় ঘটে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালির দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মূলে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা। আর এ বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি হলো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির গণচেতনার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। বাঙালি জাতির মধ্যে ঐক্যচেতনার ভিত্তি মজবুত করে।

রাষ্ট্রভাষার মধ্য দিয়ে অর্জিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতাসীন পাকিস্তান শাসকদের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার অর্জনের লড়াই-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় বাঙালি জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান করেছিল। এ আত্মপ্রত্যয় বাঙালিকে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফাভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও পরিশেষে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতির প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনে সহায়তা করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অগণতান্ত্রিক মানসিকতা, নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা বাঙালি জাতিকে চরমভাবে ক্ষুব্ধ করে যার শেষ পরিণতি হলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এ বিবেচনায় একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনই মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি। আর বাঙালি জাতীয়তাবাদ উদ্ভূত প্রেরণাই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং পরিশেষে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পিছনে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। সেই দিক থেকে বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রথম আন্দোলন। এটি ছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বজনীন আন্দোলন। এটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাঙালির মাতৃভাষা ও তাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আগ্রাসন প্রতিহত করার এক সর্বাত্মক সংগ্রাম। এতে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী, কবি সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ অংশ নিয়েছিল। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার এ আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল। অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, এক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে বাঙালি নারীসমাজ পারিবারিক ও সামাজিক গণ্ডি অতিক্রম করে উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত হন। বিশ শতকে এসে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং এ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীসমাজ উল্লেখ করার মতো অবদান রাখেন। সার্বিক বিবেচনায় হিন্দুসমাজের তুলনায় রাজনীতিতে বাঙালি মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম হলেও একেবারে অনুল্লেখ্য ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনেও মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয় এবং অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাঙালির রাজনীতিতে অংশগ্রহণের এ ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। শুধু তাই নয়, এ অন্দোলনে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ তাদের মধ্যে রাজনৈতিক

সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং ঘরের বাইরে এসে আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত হয়ে নিজেদের এবং স্বজাতির কল্যাণে কাজ করার নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করে। স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সোপান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বাঙালি নারীসমাজের ভূমিকা বিচার–বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

৩.১: পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পটভূমি

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষের মানচিত্রে ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে ভারত ছিল অখণ্ড রাষ্ট্র। অন্যদিকে ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তের ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দু'টি অসম জনপদ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র।[১] হাজার মাইলেরও অধিক দূরত্বে অবস্থিত দু'টি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনপদ নিয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। একে একটি অভিনব রাষ্ট্র বলা যায়। কারণ শুধুমাত্র ভৌগোলিকভাবেই দু'টি বিচ্ছিন্ন জনপদ নিয়ে এ রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছিল এমন নয়, নৃ-তাত্ত্বিক, ভাষাগত, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক এক কথায় সামগ্রিক জীবনধারার দৃষ্টিকোণ থেকেও পাকিস্তানের পূর্ব পশ্চিম অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল।[২] তবে পাকিস্তানের দুটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একটি মাত্র সাধারণ মিল ছিল, আর তা হলো উভয় অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারি ছিল। তথ্যসূত্র মতে, পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা ৯৭.২ ভাগের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং পূর্ব বাংলায় ইসলামের অনুসারী সংখ্যা ছিল শতকরা ৮০.৪ ভাগ।[৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ধর্ম বিশ্বাসে এক হলেও ধর্মীয় আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও পাকিস্তানের দু'টি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বৈসাদৃশ্য ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নিম্নশ্রেণির হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান বলে অবজ্ঞা করতো। এতসব বিষয়ে পার্থক্য সত্ত্বেও বাহ্যিক ধর্মীয় ঐক্য বিবেচনায় ভারতের দু'টি বিচ্ছিন্ন জনপদ একই রাষ্ট্রের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মানুষ প্রত্যাশা করেছিল যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে অবিভক্ত বাংলায় তারা যে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছিল সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের স্বধর্মীয় শাসকগোষ্ঠী তাদের সে বঞ্চনার হাত থেকে পরিত্রাণ দিবে।

পূর্ব বাংলার মানুষ আর্থ-সামাজিক মুক্তির প্রত্যাশায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের শামিল হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ সরকার তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও বাস্তবমুখী কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করতে ব্যর্থ

---

১. পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট আয়তন ছিল ৩,৬৫, ৫২৯ বর্গমাইল। তন্মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন ছিল ৩, ১০, ৪০৩ বর্গমাইল এবং পূর্ব বাংলার মাত্র ৫৫, ১২৬ বর্গমাইল।

২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য Rounak Jahan, *Pakistan Failure in National Integration,* Columbia University Press, New York, & London, 1972, pp. 9-23

৩. *Population Census of Pakistan 1961,* Vol. I, Table-5, Ministry of Home and Kashmir Affairs, Home Affairs Division.

হয়। এমনকি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যে পূর্ব বাংলার স্বার্থের ব্যাপারে উদাসীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালি জাতির এ বোধ জন্মে যে, পাকিস্তানের শাসকচক্রের কাছে পূর্ব বাংলা একটি শাসন শোষণের নব্য উপনিবেশ মাত্র। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি বাঙালির মোহমুক্তি ঘটে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রথম বিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব বাংলায় তাদের অনুগত রাজনীতিবিদের বাঙালির প্রতি তাঁদের বৈষম্য ও শোষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বৈরমানসিকতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন তারা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশের মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে অবস্থানগত দিক থেকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ নেয়। পাকিস্তান ছিল একটি বহুভাষিক রাষ্ট্র (Multilingual state)। এ কারণে দাপ্তরিক ও অন্যান্য কাজের প্রয়োজনে এ রাষ্ট্রের একটি সাধারণ ভাষা (Lingua Franca) ছিল। শাসকগোষ্ঠী এ অজুহাতে উর্দুকে পাকিস্তানের সাধারণ ও একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করে। অথচ এটি পাকিস্তানের মাত্র ৩.৩৩ শতাংশ লোকের মাতৃভাষা ছিল। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের ভাষাভিত্তিক অবস্থান ছিল নিম্নরূপ[৪]:

ভাষা	**শতকরা হার**
বাংলা	৫৬.৪০
পাঞ্জাবি	২৮.৫৫
সিন্ধি	৫.৪৭
পশতু	৩.৪৮
উর্দু	৩.৩৩
বেলুচ	১.২৯
ইংরেজি	০.০২

পাকিস্তানের তৎকালীন ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান সম্পর্কে ভিন্নমতও পাওয়া যায়। যেমন A K Choudhury পরিবেশিত তথ্য মতে, এ সংখ্যা ছিল বাংলা ৫৪.৬%, পাঞ্জাবি ২৮.৪%, পশতু ৭.১%, উর্দু ৭.২%, সিন্ধি ৫.৮%, ইংরেজি ১.৮%, বেলুচ ১.৪%।[৫] ভাষাগত সংখ্যাতাত্ত্বিক মতভিন্নতা সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় যে, প্রতিটি পরিসংখ্যানই উর্দুকে অবস্থানগত দিক থেকে সাতটি প্রধান ভাষার মধ্যে পঞ্চম বা চতুর্থ অবস্থানে ছিল। এতদসত্ত্বেও নিজেদের মাতৃভাষা হওয়ায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। ফলে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই এর দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রবল বিতর্ক দেখা দেয়। যার পরিণতি হলো পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন।

---

৪. *Population Census of Pakistan 1961*, Vol. I, Ministry of Home and Kashmir Affairs, Home Affairs Division.

৫. A K Choudhury, *The Independence of East Bengal: A Historical Process*, Jatiya Granta Kendra, Dhaka, 1984, p. 3

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ভারতীয় উপমহাদেশে বিরোধ ও বিতর্ক বেশ পুরনো এবং বলা যায় যে, পাকিস্তান এটি লাভ করেছিল অনেকটাই উত্তরাধিকার হিসেবেই।[৬] বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এ বিতর্ক জোরালো হয় যখন সর্বভারতীয় কংগ্রেস ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 'হিন্দি' ভাষার পক্ষে মত দেয় এবং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা শুরু করে। কংগ্রেসের এ অবস্থানের প্রতিক্রিয়ায় উত্তর ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ হিন্দি নয় বরং 'উর্দু' ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে বলে দাবি জানায়। পরস্পরবিরোধী এ দু'টি ধারার বিপরীতে ভারতে বাঙালিদের পক্ষ থেকে 'বাংলা ভাষাকে ভারতের সাধারণ ভাষার মর্যাদায় অভিসিক্ত করার পক্ষে দাবি জানানো হয়। ১৯২০ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সভাপতিত্বে শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ[৭] বাংলা ভাষার পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৮] ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামক একটি প্রগতিশীল সংগঠন। এর পক্ষ থেকেও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল।[৯] তবে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত হয়েছিল বিশ শতকের ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। এ সময় কংগ্রেসের হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার জোরালো ও সক্রিয় তৎপরতার বিপরীতে উর্দু ভাষার পক্ষেও প্রচারণা জোরদার করা হয়। এমন এক পরিস্থিতিতে ১৯৩৭ সালে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়:

> এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে (বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল) প্রায় ৭ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। হিন্দি ভাষীর সংখ্যা এর চেয়ে বেশী নয়। তাছাড়া আসামী, উড়িয়া এবং মৈথিলি ও বাংলারই শাখা ভাষা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যের দিক দিয়া বাংলা ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাংলা ভাষার বিবিধ ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দের সংখ্যাও বেশী। অতএব বাংলা সবদিক দিয়াই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবি করিতে পারে। ---রাষ্ট্রভাষার আসনের উপর বাংলা ভাষার দাবি সমন্ধে আর একটি কথা ও বিশেষভাবে জোর দিয়া বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রভাষার নির্বাচন লইয়া হিন্দি ও উর্দুর সমর্থকদের মধ্যে আজ

---

৬. ভাষা বিতর্ক সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৮৯-১৯৫ ; মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *ভাষা-আন্দোলন ও নারী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২-৬

৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ছিলেন বহুভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ। তিনি ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯৬৭ সালে প্রথম ইমেরিটাস প্রফেসর হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পান। তিনি *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দুই খণ্ড), *পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* (দুই খণ্ড) সহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা।

৮. মোস্তফা কামাল, *ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. চট্টগ্রাম,দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, গ্রন্থ প্রসঙ্গে অংশে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ কর্তৃক লিখিত। তবে বশীর আল হেলাল লিখেছেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভারতের সাধারণ ভাষা শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৯১৯ বা ১৯২০ সালে শান্তি নিকেতনে অবস্থিত বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করেন সেখানে তিনি ভারতের সাধারণ ভাষারূপে ইংরেজি এবং কতগুলো ভারতীয় ভাষার সম্ভাবনা পর্যালোচনা করেছেন। বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯-১৯১। অবশ্য এর আগেই উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট হুগলির দেলোয়ার হোসেন (১৮৪০-১৯০৩ খ্রি.) মুসলিম অভিজাতদের উর্দুর পরিবর্তে বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন বলে জানা যায়। মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

৯. Mohammad Towfiqul Haider, *Muslim Intellectual Movement in East Bengal (1926-1938),* Unpublished Ph. D Thesis, Dept. of Islamic History and Couture, University of Dhaka, p. 116

যে তুমুল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফল হয়ত উর্দু ও হিন্দির মধ্যে কোনটারই রাষ্ট্রভাষার আসন অধিকার করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করা হইলে এই সাম্প্রদায়িক সংঘাত সংঘর্ষের আশঙ্কা বহু পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে।[১০]

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর অবাঙালি ও প্রভাবশালী মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে উর্দুর প্রতি আগ্রহ ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। তবে পূর্ব বাংলার লেখক বুদ্ধিজীবীগণ বাংলা ভাষার পক্ষে তাঁদের অবস্থান অক্ষুণ্ন রেখে এর সপক্ষে লেখনির মাধ্যমে জনমত সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। ১৯৪৩ সালে প্রখ্যাত সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রি.) এতদ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর এ প্রবন্ধটি মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে তিনি উর্দু নিয়ে বির্তকে মাতামাতি পরিহার করে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণের পক্ষে তাঁর যৌক্তিক অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি লিখেন, "জাতির যে অর্থ, শক্তি, সময় ও উর্দু প্রবর্তনে অপব্যয় হবে তা যদি আমরা শিক্ষা, সাহিত্যে নিয়োজিত করি তবে পূর্ব পাকিস্তানকে শুধু আমরা ভারতে নয়, সমগ্র জগতে এমনকি গোটা দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারবো।"[১১] বাংলা ভাষার বিপক্ষবাদীদের একদল শিক্ষিত মানুষের কঠোর সমালোচনা করে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন মুসলিম জাগরণের কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪ খ্রি.)। 'পূর্ব পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক এ নিবন্ধে তিনি লিখেন:

পাকিস্তান অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে এ কথা সর্ববাদিসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানেরই তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা ভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচীন মত প্রকাশ করেছেন যা নিতান্তই লজ্জাজনক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরিত করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ করা হবে এই তাদের অভিমত। কী কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পেছনে কাজ করছে এ কথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি।[১২]

ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে ১৯৪৭ সালের ১৮ মে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) ভবিষ্যত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন।[১৩] তাঁর মত আরো অনেকেরই মনোভাব ছিল একই রকম। এমনকি পূর্ব বাংলার শিক্ষিত সমাজের একাংশ, কতিপয় রাজনীতিবিদ লেখক বুদ্ধিজীবীগণও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার অবাঙালি রাজনীতিবিদদের মতকে সমর্থন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বাঙালি কবি গোলাম মোস্তফার কথা বলা যায়। তিনিও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থক ছিলেন।[১৪] উল্লেখিত কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাঙালি বুদ্ধিজীবী–

---

১০. আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৩৪-৩৬

১১. মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৫০, উদ্ধৃত মোস্তফা কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

১২. কবি ফররুখ আহমদ, *মাসিক সওগাত*, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৫৪, উদ্ধৃত আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮

১৩. *দৈনিক আজাদ* ১৯ মে, ১৯৪৭, উদ্ধৃত সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩১

১৪. আবদুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৪২-৪৩

শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার আসনে দেখতে চেয়েছিলেন। তাই চৌধুরী খালিকুজ্জামান ও অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতারা যখন উর্দুর পক্ষে তাঁদের জোরালো মতামত প্রকাশ করেন, তখন বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগণ প্রতিবাদস্বরূপ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার পক্ষে লেখালেখি জোরদার করেন। আব্দুল হক (১৯১৮-২০০৬ খ্রি.) ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত চারটি প্রবন্ধ লেখেন।[১৫] এসব প্রবন্ধে তিনি বাঙালি হয়েও যারা উর্দুকে সমর্থন করেন তাঁদের সমালোচনা করে এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার সপক্ষে জোরালো ও যৌক্তিক মতামত প্রদান করেন।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিতর্কটি তুঙ্গে উঠে যখন ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুর পক্ষে অভিমত প্রদান করে বক্তব্য দেন। তিনি হিন্দিকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন।[১৬] জিয়াউদ্দিন আহমদের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর এ প্রবন্ধটি *দৈনিক আজাদ পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়। এতে তিনি যুক্তিপূর্ণ ভাষায় জিয়াউদ্দিন আহমদের মত খণ্ডন করে বাংলা ভাষার সপক্ষে তাঁর মত তুলে ধরেন। এতে তিনি লিখেন:

> কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দির অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে গণ্য হইলে শুধু পশ্চাদগমনই হইবে। ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, ইহা পাকিস্তানের ডোমিনিয়নের কোনও প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়, উর্দুর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য, পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন যেমন পশতু, বেলুচী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি এবং বাংলা কিন্তু উর্দু কোন অঞ্চলেরই মাতৃভাষা রূপে চালু নয়। যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয় তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।[১৭]

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসেই বাংলা ভাষার পক্ষে সংবাদ পত্রে আরো বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এসব প্রবন্ধের মধ্যে ২১ জুলাই ১৯৪৭ সালে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'

---

১৫. আবদুল হক একজন বিশিষ্ট লেখক। তিনি বাংলা একাডেমির পাঠ্যপুস্তক বিভাগের পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' এবং এটি *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায় ২২ ও ২৯ জুন ১৯৪৭ সালে দু'কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালের ৩০ জুন দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। একই বছর ২৭ জুলাই *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায় 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে' শিরোনামে আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর চতুর্থ প্রন্ধটি ছিল 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। এটি তিনি মিসেস এম.এ হক ছদ্মনামে লিখেছিলেন এবং সাপ্তাহিক '*বেগম*' পত্রিকায় এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৬. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, **১ম খণ্ড**, সুবর্ণ প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৯

১৭. *দৈনিক আজাদ*, ১২ শ্রাবণ, ১৩৫৪, উদ্ধৃত বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

শিরোনামে আব্দুল মতিনের প্রবন্ধ এবং একই পত্রিকায় প্রকাশিত এ কে নুরুল হকের 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামক প্রন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এভাবেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহল পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার যোগ্যতা নিরূপণ ও দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা ও দাবি অব্যাহত রেখেছিলেন।

উপর্যুক্ত বাস্তবতার মধ্যেই ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাসকৃত 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' (The Indian Independence Act, 1947)[১৮] বলে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘোষণা করা হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, ভৌগোলিক অবাস্তবতা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও ধর্মীয় ঐক্য মাথায় রেখে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি অন্যতম প্রদেশ হিসেবে যুক্ত হয়েছিল। তবে এ সংযুক্তি যে যথাযথ হয়নি, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যে, পূর্ব বাংলাকে তাঁদের একটি নব্য উপনিবেশে পরিণত করার অশুভ চিন্তা দ্বারা তাড়িত হয়েছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই বাঙালি জাতি তা উপলব্ধি করে। আর এ উপলব্ধির প্রথম সূত্রটি তারা পেয়ে যায় পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪ শতাংশের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে যখন সংখ্যালগিষ্ঠের ভাষা উর্দুকে যখন পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার পিছনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থবুদ্ধি জড়িত ছিল। বস্তুত, উর্দু ছিল উত্তর ভারতের অভিজাত মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষা। বাঙালি অভিজাত শ্রেণির মধ্যেও এ ভাষার ব্যবহার ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এর সরকার পরিচালনার ভার লাভকারী রাজনীতিবিদ ও আমলাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল উত্তর ভারত থেকে আগত উর্দুভাষী। শুধু প্রশাসন নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল এ উর্দুভাষীদের হাতে। সংখ্যালগিষ্ঠ এ অংশটি পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁদের একাধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়।[১৯] পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচ ও অন্যান্য ভাষাভাষীরা এ সিদ্ধান্ত বিনা প্রতিবাদেই মেনে নিয়েছিল। কারণ নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধাগুলো প্রথম থেকেই তারা ভোগ করতে পারছিল। তাই শুরু থেকেই তারা শাসকগোষ্ঠীর মাতৃভাষা উর্দুকে তাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ায় এ ভাষাটি পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে এতে তাদের বিশেষ কোনো স্বার্থহানীর আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু বাঙালি জাতির জন্য এ সিদ্ধান্ত ছিল মারাত্মক। এটি শুধু তাদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আগ্রাসন ছিল না, এর সাথে তাদের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থও নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। তাই বাঙালি জাতি উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তারা উর্দুর পাশাপাশি তাদের মাতৃভাষা বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে সর্বাত্মক গণআন্দোলন গড়ে তোলে।

---

১৮. ভারত শাসন আইন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৯৪৭-৭১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২০-২২

১৯. বিশদ দ্রষ্টব্য মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২-৯৩

৩.২: পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও নারীসমাজ

বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে একাধিক পর্বে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৪৮ সালে মার্চ মাসে গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকায় আগমন কাল পর্যন্ত। (খ) জিন্নাহর ঢাকা সফরের পর থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত। (গ) ১৯৫২ সাল ও তৎপরবর্তী সময়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের এ তিনটি পর্বেই পুরুষদের পাশাপাশি নারীসমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উপর্যুক্ত প্রতিটি কালপর্বে বাঙালি নারীসমাজের ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে।

৩.২.ক: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৪৭- মার্চ ১৯৪৮: প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান অর্জনের পূর্বে ভাষা বিতর্ক কাগজে কলমে ও বৌদ্ধিক বিতর্ক পর্যায়ে থাকায় তা সাধারণ বাঙালির মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেনি। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই উর্দু ভাষার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার অবাঙালি শাসকদের অপচেষ্টার বাঙালি জনমানসে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। শুরু হয় মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি জাতির আন্দোলন সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়। এ পর্যায়ে সংবাদ মাধ্যমে লেখালেখির পাশাপাশি সাংগঠনিক উপায়েও বাংলা ভাষার দাবি জোরদার করা হয়। 'গণআজাদী লীগ' নামক রাজনৈতিক সংগঠন[২০] আশু দাবি কর্মসূচি আদর্শ নামে তাদের যে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে তাতে বলা হয় যে, "বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"[২১] 'পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক যুবলীগ' ছিল পূর্ব বাংলার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে নিয়ে গঠিত একটি প্রগতিশীল সংগঠন। এ সংগঠনটির সাথে ছাত্রী ও যুবা নারীগণও যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি- ৬ মার্চ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগের পক্ষে একটি প্রতিনিধিদল অংশ নিয়েছিল। এ প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে নৃত্য শিল্পী লিলি খান ও লায়লা আরজুমান বানু ছিলেন।[২২] উক্ত সংগঠনটির উদ্যোগে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে ঢাকায় একটি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ উপলক্ষ্যে *আমরা গড়িব স্বাধীন সুখী গণতান্ত্রিক পাকিস্তান* নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে প্রস্তাব করিতেছি যে, বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলাচেনা ও

---

২০. ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে কামরুদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দিন আহমদ ও অলি আহাদ প্রমুখ মুসলিম লীগের কিছু সংখ্যক বামপন্থী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগ ও সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল।

২১. *আশু দাবি কর্মসূচী আদর্শ*, প্রকাশক: কামরুদ্দীন আহমদ, কনভেনার গণ আজাদী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান পাবলিশিং হাউজ, জুমরাইল লেন, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৪৭, পৃ. ২২-২৩, উদ্ধৃত: বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮

২২. ফরিদা ইয়াসমিন, *ভাষা আন্দোলন ও নারী*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৬

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।[২৩]

আর একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ভাষার প্রশ্নে সোচ্চার হয়। এই সংগঠনটির নাম তমদ্দুন মজলিশ। একে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জনক সংগঠনও বলা হয়।[২৪] এটি ছিল একটি আধা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে এ সংগঠনটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। এ সংগঠনটি বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচনা ও কার্যক্রমের সূত্রপাত করে। সংগঠনটি রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য সভা, আলোচনা ও সেমিনারের আয়োজন করা ছাড়াও জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে বিবৃতি হ্যান্ডবিল প্রচারের মতো কর্মসূচি পালন করতো। জনস্বাক্ষর সংগ্রহ করে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সংবলিত স্মারকলিপি প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের কাছে তা পেশ করাও তমদ্দুন মজলিশের অন্যতম প্রাথমিক কর্মসূচি ছিল।[২৫] ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু* নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এটি ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা। আবুল কাশেমের সম্পাদনায় প্রকাশিত এ পুস্তিকাটিতে সম্পাদক ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১ খ্রি), *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রি.) এর লেখা প্রবন্ধ সংকলন করা হয়েছিল।[২৬] পুস্তিকাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব যুক্ত করা হয়েছিল। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল যে- (১) বাংলা ভাষাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন এবং অফিস-আদালতের ভাষা। (২) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দু'টি– বাংলা ও উর্দু। (৩) বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম এবং উর্দু হবে দ্বিতীয় বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। আর ইংরেজি হবে তৃতীয় বা আন্তর্জাতিক ভাষা। (৪) শাসন কাজ ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বছরের জন্য ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসন কাজ চলবে।[২৭] পুস্তিকায় সংকলিত তমদ্দুন মজলিশের প্রস্তাবনা ও প্রবন্ধগুলোতে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা না গেলে বাঙালি জনগোষ্ঠী কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে

---

২৩. উদ্ধৃত মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

২৪. মোস্তফা কামাল, *প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম ও ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২১

২৫. মোস্তাফা কামাল কর্তৃক গৃহীত আবুল কাশেমের সাক্ষাৎকার। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য মোস্তফা কামাল, *ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১-৫৪

২৬. কাজী মোতাহার হোসেনের রচিত প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' এবং আবুল মনসুর আহমদের প্রবন্ধের শিরোনাম 'বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা।' বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯-১৮৬

২৭. আবুল কাশেম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু*, তমদ্দুন মজলিশ, ঢাকা, ১৯৪৭, পৃ. ১২

সম্পর্কেও এ উল্লেখ করা হয়েছিল। তমদ্দুন মজলিশের প্রকাশিত পুস্তিকাটি প্রত্যাশামাফিক প্রচার ও প্রসার লাভ করলেও তমদ্দুন মজলিশ অব্যাহত কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত সংগঠনে ভূমিকা রাখে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে সংগঠনটির পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের কাছে একটি স্মারকলিপিও প্রেরণ করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যেই রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত এটি পূর্ব বাংলায় একটি স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, পূর্ব বাংলা এ স্বতঃস্ফূর্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বাঙালি নারীসমাজ বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। ভারত বিভাগ পূর্ব রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বৌদ্ধিক বিতর্কে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিশেষ তথ্য অপ্রতুল। তবে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে ১৯৪৭ সালের ২৩ জুন কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *স্বাধীনতা* পত্রিকায় আয়েশা বেগম নামক জনৈক নারীর একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তিনি লিখেছিলেন:

> --- পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নাকি হবে উর্দু। বাংলা ও আসামের যে অংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হচ্ছে তার চার কোটি অধিবাসীদের মধ্যে বাংলা যারা বলে না কিংবা বাংলা যাদের মাতৃভাষা নয় তেমন লোকের সংখ্যা হাজারে একজনেরও কম। যেখানে প্রায় সকল অধিবাসীরই মাতৃভাষা বাংলা, সেখানে একটা স্বতন্ত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করে ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে জনগণকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, যেমন করেছিল আমাদের ইংরেজ প্রভুরা।[২৮]

১৯৪৭ সালে জুলাই মাসে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর সপক্ষে এবং বাংলা ভাষার বিরোধিতা করে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এ নিবন্ধটির প্রতিবাদে যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজের প্রগতিশীল ছাত্রী এবং ছাত্র ফেডারেশনর স্থানীয় নেত্রী হামিদা রহমান কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *'স্বাধীনতা'* পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি চিঠি লিখেন। এ চিঠিতে তিনি বলেন:

> বাঙালি হিসেবে যেমন আমরা সমগ্র বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর দাবি করেছিলাম, তেমনি আজ বাংলাদেশের ভাষা হিসেবেও বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে দাবি করব না কেন? পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় 'আজাদের' পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখে খুবই দুঃখ হয়। --- পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র। তার ভাষা হবে জনগণের ভাষা। বাংলার সাড়ে চার কোটি লোক যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে। সে ভাষা তাদের নিজস্ব ভাষা হবে না, এও কি বিশ্বাস করতে হবে? স্বাধীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার সাথে তাদের প্রাণের কোন যোগই থাকবে না। এও কি সত্যি হবে।[২৯]

পাকিস্তান সৃষ্টি পরবর্তী সময়ে পুরুষদের পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। শুধু ঢাকায় নয়, ঢাকার বাইরেও নারীরা ব্যাপকহারে এ আন্দোলনে অংশ নেয়। পূর্বোক্ত হামিদা রহমান

---

২৮. ফরিদা বেগমের এ চিঠিটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত সুকুমার বিশ্বাসের *বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের কলকাতার সংবাদপত্র* গ্রন্থে 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শিরোনামে' সংকলন করা হয়েছে। উদ্ধৃত ফরিদা ইয়াসমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

২৯. উদ্ধৃত বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৮

পরবর্তী ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে যশোরে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনকে তমদ্দুন মজলিশ কর্তৃক যে স্মারকলিপিটি প্রদানের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এতে পূর্ব বাংলার শত শত নাগরিক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, আইনজীবী, অধ্যাপক, উলামা, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার, প্রকৌশলী স্বাক্ষর করেছিলেন। স্মারকপত্রটিতে স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে কতিপয় নারীও ছিল বলে জানা যায়। এদের মধ্যে সম্ভবত *জয়শ্রী* পত্রিকার সম্পাদিকা মিসেস লীলা রায় (১৯০১-১৯৭০ খ্রি.) এবং নিখিলবঙ্গ মুসলেম মহিলা সমিতির সেক্রেটারী মিসেস আনোয়ারা চৌধুরী (১৯১৮-১৯৮৭ খ্রি.) অন্যতম ছিলেন।[৩০]

এ সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাঙালি নারীদের অবস্থান জোরালোভাবে প্রকাশিত হতে থাকে মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সম্পাদিত *বেগম* পত্রিকার মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে *বেগম* পত্রিকাটি ছিল নারীদের অন্যতম মুখপত্র। এতে প্রকাশিত বেশ কিছু সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও নারীদের লেখা চিঠিপত্রের পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে তাদের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক বিতর্কে পটভূমিতে এ সময় *বেগম* পত্রিকায় প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে পূর্ব বাংলা জনগণের প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি করে লেখা হয় যে, "সমগ্র পাকিস্তানের না হোক অন্তত পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে। পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। তার অর্থ এই যে, পাকিস্তানে দু'টি রাষ্ট্রভাষা হবে।" এ বিষয়ে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জিয়াউদ্দিনের উর্দুর সপক্ষে অবস্থান এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীদের এর বিরোধিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, "এ বিষয়ে আমাদের নারীসমাজও যে অচেতন নন তার প্রমাণ *বেগম* এর গতসংখ্যায় এবং বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত এই বিষয়ে লেখা দুটি প্রবন্ধ।" বাঙালি নারীসমাজ সামগ্রিকভাবে বাংলা ভাষাকে সমর্থন করবেন বলে নিবন্ধে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল।[৩১]

মোহ্সেনা ইসলাম নামে এক নারী 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামের এক প্রবন্ধে লিখেন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা হচ্ছে বাংলা। এটি এ অঞ্চলের মানুষের প্রাণের ভাষা। এ ভাষার মাধ্যমেই এদেশের মুসলিম সমাজের কৃষ্টি, সভ্যতা ও তাহজীব-তমদ্দুনের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছে। বিশ্ব দরবারে উচ্চ আসনে সমাসীন বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হলে বাঙালি নারীসমাজও যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তা উল্লেখ করে মোহ্সেনা ইসলাম লিখেন:

> ---পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজ এমনিই শিক্ষায় অনেকটা অনগ্রসর। তদুপরি উর্দু ভাষার সাথে তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। যদি এই হয় তবে বিগত বহুদিনের সাধনায় বাংলার মুসলিম নারীরা সাহিত্য এবং রাজনীতি

---

৩০. মোস্তফা কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯

৩১. *সাপ্তাহিক বেগম*, ২৩ আগষ্ট, ১৯৪৭, দ্রষ্টব্য মালেকা বেগম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *নির্বাচিত বেগম: অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র, (১৯৪৭-২০০০)*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৭৩-৭৪

ক্ষেত্রে যতদূর অগ্রসর হয়েছিল তাও আবার পেছনে পড়তে বাধ্য হবে। এটা বাংলার মুসলিম নারী সমাজের পক্ষে অপমৃত্যু বই আর কিছু নয়। পাকিস্তান সরকার যেন উর্দুর মতো অপরিচিত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ না করেন তজ্জন্য নারী সমাজের পক্ষ থেকে আমরা অনমনীয় দাবি জানাচ্ছি।[৩২]

সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকায় বেগম আফসারুন্নেসা নামে এক নারী 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এতে তিনি রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের অধিকার পূর্ব বাংলার জনগণের বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি লিখেন যে, "---বহু যুগের মরণ ঘুম থেকে বাঙ্গালী মুসলমান জেগে উঠেছে–রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তার চিত্তজগতে এনেছে ভাবের বিপ্লব–তার নব নব চিন্তা, নব নব আশা, আকাঙ্ক্ষা, রূপ পেতে চায়–ভাষা পেতে চায়।"[৩৩] এভাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পূর্ব বাংলার নারীরাও লেখালেখির মাধ্যমে তাদের মতামত তুলে ধরেন। পুরুষদের তুলনায় তাঁদের সংখ্যা কম হলেও ভাষার প্রশ্নে নারীরাও যে সচেতন ছিলেন এবং মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এটাই তার প্রমাণ।

রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পাকিস্তানে বিতর্ক চলাকালেই ১৯৪৭ সালে ২৭ নভেম্বর রাজধানী করাচিতে শিক্ষা সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে পূর্ব বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার ও পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল রহমানসহ পূর্ব বাংলা থেকে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদ যোগদান করেন। বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও এই সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল রহমান উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৩৪] সম্মেলন থেকে ঢাকায় ফিরে মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় বলে জানিয়েছিলেন। তবে ৬ ডিসেম্বর *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে উল্লেখ করা হয় যে, সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে উর্দুকে পাকিস্তানে লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। পাকিস্তানের সংবিধান সভাই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের মীমাংসা করবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে।[৩৫]

১৯৪৭ সালেই ঢাকার বাইরে দেশের অন্যান্য অনেকস্থানে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জনমত সংগঠিত হতে শুরু করে। সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ[৩৬] এবং সিলেট থেকে প্রকাশিত

---

৩২. *সাপ্তাহিক বেগম*, ২৩ আগষ্ট, ১৯৪৭; মালেকা বেগম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *নির্বাচিত বেগম: অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০*, ১ম খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ.৭৪

৩৩. *সাপ্তাহিক বেগম*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৭; মালেকা বেগম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *ঐ*, পৃ.৭৬

৩৪. বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

৩৫. *Morning News*, 6. 12. 1947; বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

৩৬. সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ ১৯৩৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত একটি সাহিত্য সংগঠন। আসামের তৎকালীন এম এল এ আশরাফ উদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভার সিদ্ধান্ত মতে ওইদিন সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংসদের প্রথম সভাপতি খানবাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী এবং প্রথম সম্পাদক এ জেড আবদুল্লাহ।

মাসিক পত্রিকা *আল ইসলাহ* ও সাপ্তাহিক *নও বেলাল* সিলেটে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের জন্ম মাসেই *আল ইসলাহ* পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বাংলার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য হবে না বলে উল্লেখ করা হয়। কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সাহিত্য সভাগুলোতে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার সমর্থনে একাধিক প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ৩০ নভেম্বর সিলেট সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা অডিটোরিয়ামে মতিন উদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু হওয়া উচিত' শিরোনামে আয়োজিত এ সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী। অনেকে একে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আয়োজিত প্রথম সুধী সমাবেশ বলে দাবি করেন।[৩৭] এ সভায় সিলেটের অনেক নারীও অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৩৮]

করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলন এবং এতে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে সমর্থন জানানোর বিষয়টি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত এ সম্মেলনের মাধ্যমেই বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তান সরকার ও মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রকাশ পেয়েছিল। শিক্ষা সম্মেলনের খবর ঢাকা পৌঁছলে এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের এক বিরাট সভা ৬ ডিসেম্বর তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার পক্ষে এটিই ছিল প্রথম প্রকাশ্য ছাত্রসভা।[৩৯] এ সভায় মুনীর চৌধুরী, আব্দুর রহমান চৌধুরী (পরবর্তীতে বিচারপতি), এ. কে. এম. আহসান ও এস আহমদ প্রমুখের সাথে কল্যাণী দাশগুপ্ত নামে একজন ছাত্রী নেত্রীও বক্তব্য রেখে ছিলেন।[৪০] ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ফরিদ আহমদ কর্তৃক উত্থাপিত কয়েকটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলো ছিল– (১) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ; (২) রাষ্ট্রভাষা এবং লিংগুয়া ফ্রাংকা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার মাধ্যমে সমস্যাকে ধামাচাপা এবং বাংলা ভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে; (৩) উর্দু ভাষার দাবিকে সমর্থন করায় সভা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়; এবং (৪) সভা থেকে *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার বাঙালিবিরোধী প্রচারণার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন এবং জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য পত্রিকাটিকে সাবধান করে দেয়।[৪১] সভা শেষে বিক্ষোভ মিছিলসহ ছাত্ররা বাংলাকে

---

৩৭. আব্দুল হামিদ মানিক, *সিলেটের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১২৬

৩৮. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭

৩৯. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

৪০. সুপা সাদিয়া, *৫২'র বায়ান্ন নারী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৪

৪১. বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে সরকারের সেক্রেটারিয়েটের সামনে উপস্থিত হয়। সেখানে কৃষিমন্ত্রী মুহম্মদ আফজল ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিয়ে বাংলা ভাষা বিষয়ক দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। এরপর ছাত্ররা প্রাদেশিক মন্ত্রী নুরুল আমিনের বাসভবনে উপস্থিত হলে তিনিও বাংলা ভাষার দাবির প্রতি সমর্থন জানান এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম করবেন।[৪২] ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি ছাত্র প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে ছাত্রদের দাবির মুখে তিনিও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন।[৪৩]

রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বাঙালির আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে যখন সরকার এনভেলাপ, পোস্টকার্ড, ডাক টিকেট, মানি অর্ডার ফরম, রেল টিকেট ইত্যাদি এবং সদ্য ছাপানো টাকায় বাংলার পরিবর্তে শুধু ইংরেজি ও উর্দুর ব্যবহার শুরু করেন। পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার বিষয় তালিকা থেকে এবং নৌবাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষাসহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে বাদ দেয়া হয়।[৪৪] এতে পূর্ব বাংলার মানুষের বিশেষ করে ছাত্রসমাজের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ পটভূমিতে বাংলা ভাষাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ১৯৪৭ সালের ১১ নভেম্বর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানকারী প্রতিনিধি দলের অন্যান্যদের মধ্যে কল্যাণী দাশসহ কয়েকজন ছাত্রী প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।[৪৫]

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্যায়েই সিলেটের অংশগ্রহণের কথা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারি পাকিস্তানের যোগাযোগমন্ত্রী আব্দুর রব নিশতার (১৮৯৯-১৯৫৮ খ্রি.) সিলেট সফরে গেলে জেলা কমিটির সভানেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরাণীর (১৯০১-১৯৮৬ খ্রি.) নেতৃত্বে সিলেট নারী মুসলিম লীগের একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে দেখা করে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।[৪৬] ওই দাবিতে ১৯৪৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সিলেট মুসলিম মহিলা লীগ মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বরাবর একটি স্মারকলিপি পেশ করে করেন। এতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন সভানেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সহ-সভানেত্রী সৈয়দা সাহার বানু, সম্পাদিকা সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন, সৈয়দা নাজিবুন্নেসা খাতুন, সিলেট সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া খাতুন, মাহমুদা খাতুন, জাহানারা মতিন, রোকেয়া

---

৪২. *Morning News*, 10.12.1947; বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

৪৩. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

৪৪. ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইস্যুকৃত ২১৪৭- ই(পি) নম্বর চিঠিতে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য যে ৩১টি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছিল তার মধ্যে বাংলার উল্লেখ ছিল না।

৪৫. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

৪৬. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা: ২০০০, পৃ. ২৫৮

বেগম, নূরজাহান বেগম প্রমুখ।[৪৭] বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে তৎপরতা চালানো বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদানের কারণে সিলেটের *দৈনিক ইস্টার্ন হেরাল্ড* পত্রিকা জোবেদা খাতুন সম্পর্কে অশোভন ও বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে। পত্রিকাটির এহেন কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন নামে স্মারকলিপি স্বাক্ষরকারী একজন নারী। সাপ্তাহিক *নও বেলাল* পত্রিকায় তাঁর একটি প্রতিবাদ বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তিনি বলেন, সিলেটের নারীরা বাঙালি জাতির ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে, এ অধিকার তাদের আছে। তিনি আরো বলেন, "যাহারা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী হইয়া মাতৃভাষার বিরুদ্ধাচারণ করেন তাহারা মাতৃভাষার বিশ্বাসঘাতক কু-পুত্র তুল্য।"[৪৮]

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সিলেটের নারীদের এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম এজন্য সিলেটের নারীসমাজকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিনি মহিলা মুসলিম লীগের সভানেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরীকে একটি পত্র লিখে তাঁদের অভিনন্দিত করেছিলেন। পত্রটিতে তিনি লিখেছিলেন:

> আজ সত্যি আমরা অভূতপূর্ব আনন্দ এবং অশেষ গৌরব অনুভব করছি। সিলেটের পুরুষরা যা পারেনি তা আপনারা করেছেন। উর্দুর সমর্থনে সিলেটের কোন কোন পত্রিকা যে জঘন্য প্রচার করছে আর সিলেটের কোন পুরুষরা স্মারকলিপি দিয়ে যে কলংকজনক অভিনয় করেছেন তা সত্যি বেদনাদায়ক। কিন্তু আপনাদের প্রচেষ্টা দেখে মনে হচ্ছে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনাদের প্রেরিত স্মারকলিপি আমাদের আশান্বিত করে তুলেছে। নিশতার সাহেবের সাথে দেখা করেও আপনারা মাতৃভাষার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। 'তমদ্দুন মজলিশ' আজ আপনাদের অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আপনাদের নিঃস্বার্থ কর্মচাঞ্চল্য বাংলাভাষা আরো সক্রিয় আরো প্রবল হয়ে উঠবে।[৪৯]

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করে উর্দু এবং ইংরেজির সাথে বাংলা ভাষাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। শুধু তাই নয় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে গণপরিষদে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়।[৫০] বস্তুত, একজন হিন্দু সদস্য কর্তৃক এ প্রস্তাবটি উত্থাপিত হওয়ায় মুসলিম লীগ দলীয় রক্ষণশীল সদস্যগণ এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পান এবং একে পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা বিনষ্টের অপপ্রয়াস বলে আখ্যায়িত করেন।

---

৪৭. অদিতি ফাল্গুনী, *বাংলার নারী সংগ্রামের ইতিহাস*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯৪

৪৮. উদ্ধৃত তাজুল মোহাম্মদ, *ভাষা আন্দোলনে সিলেট*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৫

৪৯. তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

৫০. এতদবিষয়ে বিতর্কের জন্য দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ ৫৪-৫৮

প্রধানমন্ত্রী লিকায়ত আলী খান গণপরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে যখন পাকিস্তানের ঐক্য জোরদার করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে, তখন তা বানচাল করার জন্যই বাংলা ভাষার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং এ জন্য এর ভাষাও ইসলামি হওয়া উচিত। উর্দুকে পাকিস্তানের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতএব উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়।[৫১] প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আরো বলেন:

> এখানে প্রশ্নটি তোলাই ভুল হয়েছে। এটি আমাদের জন্য একটা জীবন মরণ সমস্যা। আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করি এবং আশা করি যে এ ধরনের সংশোধনী প্রস্তাবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবে।[৫২]

পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনও ধীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সকল অধিবাসীরই এই মনোভাব যে, একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। গণপরিষদের সহ-সভাপতি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি তমিজুদ্দিন খানও এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্য দিয়েছিলেন।[৫৩] গণপরিষদে বাংলা ভাষার সপক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উত্থাপিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়া এবং উর্দুর পক্ষে প্রধানমন্ত্রীসহ মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের অবস্থান গ্রহণ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন ও শিক্ষিত মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রধানমন্ত্রীর খাজা নাজিমুদ্দীনের বাংলা ভাষা বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাশ বর্জন করে মিছিলসহ রমনা এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল) এসে এক ছাত্র সমাবেশে মিলিত হয়। তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রতিবাদ সভায় নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম সরকারি ভাষা করার উদ্দেশ্যে একটি সংশোধনী প্রস্তার আনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এবং এ সম্পর্কে মুসলমানদের মনোভাব এবং ঢাকা বেতারের মিথ্যা ও পক্ষপাতমূলক সংবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৫৪] ভাষার দাবিতে সংগ্রামকে সক্রিয় ও বেগবান করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে ২ মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস এবং তমদ্দুন মজলিশের যৌথ উদ্যোগে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কামরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে আনোয়ারা খাতুন ও লিলি খান প্রমুখ ছাত্রী প্রতিনিধিগণও উপস্থিত

---

৫১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪-৫৮

৫২. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

৫৩. বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪

৫৪. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, পৃ. ৫৩

থেকে বক্তব্য রেখেছিলেন।[৫৫] এ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। তমদ্দুন মজলিশ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, গণ আজাদী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, সলিমুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি হল থেকে দু'জন করে ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। শামসুল আলমকে এর আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়। এ পরিষদে দু'জন নারী সদস্য ছিলেন আনোয়ারা খাতুন ও লিলি খান।[৫৬]

পূর্বোক্ত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পূর্ব বাংলা প্রদেশে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ধর্মঘট কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ঢাকাসহ সর্বত্র প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হয়। এ উপলক্ষ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভা ও কার্যক্রমে বহু ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। ঢাকার বাইরে সিলেটে নারীসমাজের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ততার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন সিলেটের নারীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এ জন্য সিলেটের মুসলিম মহিলা লীগের পক্ষ থেকে তাঁকে সমর্থন ও অভিনন্দন জানিয়ে একটি টেলিগ্রাম করা হয়েছিল।[৫৭] ১১ মার্চ আহূত সাধারণ ধর্মঘট কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন ও এবং তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ৮ মার্চ তদানীন্তন গোবিন্দচরণ পার্কে এক প্রস্তুতি সভা আয়োজন করা হয়। এ সভাটি আয়োজনের পিছনে জোবেদা খাতুন চৌধুরীর বিশেষ ভূমিকা ছিল কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া ভাষা সংগ্রামী পীর হাবিবুর রহমানের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়।[৫৮] এ সভাটিতে সভাপতিত্ব করার কথাও ছিল তাঁর। তবে স্বামী পাবলিক প্রসিকিউটর দেওয়ান আবদুর রহিম এবং পুত্রের অসম্মতি এবং বাঁধার কারণে শেষ পর্যন্ত জোবেদা খাতুন চৌধুরী এ সভায় অংশ নিতে পারেননি। মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বাংলাভাষা বিরোধী মুসলিম লীগ দলীয় কিছু ক্যাডার আক্রমণ করে মঞ্চ দখল করে নেয় এবং তাদের আক্রমণে সভাপতিসহ অনেকেই অহত হয়।[৫৯] এ ঘটনার প্রতিবাদে ১০ মার্চ মুসলিম মহিলা লীগের পক্ষ থেকে গোবিন্দচরণ পার্কে একটি প্রতিবাদ সভা আহ্বান করলেও সরকারের নিষেধাজ্ঞা এবং ১৪৪ ধারা জারি ফলে সভাটি করা সম্ভব হয়নি। এমনকি সরকারি নিষেধাজ্ঞা ও ১৪৪ ধারা জারির ফলে সিলেটে ১১ মার্চের ধর্মঘট কর্মসূচিও পালন করা সম্ভব হয়নি।

---

৫৫. সভায় উপস্থিত ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে কামরুদ্দীন আহমদ, রনেশ দাশ গুপ্ত, আবুল কাশেম, শামসুদ্দিন আহমদ, অজিত গুহ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, শহীদুল্লাহ কায়সার, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ বক্তব্য রেখেছিলেন। বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, পৃ. ৬৩

৫৬. মোবাশ্বের আলী, 'একুশের প্রেক্ষিত ও প্রতিচিত্র', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ২০০১; মাহ্‌বুব উল্লাহ (সম্পাদিত), *মহান একুশে সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ*, বাংলাভাষা স্মারক, অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৭৬১

৫৭. A M A Muhith, *State Language Movement in East Bengal 1947-1956,* UPL, Dhaka, 2004, p. 38

৫৮. দ্রষ্টব্য আবদুল হামিদ মানিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫

৫৯. মোহাম্মদ তাজুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ প্রদেশব্যাপী সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট কর্মসূচিসহ সে সময় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছাত্রী নেত্রী বেগজাদী মাহমুদা নাসির এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, আন্দোলনকারী ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধে কর্মসূচি সফল করার জন্য ঢাকায় ছাত্রী ও নারীরাও ব্যাপক হারে অংশ নেয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মমতাজ বেগম, মালেকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি সম্মানের ছাত্রী), সুলতানা রাজিয়া, আফরোজা হোসেন, লিলি খান, খালেদা খানম ফেন্সী, লুলু বিলকিস বানু, মেহেরুন্নিসা, লায়লা ও সামসুন্নাহার প্রমুখ।[৬০] ছাত্রীরা ছাত্রদের সাথে পিকেটিং ও অবরোধ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিল। কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকায় আন্দোলনকারী ছাত্রসমাজ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মিছিলসহকারে সেক্রেটারিয়েটের সামনে উপস্থিত হলে পুলিশ ব্যাপক লাঠি চার্জ করে এবং এতে কমপক্ষে ৫০ জন আন্দোলনকারী আহত হয়।

শুধু ঢাকায় নয়, ঢাকার বাইরেও ১১ মার্চের এ ধর্মঘট পালিত হয় এবং ধর্মঘট কর্মসূচিতে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। অধিকাংশ স্থানেই ধর্মঘট কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ হলেও ব্যতিক্রম ছিল যশোরের মোমিন গার্লস স্কুল। সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে এ স্কুলের ছাত্রী ছিল এবং এ স্কুল কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিল। কিন্তু যশোর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর সিদ্দিকী ও হামিদা রহমান মিছিল সহকারে স্কুলে উপস্থিত হয়ে ছাত্রীদের ধর্মঘটে যোগ দিতে বাধ্য করেন। প্রতিক্রিয়া হিসেবে সরকার ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে হামিদা রহমানের নামেও 'হুলিয়া' জারি করা হয়।[৬১] যশোরে হামিদা রহমানের সাথে ১১ মার্চ মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন সুফিয়া খাতুন (১৯৩৩-১৯৯২ খ্রি.)। এ কারণে পরের দিন সকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। সম্ভবত সুফিয়া খাতুনই ভাষা আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার হওয়া প্রথম নারী ছিলেন।[৬২]

বগুড়াতে কবি আতাউর রহমানকে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। অন্যান্যদের সাথে অন্যতম দুই সদস্য হলেন রহিমা খাতুন ও সালেহা খাতুন।[৬৩] বগুড়াতে ১১ মার্চ যে মিছিল বের হয় তাঁর নেতৃত্ব দেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। খুলনায় প্রথম আন্দোলন দানা বাঁধে দৌলতপুর বি.এল কলেজে। ২৮ ফেব্রুয়ারি সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। ১১ মার্চ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র কংগ্রেসের (ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থিত) ডাকে ধর্মঘট পালন করে। শহরে বিশাল মিছিল বের হয় এবং গান্ধী পার্কে

---

৬০. বেগজাদী মাহমুদা নাসির, 'আমি ও আমার সময়' নাজমা চৌধুরী ত্রয়োদশ স্মারক বক্তৃতা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ. ৯-১২

৬১. ফরিদা ইয়াসমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

৬২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ.৬১; সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

৬৩. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯; বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬-২৬৭

হাদিস পার্ক) গিয়ে শেষ হয়। ১১ মার্চের কর্মসূচি ও একে কেন্দ্র করে আয়োজিত আন্দোলনে ছাত্র ও রাজনীতিবিদদের সাথে যেসব নারী কর্মী যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আনোয়ারা খাতুন, লুৎফুন্নাহার, ফাতেমা চৌধুরী, রাবেয়া খাতুন, রেবা, সাজেদা হেলেন ও কৃষ্ণা দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৬৪]

১১ মার্চের ধর্মঘট পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি করেছিল। সরকারের তরফ থেকে আন্দোলনকারীদের পাকিস্তানের শত্রু এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দিয়ে ১২ মার্চ একটি প্রেসনোট জারি করা হয়।[৬৫] সরকারের অপপ্রচার ও দমননীতি সত্ত্বেও ১১ মার্চ পরবর্তী রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন অব্যাহত থাকে। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করায় ১৩ মার্চ গৃহীত এক সরকারি সিদ্ধান্তে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *অমৃতবাজার পত্রিকা*, *আনন্দবাজার পত্রিকা* এবং *স্বাধীনতা পত্রিকা* পূর্ব বাংলায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তবে এতেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায়নি। পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অংশ হিসেবে ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। আবুল কাশেম, কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা ও নঈমুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি দল ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার আলোচনা শেষে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি আট দফা চুক্তি নামা স্বাক্ষরিত হয়।[৬৬] চুক্তির শর্তে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দান করা হবে; পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তদন্তপূর্বক এক মাসের মধ্যে একটি বিবৃতি প্রদান করা হবে; এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে প্রাদেশিক পরিষদের নির্ধারিত বেসরকারি আলোচনায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এবং একে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের বিষয়ে একটি বিশেষ প্রস্তাব উপস্থাপন করা হবে; প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির বিলুপ্তির পর এর স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদানের বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে; পূর্ব বাংলার শিক্ষার মাধ্যমও হবে বাংলা; আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না; সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে; রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জন্য যে সকল স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করা হইবে। প্রতিনিধি দলের দাবি মোতাবেক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন স্বীকার করেন যে, এ আন্দোলন কোনো স্বদেশবিরোধী চক্রান্ত নয় এবং রাষ্ট্রের শত্রুদের দ্বারাও অনুপ্রাণিত নয়। তিনি আন্দোলনের যথার্থতা স্বীকার করে নিয়ে চুক্তিনামায় নিজ হাতে লিখতে বাধ্য হন যে, "He was satisfied that the movement was not inspired by the enemies of the state." [৬৭]

---

৬৪. মোহাম্মদ আবদুল হালিম, *খুলনায় ভাষা আন্দোলন-১৯৪৮*, চিত্র প্রকাশনী, খুলনা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

৬৫. প্রেসনোটটি দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৭

৬৬. চুক্তির শর্তাবলী সবিস্তার দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৭

৬৭. S A Akand, 'The Language Issue: Potent force for transforming East Pakistan Regionalism into Bengali Nationalism', *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. I, 1976, pp. 1-29

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সম্পাদিত উপর্যুক্ত চুক্তিটি তখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত না হওয়ায় ১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনের দিনও ছাত্ররা মিছিল সহকারে পরিষদ ভবনের সামনে উপস্থিত হয় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে থাকে। সভার শুরুতেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এ. কে. প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত রায় ও মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ বাইরে ছাত্রদের ওপর কোনো অত্যাচার হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে জানতে চাইলে পরিষদের ভেতরে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ কে ফজলুল হক, আনোয়ারা খাতুন এবং অন্যান্যরা বাইরের পরিস্থিতি দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ক্রমাগত দাবি জানাতে থাকেন। এ সময় আনোয়ারা খাতুন অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "গত ১১ মার্চ তারিখে যা হয়েছে তা হয়েছে, আজ পুলিশ মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে, গলা টিপে মেরেছে, তার প্রতিকার চাই। ঐ সমস্ত চোরামী এখানে চলবে না। আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়ে দেখে আসুন।[৬৮] আনোয়ারা খাতুনের এই বলিষ্ঠ দাবিকে সমর্থন করে শামসুদ্দিন আহমদ বলেন যে, পুলিশ যখন মেয়েদের গায়ে হাত তুলেছে তখন এই মুহূর্তে সকলের পদত্যাগ করা উচিত।[৬৯] শেষোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ছাত্রীরাও অংশ নিয়ে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন নেলী সেন গুপ্তা (১৮৮৬-১৯৭৬ খ্রি.) পরিষদের বাইরে বিক্ষোভ চলাকালে ফজলুল হক, মুহম্মদ আলী, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের সাথে তিনিও বাইরে এসে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের বাংলা ভাষার দাবির প্রতি সমর্থন জানান।[৭০]

রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় চলমান উপর্যুক্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮ খ্রি.)[৭১] পূর্ব বাংলা সফরে আসেন। এটি ছিল পূর্ব বাংলায় মি. জিন্নাহর প্রথম ও শেষ সফর। কোনো কোনো সূত্র মতে, রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় চলমান পরিস্থিতিতে ভীত হয়ে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে পূর্ব বাংলা সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যাহোক তাঁর পূর্ব বাংলায় আগমন এবং রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাঁর অবস্থান ঘোষণাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্বে পরিসমাপ্তি ঘটে এবং এ আন্দোলন একটি নতুন পর্বে প্রবেশ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্বে পুরুষদের পাশাপাশি বাংলার নারীসমাজের একটি অংশ এতে সক্রিয়ভাবে

---

৬৮. *East Bengal Assembly Proceeding,* 15 March, 1948, Vol. 1, No.1

৬৯. *Ibid*

৭০. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, পৃ. ৯৩

৭১. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন গুজরাটি বংশোদ্ভূত একজন আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৩ সাল থেকে মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং একপর্যায়ে তিনি এর প্রধান নেতায় পরিণত হন। স্বাধীনতার পর তিনি পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন এবং ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। পাকিস্তানে তাঁকে 'কায়েদে আজম' (মহান নেতা) ও 'বাবায়ে কওম' (জাতির পিতা) হিসেবে সম্মান করা হয়।

অংশ নেয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের এ গঠনপর্বে মূল কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল একটি বৌদ্ধিক পরিবেশ ও জনমত সৃষ্টির প্রয়াস। এর জন্য পুরুষরা যেমন লেখালেখিকে তাঁদের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি নারীদেরও কেউ কেউ একই পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধ, চিঠিপত্রাদি এবং প্রবন্ধ প্রকাশ ছাড়াও সভা-সমিতির মাধ্যমে আলোচনা ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষার সপক্ষে দাবি জানানো হয়। সংখ্যায় তুলনামূলক কম হলেও নারীরাও এসব কাজ করেছিলেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পর এ সংগঠনের কর্মসূচি হিসেবে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতেও নারীদের অংশগ্রহণ এবং সক্রিয় তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। পুরুষদের পাশাপাশি ধর্মঘট কর্মসূচি পালন, বিক্ষোভ, অবরোধ এবং পিকেটিং-এর মতো কর্মসূচি পালনেও নারীদের তৎপর হতে দেখা যায়। অবস্থানগত দিক থেকে এসব কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া নারীদের সিংহভাগই ছিলেন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তবে সংখ্যায় কম হলেও লেখক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কতিপয় নারীর অংশগ্রহণও ছিল।

৩.২.খ: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: জিন্নাহর ঢাকা সফরের পর থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব বাংলা সফরে আসেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিন্নাহকে ঢাকায় স্বাগত জানায়। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে একটি নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর মতামত দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন। উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন:

> --- এ কথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে কেউ যদি আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোনো জাতিই একসূত্রে গ্রথিত হয়ে কার্যনির্বাহ করতে পারে না।--- অতএব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্য কোনো ভাষা নয়।[৭২]

তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্তদের পাকিস্তানের সংহতি বিপন্নকারী ও বিদেশি এজেন্সির সাহায্যপুষ্ট এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করে এদের ব্যাপারে উপস্থিত জনতাকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে জিন্নাহর এরূপ একগুঁয়ে ও অযৌক্তিক অবস্থান এবং বাংলা ভাষার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন উপস্থিত মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এমনকি 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' জিন্নাহর এমন কথা উচ্চারণের সাথে সাথে সভায় না না ধ্বনিও উচ্চারিত হয়েছিল।[৭৩] জিন্নাহর এ বক্তৃতার প্রতিবাদে ২৩ মার্চ এ কে

৭২. Abdul Wadud, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*, New Delhi, 1982, p. 24;Tahir kamran, Early phase of Electoral Politics in Pakistan: 1950, *South Asian Studies, vol.24. no.2, July-December 2009*, p.274

৭৩. গাজীউল হক, *আমার দেখা আমার লেখা*, মেরী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৪৫; বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, পৃ. ৯৫

ফজলুল হক একটি বিবৃতি প্রদান করেছিলেন।[৭৪] ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়েও জিন্নাহ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাঁর পূর্ববর্তী কথারই পুনরাবৃত্তি করেন। সাথে সাথেই উপস্থিত ছাত্ররা সমস্বরে নো নো ধ্বনিতে সমাবর্তন স্থলকে মুখরিত করে তোলে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অপ্রস্তুত জিন্নাহ দ্রুত তাঁর বক্তৃতা শেষ করে সমাবর্তন স্থল ত্যাগ করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদের বাসভবনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের সাথে নারী প্রতিনিধি হিসেবে লিলি খান অংশ নিয়েছিলেন।[৭৫] বৈঠকের সময় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি জিন্নাহর কাছে প্রদান করা হয়। তবে বাংলা ভাষার দাবিকে উপেক্ষা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে গভর্নর জেনারেল জিন্নাহর অনমনীয় অবস্থানের কারণে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।[৭৬]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অযৌক্তিক ও একগুঁয়েমীপূর্ণ বক্তব্য পূর্ব বাংলার জনমনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর আগমনের পর পূর্ব বাংলায় পরিচালিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এক রকমের ভাটা পড়ে। জিন্নাহর বক্তব্য ও রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে তাঁর অবস্থান পূর্ব বাংলার ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। ফলে তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জিন্নাহর মতকে সমর্থন করে। অন্যদিকে বাংলা ভাষার সমর্থকগণ নিজেদের সংগঠিত করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জোরদার করতে পারেনি। এমনকি ৬ এপ্রিল পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় খাজা নাজিমুদ্দীন সংগ্রাম পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে পূর্ব বাংলায় ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলা অথবা অধিকাংশের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব করলেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা প্রস্তাব এড়িয়ে যান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আন্দোলন জোরালো করা যায়নি। বস্তুত জিন্নাহর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও তাঁর সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের প্রতি পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রভাষার পক্ষে তাদের সংগঠিত করা যায়নি।[৭৭] ফলে দেখা যায় যে, স্বৈরশাসনের মোকাবেলা ও অন্যান্য কিছু ইস্যুকে কেন্দ্র করে ছাত্ররা বিভিন্ন আন্দোলন করলেও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আর জোরালো হয়নি। ১৯৪৮ সালের ১৫ নভেম্বর মাসে ঢাকায় একটি ছাত্রী ধর্মঘট সংঘটিত হয়। এটি ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম ছাত্রী ধর্মঘট। তবে এর সাথে রাষ্ট্রভাষার কোনো সম্পর্ক ছিল না। ইডেন ও কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলকে একত্রীভূত করার প্রতিবাদে এই দুই স্কুলের

---

৭৪. ৫ মার্চ *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় বিবৃতিটি ‘ হক সাহেবের হুঙ্কার কায়েদ আজমের প্রতি জঘন্য আক্রমণ’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়। উদ্ধৃত মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

৭৫. প্রতিনিধি দলে আরো অংশ নিয়েছিলেন শামসুল হক, নঈমুদ্দীন আহমদ, কামরুদ্দীন আহমদ, আজিজ আহমদ, শামসুলআলম, তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক আবুল কাশেম, মোঃ তোয়াহা ও অলি আহাদ প্রমুখ।

৭৬. বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৩

৭৭. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, পৃ. ১২৭-১২৮

ছাত্রীরা ধর্মঘট পালনের পর প্রাদেশিক সচিবালয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল।[৭৮] বস্তুত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে নারীসমাজ আন্দোলন সংগ্রামের যে প্রেরণা লাভ করেছিল ছাত্রী ধর্মঘট পালনে এর প্রভাব রয়েছে।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, জিন্নাহর আগমনের পর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন মন্থর হয়ে গেলেও একবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ১৯৪৮ সালের ১৮ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান (১৮৯৬-১৯৫১ খ্রি.) ঢাকা সফরে এলে আন্দোলন নতুন প্রাণ পায়। ছাত্রসমাজ তাঁর কাছে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম মাঠে লিয়াকত আলী খান বক্তৃতা করেছিলেন। এ অনুষ্ঠানে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানপত্রে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুস্পষ্টভাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, গণপরিষদের অন্যতম ভাষা এবং কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার বিষয় তালিকায় বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্তির দানের দাবি করা হয়।[৭৯] এ সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বাংলা বর্ণমালাকে আরবিকরণের পরিকল্পনা করেন এবং এ জন্য মাওলানা আকরাম খাঁকে প্রধান করে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এ সিদ্ধান্তের জোর প্রতিবাদ জানায় এবং সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহরের দাবি জানিয়ে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে একটি প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করে। ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আরবি বা রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রয়াসের তীব্র বিরোধিতা করেন। এ সম্মেলনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[৮০] ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি 'পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড' পাকিস্তানের সব ভাষার লিখন প্রণালী আরবি হরফ করার জোর সুপারিশ করে। এর পিছনে বাংলা লিপির স্বকীয়তা ধ্বংস করার অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের এ ষড়যন্ত্রের সাথে হাত মিলালে পূর্ব বাংলার ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ এর তীব্র প্রতিবাদ করে। তারা আরবি লিপি প্রবর্তনের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহাভিযান, প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। পাকিস্তানি শাসকচক্রের এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে অন্যান্যদের মধ্যে বেগম কাজী মোতাহের হোসেন অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৮১]

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য ইস্যুতে ছাত্র আন্দোলনের জন্য ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশেষ করে রাজশাহীতে আবুল কাশেমসহ তিনজন ছাত্রের বহিষ্কার আদেশের প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালের ৮ জানুয়ারি ছাত্রসমাজ পূর্ব বাংলায় 'জুলুম প্রতিরোধ' দিবস পালন করে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা

---

৭৮. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, পৃ. ১৩৪
৭৯. *ঐ*, পৃ. ১৪১
৮০. গাজীউল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
৮১. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেদিন পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সাধারণ ছাত্রসভাও অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অন্যান্যদের সাথে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী নাদেরা বেগম। বামপন্থি রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী নাদেরা বেগম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব থেকেই তিনি এতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করতে তিনি কামরুন্নেসা স্কুল, বাংলাবাজার গার্লস স্কুল ও ইডেন কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সভা করতেন। তাঁর বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক ছাত্রী রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৮২] ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এতে তকিউল্লাহ, নাসির আহমদ প্রমুখ ছাত্র নেতাদের সাথে নাদেরা বেগমও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আরবি হরফে বাংলা লেখা চলবে না' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে বিক্ষোভ মিছিলটি প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে অংশগ্রহণকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং কয়েকজন ছাত্র নেতাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।[৮৩] এ বছরই মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট শুরু করে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ধর্মঘট কর্মসূচির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। ধর্মঘট চলাকালে তমদ্দুন মজলিশের সাহিত্য শাখার উদ্যোগে ৪ মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হল মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় 'পূর্ব পাকিস্তানের হরফ সমস্যা' ও 'সোজা বাংলা' শিরোনামে দু'টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। শেষোক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এ সভায় বাংলার ভাষার আরবিকরণের শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৮৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদের পক্ষ থেকে ১৯৪৯ সালের ১০ ডিসেম্বর আয়োজিত সভায় বাংলা বর্ণমালার আরবিকরণের প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছাড়াও ইডেন কলেজের ছাত্রীরাও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছিল।

এদিকে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ধর্মঘট কর্মসূচির সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শাস্তি প্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন আইন বিভাগের ছাত্রী লুলু বিলকিস বানু ও ইংরেজি বিভাগের নাদেরা বেগম।[৮৫] এ থেকে বুঝা যায় যে, এ আন্দোলন কর্মসূচিতে ছাত্রীদেরও অংশগ্রহণ ছিল।

---

৮২. বেবী মওদুদ, *বাংলাদেশের নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪, পৃ. ৪২

৮৩. গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্র নেতাদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ আফজাল হোসেন, মৃণাল কান্তি বড়রী, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, ইকবাল আনসারী খান ও আবদুস সালাম প্রমুখ। বেবী মওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪-৫৫

৮৪. *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ১১ মার্চ, ১৯৪৯; মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

৮৫. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পূর্ব বাংলায় নতুন বিতর্কের সূচনা হয়। এ বিতর্কের মূলে ছিল পাকিস্তান গণপরিষদের মূলনীতি কমিটি কর্তৃক ২৮ সেপ্টেম্বর অন্তবর্তী রিপোর্ট পেশ এবং এতে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব। এর প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি জাতীয় সম্মেলন থেকে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ১২ নভেম্বর বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। জনপ্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার মূলনীতি কমিটির অন্তবর্তী রিপোর্টটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

১৯৫১ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এদিন খালেক নেওয়াজ খানের সভাপতিত্বে দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনেক ছাত্রীও অংশ নিয়েছিল। সভায় বক্তারা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে গণপরিষদে দাবি উত্থাপন করার জন্য বাঙালি সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানায়। সভায় ছাত্র নেতা আব্দুল মতিন ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের মধ্যে কার্যক্রম সীমাবদ্ধ না রেখে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে কার্যক্রম বৃদ্ধির দাবি জানান। সভায় অংশ নেওয়া ছাত্রী নেত্রী নাদেরা বেগম এজন্য কি করণীয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেয়ার জন্য আব্দুল মতিনকে অনুরোধ জানান। জবাবে আব্দুল মতিন নতুন করে রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদ গঠনের প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাবের পর ঐ সভাতেই আব্দুল মতিনকে আহ্বায়ক করে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এ পরিষদে দু'জন নারী সদস্য অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল। তারা হলেন–নাদেরা বেগম ও লিলি খান। নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ 'পতাকা দিবস' উদ্‌যাপন এবং গণপরিষদ সদস্যদের কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পাঠায়। পাকিস্তানের সব পত্রিকাতে এ স্মারকলিপির কপি পাঠানো হয়েছিল।[৮৬]

১৯৫১ সালের ১৫ এপ্রিল করাচিতে অনুষ্ঠিত উর্দু সম্মেলনের সভাপতি মাওলানা আকরাম খাঁ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু ভাষার বিরোধিতাকারীদের সম্পর্কে আপত্তিকর বক্তব্য রাখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এর প্রতিবাদ জানায়। ৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত তাদের সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবের একটিতে বলা হয়:

> আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলাম এবং সেই দাবির উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের রাষ্ট্র গঠন করবো। এই প্রতিশ্রুতিই আমরা জনসাধারণকে দিয়েছিলাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ সে কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের উপর লোক বাংলা ভাষাভাষী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের মাতৃভাষাকে

৮৬. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৪

> পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। উর্দুর সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে যদি দুই বা ততোধিক ভাষার প্রচলন নাও থাকত তবুও আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন করতাম। কারণ পাকিস্তানের উন্নতি পূর্ণ বিকাশ ও একতার জন্য বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা কেবল বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়।[৮৭]

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সফরের পর নানা কারণে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন অনেকাংশেই গতি হারিয়েছিল। তখন থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সীমিত পরিসরে যে আন্দোলন কর্মসূচি পালিত হয়েছিল এতেও পুরুষদের পাশাপাশি ছাত্রী ও নারীদেরও অংশগ্রহণ ছিল। এমনকি, পুনর্গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদেও তাদের অংশীদারিত্ব বহাল ছিল।

৩.২.গ: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সাল ও তৎপরবর্তী সময়

১৯৫২ সালের শুরুতেই পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এক নতুন গতিবেগ লাভ করে। পূর্ব বাংলার সাবেক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর জানুয়ারি মাসে পূর্ব বাংলা সফরে এসে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে যে বক্তব্য রাখেন, মূলত একে কেন্দ্র করেই ঝিমিয়ে পড়া রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সময় তার সরকার রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে এক কৌশলী নীরবতার নীতি গ্রহণ করেছিল। এ সময় সরকার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রকাশ্য বক্তব্য না দিয়ে গোপনে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপতৎপরতায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু লিয়াকত আলী খানের হত্যাকাণ্ডের পর খাজা নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে পূর্বসূরির কৌশলী নীতি ত্যাগ করে প্রকাশ্যতই উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তৎপরতা শুরু করেন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় খাজা নাজিমুদ্দীন বলেন, "কায়েদে আজম উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" তিনি আরো বলেন, "কায়েদে আজম কঠোরভাবে প্রাদেশিকতার বিরোধিতা করতেন এবং যারা প্রাদেশিকতা উস্কে দেয় তারা পাকিস্তানের শত্রু।"[৮৮] নাজিমুদ্দীনের এ বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যে প্রতিবাদে ২৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।[৮৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৩০ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা 'প্রতীকী' ধর্মঘট পালন করেন। এ দিন ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের

---

৮৭. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২২

৮৮. *Morning News,* 31 January, 1952

৮৯. *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ০৩.০২.১৯৫২; বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২

অন্যতম নেতা খালেক নওয়াজ খানের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনের আমতলায় একটি প্রতিবাদ সভা করে। সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে তাঁর পূর্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়। এ সভা থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।[৯০]

উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং করণীয় নির্ধারণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে ৩১ জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, যুব সংঘ, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মোহাজের সমিতির কর্মী ও নেতৃবৃন্দসহ ঢাকার কিছু নেতৃস্থানীয় নাগরিক ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় অনেকেই বক্তব্য রাখেন এবং বক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুন। মাহবুবা খাতুন তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবি স্বীকার করিয়া নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা তাদের রক্ত বিসর্জন দেবে।"[৯১] মাহবুবা খাতুনের এ বক্তব্যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সপক্ষে নারীদের দৃঢ় অবস্থান ও মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এ সভায় পল্টন ময়দানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিষয়ে নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতার বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আহুত ৪ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিশেষে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ৪০ সদস্যের 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ পরিষদে অন্যতম ও একমাত্র নারী সদস্য ছিলেন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্য আনোয়ারা খাতুন।[৯২]

পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষার্থীরা মিছিল সহকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণে একত্রিত হয়। গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সেখানে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে মিছিল নিয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আরবি হরফে বাংলা লেখা চলবে না' ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে উপাচার্যের বাসভবন হয়ে নবাবপুর রোড, পাটুয়াটুলী, আরমানীটোলা, নাজিমুদ্দীন রোড প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। ৪ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট ও মিছিল শোভাযাত্রায় ছাত্রদের পাশাপাশি ইডেন কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুলসংখ্যক নারী শিক্ষার্থী অংশ

---

৯০. গাজীউল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

৯১. *দৈনিক আজাদ*, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২; উদ্ধৃত বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫ ৪

৯২. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৮

নিয়েছিলেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা ও মিছিলে ইডেন কলেজের আই.এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী শরীফা খাতুন, তাঁর সহপাঠী হেনা, রহিমা এবং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী লুৎফা আমিরসহ অনেকেই যোগ দিয়েছিল।[৯৩] কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রীরা সেদিন স্কুলের সামনে পিকেটিং করেছিল। বিদ্যালয়ের সিনিয়র ছাত্রীরা জুনিয়রদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে স্কুলের সাধারণ কার্যক্রম বন্ধ রেখেছিল। এ কাজে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এদের মধ্যে জুলেখা হক ছিলেন অন্যতম। কামরুন্নেসা স্কুল ও মুসলিম গার্লস স্কুলের কিছু ছাত্রী ৪ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায়ও যোগ দিয়েছিল। এমনকি পদযাত্রায় সাধারণ মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৯৪] ৪ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতাল, ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিলসহ আইন পরিষদ ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করে। মওলানা ভাসানী এ কর্মসূচি সফল করে তোলার জন্য ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

৪ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট ঢাকা শহরের জন্য নির্ধারিত থাকলেও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে। যশোর ও নোয়াখালী সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, মানিকগঞ্জ, দিনাজপুর, চাঁদপুর, ফেনী এবং কুমিল্লাতেও ঢাকার অনুরূপ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৯৫] ৪ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে সমস্ত স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালিত হয়। কাগজে ছাপানো ছোট ছোট পতাকা তৈরি করে তাতে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান লিখে আন্দোলনকারীরা মিছিল নিয়ে ভুবন পার্কে গিয়ে সভা করে। সে সভায় অন্যান্যদের মধ্যে মোহসেনা বেগম নামক একজন ছাত্রী বক্তৃতা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, মোহসেনা বেগম শুরু থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলন।[৯৬] তিনি ছাড়াও রাজশাহীতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আরো অনেক নারী অংশ নিয়েছিলেন। আন্দালন কর্মসূচির অংশ হিসেবে মিছিল, সভা ও সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী নারীদের মধ্যে রাজশাহী কলেজের ছাত্রী বেগম জাহান আরা, কলেজ ছাত্রী শামসুন্নাহার ও হাসনা বেগম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।[৯৭] ৪ ফেব্রুয়ারি নীলফামারীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ধর্মঘট পালিত হয়েছিল। এ ধর্মঘট কর্মসূচিতে ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন হালিমা খাতুন, জাহেদা বেগম, জাকিয়া, সালমা বেগম, রেজিনা বেগম, জেবুন্নেসা প্রমুখ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ধর্মঘট শেষে বিক্ষোভ মিছিলসহ শহর প্রদক্ষিণ শেষে একটি সভা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। এ বিক্ষোভ ও সভাতেও অনেক ছাত্রী অংশ নিয়েছিলেন।[৯৮]

---

৯৩. তুষার আবদুলাহ, (সম্পাদিত), *বাহান্নর ভাষাকন্যা*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.২২

৯৪. আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৬৭; বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৫

৯৫. বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩

৯৬. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

৯৭. মুহাম্মদ একরামুল হক, *রাজশাহী জেলার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১০,২৪,৩১

৯৮. *ঐ*, পৃ. ১৭৮

৪ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি সফল হওয়ার পর এ আন্দোলনকে আরো বেগবান ও সর্বব্যাপী করার জন্য ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি 'পতাকা দিবস' পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালানো হয়। কর্মসূচি উপলক্ষে ৫০০ পোস্টার লেখার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাদিরা বেগম ও শাফিয়া খাতুনকে।[৯৯] তাঁরা তাঁদের বান্ধবী ও হলের অন্যান্য ছাত্রীদের নিয়ে পোস্টার লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। নুরুন্নাহার কবীরের হাতের লেখা সুন্দর হওয়ায় তিনি বেশির ভাগ পোস্টার লিখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তাঁকে সাহায্য করতেন রওশন আরা বাচ্চুসহ আরো অনেকে। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মাহফিল আরা, রাবেয়া ইসলাম, নূরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন ও কায়সার সিদ্দিকীসহ আরো অনেকেই পোস্টার লেখার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন।[১০০]

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও যোগানের কাজেও ছাত্রী ও নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভাষা সংগ্রামী আব্দুল মতিন লিখেছেন:

> আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে দেবার জন্য টাকার খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের হাতে শুরুতে কিছুই ছিল না। ছাত্রাবাসগুলো থেকে চাঁদা তোলা হচ্ছিল। কিন্তু তাদের কাছে আবেদন করেও সাড়া মেলেনি। --- অবস্থা দৃষ্টে 'চামেলী হাউস' অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের হোস্টেলে রোকেয়া নামে বগুড়ার এক ছাত্রীকে পূর্ব পরিচয়ের সুবাদে আন্দোলনের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহের অনুরোধ জানাই। ওরা কয়েকজন ছাত্রী চাঁদা তুলতে কলোনীতে গিয়ে আশাতীত সাড়া পেয়েছিল। দুই দিন পর সন্ধ্যায় কথা বলতে গিয়ে আমিও অবাক হই। প্রায় দশ হাজার টাকা ওরা সংগ্রহ করে এনেছে। সে টাকা খুব কাজে লেগেছিল। মফস্বলে ছাত্রকর্মীদের পাঠাতে, ইশতেহার ছাপাতে আরো নানা কাজে বেশ পরিমাণ টাকা খরচ হয়।[১০১]

এভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে চাঁদা সংগ্রহকারী ছাত্রীদের মধ্যে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্রী সুফিয়া ইব্রাহীম (১৯৩২-২০২০ খ্রি.)[১০২] একই বিভাগের সুরাইয়া আশ্রাফ ডলি প্রমুখও যুক্ত ছিলেন।[১০৩]

---

৯৯. নাদিরা বেগম সম্পর্কে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। শাফিয়া খাতুন ছিলেন ১৯৫১-৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ভিপি। তিনি ভাষা আন্দোলনে নারীদের সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদেও তাঁকে সদস্য করা হয়েছিল। বলা হয় যে, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের যাবতীয় কর্মতৎপরতা গোপন ও প্রকাশ্য নির্দেশনাবলি তাঁর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছানো হতো। ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত ছাত্র জনতার সমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে তিঁনি তাঁর সাংগঠনিক দূরদর্শিতার দ্বারা বিপুল সংখ্যক ছাত্রীদের সমাবেশস্থলে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫- ৮৬

১০০. তুষার আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪, ১৭

১০১. আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

১০২. সুফিয়া ইব্রাহিম ছিলেন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও পাকিস্তান সরকারের আইন ও বিচারমন্ত্রী বিচারপতি ইব্রাহিমের কন্যা। বাংলাদেশের প্রতিথযশা আইনজীবী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের স্ত্রী সুফিয়া আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী ড. সুফিয়া আহমেদ ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম নারী জাতীয় অধ্যাপক। ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা ও গবেষণায় অনন্য অবদানের জন্য সরকারে তাঁকে একুশে পদক প্রদান করে সম্মানিত করেছিলেন।

১০৩. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬-১৫৭

২১ ফেব্রুয়ারির নির্ধারিত ধর্মঘটকে সফল করার জন্য দু সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। প্রস্তুতিমূলক সব কর্মসূচিতে ছাত্রী ও নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের সংগঠিত করা। এ দায়িত্বটি পালনকারীদের মধ্যে ছিলেন লায়লা সামাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওমেন স্টুডেন্ট ইউনিয়নের' ভাইস প্রেসিডেন্ট শাফিয়া খাতুন, সারা তৈফুর[১০৪], শামসুন্নাহার আহসান[১০৫], রওশন আরা বাচ্চু (অনার্স, দর্শন) ও সুফিয়া আহমেদ (অনার্স, ২য় বর্ষ, ইস. ইতিহাস) প্রমুখ। তবে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকাটি পালন করেছিলেন শাফিয়া খাতুন। [১০৬] ২০ ফেব্রুয়ারি সকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটে যোগদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়ার জন্য প্রচার কাজ চালান। এক্ষেত্রে ইডেন কলেজের ছাত্রীরা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা প্রচারপত্র বিলি, পোস্টার লাগানো এবং স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণের দায়িত্ব পালন করেন। একাজে অংশ নেওয়া ইডেন কলেজেরে ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা রওশন আরা বেগম, মনু, দুলু, লুৎফুন্নেসা বেগম, আমিরুন্নেসা বেগম, সুফিয়া করিম, ফরিদা বারী, বানু বীথি এবং আই.এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী শরীফা খাতুন সহ আরো অনেকে।[১০৭]

কেবল ছাত্রীসমাজ নয়, এসময় বিভিন্ন নারী সংগঠনের (যেমন– 'শিশু রক্ষা সমিতি', 'ওয়ারি নারী সমিতি') নেত্রী ও কর্মীরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অশংগ্রহণ করেছিলেন। তারা পাড়ায় পাড়ায় সর্বদলীয়

---

১০৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী সারা তৈফুর ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সমাবেশে মুসলিম গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের সংগঠিত করে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারির ১৪৪ ধারা ভঙ্গের উদ্দেশ্যে একই দলের সাথে তিঁনি বের হন। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কাঁটাতার ডিঙোতে গিয়ে পা কেটে ফেলেন। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে তিঁনি নিজ শহর রংপুরে ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। তার মা ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বড় বোন। সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪-৯৫

১০৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্রী শামসুন্নাহার আহসান জন্মস্থান ছিল বরিশাল শহরের আলোকান্দার গ্রামে। পর্দানশীন শামসুন্নাহার বোরকা পরেও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নিতেন। তিনি শাফিয়া খাতুনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতেন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে অন্যান্য ছাত্রীদের সাথে তিনিও প্রতিবাদ করেন সহপাঠীদের সাথে প্রায় সকল মিটিং-মিছিল, পিকেটিং, ছাত্রসভায় অংশগ্রহণ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী নারী গ্রুপের সাথে ছিলেন এবং পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে কাঁটাতারের বেড়ায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আহত হন। ২২ ফেব্রুয়ারি গায়েবী জানাজা শেষে যে মিছিল সমাবেশ হয়েছিল তার সবগুলোতেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮০

১০৬. তুষার আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

১০৭. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের লিফলেট বিলি ও সভা করে জনমত সংগঠনের কাজ করেন। সরকারের দমননীতি উপেক্ষা করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের এ কার্যক্রমগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯ খ্রি.), কামরুন্নাহার লাইলী, হালিমা খাতুন, নূরজাহান মোর্শেদ, আফসারী খানম প্রমুখ অন্যতম ছিলেন।[১০৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি সুফিয়া কামালের অনবদ্য অবদান রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এ উজ্জ্বল নক্ষত্র শুরু থেকেই আন্দোলনকারীদের সব ধরনের সহযোগিতা ও গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ভাষা সংগ্রামী নাদেরা বেগম গ্রেপ্তার ও পুলিশি নির্যাতন এড়ানোর জন্য যখন আত্মগোপন করেছিলেন, তখন কবি সুফিয়া কামাল তাঁকে নিজ বাসায় আশ্রয় দিয়েছিলেন।[১০৯]

২১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের জোর প্রস্তুতি চলতে থাকে। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট রাজনৈতিক উত্তেজনায় সরকার ভীত হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় ঐদিনের নির্ধারিত প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন নির্বিঘ্ন করা এবং ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচিকে বানচাল করার লক্ষ্যে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শামসুল হক কোরেশী সরকারের নির্দেশে ২০ তারিখ থেকে পরবর্তী এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেন। এ অবস্থায় আন্দোলন কর্মসূচি বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য ২০ ফেব্রুয়ারি আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগে কেন্দ্রীয় অফিসে (৯৪, নবাবপুর রোড, ঢাকা) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠক বসে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কর্মসূচি পালন করা হবে কি-না এ বিষয়ে সংগ্রাম পরিষদের উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে তীব্র মত পার্থক্য দেখা দেয়।[১১০] অধিকাংশ সদস্যই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করেন এবং নিজেদের মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষাবলম্বনকারীগণ যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন যে, ১৪৪ ধারা জারি করে সরকার যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কাছে নতি স্বীকার করলে ভাষা আন্দোলনের কোনো অগ্রগতি তো হবেই না বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে। তর্ক-বিতর্কের পর আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করা এবং ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি বাতিলের প্রস্তাব পেশ করেন। আব্দুল মতিন ও অলি আহাদ প্রবল আপত্তি জানালে সেটা ভোটে প্রদান করা হয়। অবশেষে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে একই সঙ্গে এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়, যদি ছাত্র ও জনসাধারণের কোনো অংশ সর্বদলীয় কর্ম সংসদের এ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন চালিয়ে যায় তবে তাই হবে এবং এক্ষেত্রে এ

---

১০৮. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৩২

১০৯. *সাপ্তাহিক অনন্যা*, ১৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

১১০. এতদবিষয়ে বিস্তারিতদ্রষ্টব্য অলি আহাদ *জাতীয় রাজনীতি* পৃ.১৩৭-৩৮ বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫৫

সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ বাতিল বলে ধরে নেয়া হবে।[১১১] সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে পরিষদ সদস্য আনোয়ারা খাতুনও উপস্থিত ছিলেন।[১১২]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য ঐ রাতেই ফজলুল হক মুসলিম হলের পুকুরের পূর্ব পাড়ের সিঁড়িতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জরুরি বৈঠক বসে।[১১৩] বৈঠকে যে কোনো মূল্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা এবং ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সফল করার বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হয়। সভায় গাজীউল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে পরদিন গাজীউল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশে সভাপতিত্ব করবেন। এ সিদ্ধান্ত ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জানানোর জন্য চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। সে সময় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী জাহানারা লাইজু ও গাজীউল হকের ছোট ভাই সিয়াম চিঠি বহন করে নিয়ে যান।[১১৪]

পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি খুব ভোর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। বাংলা বাজার বালিকা বিদ্যালয়, মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সমবেত করার এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়িত্ব পালন করেন রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া খান, সারা তৈফুর, কায়সার সিদ্দিকী[১১৫], হালিমা খাতুন প্রমুখ।[১১৬] হালিমা খাতুন কামরুন্নেসা ও বাংলা বাজার স্কুলের বেশ কিছু ছাত্রীদের নিয়ে নওয়াবপুর রোড হয়ে শ্লোগান দিতে দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় উপস্থিত হতে সক্ষম হন।[১১৭] সারা তৈফুর ও তাঁর ২/৩ জন সহপাঠীর প্রচেষ্ঠায় মুসলিম গার্লস স্কুলের প্রায় ২৫/৩০ জন ছাত্রী আমতলার মিছিলে যোগদান করে।[১১৮] সুফিয়া করিম (সাধারণ সম্পাদিকা ছাত্রী সংসদ, ইডেন কলেজ, ১৯৫১-৫২) ১৯ ফেব্রুয়ারি অন্যান্য ছাত্রীদের নিয়ে আনন্দময়ী গার্লস হাইস্কুল ও

---

১১১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩-২৩৪

১১২. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২০৮

১১৩. বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন– গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান (শেলী), মোহাম্মদ সুলতান, জিল্লুর রহমান, আব্দুল মোমিন, এস. এ. বারী, এটি. এম. আর আখতার মুকুল, কামরুদ্দীন হোসেইন, আনোয়ারুল হক খান, আনোয়ার হোসেন, মঞ্জুর আহমেদ সহ এগারজন।

১১৪. বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ; গাজীউল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫১

১১৫. কায়সার সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী ছিলেন। শাফিয়া খাতুনের উৎসাহে তিঁনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যুক্ত হন এবং মিছিল, শোভাযাত্রা, ছাত্রসভা, জনসভা, পিকেটিং ইত্যাদিতে স্বতঃফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সফলেল জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ, পোষ্টার ও ফেষ্টুন তৈরি করাসহ অন্যান্য কাজেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

১১৬. তুষার আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-১৭

১১৭. মোস্তফা কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬-২১৯

১১৮. তুষার আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৮

বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে আমতলায় মিটিংয়ে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান এবং ২১ ফেব্রুয়ারি তাদের নিয়ে আমতলার সভায় যোগদান করেন।[১১৯] ইডেন কলেজের ছাত্রী শরীফা খাতুন হেনা, রওশন জাহান হোসেন প্রমুখ ইডেন কলেজের ছাত্রীবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। কামরুন্নেসা স্কুল থেকে যোগদানকারী ছাত্রীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কাজী খালেদা খাতুন, জুলেখা হক। এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের মধ্যে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রওশন আহমেদ দোলন ও নবম শ্রেণীর ছাত্রী আমেনা আহমেদও সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। শেষোক্ত আমেনা আহমেদও ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সমবেত করানোর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১২০]

কামরুন্নেসা স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন মালেকা খান। তিনিও ২১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন। বর্তমান গবেষকের সাথে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন:

> ভাষা আন্দোলনের সময় আমি ছিলাম কামরুন্নেসা স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। সেসময় কামরুন্নেসা স্কুল থেকে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রীরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিল বের করেছিল। সেখানে আমি অংশগ্রহণ করি। আমি তখন ছোট ছিলাম বলে মিছিলের সামনের দিকেই ছিলাম। আমার স্কুল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা পর্যন্ত 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে মিছিলটি মুখরিত ছিল। পথের দু'ধারের মানুষ করতালি দিয়ে, শ্লোগান দিয়ে ভাষা আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আমাদের উৎসাহিত করেছিল।[১২১]

পুলিশি বাঁধা উপেক্ষা করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় সমাবেশ স্থলে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনতার বিপুল উপস্থিতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ছাত্র সমাবেশ শুরু হওয়ার পর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এতে উপস্থিত ছাত্র -জনতার মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিতর্ক চলার এক পর্যায়ে শাফিয়া খাতুন উপস্থিত ছাত্রীদের নিয়ে কমনরুমে চলে গিয়ে সেখানে একটি সভা করেন। এতে অন্যান্যদের মাঝে বক্তৃতা করেন ইডেন কলেজের ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা দুলু এবং স্কুলছাত্রী কাজী খালেদা খাতুন।[১২২] পরে অবশ্য ছাত্রনেতাদের অনুরোধে তাঁরা সভাস্থলে এসে যোগ দেন। সভা প্রায় ঘণ্টা খানেক চলার পর গাজীউল হক সভাপতির বক্তব্য রাখেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এ সময় আবদুস সামাদ আজাদের প্রস্তাব অনুযায়ী ১০ জন করে একেক দলে বের হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক হাবিবুর রহমান শেলীর (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান) নেতৃত্বে প্রথম দলটি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশন স্থল জগন্নাথ হলের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। এর পর ছাত্রদের আরো একটি দল বের হওয়ার পর মেয়েদের একটি গ্রুপ গ্রুপ কলাভবন এলাকা থেকে বের হয়। এ গ্রুপটিতে ছিলেন

---

১১৯. মনোয়ার আহমদ, *ভাষা আন্দোলনে সচিত্র দলিল*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯৮

১২০. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪; সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খণ্ড, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৬৬

১২১. মালেকা খান, সাক্ষাৎকার, ২৮.০৬.২০১৯

১২২. তুষার আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রওশন আরা বাচ্চু, শাফিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার, সুফিয়া ইব্রাহিম (আহমেদ) হালিমা খাতুন প্রমুখ। এ দলে স্কুল ছাত্রী পারুল, সেতারা, নুরী ও জুলেখা হক।[১২৩] মেয়েদের দ্বিতীয় দলে ছিলেন সারা তৈফুর সহ অন্যরা। সরকারি কর্মচারী হয়েও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন ইডেন কলেজের লাইব্রেরিয়ান গুলে ফেরদৌস। এছাড়াও ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচিতে অংশ নেওয়াদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লায়লা সামাদ, সোফিয়া করিম, জাহানারা লাইজু প্রমুখ।[১২৪] এদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের দিকে এগিয়ে যাওয়া কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ে ও লাঠি চার্জ করে। উল্লেখ্য যে, ছেলেদের দু'টি দল কলাভবন গেট অতিক্রম করার সাথে সাথে মোতায়েনকৃত পুলিশ তাদের ট্রাকে তুলে নিয়েছিল। ছাত্রীদের দলটিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, তবে তাদের ওপর লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এতে আহত হয়েছিলেন রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহিম ও শামসুন্নাহার প্রমুখ। কাঁটাতার ডিঙোতে গিয়ে আঘাত পেয়েছিলেন সারা তৈফুর। সুফিয়া আহমেদ এক স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারে ঐদিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

> সকাল ৮-৮:৩০ টার দিকে আমতলায় গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠ ভরে গেল। সভা শুরু হয়ে গেল। গাজীউল হক সভাপতিত্ব করলেন। সকল পার্টির নেতারা তাদের বক্তব্য পেশ করলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ব্যাপারে বক্তাদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হয়েছিল। তবে বেশীর ভাগই ভাঙ্গার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। আমরাতো উপস্থিত হয়েছি ভাঙ্গার জন্যই। আমরাতো জেনেই এসেছি ১৪৪ ধারা আছে। কাজেই ভাঙ্গার পক্ষে সাধারণের মতও বেশী। এই বিতন্ডা চলাকালে আমরা মেয়েরা দোতলার বারান্দায় চলে যাই। পরে আমাদের সেখান থেকে ডেকে আনা হয়। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্তের পর প্রথমে দু'টি ছাত্রদের দল বের হয়ে যায়। এর পরই খবর আসে ওদের ধরেছে এবং লাঠিপেটা করেছে। তাদের মধ্যে কিছু ছাত্রকে এ্যারেস্ট করেছে এবং ট্রাকে তুলে নিয়ে গেছে। তখন সিদ্ধান্ত হয় মেয়েরা গেলে কি হয় দেখা যাক। মেয়েদের দলের প্রথমটিতেই আমি ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল ড. শাফিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার (যিনি বোরকা পরতেন), রওশন আরা বাচ্চু, ইডেন কলেজের একজন মেয়ে ছিল। বের হয়ে দেখি সিটি এস.পি মাসুদ মাহমুদ, ঢাকার ডি.সি কোরেশী সাহেব। মাসুদ মাহমুদ আমার পূর্ব পরিচিত। তিনি আমাকে বললেন, "সুফিয়া তুমি কেন এর মধ্যে যাচ্ছ?" আমি বললাম "যাচ্ছি Because আমরা Assembly হলে যেতে চাই"। তিনি বললেন " দেখ, এ ব্যাপারে কেউ যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তাহলে সরকার কিন্তু কঠিন, কঠোর ব্যবস্থা নিবে- এগুলো জেনেও কি তোমরা যাবে?" আমরা বললাম, "আমরা যখন বের হয়েছি, আমরা যাব।" তিনি আমাদের বাঁধা দিতে চাইলেন কিন্তু আমরা সেটা শুনলাম না। আমরা বের হতেই লাঠিচার্জ শুরু হলো। কারো হাতে, কারো পায়ে, কারো পিঠে। রওশন আরা বাচ্চুর পিঠে, আমার পায়ে লাঠিচার্জ হয়েছিল। শামসুন্নাহারের হাতে লেগেছিল। আমরা সবাই কিছু না কিছু আহত হয়েছি। আমাদের লাঠিচার্জের খবর যখন ছেলেরা পেল তখন আর তারা থামল না। তখন দলে দলে বের হয়ে গেল। কোন শৃঙ্খলা রইল না। পুরো রাস্তা জনাকীর্ণ। একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। উপরে কিছু ছাত্র ছিল

---

১২৩. বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৩; আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
১২৪. তুষার আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬.০২.১৯৯৯

তারা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে শুরু করল। পুলিশও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করছে। আমরা এদিকে যেতেই থাকলাম। যেতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমরা গিয়ে সলিমুল্লাহ হলের প্রভোষ্ট ড. ওসমান গণির বাসভবনের মাঠে আশ্রয় নিলাম। আহত এবং টিয়ার গ্যাসের কারণে আর যেতে পারছিলাম না। কাজেই মাঠের কলের পানি দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম এবং বিশ্রাম নিলাম। ইতোমধ্যে ছাত্রদের সাথে জনসাধারণও মিশে গেছে। চারিদিকে মিছিল হচ্ছে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। আমরা যেহেতু সবাই কিছুটা আহত, তাই আমরা মেডিকেল কলেজে গিয়ে মেডিকেল Aid নেওয়ার জন্য যাব সিদ্ধান্ত নিলাম। বের হওয়ার সময় কিছু লোক (ছাত্র বা জনসাধারণ হবে) বলল, "গুলি হয়েছে, কাজেই তোমরা মেডিকেল কলেজের দিকে যেতে পারবে না।" তারপর ওখানেই আমরা কিছুক্ষণ বসে থেকে মেয়েদের হোস্টেলে ফিরে গেলাম।।[১২৫]

বেলা ৩টার দিকে পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। আকস্মিকভাবে পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেল গেটের সামনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সমবেত ছাত্র-জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করলে কয়েকজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আবুল বরকতসহ রফিক ও জব্বার প্রমুখ নিহত হন।[১২৬] বেশ কয়েকজন আহত আহত এবং অনেকেই পুলিশের হাতে বন্দি হন। পুলিশের গ্রেপ্তার তালিকায় কয়েকজন ছাত্রীও ছিলেন। ফরিদা বারী, ফিরোজা বেগম, জহরত আরা রাহেলা, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, জোহরা প্রমুখ ছিলেন গ্রেপ্তারকৃত নারীদের অন্যতম।[১২৭]

২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি পালনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশের গুলি এবং হতাহতের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। চলমান প্রাদেশিক পরিষদ সভায়ও এর প্রতিফলন ঘটে। পরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ অধিবেশন স্থগিত রেখে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের আহ্বান জানান। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পরিষদে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী এতে সম্মত না হওয়ায় বিরোধী দলীয় সদস্যগণ সেদিনের মতো অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবি করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন এতে সম্মত না হওয়ায় প্রতিবাদে মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আনোয়ারা খাতুন এবং আলী আহমদ খান অধিবেশন বর্জন করে আন্দোলনকারীদের মাঝে উপস্থিত হন।[১২৮]

২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ সারা দেশে বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করা হয়। শহীদদের স্মরণে ঢাকায় আয়োজিত গায়েবি জানাযায় হাজার হাজার মানুষ অংশ নেয়। জানাযা শেষে যে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয় এতে বিপুল সংখ্যক ছাত্রী ও নারী অংশ নিয়েছিল।[১২৯]

---

১২৫. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবিরকে জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদের প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, ০৫.০৫.২০০৫ উদ্ধৃত মোহাম্মদ হুমায়ন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

১২৬. ঐদিন গুলিবিদ্ধ হলেও পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আবদুস সালাম।

১২৭. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬.০২.১৯৯৯

১২৮. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫-২৪৮

১২৯. *ঐ*. পৃ. ২৬২-২৬৬

২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে তুমুল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এ বিতর্কে অংশ নিয়ে পরিষদ সদস্য মিসেস আনোয়ারা খাতুন বলেন:

> ঘটনা দেখে মনে হয় আজও আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাই না, তার প্রমাণ এই পুলিশি জুলুম। এ অত্যাচার থেকে মেয়েরা পর্যন্ত রেহাই পায় নাই। ছেলেদের কথা আর নাই বল্লাম। যে জাতি মাতৃজাতির সম্মান দিতে জানে না সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। এ অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর নয়। দু' একটি কথায় কিছুটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করব– মিলিটারী মেয়েদের গাড়ীতে করে নিয়ে কুর্মিটোলায় ছেড়ে দিয়েছে। যে Ministry-র আমলে এ সমস্ত অত্যাচার হয়–তাঁরা মাতৃজাতির সম্মান দেয় না তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। পুলিশের লাঠিচার্জে মেয়েরা Wounded হয়েছে। আমি তাদের মধ্যে দু'জনার নাম দিচ্ছি। একজন হলো ঢাকা হাইকোর্টের জাস্টিস ইব্রাহিমের মেয়ে মিস সুফিয়া ইব্রাহিম, আর একজন মিস রওশন আরা থার্ড ইয়ার বি.এ, মেয়েদের Total wounded সংখ্যা হলো ৮ জন। মন্ত্রীসভা এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন যাতে নাকি মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছে।[১৩০]

মিসেস আনোয়ারা খাতুনের উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ২ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নারীদের ওপর পুলিশের নিপীড়ন নির্যাতন এবং এতে নারীসমাজের প্রতিক্রিয়ার চিত্র পাওয়া যায়। ছাত্র-জনতার ওপর গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি কামরুন্নেসা স্কুলের গলিতে নারীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার উদ্যোক্তা ও আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও বেগম কাজী মোতাহের হোসেন প্রমুখ। সাজেদা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রতিবাদ সভায় বেগম সুফিয়া কামাল, আইন পরিষদ সদস্য নুরজাহান মুরশিদ ও দৌলতুন্নেসা খাতুন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল।[১৩১] ২৩ ফেব্রুয়ারিতেও ঢাকার বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভা শেষে অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি, পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন, নিহত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানানো হয়। প্রতিবাদ সভাসমূহ থেকে আন্দোলনের ঐক্যের জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে সক্রিয় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাইলফলক হলো ঢাকা মেডিকেল হোস্টেলে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ যা পরে সাধারণের ভাষায় 'শহীদ মিনার' নামে খ্যাতি অর্জন করে।

২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আজিমপুর কলোনীর মেয়েরা একটি প্রতিবাদ সভা করে এবং কমলাপুর ও অন্যান্য এলাকা থেকেও নারীরা এসে এ সভায় যোগদান করেন। সভায় কয়েক হাজার নারী সমাবেত হয়ে সরকারের এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।[১৩২] আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্বার্শবর্তী আজিমপুর কলোনী অঞ্চলে গিয়ে প্রচার ও অর্থ সংগ্রহের কাজ করেন। এ কাজে যারা যুক্ত

---

১৩০. *Proceedings of the East Bengal Legislative Assembly*, 22nd February 1952, vol. VII, p.98
১৩১. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০; *দৈনিক জনকণ্ঠ* ১৬.০২.১৯৯৯
১৩২. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০০

ছিলেন তাঁদের মধ্যে মোসলেমা খাতুন, সুফিয়া খান, সারা তৈফুর, শামসুন্নাহার, কায়সার সিদ্দিকী প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। এরা আজিমপুর কলোনী ছাড়াও শান্তিনগর, মালিবাগ এবং আশেপাশের পাড়া মহল্লায় অফিসে গিয়ে তহবিল সংগ্রহের কাজ করেন। ইডেন কলেজের লাইব্রেরিয়ান গুলে ফেরদৌস মনু, দুলু, মতি, জেবা ও মমতাজ প্রমুখ ছাত্রীদের সহায়তায় কারাগারের ছাত্রদের জন্য খাবার সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করেন।[১৩৩]

প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন ২৪ তারিখ তাঁর এক বেতার ভাষণে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে বিদেশি এজেন্টদের দ্বারা পরিচালিত বলে আখ্যায়িত করেন।[১৩৪] মুখ্যমন্ত্রীর এ বক্তব্য পূর্ব বাংলার গণমানুষের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এমতাবস্থায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ১২ নং অভয় দাস লেনে নারীদের একটি বৃহৎ সভা হয়। পর্যাপ্ত গাড়ি বা রিকশা না থাকায় বর্ষীয়ান নারীরাও পায়ে হেঁটে এতে যোগ দেন। সভায় ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনার নিন্দা জানানো হয়। সভায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে গ্রেপ্তার ছাত্রদের মুক্তিদান, বাংলা ভাষার আন্দোলনকে বিদেশিদের এজেন্টদের দ্বারা পরিচালিত এবং যে বাঙালি-অবাঙালি ও হিন্দু-মুসলিম রূপ দেওয়ার অপচেষ্টার নিন্দা জানানো হয়। সভা থেকে শহীদদের নাম পরিচয় প্রকাশসহ তাদের দাফন সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ সঠিকভাবে প্রকাশেরও দাবি জানানো হয়। উক্ত সভায় সর্বদলীয় ঢাকা নারী রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৩৫]

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একটি জরুরি সভা ডেকে উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন।[১৩৬] তবে এতে করেও আন্দোলন প্রশমিত হয়নি। ২৮ ফেব্রুয়ারি পুরানা পল্টনে নারীদের একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নূরজাহান মোর্শেদ ও লায়লা সামাদ (দৈনিক সংবাদের স্টাফ রিপোর্টার) ভাষা আন্দোলনে শহীদদের আরব্ধ কাজ করে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। এ সভায় সংবাদপত্রের বাক-স্বাধীনতা, ১৪৪ ধারা বাতিল, সকল গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি এবং নুরুল আমীন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবি করে কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৩৭]

শুধু ঢাকায় নয়, ঢাকার বাইরেও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ২১ ফেব্রুয়ারি ও পরবর্তী নানা কর্মসূচি পালিত হয় এবং এসব কর্মসূচিতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীসমাজেরও চোখে পড়ার মতো অংশগ্রহণ ছিল। ২১

১৩৩. তুষার আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০, ১৬, ১৮, ৩৭, ৩৪, ৪৪
১৩৪. *দৈনিক আজাদ*, ২৪.০২.১৯৫২
১৩৫. *দৈনিক আজাদ*, ২৭.০২.১৯৫২
১৩৬. *The Statesman*, 28.02.1952
১৩৭. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১-১৩২

ফেব্রুয়ারির ঢাকার পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জে হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় ছাত্রদের গুলিবর্ষণের খবর পৌঁছলে সেখানে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ২২ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ মিছিলের শহরে পরিণত হয়। বিকেলে শ্রমিক নেতা ফয়েজ আহম্মদের সভাপতিত্বে চাষাড়া বিশাল জনসভা হয়। এ জনসভায় স্থানীয় মর্ডান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে নারীদের একটি দল শোভাযাত্রা সহকারে অংশগ্রহণ করে।[১৩৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ ঘটনার পর থেকে নারায়ণগঞ্জে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জোরালো হতে থাকে এবং তা চরম রূপ নেয়। এ আন্দোলনে ছাত্রী ও নারীদের সংগঠিতকরণে মমতাজ বেগম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ অভিযোগে ২৯ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় পুলিশ মমতাজ বেগমকে গ্রেপ্তার করে। কারারুদ্ধ মমতাজ বেগমকে মুচলেকা দিয়ে মুক্তির প্রস্তাব দিলে তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া মমতাজ বেগমের পারিবারিক জীবনে অশান্তি নেমে আসে এবং তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দেন। মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে মমতাজ বেগমের এ আত্মত্যাগ ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। শুধু মমতাজ বেগম নয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার অপরাধে নারায়ণগঞ্জে আরো অনেক ছাত্রী ও নারীকে নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল। ভাষা প্রসঙ্গে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হওয়া নারায়গঞ্জের ছাত্রী ইলা বকশী, রেনুধর ও বেলা প্রমুখের নাম স্মরণযোগ্য।

ঢাকায় ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহের শেরপুরে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেওয়া নারীদের অন্যতম ছিলেন জাহানারা বেগম।[১৩৯] ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যক ও সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ। ময়মনসিংহ মেডিকেল স্কুলের ছাত্রী হালিমা খাতুন ছাত্রীদের সংগঠিত করে মেইন গেইটের তালা ভেঙে এ মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর হাতে কালো পতাকা থাকায় তার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি করা হয়। তৎকালীন প্রধান শিক্ষিকা হাসিনা বেগম রাত দশটায় হালিমা খাতুনকে হোস্টেল থেকে বের করে দিয়েছিলেন।[১৪০] ঢাকা ঘটনার প্রতিবাদে ময়মনসিংহের জামালপুরেরও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সভায় অংশ নিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন দশ বছর বয়সী মতিয়া চৌধুরী[১৪১] তৎকালীন কুমিল্লার (বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) মেয়ে অধ্যাপক মমতাজ বেগম (জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় পরোক্ষভাবে অংশ নেন। তিনি বলেন–

> ভাষা আন্দোলনের সময় ছোট থাকায় খুব বেশি কিছু বুঝি না তবে এটা মনে আছে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ঢাকায় ছাত্রদের ওপর গুলির প্রতিবাদে কসবাতে বাবা আব্দুল গণি ভূঁইয়ার পরামর্শে চাচাতো ভাই আব্দুল রউফের (শ্রমিক নেতা) নেতৃত্বে ছাত্রদের মিছিল বের হয়। ছাত্ররা রেল যোগাযোগ বাঁধা

১৩৮. *দৈনিক আজাদ*, ২২.০২.১৯৫২

১৩৯. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

১৪০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩১

১৪১. বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী। সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫

দেওয়ার জন্য রেল লাইনের ওপর শুয়ে পড়ে। ছাত্রদের সাথে আমিও রেল লাইনের ওপর অবস্থান নিই। আমি ছাত্রদের কালো ব্যাজ পরিয়ে দেই, সেই সাথে বাড়ির সব সদস্যদেরকেও।[১৪২]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ টাঙ্গাইল মহকুমা শাখার উদ্যোগেও ২১ ফেব্রুয়ারি এবং পরবর্তী কর্মসূচি পালিত হয়। এসব কর্মসূচিতে মেয়েরাও অংশ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে যাদের নাম বিভিন্ন সূত্র থেকে পওয়ায় যায় তারা হলেন জোৎস্না (পিতা কে এন সাকের), ঝর্ণা এবং মাহেরার সৈয়দ ডাক্তারের কন্যা ছালেহা প্রমুখ। শেষোক্ত ছালেহা খাতুন ছিলেন টাঙ্গাইল কুমুদিনী কলেজের ছাত্রী। তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারির মিছিলেও অংশ নিয়েছিলেন।[১৪৩] কুমুদিনী কলেজের আরেক জন ছাত্রী ছিলেন নাজমী আরা। তিনি বিন্দুবাসিনী স্কুলের মেয়েদের সংগঠিত করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মিছিলের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন। এ অপরাধে তাঁকে দণ্ডস্বরূপ তিন টাকা জরিমানা করা হয়েছিল।[১৪৪]

২১শে ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরেও স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের মধ্যে যারা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে হামিদা হক, খুকুমণি, কচিমণি, আমিনা দানেশ, রওশন আরা ও জান্নাতুন আরা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।[১৪৫] পাবনায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসব কর্মসূচিতে পুরুষদের পাশাপাশি যেসব ছাত্রী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তারা হলেন সুফিয়া বেগম, জাহানারা প্রধান, নূরজাহান বেগম, হালিমা খাতুন ও রাবেয়া খাতুন প্রমুখ।[১৪৬] ঝিনাইদহের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল স্নিগ্ধা, কাঞ্চন আরা এবং আনোয়ারা ও জাহানারা খাতুন নামক দু'বোন। স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুরারী মোহন ঘোষালের কন্যা পুতুল ছন্দার নামও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের নামের সাথে উল্লেখযোগ্য।[১৪৭]

স্থানীয় প্রশাসনের কাড়াকড়ি আরোপের কারণে খুলনায় ২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি পালিত হয়নি। ঢাকায় ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলিবর্ষণের খবর খুলনায় পৌঁছার পর ২২ ফেব্রুয়ারি সেখানে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। খুলনায় ছাত্রীসমাজও এর প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া খুলনার করোনেশন গার্লস স্কুলের ছাত্রীনেত্রী রোকেয়া মাহবুব শিরির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে খুলনায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রী কালোব্যাজ ধারণ করে মিছিলে অংশ নেন। মিছিলে শ্লোগান দেন সাজেদা আলী (সাবেক স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীর স্ত্রী)। এছাড়াও এ আন্দোলনে অংশ নেওয়া খুলনার আর যেসব নারী কর্মীর নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে আনোয়ারা খাতুন, লুৎফুন্নাহার, ফাতেমা চৌধুরী, সাজেদা হেলেন ও

---

১৪২. অধ্যাপক মমতাজ বেগম, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান, সাক্ষাৎকার, ১৯.০৯.২০১৯
১৪৩. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২
১৪৪. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬
১৪৫. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯
১৪৬. *ঐ*, পৃ. ১৯৪
১৪৭. *ঐ*, পৃ. ২৩৬

কৃষ্ণা দাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৪৮] খুলনায় স্কুল ছাত্রী হামিদা খাতুন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রচেষ্টায় লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।[১৪৯]

বরিশালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম কাতারে ছিলেন জগদীশ সরস্বতী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রাণী ভট্টাচার্য অন্যতম। তিনি বরিশালে অনুষ্ঠিত সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের দলেও তিনি ছিলেন।[১৫০] ঢাকায় গুলিবর্ষণের সংবাদ বরিশালে পৌঁছালে ২২ ফেব্রুয়ারি অশ্বিনীকুমার টাউন হলের সামনে ভোর হতে জনতার স্রোত নামে। সামসুন্নাহার খোকনের (মিসেস হামিদ উদ্দিন নামে পরিচিত, সাবেক আওয়ামী লীগ এম.পি) নেতৃত্বে প্রথম নারীদের শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিলেন নারীরা এবং তাদের পিছনে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ। বরিশালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারী সৈনিকদের মধ্যে হোসনে আরা নিরু, মঞ্জুশ্রী, মাহেনুর বেগম, চারুবালা গাঙ্গুলী ও উষারাণী চক্রবর্তীর নাম পাওয়া যায়।[১৫১] ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বরিশালের ঝালকাঠিতে ২২ ফেব্রুয়ারি ঝালকাঠি সরকারি বালক বিদ্যালয় ছাত্ররা একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করেছিল। মিছিলটি স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের কাছে পৌঁছলে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী লাইলী বেগমের নেতৃত্বে ছাত্রীরা এসে মিছিলে যোগ দেয়।[১৫২] একজন ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার প্রতি এ অনুরাগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

বাংলাদেশের যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সিলেটের নারীসমাজের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বে সিলেটের নারীদের ভূমিকা বিষয়ে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেও সিলেট জেলায় আন্দোলন অব্যাহত ছিল। সিলেট জেলা ও এর অধীন হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার মহকুমায় ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি পালিত হয়। ঢাকায় ছাত্র ও জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হতাহতের ঘটনার সংবাদে সিলেটি দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। ২২ ফেব্রুয়ারি সিলেটে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। প্রতিবাদ মিছিল বের হলে মেয়েরাও এতে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় মেয়েরা অংশ নেয় এবং সামনের সারিতে বসে বক্তৃতা শুনে। সিলেটে এমন দৃশ্য বিরল ছিল।[১৫৩] অনিল কুমার সিংহ উল্লেখ করেছেন যে, ২২ ফেব্রুয়ারির মিছিলের বিশেষত্ব ছিল এই যে, এতে মেয়েরা মিছিলের পুরোভাগে থেকে অংশ নেয় এবং পুরুষরা তাদের অনুসরণ করে। সিলেটের রক্ষণশীল সমাজের এ ঘটনাকে তিনি বিরল এবং অবাক করা দৃষ্টান্ত হিসেবে অবহিত করেছেন। মিছিল শেষে গোবিন্দচরণ পার্কে অনুষ্ঠিত সমাবেশেও মেয়েরা অংশ নেয় এবং সমাবেশের

---

১৪৮. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯
১৪৯. তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
১৫০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯
১৫১. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১
১৫২. *ঐ*, পৃ. ১৫৩
১৫৩. আব্দুল হামিদ মানিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

সামনের সারিতে তাঁরা বসেছিলেন। প্রখর রোদের খরতাপ উপেক্ষা করে মেয়ের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন।[১৫৪] ২৩ ফেব্রুয়ারি সিলেটে নারীসমাজের উদ্যোগে প্রতিবাদী মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গোবিন্দচরণ পার্কে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ড. নাইয়ার আহমদ এবং বক্তৃতা করেন ভাষা সংগ্রামী জোবেদা খাতুন চৌধুরীসহ অন্যান্য নেত্রীরা। বিকেলে নারীদের আর একটি সমাবেশ হয় জিন্নাহ হলে।[১৫৫] রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং নিজ স্কুলে প্রতিবাদী কালো পতাকা উত্তোলনের অভিযোগে স্কুলছাত্রী সালেহা বেগমকে ৩ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছিল। এর ফলে তাঁর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়।

ঢাকার নির্মম ঘটনার পর রংপুর জেলা বোর্ডে মাসুদা চৌধুরী ও নিলুফার আহমেদ ডলি নারীদের একটি শোভাযাত্রা আহ্বান করেন এবং মিটিং মিছিল করেন। এ সময় নিলুফার আহমেদ ডলিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে এ গণজমায়েত সংগঠনে নিলুফার আহমেদ ডলির মা আফতাবুন নাহার সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা পালনকারী রংপুরের আরেক নারী ছিলেন মালেকা আশরাফ।[১৫৬] সাতক্ষীরাতে ঢাকার পুলিশের গুলিবর্ষণে হত্যার প্রতিবাদে সাতক্ষীরা স্কুলের ছাত্রী রসুলপুরের মাহবুবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা গুলেরা বেগমের নেতৃত্বে স্কুল ছাত্রীরা কালোব্যাজ ধারণ করে মিছিল বের করে। গুড়পুকুর বটতলায় বাংলাভাষার পক্ষে বক্তৃতা করেন গুলেরা বেগম।[১৫৭]

চট্টগ্রামে ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ১৯৫২ সালে ঢাকার আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ রেখে ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) মাহবুবুল আলম চৌধুরী আহবায়ক ও চৌধুরী হারুন অর রশীদ ও এম এ আজিজকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে গঠন করে 'চট্টগ্রাম জেলা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এর মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল, মিছিল ও লালদিঘী ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করে যার অংশ হিসেবে ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি শহরের বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগানো হয় যাতে অংশ নেন মিরা সেন, জাহানার রহমান, জওশন আরা রহমান, হোসনে আরা প্রমুখ।[১৫৮]

২১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতালে অংশগ্রহণ করে। শহরের দোকান পাট, যানবাহন, অফিস আদালত বন্ধ থাকে। এ আন্দোলনে মেয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। ঐ দিন ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর চট্টগ্রামে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং চট্টগ্রামের ছাত্ররা সাথে এর প্রতিবাদে পথে নেমে আসে। সে মিছিলে অনেক ছাত্রী ছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন প্রতিভা মৎসুদ্দি। তিনি ১৯৫২ সালে চট্টগ্রাম

---

১৫৪. *যুগভেরী*, ৩ এপ্রিল, ১৯৮৯; মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০
১৫৫. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), পৃ. ২৬২
১৫৬. সেলিনা হোসেন, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ৫৮ ও ৭৫
১৫৭. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, পৃ. ৩৬
১৫৮. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮

সরকারি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৫১ সাল থেকে তিনি কলেজের ছাত্রীদের ভাষা আন্দোলনের জন্য সংঘবদ্ধ করেছিলেন। [১৫৯]

২২ ফেব্রুয়ারিতে মিছিল ও শ্লোগানে চট্টগ্রাম শহর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঐ দিন চট্টগ্রাম নগরীতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। এরূপ মিছিলে হালিমা খাতুনের নেতৃত্বে ডাঃ খাস্তগীর স্কুলের ছাত্রীরা অংশ নেয়। তাছাড়া মিছিলটি অর্পণচরণ গার্লস কলেজের সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে আরো কিছু মেয়ে অংশ নিয়েছিল। ২৩ ফেব্রুয়ারি ও অসংখ্য শোক মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। ২৪ ফেব্রুয়ারিতে হরতাল ও জনসভা পরিচালিত হয় চট্টগ্রাম নগরীতে। এ সমগ্র মিছিল জনসভায়, প্রচার প্রচারণায় নারীদর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল।[১৬০]
২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রতিভা মুৎসদ্দি, তালেয়া রহমান প্রমুখ ছাত্রীর ছোট্ট মিছিল ডাঃ খাস্তগীর স্কুলে আসে। সেখান থেকে জওশন আরা ও হালিমা খাতুনসহ অন্যান্যরা মিছিলে যোগ দেয়। মিছিলকারী ছাত্রীরা ট্রাকে করে চট্টগ্রাম শহর প্রদক্ষিণ করে। পরে এক সমাবেশে ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দারি করেন। গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান।[১৬১] খাস্তগীর স্কুলের মেয়েরা দেয়াল টপকিয়ে এসে মিছিলে যোগ দেয় এবং এসব মিছিলের কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

রাজশাহীতেও ২১ ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী হরতাল পালিত হয়। বাজারের প্রত্যেকটি দোকানপাট বন্ধ থাকে। বেলা ১১.০০ টার দিকে রাজশাহী কলেজ থেকে ১ হাজারের অধিক ছাত্র ছাত্রী সহকারে একটি শোভাযাত্রা ও শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।[১৬২] ঐদিন ভুবনমোহন পার্কে ডাঃ এস.এম.এ গাফফারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় জাহানারা বেগম 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা' গানটি পরিবেশন করেছিলেন।[১৬৩] তাছাড়া ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাকার সংগ্রামী ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর অগ্নিস্ফূলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়লে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো রাজশাহীতেও ছড়িয়ে পড়লে ২২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ মিছিলে মেয়েদের অংশগ্রহণের জন্য দশম শ্রেণির ছাত্রী হাফিজা বেগম, ফিরোজা বেগম, হাসিনা বেগম ও খুকু এরা সকলে মিলে পাল্কি গাড়িতে করে মাইকের পরিবর্তে চোঙ্গা নিয়ে প্রচারণায় বের হন।[১৬৪]

---

১৫৯. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
১৬০. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯
১৬১. *ঐ*, পৃ. ১২০
১৬২. দৈনিক আজাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
১৬৩. মুহাম্মদ একরামুল হক, *রাজশাহী জেলার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৮
১৬৪. তসিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন*, একতা মুদ্রায়ন, রাজশাহী, ১৩৯৬, পৃ. ১১৮

অতঃপর আতাউর রহমান খান, গোলাম আরিফ টিপু, মহসিন প্রামানিক, লুৎফর রহমান মল্লিক (ডলার) প্রমুখের নেতৃত্ব বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। এ মিছিলে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শহর প্রদক্ষিণের জন্য বের হলে ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে পি.এন গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী মনোয়ারা বেগম স্বৈরাচারী শাসক এবং মিছিলে গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে তুখোড় ভাষায় তীক্ষ্ণ বক্তৃতা প্রদান করলে মেয়েরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার বক্তব্য শুনে ক্লাশ বর্জন করে মিছিলে অংশগ্রহণ করতে থাকে। মিছিল পরিচালনায় সহযোগিতা করেছিলেন হাফিজা বেগম টুকু, জাহানারা বেগম, মহসিনা বেগম ও অন্যান্যরা। এছাড়া শিক্ষক শিক্ষিকারাও আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিলেন। শিক্ষিকাদের মধ্যে ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা নূরমহল খাতুন, হাজেরা বেগম, মনসুরা বেগম, মিনতি স্নেহ, গীতা, হালিমা, নিরূপমা প্রমুখ। স্কুল থেকে লম্বা মিছিলটি নিয়ে সাগরপাড়া হয়ে আলুপট্টির মোড় ঘুরে জুবিলী স্কুলে ছেলে মেয়েদের নিয়ে ভুবনমোহন পার্কে উপস্থিত হয়।

সেখানে ছাত্র ভাইদের সঙ্গে বক্তব্য রাখেন মনোয়ারা বেগম, ডাঃ মহসিনা বেগম প্রমুখ। তাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা জনগণকে অশ্রুসিক্ত করে তোলে।[১৬৫] তাছাড়া রাজশাহী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হাসনা বেগম (যিনি ছাত্রীদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন), শামছুননাহার (মুহাম্মদ একরামুল হকের স্ত্রী) বেগম, জাহানারা বেগম ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বেগম জাহানারা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক।[১৬৬]

উল্লেখ্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নির্মিত 'রাজশাহীতে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের নামফলক'- এ যেসব নারীদের নাম রয়েছে তারা হলেন রাজশাহী কলেজের জাহানারা বেগম বেগু, রাজশাহী মেডিকেল স্কুলের মহসিনা বেগম, জেরিনা বেগম ও কুলসুম বেগম এবং তৎসঙ্গে পি.এন. গার্লস স্কুলের মনোয়ারা বেগম, হাফিজা বেগম টুকু, হাসিনা বেগম ডলি, রওশন আরা খুকু।[১৬৭]

তাছাড়া ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে কুমিল্লায় ২৫ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মিস সাবিহা খাতুনের সভানেত্রীত্বে কুমিল্লার স্কুল কলেজের ছাত্রীদের এক সভা হয় সেখানে পুলিশ জুলুমের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোসহ তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।[১৬৮]

---

১৬৫. তসিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮-১১৯

১৬৬. মুহাম্মদ একরামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬ ও ৪৫-৪৬

১৬৭. *ভুবনমোহন পার্ক*, রাজশাহী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ উদ্ধৃত মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫

১৬৮. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

এছাড়া যে সব নারী ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন তার মধ্যে ১৯৪৮ সালে গড়ে উঠা নারী সমিতির সম্পাদিকা নিবেদিতা নাগ অন্যতম। তিনি আন্ডার গ্রাউন্ডে থাকা অবস্থায় ভাষা আন্দোলনের জন্য কাজ করেন। সিলেটে প্রীতিরানী দাশ পুরকায়স্থ, বদরুন্নেসা আহমেদ, বরিশালের পুষ্পগুহ, ঢাকার মেডিকেল স্কুলের ছাত্রী নেপিশা বেগম, কুর্মিটোলা স্কুলের ছাত্রী সাহারা খাতুনসহ আরো অনেকে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[১৬৯]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে শোষণ করে আসছিল। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্যবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করতে শুরু করে। গড়ে তোলে সংগঠন। ধীরে ধীরে শোষণের বিরুদ্ধে তাদের এ প্রতিবাদ আন্দোলনে রূপ নেয়। রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করেই তাদের প্রথম আন্দোলন সংগ্রাম শুরু হয়। এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা বিশেষ করে ছাত্রীরাও রাজপথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ভাষা আন্দোলনে নারীদের এ ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ পূর্ব বাংলার আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষপটে ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

ভাষা আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ধীরে ধীরে এ আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর লেখনী প্রচেষ্টার মাধ্যমে এর বুনিয়াদ রচনা হয়। এ লেখনী প্রচেষ্টায় নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারা প্রবন্ধ চিঠিপত্র, সম্পাদকীয় প্রভৃতির মাধ্যমে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব রাষ্ট্রভাষা করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। দেশ বিভাগোত্তর পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যে স্মারকলিপির মাধ্যমে দাবি জানানো হয় সেখানেও নারীরা স্বাক্ষর প্রদান করে। ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে লিলি খান ও আনোয়ারা খাতুনও ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীগণ অধিকাংশ ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের। অল্পসংখ্যক নারী ছিলেন উচ্চবিত্ত শ্রেণির। তবে নিম্নবিত্তের অংশগ্রহণ তেমনভাবে ছিল না। যারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন তারা পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বন্ধু-বান্ধব রাজনৈতিক কর্মী ও রাজনৈতিক দলের ছাত্রী শাখার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

প্রথমদিকে এ আন্দোলন শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তারা প্রথমদিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। কিন্তু পরবর্তীতে এ দাবিকে কেন্দ্র করে তারা রাজপথে নামে। এ পর্যায়ে শুধু শিক্ষিত শ্রেণি নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির মনে প্রভাব ফেলে। ভাষা আন্দোলন কেবল

---

১৬৯. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, ৬৪ ও ৬৫, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০, ৬৩, ৯৪ ও ১১৯

ঢাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল না, দেশের প্রতিটি জেলা ও মহকুমায় তা ছড়িয়ে পড়ে। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। যদিও সে সময় সমাজের অনগ্রসরতা, কুসংস্কার প্রভৃতি কারণে নারী শিক্ষার হারও ছিল কম। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজগুলোতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। তাছাড়া সমাজের রক্ষণশীলতা, প্রতিবন্ধকতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কঠোর বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনে ছাত্রসহ বিভিন্ন শ্রেণির পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

ভাষা আন্দোলনে নারীদের একাংশ অংশগ্রহণ করেছিল প্রত্যক্ষভাবে। তারা সভা সমাবেশ মিছিল, প্রতিবাদ সভা, বক্তৃতা ও নানারকম সাংগঠনিক দাপ্তরিক কাজে পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো এলাকায় স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কোনো কোনো স্থানে শিক্ষিকা সরাসরি ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। কেউ কেউ ছাত্রীদের সংগঠিত করে মিছিলে নিয়ে গিয়েছেন। নারী সংগ্রাম কমিটিতে থেকে আন্দোলন পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছেন। বিধান পরিষদে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন।

অনেকে পরোক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনকে সফল করতে সহযোগিতা করেছেন। ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত নেতাকর্মীদের আশ্রয় দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল নারী আন্দোলনকারীদের তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ ও অর্থ সাহায্য করে সহযোগিতা করেছেন।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার জন্য নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা মিছিল মিটিং সমাবেশ করে এবং পরবর্তী সংগ্রামে নারীবৃন্দ জোরালো ভূমিকা রাখে। ১৯৫২ সালে তাদের ভূমিকা ছিল অনন্য। তারা মিছিল মিটিং অংশগ্রহণ ছাড়াও কর্মী সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আন্দোলনকে সফল করার জন্য নারীবৃন্দ প্রচার-প্রচারণা ও পোষ্টার লিখন প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ করে। ১৯৫২ পরবর্তীতেও ভাষা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

ভাষা আন্দোলন নারীদের অংশগ্রহণে সামগ্রিকতা লাভ করে। কারণ পূর্ব বাংলার নারীরা ছিলেন মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তা বোধ দৃঢ় হয়। যার ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজতি করতে সক্ষম হয় যুক্তফ্রন্ট। জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ সম্পর্কে সচেতন হয়। পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের দাবি সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফলে ১৯৬৬ -এর ৬ দফা দাবি প্রণীত হলে জনগণ তাদের প্রাণের দাবি হিসেবে মেনে নেয়। ছাত্রদের ১১ দফা তার প্রেক্ষিতে ১৯৬৯- এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭০- এর নির্বাচনে বিপুল রায় বাংলাদেশ সৃষ্টিকে অনিবার্য করে তোলে। কাজেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল যা বাংলাদেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং পরবর্তীতে আন্দোলন সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ও নারীসমাজ

পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এটি ছিল সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত প্রথম অবাধ নির্বাচন। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য এ অঞ্চলের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলামী 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনি জোট গঠন করেছিল। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সংখ্যালঘু আসনগুলোর জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী গণসমিতির নেতৃত্বে অভয়াশ্রম (কুমিল্লা) ও পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল একত্র হয়ে 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে নির্বাচনে অংশ নেয়। আর এ কারণেই ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচনটি 'যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন' নামেও পরিচিতি লাভ করে। বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি এবং বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানি শাসকদের ছয় বছরের শোষণের বিরুদ্ধে এ নির্বাচন ছিল একটি ব্যালট বিপ্লব। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে ব্যালটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে। যদিও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের ফলে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেও বেশি দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। তথাপি এ নির্বাচন ও এর ফলাফলকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। কারণ এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি এবং যুক্তফ্রন্টের 'ভূমিধস বিজয়' (Landslide victory) ছিল মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয়। এ বিজয়ের ফলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরো সুদৃঢ় হয় এবং রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করে। এ জাতীয়তাবাদী চেতনাই পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে বিকশিত হয়ে প্রথমে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন ও পরিশেষে স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়। সর্বশেষ একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। আর এ কারণেই বাঙালির জাতীয় জীবনে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৫৪ সালের এ নির্বাচনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল এতে নারীসমাজের অংশগ্রহণ। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় সূচিত প্রতিটি প্রতিবাদী আন্দোলনে নারীদের সোচ্চার ভূমিকায় দেখা যায়। এক কথায় বলতে গেলে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরো ধারাতেই বাংলার নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। রাষ্ট্রভাষা

আন্দোলন যে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্ধারণের আন্দোলন– এ সত্য তৎকালীন বাঙালি নারীসমাজ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ফলে কেবল ঢাকা শহরেই নয়, সারা বাংলাতেই নারীরা এ আন্দোলনে অংশ নেন। বর্তমান অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এতদবিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরবর্তী ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে ১২টি সংরক্ষিত নারী আসন রাখা হয়েছিল। এর বাইরে সাধারণ আসনেও নারীদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ অবারিত রাখা হয়। এরূপ বাস্তবতায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, স্বাধিকার অর্জন, রাজবন্দিদের মুক্তি, দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করা এবং মুসলিম লীগ সরকারের নারী জাগরণ বিরোধী দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে পূর্ব বাংলার নারীরা এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নারীদের কেউ কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হয়, অনেকেই নিজ দল ও জোটের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেয় এবং পছন্দের প্রার্থীদের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন একটি বহুল চর্চিত বিষয়। তবে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা, গবেষণা, লেখালেখি হলেও এ নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ এবং তাদের ভূমিকা সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। অথচ এ বিষয়ে আলোচনা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। এরূপ বাস্তবতায় আলোচ্য অধ্যায়ে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনা থাকলেও মূল মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা হয়েছে এ নির্বাচনে নারীসমাজের অংশগ্রহণের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে উপর।

৪.১: ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পটভূমি

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সাথে বাংলা প্রদেশও বিভক্ত হয়। খণ্ডিত বাংলার পূর্ব অংশ সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয়। এভাবেই পূর্ব বাংলা বাঁধা পড়ে নতুন এক ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশে। অবিভক্ত বাংলায় সর্বশেষ প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। এতে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়লগ্নে ঘোষিত 'Provincial Legislative Assembly Order, 1947' অনুসারে অবিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চল থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যে পরিণত হন। প্রাদেশিক পরিষদের মেয়াদকাল যেহেতু পাঁচ বছর ছিল সে হিসেবে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের পরবর্তী নির্বাচন ১৯৫২ সালে নির্ধারিত ছিল। পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রাদেশিক নির্বাচন যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। কিছুটা বিলম্ব হলেও সিন্ধু প্রদেশে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়।[১] কিন্তু পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকার নানা টালবাহানা শুরু করে। উল্লেখ্য যে, এ সময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের ৩৪ টি আসন (মোট আসনের প্রায়

১. M. Zavaid Akhtar, Sajid Mahmood Awan & Suja-ul-Haq, 'Elections of Pakistan and Response of Social Scientists: A Study of Theoretical Understandings', *Pakistan Journal of Social Sciences*, Vo. 30, No. 2, Dec, 2010, p. 457

এক পঞ্চমাংশ) শূন্য হয়ে যায়। কিন্তু সরকার এসব শূন্য আসন পূরণের জন্য কোনো উপনির্বাচনেরও ব্যবস্থা করেনি। এর কারণ ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের একটি উপনির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগের তরুণ প্রার্থী জনাব শামসুল হক চৌধুরীর কাছে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা জমিদার খুররম খান পন্নীর শোচনীয় পরাজয়ের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য যে টাঙ্গাইলের এ আসনটিতে দু'বার উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমবারের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। কিন্তু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী খুররম খান পন্নীর একটি অভিযোগের কারণে নির্বাচন কমিশন সে উপনির্বাচন বাতিল করে পুনরায় উপনির্বাচন আয়োজন করেছিল। এ নির্বাচনে মওলানা ভাসানী প্রার্থী না হয়ে শামসুল হককে প্রার্থী করেন এবং নির্বাচনে জিতিয়ে আনেন।[২] টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে পরাজয়ের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জনসমর্থনহীনতা প্রমাণিত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ সরকার সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে আর কোনো উপনির্বাচন আয়োজনের পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে ৩৪ টি আসন খালি হয়ে পড়ে। এদিকে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন আয়োজনের জন্য গণদাবি জোরদার হলে, স্বাধীন পাকিস্তানে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে –এ যুক্তিতে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৬১ (২) নং ধারা সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পূর্ব বাংলার পরবর্তী প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার সে কথাও রাখেনি। সরকারের পক্ষ থেকে যথাসময়ে নির্বাচন আয়োজন করতে না পারার যুক্তি হিসেবে কয়েকটি আসনে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতার কথা বলা হয়। উল্লেখ্য যে, সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে এইচ এস এম ইসহাককে চেয়ারম্যান এবং এনায়েতুর রহমান ও এমদাদ আলীকে সদস্য করে একটি Delimitation of Constituencies গঠন করা হয়েছিল। এ কমিটি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করতে বিলম্ব করায় ১৯৫৩ সালের ঘোষিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি বলে সরকারের তরফ থেকে বলা হয়।[৩] এ অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সরকারের অনুরোধে পাকিস্তান গণপরিষদ 'The East Bengla Legislative Assembly (Continuation) Act 1953 প্রণয়নের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের মেয়াদ আরো এক বছর বৃদ্ধি করে। এভাবে বহু টালবাহানার পর অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়।

৪.২: নির্বাচন পদ্ধতি

১৯৫৪ সালের নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার ও স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী এ দুই নীতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনটি আয়োজনের জন্য ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৩৫ সালের

---

২. এতদবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*, University of Dacca, 1980, pp. 85-88 গ্রন্থে।

৩. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954*, Dhaka, (Secretary, Bangladesh Election Commission), May, 1977, pp. 2-3

ভারত শাসন আইনের নির্বাচন সংক্রান্ত বিধির পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে–

ক. এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২১ বছর বয়স্ক সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে;

খ. অমুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে পৃথক নির্বাচনি ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে;

গ. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের আসন সংখ্যা হবে ৩০৯[৪] এবং এর বিন্যাসক্রম হবে নিম্নরূপ:[৫]

ক্রমিক	সম্প্রদায়	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত নারী আসন	মোট আসন
১.	মুসলিম	২২৮	০৯	২৩৭
২.	সাধারণ (বর্ণ হিন্দুসহ)	৩০	০১	৩১
৩.	তফসিলি হিন্দু জাতি	৩৬	০২	৩৮
৪.	বৌদ্ধ	০২		০২
৫	খ্রিস্টান	০১		০১
১২ টি সংরক্ষিত আসনসহ মোট ৩০৯টি				

৪.৩: সংরক্ষিত নারী আসন ও এর পরিচিতি

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচনে ৯টি মুসলিম এবং ৩টি অমুসলিম সংরক্ষিত আসন মিলে যে ১২টি সংরক্ষিত নারী আসন ছিল নিম্মরূপ:

মুসলিম নারী আসন: ১. দিনাজপুর-কাম-রংপুর-বগুড়া (সংসদীয় আসন নং-২৯৮); ২. রাজশাহী-কাম-পাবনা (সংসদীয় আসন নং - ২৯৯); ৩. ফরিদপুর-কাম-কুষ্টিয়া (সংসদীয় আসন নং -৩০০); ৪. বাকেরগঞ্জ (সংসদীয় আসন নং- ৩০১); ৫. ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ (সংসদীয় আসন নং -৩০২); ৬. ঢাকা নগরী পশ্চিম (সংসদীয় আসন নং -৩০৩); ৭. ময়মনসিংহ (সংসদীয় আসন নং -৩০৪); ৮. ত্রিপুরা-কাম-সিলেট (সংসদীয় আসন নং- ৩০৫); ৯. চট্টগ্রাম-কাম-নোয়াখালী (সংসদীয় আসন নং -৩০৬)।

সাধারণ হিন্দু নারী আসন: সাধারণ হিন্দু নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল একটি এবং সারা পূর্ব বাংলাকে নিয়ে এ আসনটির ব্যাপ্তি ছিল। একে ৩০৭ সংসদীয় আসন হিসেবে পরিচিতি প্রদান করা হয়।

তফসিলি হিন্দু নারী আসন: তফসিলি হিন্দুদের সংরক্ষিত নারী আসন ছিল ২টি। **১.** ঢাকা-কাম-চট্টগ্রাম বিভাগ (সংসদীয় আসন নং -৩০৮) এবং ২. রাজশাহী বিভাগ (সংসদীয় আসন নং -৩০৯)।[৬]

---

৪. পূর্ব বাংলার প্রথম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭১ জন। এর মধ্যে ১৪১ জন ছিল পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত। সিলেট জেলা পূর্ব বাংলার সাথে যুক্ত হওয়ায় সেখানকার নির্বাচিত ৩০ জন সদস্য যুক্ত হয়। তাতে মোট সদস্য দাঁড়িয়েছিল ১৭১। Najma Chowdhury, *op.cit*, pp.17-19

৫. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954*, p. 2

৬. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954,*, pp.72-73

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৩৫ সালে ভোটাধিকার সম্পর্কিত গোলটেবিল বৈঠকে গণপরিষদে নারীদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষিত আসনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের দুই সদস্য জাহানারা শাহনেওয়াজ ও শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ পাকিস্তান গণপরিষদে নারীদের জন্য ১০% সংরক্ষিত আসনের প্রস্তাব উঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে কেন্দ্রীয় গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নারীদের জন্য ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল।[৭] ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ছিল ৩.৮৮ শতাংশ।

১৯৫১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে প্রাদেশিক পরিষদের আসন বিন্যাস করা হয়েছিল। আনুমানিক ১ লক্ষ ৪০ হাজার বা তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার জন্য একটি করে আসন নির্ধারণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী তখন পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪,১৯,৩২,৩২৯ জন। এর মধ্যে নির্বাচনের জন্য তালিকাভুক্ত ভোটার সংখ্যা ছিল মোট ১,৯৭,৪৮,৫৬৮ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ছিল ৯২,৩৯,৭২০জন।[৮] উল্লেখ্য যে, ১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি যাদের বয়স ২১ বছর হয়েছিল তারাই ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ১২টি সংরক্ষিত নারী আসনে ভোটদানের অধিকার ছিল কেবল মিউনিসিপ্যাল এলাকার নারী ভোটারদের। আর সে হিসেবে মিউনিসিপ্যাল এলাকার প্রত্যেক নারী ভোটারের ভোট ছিল দু'টি। একটি নিজ সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থীদের জন্য এবং অন্যটি সংশ্লিষ্ট সংসদীয় সাধারণ আসনের নারী বা পুরুষ প্রার্থীর জন্য। অন্যদিকে মফস্বল এলাকার নারীদের ভোট ছিল মাত্র একটি। এটি তিনি নিজ সম্প্রদায়ের পুরুষ অথবা নারী প্রার্থীদের দিতে পারতেন। উল্লেখ্য যে, নির্বাচনি আইন অনুযায়ী একজন নারী তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত আসনের জন্য যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন, তেমনি সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারও তাঁর ছিল। নির্বাচনি আইনে প্রথমে বিধান করা হয়েছিল যে, একজন নারী যে কোনো আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। তবে তাঁকে অবশ্যই পূর্ব বাংলার তালিকাভুক্ত ভোটার হতে হবে। কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৫৩ সালের ৭ আগষ্ট এ বিধিটি সংশোধন করা হয় এবং নিয়ম করা হয় যে, একজন নারী যে নির্বাচনী আসনে প্রার্থী হবেন, তাঁকে সেখানকার তালিকাভুক্ত ভোটার হতে হবে। নির্বাচনের প্রাক্কালে আকস্মিকভাবে এ বিধি পরিবর্তনের ফলে নারীসমাজে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং তাঁরা নির্বাচন কমিশনের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। এ বিষয়ে ঢাকায় একটি প্রতিবাদ সমাবেশ আহ্বান করা হয়েছিল। এ সমাবেশের মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন নারী নেত্রী আশালতা

---

৭. Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (Ed.). *Women of Pakistan,* Zed Books Ltd., London 1987, pp. 55-56

৮. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954,* p. 22; অবশ্য মোঃ মাহবুবর রহমান *Pakistan, 1953-54,* Karachi, Pak Publication এর সূত্রের উল্লেখ করে ভোটার সংখ্যা ১,৯৭,৩৯, ০৮৬ জন এবং এর মধ্যে নারী ভোটার ১,০৫,৭১,৯৪১ জন বলে উল্লেখ করেছেন। মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা ২০০০, পৃ. ১০৬।

সেন, কবি সুফিয়া কামাল, নূরজাহান মোর্শেদ, দৌলতননেছা, সেলিনা বানু, আনোয়ারা খাতুন, সুফিয়া আহমেদ, মরিয়ম খন্দকার, আমেনা বেগম, লায়লা সামাদ ও লুৎফুন্নেছা প্রমুখ।[৯] এদের মধ্যে কয়েকজন নির্বাচনে প্রার্থীও হয়েছিলেন।

৪.৪: যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মোট ১৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।[১০] উল্লেখ্য যে, ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও অনেক প্রত্যাশা নিয়ে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সাথে জোটবদ্ধ আমলাগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক আচরণ ও পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনসহ সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ব্যাপারে বাঙালির মোহমুক্তি ঘটেছিল। তাই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী মুসলিম লীগসহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সাল থেকেই এদের মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণের উদ্যোগ শুরু হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আলাপ-আলোচনা শুরু করে। বলা হয় যে, বায়ান্নোর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলার রাজনীতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন এসেছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর সাফল্য পূর্ব বাংলায় জোটবদ্ধ রাজনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছিল।[১১] মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ার প্রথম উদ্যোগটি নিয়েছিল যুবলীগ। ১৯৫২ সালের তাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ ও গণতন্ত্রী দল। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নও এ উদ্যোগকে সমর্থন জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জোট গঠনের উদ্যোগ গৃহীত হয়। ১৯৫৩ সালের ১৪-১৫ নভেম্বর ময়মনসিংহের অলকা সিনেমা হলে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এ কাউন্সিল অধিবেশনে নির্বাচনের জন্য বিরোধী দলগুলো নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রশ্নে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়।[১২] তবে শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের

---

৯. মালেকা বেগম, *নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২২

১০. দলগুলো ছিল: মুসলিম আসনে মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী, যুব লীগ, গণতন্ত্রী পার্টি, খেলাফতে রাব্বানী পার্টি প্রভৃতি। আর অমুসলিম দলগুলোর মধ্যে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফসিলি ফেডারেশ, গণ সমিতি, অভয়াশ্রম (কুমিল্লা) এবং পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল। কমিউনিস্ট পার্টির মুসলিম সদস্যরা মুসলিম আসনে এবং হিন্দুরা হিন্দু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

১১. Musharrat Jabeen, Amir Ali Chandio & Zarin Qasim, ‘Language Controversy: Impact on National Politics and Secession of East Pakistan’, *South Asian Studies*, Vol. 25, No. I 2010, pp.99-124

১২. এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৪৫-২৫০; হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ,১৯-২৩

ভিত্তিতে একটি 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মাওলানা আতহার আলীর নেজামে ইসলামী ও হাজী দানেশের গণতন্ত্রী পার্টি ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে সরকার বিরোধী নির্বাচনি জোট 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে।[১৩] বস্তুত যুক্তফ্রন্ট ছিল ডান ও বামপন্থি রাজনৈতিক দলের একটি সমন্বিত জোট। নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করা ছাড়া শরিক দলগুলোর মধ্যে কোনো লক্ষ্য ও আদর্শগত ঐক্য ছিল না। মূলত যুক্তফ্রন্ট ছিল দু'টি বড় দলের সাথে ছোট দু'টি দলের শিথিল কোয়ালিশন বা মৈত্রীজোট। তবে নির্বাচনে বিজয় অর্জনের জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠনের এ কৌশল ছিল সময়োপযোগী ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। এ জোট পূর্ব বাংলার জনগণকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও একটি 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়েছিল। এ ফ্রন্টের প্রধান উদ্যোক্তা ও নেতৃত্বদানকারী সংগঠন ছিল 'গণসমিতি' দল।[১৪] এর সাথে যুক্ত হয়েছিল অভয় আশ্রম (কুমিল্লা) এবং পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল। বলা হয় যে, এ সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট গঠনের পিছনে মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মূল যুক্তফ্রন্টের নেতাদের ইঙ্গিত ছিল। নির্বাচনে মুসলিম আসনগুলোতে মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা সমান সংখ্যায় বিজয়ী হলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের মতো বাস্তবতা দেখা দিলে, সেক্ষেত্রে হিন্দু আসনগুলোর সমর্থন প্রয়োজন হবে -এমন বিবেচনা থেকেই যুক্তফ্রন্টের নেতাদের ইঙ্গিতে সংখ্যালগু যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত।[১৫]

৪.৫: নির্বাচনী ইশতেহার ও যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনি ম্যানিফেস্টো বা ইশতেহার প্রকাশ করেছিল। নির্বাচন উপলক্ষে মুসলিম লীগ একটি দীর্ঘ নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে। ১৯৫৪ সালের ২৭ জানুয়ারি ইশতেহারটি *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ ইশতেহারের প্রধান বক্তব্য ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষা, কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালীকরণ এবং পাকিস্তানের জন্য ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। তবে মুসলিম লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে পূর্ব বাংলার জনমানুষের প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আর্থ-

---

১৩. কামাল উদ্দিন আহমেদ, 'চুয়ান্ন সালের নির্বাচন: স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ', সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, *প্রথম খণ্ড*, *রাজনৈতিক ইতিহাস*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬৯

১৪. গণসমিতি ছিল পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আসা রাজনীতিবিদদের গঠিত একটি দল। জানা যায় যে, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের কতিপয় নেতা দলটির নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের কাছে তাদের এ প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হওয়ায় কংগ্রেস ত্যাগ করে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে তাঁরা 'গণসমিতি' নামে এ রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ দলে কংগ্রেস ত্যাগী নেতারা ছাড়াও সমাজতন্ত্রী দল, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল ফরওয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য সংগঠন থেকে বের হয়ে আসা নেতা-কর্মীরাও যোগ দিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য Najma Chowdhury, *op.cit*, pp.118-120

১৫. মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রতিফলন ছিল না। তাই এ ইশতেহার পূর্ব বাংলার জনমানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। অন্যদিকে নির্বাচনে ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন চিন্তা মাথায় রেখে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা সংবলিত একটি নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করা হয়।[১৬] বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা বিলোপ, পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, বন্যা প্রতিরোধের স্থায়ী ব্যবস্থা, কৃষির আধুনিকায়ন, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, সব কালাকানুন রহিতকরণ, সমন্বিত বেতন কাঠামো প্রবর্তন, দুর্নীতি দমন, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, ভাষা শহীদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষা উন্নয়নের কেন্দ্রে রূপান্তর, ২১ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা এবং পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ছিল এ ইশতেহারের মূল কথা।[১৭] ২১ দফা কর্মসূচি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এতে বৈপ্লবিক কার্যসূচি না থাকলেও এগুলো ছিল মূলত পূর্ব বাংলায় বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি, স্বনির্ভর কৃষক ও শিল্পপতিদেরই কর্মসূচি।[১৮] এ কর্মসূচিতে পূর্ব বাংলার জনমানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। এতে যেমন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ছিল, তেমনি বাঙালি জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিও ছিল। আর এ কারণেরই এ কর্মসূচি পূর্ব বাংলায় ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। উল্লেখ্য যে, মুসলিমদের যুক্তফ্রন্ট ছাড়াও এ নির্বাচনে সংখ্যালঘু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট ও আন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের নিজেদের নির্বাচনি ইশতেহার ছিল।[১৯]

৪.৬: নির্বাচনে নারী প্রার্থী ও তাঁদের পরিচিতি

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সংরক্ষিত ১২টি নারী আসনসহ ৩০৯টি আসনে মোট ১২৮৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এর মধ্যে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ২৩৭ টি আসনে প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১০২৮ এবং ৭২টি অমুসলিম আসনে ২৬৭ জন।[২০] মুসলিম আসনে মুসলিম লীগের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ২৩৭ এবং যুক্তফ্রন্টের ২৩৪।[২১] এ পর্যায়ে প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে এ নির্বাচনে ১২টি সংরক্ষিত নারী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের নাম ও তাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। উল্লেখ্য যে, এ নির্বাচনে ১২ টি সংরক্ষিত নারী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মোট ৩৫ জন। এর বাইরে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন রাজশাহী সদর (পূর্ব) থেকে একজন স্বতন্ত্র নারী প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল Mrs.

---

১৬. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ইশতেহার সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩৭৩-৩৭৫

১৭. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, তথ্য মন্ত্রণালয়*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪

১৮. ২১ দফা কর্মসূচিতে প্রতিফলিত শ্রেণিগত দাবিসমূহের স্বরূপ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে লেনিন আজাদের গ্রন্থে। লেনিন আজাদ, *উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান: রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২২৭

১৯. দ্রষ্টব্য মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭-১১৯

২০. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954,* p. 22

২১. মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

Quamar Begum Roy. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তালিকা মোতাবেক এ আসনের অপর দু'জন প্রার্থী ছিলেন যুক্তফ্রন্টের আবুল কালাম আজাদ মোল্লা ও মুসলিম লীগের জসীমউদ্দিন আহমেদ।[২২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মোঃ মাহবুবর রহমান তাঁর গ্রন্থে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। এতে দেখা যায় যে, নির্বাচনে অরুন্ধতি মণ্ডল নামে একজন নারী প্রার্থী ফরিদপুর উত্তর-পশ্চিম তফসিলী কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।[২৩] তবে নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় উপর্যুক্ত আসনের প্রার্থী হিসেবে অরুন্ধতি মণ্ডলের নাম নেই। সেখানে একমাত্র প্রার্থী হিসেবে নীলকমল সরকারের নাম রয়েছে।[২৪] এ অবস্থায় অরুন্ধতি মণ্ডলের প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে সংশয় প্রকাশের অবকাশ আছে।

এ পর্যায়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়া নারী প্রার্থীদের নাম এবং প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য যে, এ নির্বাচনে মুসলিম আসনে বিজয়ী নারী প্রার্থীরা সকলেই ছিলেন যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী। বিজয়ী এ প্রার্থীদের পরিচিতি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও মুসলিম লীগ দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সম্পর্কে বলতে গেলে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে নিচের পরিচিতিমূলক আলোচনায় তাঁদের নাম ও সংসদীয় আসন উল্লেখ করা হলো:

৪.৭: সংরক্ষিত মুসলিম নারী আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীবৃন্দ

(১) দিনাজপুর-কাম-রংপুর-বগুড়া। এ আসনে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী ছিলেন দৌলতননেছা খাতুন (১৯২২-১৯৯৭ খ্রি:)। বগুড়া জেলার সোনাতোলায় জন্মগ্রহণকারী দৌলতননেছার মাত্র ৮ বছর বয়সে গাইবান্ধার ডাঃ হাফিজুর রহমানের সাথে বিয়ে হয়। নানা বাঁধা সত্ত্বেও তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাস করেন। তিনি সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি বিপ্লববাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ১৯৩২ সালে লবণ আইনভঙ্গের অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২৫] চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট তাঁকে প্রার্থী করে। এ আসনে অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নারী প্রার্থী না থাকায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

(২) মুসলিম নারী আসন রাজশাহী-কাম-পাবনায় যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী ছিলেন সেলিনা বানু (১৯২৬-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ)। ত্রিশের দশকে পর্দা প্রথার যুগে আত্মমর্যাদাসচেতন ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী পাবনায় জন্মগ্রহণকারী সেলিনা বানু কমিউনিস্ট রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ব্রিটিশবিরোধী বিভিন্ন

---

২২. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954,* p. 27

২৩. *দৈনিক আজাদ* ১-২ ফেব্রুয়ারি, উদ্ধৃত, মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

২৪. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954,* p. 69

২৫. তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য গোলাম কিবরিয়া পিনু, *দৌলতননেছা খাতুন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

আন্দোলন সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করেন। আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন এবং মওলানা ভাসানী কর্তৃক ন্যাপ গঠিত হওয়ার পর তিনি ন্যাপের রাজনীতিতে যোগ দেন।[২৬] সেলিনা বানু যুক্তিবাদী বক্তা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন এবং নির্বাচনে জয় লাভ করে প্রাদেশিক পরিষদে তাঁর পরিচয়ের স্বাক্ষর রাখেন। এ আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ প্রার্থী ছিলেন মিসেস শামীম হোসাইন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিসেস নূরজাহান বেগম। তবে এ দু'জন সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না।

(৩) ফরিদপুর-কাম-কুষ্টিয়া আসনে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী ছিলেন বাংলাদেশের শিক্ষাজগত ও রাজনীতিতে সুপরিচিত বদরুননেছা বেগম (১৯২৪-১৯৭৩ খ্রি.)। প্রগতিশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী কিংবদন্তি শিক্ষাবিদ, সামাজিক কর্মী ও রাজনীতিবিদ বদরুননেছা বেগমের দৃঢ়তা, কর্মোদ্যোগ ও আত্মবিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁকে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রিপরিষদে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।[২৭] দেশের বিখ্যাত নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেগম বদরুননেছা সরকারি কলেজ তাঁর স্মৃতির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এ নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুসলিম লীগের মিসেস আয়েশা সরদার।

(৪) সংরক্ষিত নারী আসনগুলোর মধ্যে বাকেরগঞ্জ সংসদীয় আসনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এ আসনে মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৭ জন এবং তাঁরা হলেন- যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী রাজিয়া বানু, মুসলিম লীগের মিসেস উম্মে হাবিবা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মিসেস হোসনে আরা বেগম, মিসেস লুৎফুন্নেছা, বেগম শামসুন্নাহার হামিদুদ্দীন আহমেদ, বেগম জাহান আরা ও মিসেস রাবিয়া হামিদ চৌধুরী।[২৮] তবে তাঁদের পরিচয় প্রদানের মতো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

(৫) ঢাকা-কাম-নারায়ণগঞ্জ সংসদীয় আসনে মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৩ জন। এদের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী ছিলেন নূরজাহান মোর্শেদ (১৯২৪-২০০৩ খ্রি.)। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ, নারীমুক্তি আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে সুপরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণকারী নূরজাহান মোর্শেদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর স্বামী অধ্যাপক খান সারওয়ার মোর্শেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে নূরজাহান মোর্শেদ রাজনীতিতে সক্রিয় হন এবং দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হন। তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকুরি করতেন।[২৯] স্বাধীন বাংলাদেশে নারী মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু যে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেছিলেন নূরজাহান মোর্শেদ এর

২৬. হেনা দাস, *নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৪

২৭. *The Daily Star,* April 25, 2018

২৮. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954,* p. 72

২৯. সেলিনা হোসেন, মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৮০০-৮০১

অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তাছাড়া ১৯৭৩ সালে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের মন্ত্রিপরিষদে সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩০] যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুসলিম লীগ প্রার্থী মিসেস শামসুন্নাহার এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মিসেস হাসনুর রশীদ।

(৬) ঢাকা নগরী পশ্চিম। এ আসনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন আনোয়ারা খাতুন (১৯১৮-১৯৮৮)। ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণকারী আনোয়ারা খাতুনের স্বামী ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস প্রেসিডেন্ট আমজাদ খান। আনোয়ারা খাতুন ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে তিনিই ছিলেন প্রথম নির্বাচিত মুসলিম নারী সদস্য। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও তিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি শিক্ষার্থীদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে তিনি প্রাদেশিক পরিষদে সাহসী বক্তব্য রাখেন এবং অধিবেশন বর্জন করেন।[৩১] চুয়ান্নর নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী বেগম আকতার জাহান।

(৭) ময়মনসিংহ সংরক্ষিত নারী আসনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন মেহেরুন্নেছা খাতুন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম নারী আইনজীবী ছিলেন। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের প্রখ্যাত রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা খান বাহাদুর আব্দুল গোফরান ছিলেন অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রীপরিষদ সদস্য। এ আসনে মেহেরুন্নেছা খাতুনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুসলিম লীগের মিসেস মমতাজ বেগম এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মিসেস নাজমুন্নেসা আজিজ ও মিসেস রহিমা আক্তার।[৩২]

(৮) ত্রিপুরা-কাম-সিলেট সংরক্ষিত আসনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এ আসনে মোট প্রার্থী ছিল ৫ জন। এদের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন আমেনা বেগম (১৯২৫-১৯৮৯)। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের নেত্রী ছিলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদসহ শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের যখন গ্রেপ্তার করা হয়, সে সময় ১৯৬৬ সালের ২৭শে জুলাই আমেনা বেগমকে দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দলের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমেনা বেগম স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার চাপ সৃষ্টি করেন ও আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলেন। তিনি ছয় দফা কর্মসূচি আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের এগারো দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[৩৩] ১৯৭০ এর কাউন্সিলে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ দাবি করেছিলেন। কিন্তু তা না করায় পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন ও আতাউর রহমান

---

৩০. মমতাজ বেগম, মফিদা বেগম, *স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারী*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা ২০১৮, পৃ. ৫৯

৩১. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪-১৫৫

৩২. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954,* p.72

৩৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমি, ২০১৭, পৃ. ২৯২

খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নতুন দল জাতীয় লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৮৪ সালে এ দলের সভাপতি হন।[৩৪] চুয়ান্নর নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা ছিলেন মুসলিম লীগ দলীয় মিসেস সাইদা জাহানারা, স্বতন্ত্র প্রার্থী মিসেস হেলেনা বেগম, মিসেস জোবেদা খাতুন চৌধুরী ও মিসেস রাজিয়া বেগম।[৩৫] এদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী জোবেদা খাতুন চৌধুরী (১৯০১-১৯৮৬ খ্রি.) একজন সুপরিচিত রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম নারী যিনি অবরোধের দেয়াল ডিঙিয়ে প্রকাশ্যে রাজনীতিতে পা রাখেন।[৩৬] ১৯২৭ সাল থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৪৩ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। মুসলিম লীগ রাজনীতিতে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগ হতে প্রার্থী হতে চান। কিন্তু মুসলিম লীগ থেকে তাঁকে প্রার্থী না করায় তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং পরাজিত হন।[৩৭]

(৯) চট্টগ্রাম-কাম-নোয়াখালী আসনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন তোফাতুন্নেছা। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। নির্বাচন কমিশনের রির্পোট অনুযায়ী তিনি চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লার অধিবাসী ছিলেন। এ আসনে তোফাতুন্নেছার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুসলিম লীগ প্রার্থী মিসেস নুরুল ইসলাম ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ডাঃ নুরুন্নাহার।[৩৮]

৪.৮: সংরক্ষিত অমুসলিম নারী আসন

সংরক্ষিত অমুসলিম নারী আসন ছিল ৩টি। (১) সাধারণ (বর্ণ হিন্দুসহ) আসন। এ আসনে প্রার্থী ছিলেন পূর্ব বাংলা কংগ্রেসের নেত্রী নেলী সেনগুপ্তা (১৮৮৬-১৯৭৩)। নেলী সেনগুপ্তা ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রেডারিক গ্রে ও এডিথ হেনরিয়েটা গ্রে দম্পতির কন্যা নেলী সেনগুপ্তা ভারতবর্ষের কংগ্রেস নেতা বিপ্লবী ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রে ভারতে আসেন এবং স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেস রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। নেলী সেনগুপ্তা ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে চট্টগ্রামে খদ্দর বিক্রয় করার সময় প্রথম গ্রেপ্তার হন। পরে ১৯৩০ সালে আবার দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার হয়ে দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হন। স্বামীর আসন চট্টগ্রাম থেকে ১৯৪৬ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে সাধারণ বর্ণ হিন্দু আসন থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন।[৩৯]

(২) রাজশাহী বিভাগ তফসিলি নারী আসন: এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ছিলেন ৩ জন। এরা হলেন মিসেস বিন্দুবাসিনী সরকার, মিসেস বীণাপানি সরকার ও মিসেস কনিকা রায়। এ তিনজন প্রার্থী সম্পর্কে

৩৪. http://bn.banglapedia.org/index.php?
৩৫. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954*, p.73
৩৬. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, প্রিপ্ট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৯৭
৩৭. তাজুল মোহাম্মদ, *জোবেদা খাতুন চৌধুরী*, *সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৬
৩৮. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954*, p.73
৩৯. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০৪-৮০৫

বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। নির্বাচন কমিশন রির্পোট মতে বিজয়ী বিন্দুবাসিনী সরকার ছিলেন পাবনার অধিবাসী এবং তাঁর প্রযত্ন হিসেবে বাবু সুনীল কুমার সরকারের নাম রয়েছে।[৪০]

(৩) ঢাকা-কাম-চট্টগ্রাম বিভাগের তফসিলি নারী আসন থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন নিবেদিতা মণ্ডল। বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া গেলেও জানা যায় যে, তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল তদানিন্তন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলে।

৪.৯: নির্বাচনী প্রচারণা ও নারীসমাজ

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা শুরু করেছিল। তবে এ এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ অপেক্ষা যুক্তফ্রন্টের প্রচারণা ছিল অধিক সুসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। উল্লেখ্য যে, নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলার শিক্ষক, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক তথা আপামর জনসাধারণের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্বাচনি প্রচার ইস্যু হিসেবে ফ্রন্ট 'বাংলাকে' রাষ্ট্রভাষার দাবি এবং পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারকে প্রাধান্য দেয়। তাছাড়া ফ্রন্ট আঞ্চলিক বৈষম্য ও শোষণের নীতি ও শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, পাটশিল্প জাতীয়করণ, সমবায় ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সাহায্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসে। অপরদিকে মুসলিম লীগ তার নির্বাচনি ইশতেহার বা প্রচারণায় গণমুখী কোনো ইস্যু তুলে ধরতে পারেনি। ভোটারদের কাছে মুসলিম লীগের একমাত্র বক্তব্য ছিল, তারা ইসলামিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। মুসলিম লীগের নির্বাচনী শ্লোগান ছিল দু'টি। একটি 'ইসলাম বিপন্ন', দ্বিতীয়টি 'পাকিস্তান বিপন্ন'। মুসলিম লীগের নির্বাচনি প্রচারণায় পূর্ব বাংলার জনগণের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়। এর ফলে জনগণের কাছাকাছি পৌঁছাতে এ দলটি ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে পূর্ব বাংলার মানুষের ভাবাবেগের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুসহ যুক্তফ্রন্ট সমসাময়িক লবণ সংকটের বিষয়টিও সামনে নিয়ে আসে এবং সরকারকে ঘায়েল করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগ সরকারকে 'গণবিরোধী', দুর্নীতিপরায়ণ' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় ফেলে দেয়। ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের প্রচারণায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ সরকারের ব্যর্থতাসহ বাংলা ভাষার প্রতি সরকারে বৈরী মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সময় যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক 'জালেম শাহীর ছয় বছর' নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ ও ব্যাপক প্রচার করা হয়।[৪১] লক্ষণীয় যে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে যে যুবক, ছাত্র তরুণরা মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করেছিল, তারাই এবার যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে এ অঞ্চলের গণজোয়ার সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব

---

৪০. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954,* p.73

৪১. পুস্তিকাটি সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র*, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৭৬-৩৮৬

পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্য সুদূর লোকালয়ে কাজ করে। পূর্ব বাংলার খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, এ কে ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ব্যাপক নির্বাচনি প্রচারাভিযান চালান। যুক্তফ্রন্টের এ প্রচার কৌশল ভোটার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং এর নির্বাচনি প্রতীক নৌকার পক্ষে জনজোয়ার সৃষ্টি হয়।

এ নির্বাচনি প্রচার কাজে নারীসমাজেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়। ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজবন্দিদের মুক্তি, দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করা ইত্যাদি দাবিকে সমানে রেখে পরিচালিত যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রচারণায় এদেশের নারীসমাজ উৎসাহভরে অংশগ্রহণ করে। তারা যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে এ নির্বাচনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার নারীসমাজের উপর নানা রকমের নিবর্তনমূলক আইন ও কার্যক্রমের মাধ্যমে নারী জাগরণ বিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল। এতে পূর্ব বাংলার প্রগতিমনস্ক নারীসমাজ সরকারের প্রতি চরমভাবে অসন্তুষ্ট ছিল। এ অসন্তুষ্ট নারীরা এবার সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এ নির্বাচনি তৎপরতায় যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। তারা এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনসংযোগের উদ্দেশ্যে নির্বাচনি প্রচারণা ও প্রার্থীদের এজেন্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচারণায় আরতি (দাশ) দত্ত, চিত্রা বিশ্বাস, প্রণতী দাশ, ড. হালিমা খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌস, লতিকা এন. মারাক, রনিলা বানোয়ারী, যাদুমণি হাজং, রওশন হাসিনা, কাজী আজিজা ইদ্রিস, রোকেয়া মাহবুব, হোসনে আরা ইসলাম (বেবী), আফতাবুন নাহার, মজিরননেছা ও ফাতেমা চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়।[৪২] যুক্তফ্রন্টের সভা সমিতি ও আলোচনা সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন নারী ছিলেন লায়লা সামাদ (১৯২৮-১৯৮৯ খ্রি.)। তিনি ছিলেন একজন কথাসাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও সংস্কৃতি কর্মী। তবে সব চাপিয়ে সাংবাদিক হিসেবও তাঁর একটি বড় পরিচয় ছিল। তাঁকে বাংলাদেশের নারী সাংবাদিকতার একজন অগ্রপথিক হিসেবে গণ্য করা হয়। সাংবাদিক হিসেবে তিনি দৈনিক সংবাদ, চিত্রালী, পূর্বদেশ ও দৈনিক বাংলায় এবং সম্পাদক হিসেবে সাপ্তাহিক বেগম, মাসিক অনন্যা ও পাক্ষিক বিচিত্রায় কাজ করেন। সমাজসেবায়ও তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। অবিভক্ত ভারতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিরও তিনি সক্রিয় সংগঠক ছিলেন।[৪৩] ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় মওলানা ভাসানী তাঁকে দিনাজপুরের নির্বাচনি এলাকা থেকে প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দিনাজপুর এলাকার ভোটার তালিকায় তাঁর নাম না থাকায় তিনি প্রার্থী হতে পারেননি।

---

৪২. রোকেয়া কবীর, মুজিব মেহদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫৯
৪৩. সেলিনা হোসেন, মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, *২য় খণ্ড*, মাওলা ব্রাদাস, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৭৫

তবে নিজে প্রার্থী হতে না পারলেও লায়লা সামাদ যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৪৪]

যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণকারী আরেক নারী ছিলেন ভাষাসংগ্রামী, শিক্ষাবিদ ও শিশু সাহিত্যিক হালিমা খাতুন। নির্বাচনে তিনি নূরজাহান মোর্শেদের পক্ষে তাঁর নির্বাচনি এলাকা ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ বন্দর এলাকায় ব্যাপক প্রচার কার্যে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিতকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[৪৫] নূরজাহান মোর্শেদের পক্ষে প্রচারণায় অংশ নেওয়া আরেকজন নারী ছিলেন মরিয়ম বেগম। তিনি গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, সমাজসেবী ও সমকালীন প্রগতিশীল গণআন্দোলনের প্রথমসারির নেত্রী ছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পূর্বে তিনি যুক্তফ্রন্টে যোগ দেন এবং নির্বাচনী প্রচারণাসহ ফ্রন্টের অন্যান্য সাংগঠনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।[৪৬]

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি সুফিয়া কামালও (১৯১১-১৯৯৯ খ্রি.) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। সুফিয়া কামাল কখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। তবে তিনি একজন রাজনীতি-সচেতন মানুষ ছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের আইনসভা নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীদের সমর্থনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ সময় তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, নারীরা প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হবেন, দেশের ও মানুষের কথা বলবেন, নারীদের জন্য আইন প্রণয়ন করবেন। নারীদের আইন পরিষদে সদস্য হিসেবে প্রেরণের লক্ষ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণায় তিনি সে সময় রাজপথে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন এবং এ কাজে অন্যান্য নারীদের যুক্তকরণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।[৪৭]

কুষ্টিয়া-যশোর এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থী বদরুননেছা বেগম তাঁর নির্বাচনি এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ করেছিলেন। নির্বাচনি প্রচারণায় তাঁর সাথে কাজ করেন খুলনার ভাষা সংগ্রামী রোকেয়া মাহবুব। এছাড়াও তাঁর প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন তাইবুন নাহার। কবিরত্ন খ্যাত এ নারী খুলনায় নির্বাচনি প্রচারণার সময়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে পরিচিত হন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। পরে বঙ্গবন্ধু তাঁকে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি করেছিলেন। খুলনা করোনেশন গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিস সুফিয়া আলী ও একই স্কুলের শিক্ষিকা রিজিয়া খানমও বদরুননেছা বেগমের নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন।[৪৮]

---

৪৪. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪-৫৫

৪৫. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১২-৭১৩; ফরিদা আখতার, সীমা দাস সীমু, সাইদা আখতার (সম্পা.) *শত বছরের শত নারী*, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৬

৪৬. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৫

৪৭. মালেকা বেগম, 'সর্বজনীন নেত্রী ও মুক্তিযুদ্ধে অবদান', *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৩ অক্টোবর, ২০১৮

৪৮. মমতাজ বেগম, মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫-৭৬

চট্টগ্রাম-নোয়াখালী নির্বাচনি এলাকার প্রার্থী ছিলেন তোফাতুন্নেসা। তাঁর পক্ষে কাজ করেন চট্টগ্রাম নারী সমিতির সভাপতি সালেহা খাতুন। সালেহা খাতুনের উৎসাহে চট্টগ্রাম নারী সমিতি ও পূর্ব পাকিস্তান নারী সংসদ, চট্টগ্রাম শাখা নির্বাচনি প্রচারণা ও অন্যান্য কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংগঠন দু'টির সদস্য জওশন আরা রহমানও নির্বাচনি প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর নামে প্রচার ও পোস্টার লাগানোর দায়িত্ব পালন করেন।[৪৯]

রাজশাহী থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী সেলিনা বানুর একজন উল্লেখযোগ্য প্রচার সংগঠক ছিলেন জান্নাতুল ফেরদৌস। তিনি ঐ নির্বাচনি এলাকায় নারী ভোটারদের সংগঠিত করার কাজ করেন। জান্নাতুল ফেরদৌসকে সেলিনা বানু তাঁর এলাকার একটি কেন্দ্রের এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিলে তিনি উৎসাহ নিয়ে সে দায়িত্ব পালন করেন।[৫০] নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তিনি সেলিনা বানুর উৎসাহে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ঢাকায় প্রচার কাজে অংশ নিয়েছিলেন মালেকা খান। বর্তমান গবেষকের সাথে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে আমরা নৌকার পক্ষে ভোট চাইতাম, আমি ছিলাম খালেদা ফেন্সী খানমের সাথে (ড. কুদরত-ই-খোদার মেয়ে)। আমাদের সাথে আরো ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রোজী সুলতানা"।[৫১] মালেকা খান বদরুননেছা বেগমের সাথেও তাঁর নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেত্রী সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুনও এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন।

যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি ও প্রচারণাসহ নির্বাচনি কার্যক্রমের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন রংপুরের লিচু বাগান স্কুলের শিক্ষিকা নিলুফার আহমেদ ডলি। নির্বাচনি কাজে তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি রংপুরের বদরগঞ্জসহ এবং মাহিগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকায় সাঁওতালদের মাঝেও প্রচার কাজ করেছিলেন।[৫২]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনি প্রচারণায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করেছিলেন ঊষারাণী চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন বরিশালের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মনোরমা বসুর অনুসারী। কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশমতো যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন তৎকালীন ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রী নেপিশা বেগম এবং সাহারা খাতুন।[৫৩] এছাড়াও যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচার কাজে অংশগ্রহণকারী অন্যান্যদের মধ্যে

---

৪৯. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩
৫০. *ঐ*. পৃ. ১১৭-১৭১
৫১. গবেষক কর্তৃক গৃহীত মালেকা খানের সাক্ষাৎকার, ২৮.০৬.২০১৯
৫২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮ ও ৫৯
৫৩. *ঐ*, পৃ. ৪, ৯৪ ও ১১৯

ছিলেন রওশন হাসিনা, হোসনে আরা ইসলাম বেবী (স্থপতি মাজহারুল ইসলামের স্ত্রী), ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য ফাতেমা চৌধুরী প্রমুখ।[৫৪] কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রার্থী ছিলেন সুধাংশু দত্ত। তিনি তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকায় তাঁর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা ও অন্যান্য কাজ পরিচালনা করেছেন তাঁর স্ত্রী আরতি (দাশ) দত্ত। তিনি নিজেও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় নেত্রী ছিলেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিনি নির্বাচনি প্রচারণা ও অফিস পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচনি প্রচারণা চালানো কালেই আরতি দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। একই কারণে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন প্রণতি দাশ (দস্তিদার) নামক আরেক নারী নেত্রী।[৫৫]

উপর্যুক্ত নারীগণ ছাড়াও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম না জানা অনেক ছাত্রী ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপক্ষে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনি তৎপরতায় যুক্ত হয়েছিলেন। সংখ্যায় কম হলেও মুসলিম লীগ প্রার্থীদের পক্ষেও নারীদের নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণ থাকা স্বাভাবিক। নির্বাচনি প্রচারণা চলাকালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গ এবং মুসলিম লীগের অনেক প্রভাবশালী নেতা পূর্ব বাংলা সফর করে লীগ প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার কাজে অংশ নিয়েছিলেন। এমনকি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব বাংলায় আসেন এবং এক পক্ষকাল এখানে অবস্থান করে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেন। পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন জনসভায় ভাষণদানকালে ভোটারদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন যে, "মুসলমান ভোটারদের উচিৎ কমিউনিস্ট ও হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করার জন্য মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দেওয়া।"[৫৬] শুধু তাই নয়, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্মদিন উপলক্ষে ১৯৫৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে পূর্ব বাংলার ভোটারদের উদ্দেশ্য করে মিস ফাতেমা জিন্নাহ বলেন:

> আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আপনাদিগকে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। নির্বাচনের ফলাফলের ওপরই পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ভবিষ্যৎ চিন্তা করুন এবং অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।[৫৭]

ফাতেমা জিন্নাহর সাথে প্রচার কাজে মুসলিম লীগের নারী প্রার্থীগণ ছাড়াও তাঁদের সমর্থক নারীরাও অংশগ্রহণ করে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। তবে এ বিষয়ে কোনো তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না।

৪.১০: নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন এ নির্বাচনে প্রার্থীদের জন্য ২৪টি প্রতীক বরাদ্দ করেছিল। এর মধ্যে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের প্রতীক ছিল হারিকেন এবং

---

৫৪. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১, ১২৫ ও ১২৬
৫৫. *ঐ*, পৃ. ৮৪, ১১৯, ১২০
৫৬. উদ্ধৃত মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪
৫৭. *দৈনিক আজাদ*, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা। ছোট খাট কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং নির্বাচনি সহিংসতায় একজনের মৃত্যুর ঘটনা ছাড়া বলা যায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০৪টি আসনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৫টি আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় তাঁদের আসনে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি।

এ নির্বাচনে প্রদত্ত গড় ভোটের হার ছিল ৩৭.১৯ শতাংশ। সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রদত্ত ভোটের হার ছিল মুসলমান সাধারণ আসনে ৩৭.৬০ শতাংশ, অমুসলিম সাধারণ বর্ণ হিন্দু আসনে ৩৯.১৯ শতাংশ, তফসিলি জাতি হিন্দু আসনে ৩৩.২৬ শতাংশ এবং বৌদ্ধ আসনে ২৮.৮০ শতাংশ। সংরক্ষিত নারী আসনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল- মুসলিম নারী আসনে ৩৭.৫১ শতাংশ এবং তফসিলি হিন্দু আসনে ৩৫.৬২ শতাংশ। মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসনসমূহে প্রদত্ত নারী ভোটের হার ছিল মাত্র ৬.০৬ শতাংশ। সাধারণ বর্ণ হিন্দু আসনে এই হার ছিল ২১.৭৩ শতাংশ, তফসিলি হিন্দু আসনে ১২.৬৪ শতাংশ এবং বৌদ্ধ আসনে এ হার ছিল ১০.৯৭ শতাংশ।[৫৮]

উপরের প্রদত্ত ভোটের হার থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজে যে অভূতপূর্ব জাগরণ তৈরি হয়েছিল, সে তুলনায় ভোট প্রদানের হার সন্তোষজনক ছিল না। অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া ভোটদানের ব্যাপারে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতারও অভাব ছিল। নারী ভোটারদের প্রদত্ত ভোটের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সংরক্ষিত নারী আসনে নারী ভোটারদের ভোট প্রদানের হার মোটামুটি হলেও সাধারণ আসনে তা একেবারেই নগণ্য ছিল। এ নির্বাচনে নারী ভোটারদের কেন্দ্রে যেয়ে ভোট প্রদানে অনীহা দেখা যায়। তদানিন্তন সামাজিক বাস্তবতা এর অন্যতম কারণ ছিল। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে অনেক পুরুষ তাদের পরিবারের নারীদের ভোটকেন্দ্র গিয়ে ভোট প্রদানের অনুমতি দেয়নি। ফলে নারীদের পক্ষে কেন্দ্রে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যারা ভোট কেন্দ্রে গিয়েছিলেন তারাও পর্দা রক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এ সময় পর্দা রক্ষার জন্য তারা এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করে। চারজন যুবক একটা মশারীর চারকোণা ধরে এবং ১৫-২০ জন মহিলা এ মশারীর নিচে ঢুকে, মশারীও চলে মেয়েরাও চলে এভাবে তারা ভোট কেন্দ্রে যায়।[৫৯] এ থেকে নারীদের ভোট প্রদানে সংখ্যা স্বল্পতার কারণ সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

---

৫৮. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954*, pp. 16, 22

৫৯. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৫৭-২৫৮

১৫ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয় এবং সরকারি ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করা হয় ২ এপ্রিল। নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ:[৬০]

২৩৭ টি মুসলিম আসনের ফলাফল	**আসন সংখ্যা**	**৭২টি অমুসলিম আসনের ফলাফল**	**আসন সংখ্যা**
যুক্তফ্রন্ট	২১৫ টি	পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪ টি
মুসলিম লীগ	৯ টি	তফসিলি ফেডারেশন	২৭ টি
খেলাফত ই রাব্বানী পার্টি	১ টি	সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	১৩ টি
স্বতন্ত্র	১২ টি	কমিউনিস্ট পার্টি	৪ টি
		বৌদ্ধ	২ টি
		খ্রিস্টান	১ টি
		স্বতন্ত্র	১ টি

মুসলিম আসনে নির্বাচিত সদস্যদের ৮ জন যুক্তফ্রন্টে যোগ দিলে ফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা হয় ২২৩ এবং ১ জন মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ায় এর সদস্য সংখ্যা হয় ১০ জন।[৬১]

৪.১১: বিজয়ী নারী প্রার্থীগণ[৬২]

মুসলিম সংরক্ষিত নারী আসন: নির্বাচিত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, মুসলিম সংরক্ষিত নারী আসনের ৯টি আসনেই যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীগণ জয় লাভ করেন। এরা হলেন:

ক্রমিক	**সংসদীয় আসন পরিচিতি**	**বিজয়ী প্রার্থী, দল ও প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা**	**নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, দল ও প্রাপ্ত ভোট**
১.	দিনাজপুর-কাম-রংপুর-কাম-বগুড়া	দৌলতননেছা খাতুন, যুক্তফ্রন্ট, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	
২.	রাজশাহী-কাম-পাবনা	মিসেস সেলিনা বানু, প্রাপ্ত ভোট ৪,৬৩৯	মিসেস শামীম হোসাইন, মুসলিম লীগ, প্রাপ্ত ভোট ১,৬২৪
৩.	ফরিদপুর-কাম-কুষ্টিয়া-কাম-যশোর	বদরুননেছা বেগম, যুক্তফ্রন্ট, প্রাপ্ত ভোট ৪,৪১৪	মিসেস আয়েশা সরদার, মুসলিম লীগ প্রাপ্ত ভোট ২,৮৯২
৪.	বাকেরগঞ্জ	মিসেস রাজিয়া বানু, যুক্তফ্রন্ট, প্রাপ্ত ভোট ১,৭৯৮ বেগম	মিসেস হোসনে আরা, মুসলিম লীগ, প্রাপ্ত ভোট ১,০৬০
৫.	ঢাকা-কাম-নারায়ণগঞ্জ	মিসেস নূরজাহান মোর্শেদ, যুক্তফ্রন্ট প্রাপ্ত ভোট ৬,৩৬৫	মিসেস শামসুন্নাহার বেগম, মুসলিম লীগ, প্রাপ্ত ভোট ২,৭২৪

৬০. Najma Chowdhury, *op.cit.*, p. 171; Ranglal Sen, *Political Elites in Bangladesh,* UPL, Dhaka, 1986, p. 124

৬১. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২৫

৬২. *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954,* pp. 72-73

ক্রমিক	সংসদীয় আসন পরিচিতি	বিজয়ী প্রার্থী, দল ও প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, দল ও প্রাপ্ত ভোট
৬.	ঢাকা সিটি পশ্চিম	বেগম আনোয়ারা খাতুন, যুক্তফ্রন্ট, প্রাপ্ত ভোট ৬,৮০৫	বেগম আকতার জাহান, মুসলিম লীগ প্রাপ্ত ভোট ২,২৫৭
৭.	ময়মনসিংহ	মিসেস মেহেরুন্নেছা খাতুন, যুক্তফ্রন্ট, প্রাপ্ত ভোট ৪,৮১৪	মিসেস মমতাজ বেগম, মুসলিম লীগ, প্রাপ্ত ভোট ১,৬০০
৮.	ত্রিপুরা-কাম-সিলেট	মিসেস আমেনা বেগম, যুক্তফ্রন্ট, প্রাপ্ত ভোট ৩,১২৮	মিসেস সৈয়দা জাহানারা, মুসলিম লীগ, প্রাপ্ত ভোট ১,৯৯৩
৯.	চট্টগ্রাম-কাম-নোয়াখালী	তোফাতুন্নেসা বেগম, যুক্তফ্রন্ট, প্রাপ্ত ভোট ২৯৯৪	মিসেস নূরুল ইসলাম, মুসলিম লীগ, প্রাপ্ত ভোট ১,০৩৩

অমুসলিম সংরক্ষিত নারী আসন: অমুসলিম সংরক্ষিত তিনটি নারী আসনে বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন:

ক্রমিক	সংসদীয় আসন পরিচিতি	বিজয়ী প্রার্থী, দল ও প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, দল ও প্রাপ্ত ভোট
১.	সাধারণ বর্ণ হিন্দু আসন	মিসেস নেলী সেনগুপ্তা, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	
তফসিলি জাতি হিন্দু আসন			
১.	ঢাকা-কাম-চট্টগ্রাম বিভাগ	মিসেস নিবেদিতা মণ্ডল, তফসিলি ফেডারেশন, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	
২.	রাজশাহী বিভাগ	মিসেস বিন্দুবাসিনী সরকার, তফসিলি ফেডারেশন, প্রাপ্ত ভোট ৭৮৬	মিসেস বীণাপানি সরকার, প্রাপ্ত ভোট ৬৬১

উপরের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট অভাবনীয় বিজয় অর্জন করে। যুক্তফ্রন্টের এ বিজয়কে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বাঙালির নীরব 'ব্যালট বিপ্লব' বলে বিবেচনা করা হয়। বস্তুত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নানা রাজনৈতিক অপতৎপরতা, পূর্ব বাংলার প্রতি তাদের ঔপনিবেশিক শাসকসুলভ বৈষম্যমূলক নীতি ও সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্য ও সংহতি যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় নিশ্চিত করেছিল বলে মনে করা হয়। মুসলিম লীগের মুখপত্র *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা এ দলের পরাজয়ের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো চিহ্নিত করেছিল:

> সাধারণভাবে লীগের পরাজয়ের যেসব কারণ সর্বত্র আজকাল আলোচিত হইতেছে সেসবের ভিতর রহিয়াছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের এবং লীগের কতিপয় নীতি ও কার্যের প্রতিবাদ... লীগের পরাজয়ের কারণগুলি হইতেছে: (১) বাংলাভাষার দাবির প্রতি অবিচার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নূরুল আমিন সরকারের দমন- নীতি; (২) পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের নীতি, সমদর্শিতার অভাব; অবিচার ও শোষণ

নীতি; (৩) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাংলাকে স্বায়ত্তশাসন না- দেওয়ার প্রস্তাব ও মনোভাব ; (৪) পূর্ব বাংলার জনগণের আর্থিক দুর্দশা; (৫) শাসনতন্ত্র রচনার বিলম্ব; (৬) লীগের গণসংযোগের অভাব ; (৭) লীগ ও মন্ত্রিত্বের একীকরণ; (৮) লীগের কর্মীর স্বল্পতা এবং লীগের প্রতি ছাত্র ও তরুণ সমাজের বিরূপ মনোভাব; (৯) লীগের ভিতর বিপুল ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বের অভাব; (১০) দুর্নীতি দমনে সরকারি ব্যর্থতা এবং এইভাবে এই তালিকায় আরো কারণ যোগ করা যাইতে পারে।[৬৩]

৪.১২: যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও ফ্রন্টে মতবিরোধ

নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় সভায় এ কে ফজলুল হককে সংসদীয় দলের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫৪ সালের ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব বাংলার গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান এ.কে ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুরোধ জানালে তিনি ৪ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন।[৬৪] এ মন্ত্রিপরিষদ গঠনকে কেন্দ্র করেই যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে মারাত্মক অসন্তোষ দেখা দেয়। কারণ এ মন্ত্রিপরিষদে জোটের সবচেয়ে বড় দল আওয়ামী মুসলিম লীগের কোনো সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অথচ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ এককভাবে ১৪৩টি আসন লাভ করেছিল। এ নিয়ে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। অবশ্য এ রকম পরিস্থিতি যে ভবিষ্যতে হতে পারে সে ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান আগেই আশঙ্কা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* উল্লেখ করেন, 'যুক্তফ্রন্টের পক্ষে যে জনমত সৃষ্টি হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভাবাবেগের উপর। মুসলিম লীগের হাত থেকে বাচাঁর জন্য সাধারণ জনগণ অস্থির হয়ে উঠেছিল'।[৬৫] পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ কে ফজলুল হক মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করেন। মন্ত্রিপরিষদে আরও ১০ জন মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন ৭ জন।[৬৬] তবে লক্ষণীয় যে, এ মন্ত্রিসভায় কোনো নির্বাচিত নারী সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৪.১৩: যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল এবং পরবর্তী পরিস্থিতিতে নারীসমাজের প্রতিক্রিয়া ও ভূমিকা

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় ও সরকার গঠন মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। ফলে প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অকার্যকর করার জন্য নানা ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা শুরু করে। এ অবস্থায় যুক্তফ্রন্টের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধ সরকারের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। এ সময় কলকাতায় আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকের একটি আবেগ তাড়িত বক্তব্য ও *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার সাথে প্রদত্ত মুখ্যমন্ত্রীর একটি সাক্ষাৎকারের বিকৃত উপস্থাপনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার

---

৬৩. *দৈনিক আজাদ*, ২২ মার্চ, ১৯৫৪; মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭

৬৪. মন্ত্রী পরিষদে এ কে ফজলুল হক ছাড়া অপর ৩ জন মন্ত্রী ছিলেন নেজামে ইসলামী দলের মৌলভী আশরাফউদ্দিন চৌধুরী এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার ও সৈয়দ আজিজুল হক। *দৈনিক আজাদ*, ২৫ মার্চ, ১৯৫৪

৬৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০

৬৬. Zillur R Khan, *The Third World Charismat Sheik Mujib and The Struggle for freedom*,The University Press Limited, 1996, p. 47

অভিযোগ আনে। কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে 'গাদ্দারের মন্ত্রিসভা' বলে আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারাভিযানে নামে।[৬৭] শুধু তাই নয়, এ সময় সরকারি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে আদমজি পাটকলে বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঁধানো হয়। দাঙ্গা মোকাবিলায় ফজলুল হক সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ এনে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে ৯২ (ক) ধারা[৬৮] জারির মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন চালু করা হয়। এভাবে বাঙালি জাতির বহুল প্রত্যাশার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। পূর্ব বাংলার প্রায় সাড়ে চার কোটি জনতার বিজয় ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়।

৯২ (ক) ধারা জারির পর সশস্ত্র পুলিশবেষ্টিত অবস্থায় এ, কে ফজলুল হককে নিজ বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখা হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকাসহ অন্যান্য স্থান থেকে যুক্তফ্রন্টের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যসহ প্রায় ১৬০০ নেতা, কর্মী ও সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের তালিকায় কেবল পুরুষ নেতাকর্মীগণ ছিল তা নয়, এদের মধ্যে নারীরাও ছিলেন। গ্রেপ্তার হওয়া নারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দৌলতননেছা খাতুন। তাঁকে প্রায় এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।[৬৯] সামরিক আইনের বিধিভঙ্গ করে কুষ্টিয়ার বস্ত্রকল ও মোহিনী মিলের শ্রমিকদের দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা ও সমর্থন জানিয়ে শ্রমিকদের আহূত জনসভায় বক্তব্য রাখার দায়ে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য বদরুন্নেছা বেগমকেও গ্রেপ্তার করে একমাস কারাবাসে রাখা হয়।[৭০] গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রাজশাহী-পাবনা আসন থেকে নির্বাচিত মিসেস সেলিনা বানুও। তাঁকে পাবনা জেলে কারান্তরীণ রাখা হয়েছিল। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল নারীনেত্রী ও যুক্তফ্রন্টের সমর্থক সাংবাদিক লায়লা সামাদের নামেও। গ্রেপ্তার এড়াতে বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর শিশু কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন।[৭১] কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী ও বরিশাল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠক কমরেড মনোরমা বসুর নামেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল।[৭২] তাছাড়া যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে প্রচার-প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ঊষা দাশ পুরকায়স্থের বাড়িতেও পুলিশি অভিযানের ঘটনা ঘটেছিল।[৭৩] ময়মনসিংহ জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য জোৎস্না নিয়োগীকে আট

---

৬৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩৮-২৩৯

৬৮. ৯২(ক) ধারা হলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের একটি বিশেষ প্রবিধি। এ ধারা বলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা বলে পাকিস্তানের অখণ্ডতা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হলে বা গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে অথবা দেশ কোনো যুদ্ধ অবস্থায় নিপতিত হলে সে ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা জাতীয় পরিষদ বা আইন পরিষদ বাতিল সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি বা তার মনোনীত গভর্নর দ্বারা সরকার পরিচালনা করতে পারবেন। এধারা মতে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ ও নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা যাবে।

৬৯. মফিদুল হক, *নারী মুক্তির পথিকৃৎ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ১০৩

৭০. ফরিদা আখতার, সীমা দাস সীমু, সাইদা আখতার সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

৭১. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫

৭২. হেনা দাস, *নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৮

৭৩. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩

মাসের শিশু সন্তানসহ গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল।[৭৪] নিরাপত্তা আইনে রংপুরের বাড়ি থেকে যুক্তফ্রন্ট কর্মী নিলুফার আহমদ ডলিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি রংপুর ও রাজশাহী কারাগারে এক বছর কারাভোগ করেন।[৭৫]

যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল এবং দমন ও নিপীড়নই নয় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক যুক্তফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসের ছুটি বাতিল ঘোষণা করে। নিষিদ্ধ করা হয় একুশের শোভাযাত্রা। সরকারের এই সব স্বৈরাচারী পদক্ষেপের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ছাত্রী ও নারীসমাজও অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রদের আহূত ধর্মঘটে ছাত্রীরাও যোগ দেয় এবং নারীসমাজ এ কর্মসূচির প্রতি জোর সমর্থন প্রদান করে। এ সময় ছাত্র আন্দোলনের প্রতি কবি বেগম সুফিয়া কামাল একাত্মতা ঘোষণা করেন। শুধু সমর্থন ঘোষণাই নয় তিনি মিছিল-সমাবেশে নেতৃত্বও প্রদান করেন। কবি সুফিয়া কামাল সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জানাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৭৬] পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। এতে নারীদের অধিকার হরণমূলক অনেক বিধি যুক্ত ছিল। ওলেমা বোর্ড এর সমর্থন ও নারীদের অধিকারের বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করলে নারীরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। গেন্ডারিয়া নারী সমিতি, পাক কৃষ্টি সংসদ ও পুরানা পল্টন নারী সমিতি যুক্ত বিবৃতি দেয়, বিবৃতিতে তারা বলেন,'গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিস্যাৎ হয়েছে, এর ফলে নারী পুরুষের সমঅধিকার নীতি উপেক্ষিত হবে'।[৭৭] তারা আরো বলেন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত গণপরিষদই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকারী হবে।

উল্লেখ্য যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করা হলেও প্রাদেশিক পরিষদ সচল ছিল। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে এ পরিষদ বাতিল করা হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদে নারী সদস্যগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৬ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত *Assembly Proceedings (official Report) East Pakistan Assembly, Third Session, 1956* উল্লিখিত মিসেস নূরজাহান মোর্শেদ, নিবেদিতা মণ্ডল, বদরুন্নেছা বেগম, দৌলতননেছা ও বিন্দুবাসিনী সরকার প্রমুখের প্রাদেশিক পরিষদে প্রদত্ত বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।[৭৮] তাঁদের বক্তব্যে সমকালীন নানা রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক প্রসঙ্গ যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি নারীসমাজের সার্বিক জীবনমানের উন্নতির বিষয়ও বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন বাঙালির জাতীয় জীবনের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ, পূর্ব

---

৭৪. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭

৭৫. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৭৬. মালেকা বেগম, 'সর্বজনীন নেত্রী ও মুক্তিযুদ্ধে অবদান', *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৩ অক্টোবর, ২০১৮

৭৭. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৭৮. *Assembly Proceedings (official Report) East Pakistan Assembly, Third Session, 1956*, pp. 209, 225, 226, 237, 238, 284, 285

বাংলার প্রতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে বাঙালি জনমানসে সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল এ নির্বাচনের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ৪টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের যুক্তফ্রন্ট গঠন ছিল একটি সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এ ফ্রন্ট বাঙালি জাতিকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়। বস্তুত, জনমনে যে মুসলিম লীগ বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় এবং মুসলিম লীগের অভাবনীয় ভরাডুবিকে নিশ্চিত করেছিল।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের একটি বিশেষ তাৎপর্য হলো এতে বাঙালি নারীদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ নির্বাচনে বাঙালি নারীসমাজ মূলত তিনটি প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। প্রথমত: প্রার্থিতা গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উল্লেখ্য যে, এ নির্বাচনে নারীদের জন্য যে ১২টি সংরক্ষিত আসন ছিল, সেগুলোতেও সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৭৯] ১২টি সংরক্ষিত নারী আসন এবং একটি সাধারণ আসনে মোট ৩৬ জন নারী প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যদিও এ নারীদের সবার বিস্তারিত পরিচিতিমূলক তথ্য পাওয়া যায় না, তথাপি যাঁদের পরিচয় জানা যায় এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, এদের প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। সমকালীন সমাজে শিক্ষাবিদ, কবি ও সাহিত্যিক হিসেবেও কেউ কেউ সুপরিচিত ছিলেন। পেশাগত জীবনে একজন প্রার্থী আইন পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি পূর্ব বাংলার প্রথম মহিলা আইনজীবী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। কেউ ছিলেন রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য এবং কেউ কেউ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথেও যুক্ত ছিলেন। এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিশেষত বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নির্বাচিত নারী সদস্যগণ প্রাদেশিক আইন পরিষদেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত: প্রার্থীতার মাধ্যমে নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও এ নির্বাচনের প্রচারণাসহ অন্যান্য নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কাজেও নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। সংরক্ষিত নারী আসনে এদের প্রচার তৎপরতা বেশি দেখা গেলেও সাধারণ আসনেও তারা প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন। নারীদের কেউ কেউ নির্বাচনি

৭৯. তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় নিসঃন্দেহে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সে সময় সংরক্ষিত নারী আসনগুলোতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী পার হলেও এখনো জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি ভোটে নারী সদস্য নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হয়নি। অথচ বাংলাদেশের নারীসমাজের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে দীর্ঘ দিন ধরে এ দাবিটি জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নের এ যুগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী, বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র চেয়ারপার্সন ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার নারী হওয়া সত্ত্বে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবিটি আজও পূরণ হয়নি।

এজেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তৃতীয়তঃ নারীরা নিজেদের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার ভোট প্রদানের মাধ্যমেও এ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যদিও নানা কারণে নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হয়নি। তথাপি এর গুরুত্ব কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় নয়।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় বাঙালি জাতিকে নতুন রাজনৈতিক প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছিল। যদিও অসাংবিধানিকভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, তথাপি এতে বাঙালি জাতি হতোদ্যম হয়ে পড়েনি। এ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস জেগেছিল এবং ৫৬ দিনের ক্ষমতায় থাকাকালে পূর্ব বাংলার মানুষ যে ক্ষমতায় সাধ পেয়েছিল তা পরবর্তীতে তাদের নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করে। এ নির্বাচনে বিজয় পরিশেষে বাঙালিকে পাকিস্তানের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করে। অন্যদিকে এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারীদের যে ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়, বাংলার রাজনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এ নির্বাচন বাঙালি নারীদের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলে। ফলে তারা সামাজিক বিধি-নিষেধ, প্রথা-সংস্কার ভেঙ্গে জাতীয় রাজনীতি ও নিজেদের অধিকার আন্দোলনে যুক্ত হয়ে একধাপ এগিয়ে যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্ব বাংলার এক দশকের (১৯৫৫-৬৫ খ্রি.) রাজনীতি এবং নারীসমাজ

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক এবং বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচন, এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় ও সরকার গঠন, যুক্তফ্রন্টের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রদেশে কেন্দ্রের শাসন জারি এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহতকরণে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অব্যাহত ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রবর্তন, ১৯৫৮ সালে সাংবিধানিক সরকারকে উচ্ছেদ করে সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানের (১৯০৭-১৯৭৪ খ্রি.) রাষ্ট্রক্ষমতা দখল সামরিক শাসন জারি, মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনসহ আইয়ুব খানের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া, ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান জারি, পূর্ব বাংলায় আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনের সূচনা, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৪-৬৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনসমূহ এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ এবং পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় পূর্ব বাংলার এক দশকের (১৯৫৫-৬৫ খ্রি.) রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বেশ চাঞ্চল্য বিরাজমান ছিল। এ সময়কার গুরুত্বপূর্ণ এসব রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদ ছাড়াও ছাত্র-জনতার সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় পরবর্তী সময়ে এর রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এতে বাঙালি নারীসমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকচক্র এবং পূর্ব বাংলার তাদের রাজনৈতিক দোসররা বাঙালির মাতৃভাষা বাংলার প্রতি যে চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে অবদমন করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল এর জোরালো প্রতিবাদ ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলনে নারীসমাজের অংশগ্রহণ এদেশের রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয় হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। বস্তুত, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের যে সুযোগ তৈরি হয়েছিল, তা আরো জোরালো ও প্রসারিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনের মাধ্যমে। এ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কিছু দায়িত্বপালন ও ভোটাধিকার প্রয়োগে পুরুষদের পাশাপাশি নারীসমাজও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন বাঙালি নারীসমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক

সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। এর ফলে ১৯৫৫-৬৫ সাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এক দশকের রাজনীতি ঘটনাক্রমেও তারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এমনকি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পুরুষ রাজনীতিবিদদের আগেই নারীরা তাঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারণ করেছিলেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন এবং ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহেও তাঁরা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গঠিত সম্মিলিত বিরোধী দল 'কপ' এর পক্ষ থেকে ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী করা হয়েছিল। 'কপ' প্রার্থীর প্রচারণা ও কর্মকাণ্ডে পূর্ব বাংলার নারী শিক্ষার্থী ও রাজনীতিবিদগণ সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল। এভাবে দেখা যায় বাংলার ইতিহাসে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এক দশকের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে বাঙালি নারীসমাজ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল। এ সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে নারীসমাজ কখনো রাজপথ ও মাঠে-পথে সংগ্রামী নেতা-কর্মী, কখনো আত্মস্বার্থত্যাগী এবং কখনো আত্মোৎসর্গকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিলেন। আলোচ্য অধ্যায়ে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার এক দশকের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহে নারীদের সম্পৃক্ততা ও ভূমিকা অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

৫. ১: পূর্ব বাংলার রাজনীতি ১৯৫৫-৫৮ ও নারীসমাজ

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৫-৫৮ সাল পর্যন্ত সময়কালটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল এবং পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি, ১৯৫৫ সালের খাদ্য সংকট, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রবর্তন, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নানা সংকট ইত্যাদি এ সময়ের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়, যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠন এবং মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় এ সরকারকে বরখাস্ত ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ ও যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল, যুক্তফ্রন্ট নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সরকারের দমন-নিপীড়নমূলক নীতি গ্রহণ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে নারীসমাজের প্রতিক্রিয়া এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারের অনমনীয় মনোভাব সম্পর্কেও ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। স্মর্তব্য যে, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ৯২ (ক) ধারা জারি ও ধড়পাকড়ের ফলে পুরুষদের মতো নারীরাও রাজনীতিতে কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দমনমূলক এ ধারাটি প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে উদ্ভূত নবতর পরিস্থিতিতে বাঙালি নারীসমাজ আবারো রাজনীতিতে সক্রিয় হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৫ সালে ২১ ফেব্রুয়ারির শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ থাকলেও তা অমান্য করে ছাত্রীরা মিছিল বের করে। এ মিছিল থেকে কামরুন্নাহার লাইলী, ফরিদা বারী,

জহরত আরা, মিলি চৌধুরী, ফিরোজা বেগম প্রমুখসহ প্রায় ১৫০ জন ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১] ছাত্রীদের এ মিছিলে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে নারীসমাজও সমর্থন জানিয়েছিলেন।[২]

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠন, অল্পদিনের মধ্যে সে সরকারকে বরখাস্ত করে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি, আবার অল্পদিনের মধ্যে তা প্রত্যাহার করে যুক্তফ্রন্টের আবুল হোসেনের নেতৃত্বে সরকার গঠন, যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন ইত্যাদি নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার রাজনীতি যখন অনেকটাই উন্মাতাল, তখন মরার উপর খাড়ার ঘাঁয়ের মতো এখানে তীব্র খাদ্য সংকট ও নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি ফলে জনজীবনে চরম দুর্ভোগ তৈরি হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকে। জনমানুষের এ চরম দুর্দিনে ১৯৫৫ সালে পূর্ব বাংলার নারীরা আবার প্রকাশ্যে রাজপথে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু করে। এমনকি নারীরা মন্ত্রী আতাউর রহমানকে রাস্তায় ঘেরাও করেন।[৩] তবে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি বরং এ সময় প্রাদেশিক সরকারের অযোগ্যতা ও ভুল অর্থনৈতিক নীতির কারণে ১৯৫৬ সাল নাগাদ পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ[৪] খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যায়। দলটি ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে খাদ্যের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যায়। ১৯৫৬ সালের ২ মে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার দাবি জানিয়ে আমরণ অনশনের ঘোষণা দেন। তিনি দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় কেন্দ্রের কাছ থেকে ৫০ কোটি টাকা দাবি করেন। ৭ মে মওলানা ভাসানী অনশন শুরু করেন এবং ১৭ মে সোহরাওয়ার্দী তাঁর অনশন ভাঙান।[৫] আওয়ামী লীগের আহ্বানে ৪ আগস্ট ক্ষুধার্ত ও ভুখা মানুষের পক্ষে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিলের আয়োজন করা হয়। এ মিছিলের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে পরিস্থিতি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে। প্রশাসন পরিচালনা ও সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলা ব্যর্থতার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভ দেখা দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আবুল হোসেনকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করে এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে বাঙালি নারীসমাজ সরেব প্রতিবাদ শুরু করেছিল। তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে সংগঠিত করার জন্য এ সময় একটি 'সর্বদলীয় মহিলা কর্মপরিষদ' গঠন করা হয়। খাদ্য সংকট মোকাবিলা করাসহ নারী ও শিশুর জীবনহানির পরিপ্রেক্ষিতেই এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা

---

১. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, প্রিপ ট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৮
২. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১ পৃ. ১১৩
৩. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
৪. দলটির পূর্ববর্তী নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। ১৯৫৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত দলটির এক সম্মেলন থেকে এর নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ করা হয়। এর মাধ্যমে দলটিকে অসাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রদান করা হয়েছিল।
৫. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৬

হয়েছিল। সর্বদলীয় মহিলা কর্মপরিষদ প্রদেশে খাদ্য সমস্যা সমাধানের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানায়। খাদ্য সংকট মোকাবিলায় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মিসেস নিবেদিতা মণ্ডল পরিষদে তাঁর জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "বর্তমানে দেশে দারুণ খাদ্য সংকট চলছে। পূর্ব-পাকিস্তানকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করুণ এবং জনসাধারণকে অনশনে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান।"[৬] এ সময় কাগজের দাম বাড়লে এর বিরুদ্ধেও নারীরা প্রতিবাদ জানায়। এ সময় বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিপর্যয় এবং মানুষের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছিল। খাদ্যের দাবিতে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব ভুখা মিছিল বের হয়েছিল তাতে ব্যাপক হারে নারীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে সিলেটে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করে তারা স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল পার্কে সভার পর মহাকুমা হাকিমের সাথে দেখা করতে যান। খাদ্যের দাবিতে সিলেটের নারীদের এ মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন ঊষা দাশ পুরকায়স্থ। একই বছর ১০ জুলাই পাবনা শহরে নারীদের ভুখা মিছিলে পর্দানশীন নারীরাও যোগ দিয়েছিলেন। এভাবে নিজস্ব দাবি দাওয়ার প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে সরকার বিরোধী বিভিন্ন বিক্ষোভ ও আন্দোলনে নারীসমাজ সংগঠিত হতে থাকে।[৭]

শুধু দেশীয় সংকট বা সমস্যা নিয়ে নয়, পর্যালোচনাধীন সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও বাঙালি নারীসমাজকে সরব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা যায়। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল জাতীয়করণকে কেন্দ্র করে মিশরের ওপর ইঙ্গ-ফরাসি-ইসরাইলের আক্রমণের ঘটনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ১৯৫৬ সালের ১০ নভেম্বর আজিমপুর মহিলা পার্কে ঢাকার নারী ও ছাত্রীদের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৮] ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আলজেরীয়দের পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে ১৯৫৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কবি বেগম সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে ঢাকার সদরঘাট লেডিস ক্লাবে নারীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা থেকে ফরাসি ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণের অভিযোগে দু'জন ছাত্রীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদানের প্রতিবাদ জানানো হয়। তাছাড়া এ সভা থেকে নিত্য পণ্যের দাম কমানোর জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। এ সভায় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য বেগম দৌলতননেছা খাতুন ও বেগম সেলিনা বানুসহ মিসেস আশালতা সেন, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, মমতাজ বেগম, বেগম হাজেরা মাহমুদ, নূরজাহান বেগম ও সুফিয়া খানম প্রমুখ বক্তৃতা করেছিলেন।[৯]

পর্যালোচনাধীন সময়ের (১৯৫৫-৫৮ খ্রি.) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান কার্যকরের বিষয়টি। সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল এবং একে রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি বলা হয়ে

---

৬. *Assembly Proceedings, official Report, East Pakistan Assembly,* third session, 1956, 17th to 23th September, 1956, p. 226

৭. মালেকা বেগম, *আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, পৃ. ১৪১

৮. *ঐ*, পৃ. ১১৩

৯. *সাপ্তাহিক বেগম*, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৭, মালেকা বেগম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *নির্বাচিত বেগম:* অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭ - ২০০০, ২য় খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৯২৯-৯৩১

থাকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনে ভারত ও পাকিস্তানকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং উক্ত আইনে বলা হয় যে, পাকিস্তানের জন্য নতুন সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনই প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে পাকিস্তানের সংবিধান হিসেবে কাজ করবে।[১০] পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালেই একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের (যাদের সংসদীয় এলাকা পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে পড়েছিল) ভোটে ৬৯ সদস্য বিশিষ্ট এ গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল।[১১] তফসিলি সম্প্রদায়ের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে (১৯০৪-১৯৬৮ খ্রি.) চেয়ারম্যান করে এ গণপরিষদ কাজ শুরু করলেও পরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ পরিষদের সভাপতি হন এবং আমৃত্যু এ পদে বহাল থাকেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গণপরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে ৭৯ জন করা হয়।[১২] এ গণপরিষদের ৭৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন নারী। তাঁরা হলেন বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ (১৮৯৬-১৯৭৯খ্রি.) ও বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ (১৯১৫-২০০০ খ্রি.)।[১৩]

১৯৪৭ সালের ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হলেও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর (১৮৭৬-১৯৪৮) জীবদ্দশায় গণপরিষদে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের তেমন অগ্রগতি হয়নি। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান (১৮৯৫-১৯৫১ খ্রি)। তিনি ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে শাসনতন্ত্র রচনার নীতিমালা হিসেবে 'আদর্শ প্রস্তাব' (Objective Resolution) উত্থাপন করেন।[১৪] আদর্শ প্রস্তাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পাকিস্তানকে একটি ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং এর জন্য একটি ইসলামি সংবিধান রচনা করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। প্রস্তাবটি প্রকাশিত হলে বিরোধীদলীয় সদস্যবর্গ বিশেষ

---

১০. S.A Akanda, 'Was Parliamentary system of Government a Failure in Pakistan? A Case Study of a Constitutional Debate in Pakistan during Martial Law, 1958-62', *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. VI (1982-83), p. 158

১১. এ ৬৯ জন সদস্যের প্রদেশভিত্তিক সংখ্যা ছিল পূর্ব বাংলা ৪৪ জন, পাঞ্জাব ১৭ জন, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৩ জন, সিন্ধু ৪ জনও বেলুচিস্তান ১ জন। মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ.৪৫

১২. এর মধ্যে পাকিস্তানভুক্ত দেশীয় রাজ্য ভাওয়ালপুর, খয়েরপুর, বেলুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজ্যসমূহ থেকে একজন করে ৪ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য Keith Callard, *Pakistan: A Political Study*, George Allen & Unwin Ltd. London: 1958, pp.77- 79

১৩. বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের একজন নেত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৩৫ সালে পাঞ্জাব প্রাদেশিক মহিলা মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৩৭ সালে তিনি পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালেও তিনি প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এ সুবাদে তিনি গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি এশিয়ার প্রথম নারী যিনি আইনসভার অধিবেশনের সভাপতিত্ব করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। বেগম শায়েস্তা সোহরাওয়ার্দী ইকরামউল্লাহ ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক এবং লেখিকা। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জনকারী প্রথম মুসলিম নারী। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উৎসাহে তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে মুসলিম মহিলা ছাত্র ফেডারেশন এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের মহিলা উপ-কমিটিতে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগ দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে ১৯৪৭ সালে গণপরিষদ সদস্য পদ লাভ করেন।

১৪. এ আদর্শ প্রস্তাবটি দ্রষ্টব্য: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ: দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড *পটভূমি, ১৯০৫-১৯৫৮*, তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৩৬-১৪১

করে কংগ্রেসদলীয় হিন্দু সদস্য এবং পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিগণ এর বিরোধিতা করেন। তবে এ বিরোধিতা উপেক্ষা করেই গণপরিষদে এ প্রস্তাব পাশ হয় এবং সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে গণপরিষদ সভাপতি তমিজউদ্দীন খানকে সভাপতি করে ২৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'মূলনীতি নির্ধারক কমিটি' গঠন করা হয়।। বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ ও বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ এ মূলনীতি নির্ধারক কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।[১৫] কাজের সুবিধার্থে মূলনীতি নির্ধারক কমিটি একটি স্টিয়ারিং কমিটি ও তিনটি সাবকমিটি গঠন করেছিল। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট 'তালিমাত-ই-ইসলামিয়া' নামক ইসলামি পরিষদও গঠন করা হয়েছিল। ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মূলনীতি নির্ধারক কমিটি প্রণীত সংবিধানের রূপরেখা বিষয়ে গণপরিষদে একটি 'অর্ন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট' পেশ করেন।[১৬] রিপোর্টটি গণপরিষদের ভিতরে ও বাইরে বেশ সমালোচিত হয়। এ রিপোর্টে শাসনতন্ত্রে ইসলামিকরণ করার বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকায় ইসলামপন্থি দলগুলো এর তীব্র সমালোচনা করে। অন্যদিকে আইন পরিষদে জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের বিধান না থাকায় এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় পূর্ব বাংলায় এ অন্তর্বর্তী রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা শুরু হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টটি বাতিলের দাবিতে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন হয়। ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট বাতিল ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে জনমত গঠন করা পূর্ব বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও আইনজীবীর সমন্বয়ে একটি 'গণতান্ত্রিক ফেডারেশন সংগ্রাম কমিটি' (Committee of Action for the Democratic Federation) গঠন করা হয়। গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি *Will Janab Liaquat Ali khan answer the following Questions?* শীর্ষক একটি লিফলেটের মাধ্যমে মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে সুপারিশমালার কতগুলো মৌলিক বৈষম্যের উপর জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১৭] ১৪ নভেম্বর ঢাকায় আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের জাতীয় মহাসম্মেলন থেকে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টের বিকল্প হিসেবে খসড়া শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পরে তা প্রকাশ করা হয়।[১৮] সংবিধানের বিকল্প খসড়া প্রস্তাব ঘোষণার পর তা সমর্থন করে পূর্ব বাংলার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং মিছিল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।[১৯] প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ছাত্রীরাও অংশ নিয়েছিল। প্রবল সমালোচনার মুখে ১৯৫০ সালের ২১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ রিপোর্টটি গণপরিষদ থেকে প্রত্যাহার করে নেন।[২০]

---

১৫. ২৪ জন মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সদস্যের নাম দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

১৬. রিপোর্টের সুপারিশমালা দেখুন, *দৈনিক আজাদ*, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫০; মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮-৫০

১৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮-১৫৯

১৮. খসড়া শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবসমূহ দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০-১৬৭

১৯. মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৩

২০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪-২০৬

১৯৫০ সালের শেষ দিকে ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। বলা হয় যে, অন্তর্বর্তী রিপোর্ট বিরোধী চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত উপায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো হয়েছিল। ঢাকার এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদে প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ছাত্র, শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসেন। দাঙ্গাবিরোধী সভা, শোভাযাত্রার কর্মসূচি পালন করা হয়। এ দাঙ্গার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীরা একটি যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন। এ বিবৃতির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অন্যতম দু'জন নারী সদস্যের একজন ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আনোয়ারা খাতুন ও অন্যজন ঊষা রায়।[২১]

১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডির পৌরসভা পার্কে এক সভা চলাকালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ী সাদ আকবরের গুলিতে নিহত হন। তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর গণপরিষদে পাকিস্তানের সংবিধানের একটি খসড়া পেশ করেন। উল্লেখ্য যে, পেশকৃত এ রিপোর্টে অন্যতম স্বাক্ষরদাতা নারী সদস্য ছিলেন বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ।[২২] নাজিমুদ্দীনের উপস্থাপিত রিপোর্টটি আরো বেশি সমালোচনার মুখে পড়ে। আইন পরিষদে সমান প্রতিনিধিত্বের কারণে যেমন এই রিপোর্ট পূর্ব বাংলার জনগণের সমর্থন পায়নি, তেমনি ভবিষ্যত পূর্ব বাংলার সঙ্গে যোগসাজশ করে আইন পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের যে-কোনো প্রদেশ কিংবা রাজ্য ইচ্ছে করলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে পাঞ্জাবের স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে – এ আশঙ্কায় পাঞ্জাবিরাও এই এ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে।[২৩]

১৯৫৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দীনের পদচ্যুতির পর বগুড়ার মোহাম্মদ আলী (১৯০৯-১৯৬৩ খ্রি.) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। সংবিধান বিষয়ে তিনি একটি আপস-ফর্মুলা প্রণয়ন করেন–যা 'মোহাম্মদ আলী ফর্মুলা' নামে পরিচিত।[২৪] ১৯৫৩ সালের ৭ অক্টোবর গণপরিষদে এই ফর্মুলা উপস্থাপন করা হয়। কিছু সংশোধনীসহ ১৯৫৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গণপরিষদে ২৯-১১ ভোটে এটি পাশ হয়।[২৫] ১৯৫৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্মদিনে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ প্রকাশ করেন। তবে শেষপর্যন্ত তা হয়নি। এ সংবিধানে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব করায় তৎকালীন গভর্নর জেনারেল

---

২১. পূর্ব-বঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটির পক্ষে, বিস্তারিত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২-১৫৪

২২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮-৩৫৭

২৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, *Pakistan Constitutional Assembly Debates, vol* - XII, No. 2 (1952), pp. 60-61; শেখর দত্ত, *ষাটের দশকের গণজাগরণ: ঘটনাপ্রবাহ, পর্যালোচনা প্রভাব*, সমাজ বিকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৯

২৪. ফর্মুলাটির বিস্তারিত দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮-৩৬০

২৫. সংবিধান সম্পর্কে মূলনীতি কমিটির এ রিপোর্টটি ১৬ টি অংশে বিভক্ত, এতে মোট ২৫৫ টি 'প্যারাগ্রাফ এবং ২ টি তফসিল (Schedule) ছিল।

ইস্কান্দর মীর্জা (১৮৯৯-১৯৬৯ খ্রি.) ২৪ অক্টোবর এক অধ্যাদেশ বলে গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন।[২৬]

গণপরিষদ বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তৎকালীন গণপরিষদ সভাপতি তমিজউদ্দীন খান আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।[২৭] অনেক নাটকীয়তার পর পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট ১৯৫৫ সাল এপ্রিল মাসে অবিলম্বে নতুন গণপরিষদ নির্বাচনের জন্য এক নির্দেশ জারি করে। এ নির্দেশনার পর গভর্নর জেনারেল পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমান সংখ্যক ৪০ জন করে নিয়ে ৮০ সদস্যের দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করা হয়। তবে দ্বিতীয় গণপরিষদে কোনো নারী প্রতিনিধি রাখা হয়নি।[২৮]

শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ মারিতে ১৯৫৫ সালে ৭ আগস্ট প্রথম অধিবেশনের আহ্বান করা হয়। ৮ আগস্ট গণপরিষদের এ অধিবেশনে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা ৫ দফা সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হন। মারি সমঝোতা চুক্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল মনসুর আহমদ এবং আতাউর রহমান খান।[২৯] মারি চুক্তির মাধ্যমে দু'অঞ্চলের মধ্যে আপাততকালীন সমঝোতা হলেও তা দু'অঞ্চলের মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হয়নি। যুক্তফ্রন্টের ভেতর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার অত্যন্ত কৌশলে অগণতান্ত্রিক ইউনিট পদ্ধতি, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাসাম্য ও পূর্ব বাংলার স্থলে পূর্ব পাকিস্তান নাম চাপিয়ে দেয়। ফলে ১৯৫৬ সালে জানুয়ারি মাস থেকেই আওয়ামী লীগ গণবিরোধী সংবিধান ঠেকানোর জন্য আন্দোলন শুরু করে।[৩০] পূর্ব পাকিস্তানে একদিন হরতাল পালন করা হয়। আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা

---

২৬ অধ্যাদেশের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :'দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট বিবেচনা করে গভর্নর জেনারেল অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শাসনতান্ত্রিক যন্ত্র অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় তিনি সারা পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গণপরিষদ তার বিদ্যমান অবস্থায় কার্যকর থাকতে পারে না। প্রকৃত ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত রয়েছে এবং তারাই শাসনতন্ত্রসহ অন্যান্য বিষয় নতুনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থির করবেন। যথাসম্ভব শীঘ্র নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দ্রষ্টব্য: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১০-৪১২; *The Pakistan Observer*, 25 October, 1954; মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

২৭. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: G.W Chowdhury, *Constitutional Development in Pakistan* (London: Longman, 1969) pp. 84-90; Tamizuddin Khan, The test of time (Dhaka: UPL, 1989), pp. 151-157; S.A.Karim, *Sheik Mujib Triump and Tragedy*, The University Press Limited, 2005, p. 64

২৮. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক*, ঢাকা ২০১০, পৃ. ১০৬-১০৭। পূর্ব বাংলার ৪০ জন প্রতিনিধির নাম দ্রষ্টব্য: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২১-৪২২; এম.আর আখতার মুকুল, *পাকিস্তানের চব্বিশ বছর, ভাসানী মুজিবের রাজনীতি*, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ১৫০-৫১

২৯. ৫ দফা চুক্তির শর্তাবলি হলো: ১. পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশকে নিয়ে এক ইউনিট গঠন; ২. পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রদেশকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান; ৩. পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সকল বিষয়ে 'সংখ্যাসাম্যনীতি' অনুসরণ ও তা কার্যকর করা; ৪. 'যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা' করা এবং ৫. বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য,. A. Karim, *op.cit*,p. 66; *The Pakistan Observer*, 11 July, 1955; আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৮৬

৩০. সালাহ্ উদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৬৫

আবদুল হামিদ খান ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার হুমকি প্রদান করেন।[৩১] পূর্ববঙ্গের সমস্ত প্রতিবাদের ঝড়কে উপেক্ষা করে ভোটাধিকারের জোরে গণপরিষদে ১৯৫৬ সালের ৯ জানুয়ারি গণপরিষদে সংবিধান বিল উত্থাপিত হলে এতে আওয়ামী লীগ ৬৭০টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু তাদের কোনো প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সদস্যবৃন্দ গণপরিষদ হল থেকে ওয়াক আউট করেন। অন্য কয়টি বিরোধী দল[৩২] অধিবেশন বয়কট করায় মুসলিম লীগ, কে.এস.পি. ও নেজামে এছলামী- এর কোয়ালিশন সরকারপক্ষীয় সদস্যগণ বিনা বিরোধিতায় ৫২-০ ভোটে ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি সংবিধান পাস করেন। সংবিধান রচিত হবার পর প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সরকার ২৩ মার্চকে প্রজাতন্ত্র দিবস ঘোষণা করে এবং ২৩ মার্চ থেকে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৩৩]

১৯৫৬ সালের সংবিধান ছিল একটি লিখিত সংবিধান। এ সংবিধানে ২৩৪ টি ধারা, ১৩ টি অনুচ্ছেদ এবং ৬টি তফসিল ছিল।[৩৪] এ সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। এর মাধ্যমে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিধান চালু করা হয়। এ সংবিধানে ৩০০ সদস্যের আইন সভায় নারীদের জন্য ১০টি করে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। নারীদের জন্য নারীদের সংরক্ষিত আসনের জন্য বিশেষ নির্বাচনি এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। নারীদের প্রত্যক্ষ ভোটে সংরক্ষিত আসনে পরিষদ সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। ফলে নারী ভোটাররা একই সাথে সাধারণ আসনে প্রার্থী ও সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকার পায়।[৩৫]

পাকিস্তানে সংবিধান ও সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলার মানুষের অনেক দিনের প্রত্যাশা ও দাবি ছিল। আর তাই এ সংবিধানকে ঘিরে বাঙালির অনেক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে এ সংবিধান পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে করতে পারেনি। বাঙালিদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পাকিস্তানে গঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা, সরকার ব্যবস্থা হবে সংসদীয়, প্রাদেশিক ক্ষমতায়ন এবং উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দান। নানা আন্দোলন সংগ্রামের মুখে এ দাবিগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে পূর্ব বাংলাকে আনুপাতিকহারে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়নি। মারি চুক্তির ভিত্তিতে পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে 'সংখ্যাসাম্যের

---

৩১. G.W. Chowdhury. *op.cit.*, p. 98

৩২. আওয়ামী লীগকে অনুসরণ করে কংগ্রেসদলীয় সদস্যবর্গ এবং আজাদ পাকিস্তান পার্টির নেতা মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, গণতন্ত্রী দলের মাহমুদ আলী, ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টির এস.কে.সেন এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের রসরাজ মণ্ডল ও গৌরচন্দ্র বালা গণপরিষদের অধিবেশন বয়কট করেন।

৩৩. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫*, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২০৮

৩৪. ১৯৫৬ সালের সংবিধান সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৫-৫৭৬

৩৫. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৪২; নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮; মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

নীতি' অনুসরণে জনসংখ্যা অনুপাতে বাঙালিদের আসন দেওয়া হয়নি। এছাড়া পূর্ব বাংলার দাবি 'যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা' বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকায় এ সংবিধান বাঙালিদের হতাশ করে। আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ এবং আর্থিক ক্ষমতা বণ্টনে প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বজায় রাখার ব্যবস্থা থাকায় পূর্ব বাংলার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় বাংলার মানুষ এ সংবিধানের ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। গণপরিষদে সংবিধন সংক্রান্ত বিল উপস্থাপনের সাথে সাথে আওয়ামী লীগ গণবিরোধী এ সংবিধান প্রতিহত করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। সর্বস্তরের জনগণকে সংবিধান বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে এর চেয়ারম্যান ও অলি আহাদকে সেক্রেটারি করে একটি সর্বদলীয় কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাথে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রী সংসদকেও এ কর্মপরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।[৩৬] পল্টন জনসভায় প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, "প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের সাত কোটি নির্যাতিত জনসাধারণকে চির শৃঙ্খলাবদ্ধ করার এক মহা ষড়যন্ত্র।" তিনি অগণতান্ত্রিক এ শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে ১৬ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত সাতদিন প্রদেশের ছাত্র, যুবক, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে কালো ব্যাজ ধারণ করতে বলেন এবং ২৯ জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী 'অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিরোধ দিবস' পালনের আহ্বান জানান।[৩৭] ২৯ জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচি হিসেবে ধর্মঘট, মিছিল ও জনসভার আয়োজন করা হয় এবং এতে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া যায়। কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে মিসেস আমেনা বেগম, প্রাণেশ সমাদ্দর, মোহাম্মদ সুলতান, আব্দুল আওয়াল, আব্দুস সাত্তার ও অলি আহাদ প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের সাথে সাক্ষাৎ করে সংবিধান বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানালে তিনি বৈঠক ডাকতে অস্বীকৃতি জানান। এর প্রতিবাদে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ ১২ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব বাংলায় 'পরিষদ আহ্বান দিবস' পালন করে এবং ৮ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রস্তাবিত সংবিধানের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে প্রতিরোধ সপ্তাহ ঘোষণা হয়।[৩৮] শাসনতন্ত্রবিরোধী এ আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৩৯]

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৯ বছর পর প্রবর্তিত সংবিধানকে ঘিরে প্রবল জনপ্রত্যাশা থাকলেও ঘোষিত সংবিধান সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। ফলে এ সংবিধানের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধানবিরোধী আন্দোলনে ব্যাপকহারে না হলেও নারীদের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। এ আন্দোলনে সক্রিয়

---

৩৬. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫

৩৭. *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ জানুয়ারি, ১৯৫৬

৩৮. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫; মেজর রফিকুল ইসলাম, *স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামী লীগের ভূমিকা*, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৭

৩৯. এতদবিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য শেখ মজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৯৩

অংশ নেওয়া নারীদের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আমেনা বেগমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পরিষদের ভেতর ও বাইরে ভূমিকা রেখেছিলেন। শাসনতন্ত্র নিয়ে যখন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল সে সময়টাতে পূর্ববঙ্গে চলছিলো চরম খাদ্যাভাব এবং গ্রামাঞ্চলে শুরু হয়েছিল দুর্ভিক্ষ। পূর্ব বাংলার এ খাদ্যসংকট ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যান্য রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি নারীরাও এগিয়ে এসেছিলেন এবং এ বিষয়ে ইতোমধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে।

৫:২: আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ও নারীসমাজ (১৯৫৮-৬১ খি.)

স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ৯ বছর ১৯৫৬ সালে এর বহুল কাঙ্ক্ষিত সংবিধান গৃহীত হয়। তবে এ সংবিধান এবং এর আওতায় একটি সাংবিধানিক সরকারের অধীনে দেশ শাসনের স্বপ্ন মাত্র দু'বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয় এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করা হয়। প্রেসিডেন্ট ইসকান্দর মির্জা সামরিক শাসন জারি করলেও মাত্র ২০ দিন পর ২৭ অক্টোবর তিনি সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে শুরু হয় আইয়ুব খানের এক দশকের (১৯৫৮-৬৯খ্রি.) স্বৈরশাসন।

সামরিক শাসনের কবলে পাকিস্তান: উল্লেখ্য যে, নতুন সংবিধানের আওতায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের পদবি পরিবর্তিত হয়ে হয় 'প্রেসিডেন্ট'। সেই সুবাদে ইস্কান্দর মীর্জা (১৮৯৯-১৯৬৯ খ্রি.) গভর্নর জেনারেল থেকে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তবে তিনি নিজে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান করার বিষয়টিও সম্ভবত তাঁর মনপুত ছিল না। তিনি 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' ও 'প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার' পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ইস্কান্দর মীর্জা জাতীয় সংসদে তাঁর নিজস্ব একটি সমর্থকগোষ্ঠী তৈরি উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেন এবং এ দল ত্যাগকারী কিছু সদস্যকে দিয়ে 'রিপাবলিকান পার্টি' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন।[৪০] প্রেসিডেন্টের প্রত্যক্ষ তৎপরতায় জাতীয় সংসদে মুসলিম লীগকে ক্রমশ দুর্বল করে ফেলা হয়। এক পর্যায়ে মুসলিম লীগকে সরকার থেকেও বিতাড়িত করা হয়। প্রেসিডেন্টের সমর্থক রিপাবলিকান দল আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তবে গণতন্ত্র ও সংবিধান বিরোধী প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জার সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব শুরু হয়। যার শেষ পরিণতিতে ১৯৫৭ সালের ১৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সোহরাওয়ার্দী পদচ্যুত হন। তাঁর স্থলে রিপাবলিকান পার্টির সমর্থনে মুসলিম লীগের ইসমাইল ইব্রাহীম চুন্দ্রীগড় (আই.আই.চুন্দ্রীগড়) প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রিপাবলিকান পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জেরে মাত্র ৮ সপ্তাহের মাথায় চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এই অবস্থায় ১৯৬৭ সালের ১২ ডিসেম্বর

৪০. এতদবিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য Mustaq Ahmed, *Government and Politics in Pakistan,* Pakistan Publishing House, Karachi, 1963, pp. 46-50

আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে রিপাবলিকান পার্টির ফিরোজ খান নূনকে প্রধানমন্ত্রী করে কেন্দ্রে সরকার গঠন করা হয়।[৪১] তবে কিছু দিনের মধ্যেই নানা কারণে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফিরোজ খানের রাজনীতিতে উত্থানের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কা করেন।

ইতোমধ্যে কেন্দ্রের ন্যায় পূর্ব বাংলায়ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ গভর্নর এ কে ফজলুল হক আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। কেন্দ্রে আওয়ামী সমর্থনে গঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ঐ রাতেই ফজলুল হককে গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করেন। চীফ সেক্রেটারিকে অস্থায়ী গভর্নর নিয়োগ করা হলে তিনি আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভাকে পুনর্বহাল করেন। কিন্তু দেড় মাসের মধ্যেই আইন পরিষদে আস্থা ভোটে হেরে গেলে আতাউর রহমান খানের সরকারের পতন ঘটে। ১৯৫৮ সালের ২০ জুন কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু ন্যাপের সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগ ২৩ জুন আইন পরিষদে অনাস্থা ভোট এনে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভাকে পরাজিত করে। নিয়ম অনুযায়ী আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের কথা থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকার তা না করে ২৫ জুন পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করে। দু'মাস পর কেন্দ্রের শাসন প্রত্যাহার করে আওয়ামী লীগ আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হয়।[৪২] এইভাবে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে প্রদেশে সাতটি মন্ত্রিসভা ও তিনবার গভর্নরের শাসন চালু হয়।

উপর্যুক্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে আইন পরিষদে এক কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগ কর্তৃক আইন পরিষদের স্পীকার আবদুল হাকিমের (কৃষক-শ্রমিক দলীয়) বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনকে কেন্দ্র করে পরিষদ অধিবেশনে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা ও অচলবস্থা তৈরি হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর পরিষদ অধিবেশনে গোলযোগ চলাকালে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী (আওয়ামী লীগ) মারাত্মকভাবে আহত হন এবং ২৫ সেপ্টেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শুধু পূর্ব বাংলা নয় পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটি এক ন্যাক্কারজনক ঘটনা। এর মধ্য দিয়ে রাজনীতিবিদদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় ফুটে ওঠে। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক রাজনীতিতে এরকম বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা, উপদলীয় কোন্দল ও সরকারের অস্থিতিশীলতা গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে দেয়। পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে গণতন্ত্র, সংবিধান ও সংসদীয় সরকারের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণকারী প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জা 'দেশের রাজনৈতিক অবস্থার

---

৪১. ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টি নির্বাচনি ঐক্যজোট গঠন করবে, পাকিস্তানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট পদে সোহরাওয়ার্দী নূনকে সমর্থন দেবেন এবং পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের সরকার টিকিয়ে রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার সমর্থন দিবে-এরূপ শর্তে এ আওয়ামী লীগ ফিরোজ খান নূনকে সরকার গঠনে সমর্থন দিয়েছিল।

৪২. দ্রষ্টব্য *Proceedings of the Third Session of the Provincial Assembly East Pakistan,* 18th June, 1958, Vol.XX

বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের' অজুহাত দেখিয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি করেন।[৪৩] সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। প্রেসিডেন্ট এক ফরমান বলে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহকে বরখাস্ত, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্তি এবং রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেন।[৪৪]

আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও তাঁর কতিপয় প্রাথমিক পদক্ষেপ: নিজের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে ইস্কান্দর মীর্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেছিলেন। কিন্তু এত কিছু করেও নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারেননি। ২৭ অক্টোবর সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দর মীর্জাকে উৎখাত করে দেশত্যাগে বাধ্য করেন।[৪৫] ২৮ অক্টোবর আইয়ুব খান *The Goverment (Presidential Cabinet)* Order, 1958 জারির মাধ্যমে চলমান সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার চালু করে নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন।[৪৬] আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট পদ লাভের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে। প্রেসিডেন্ট ১৯৫৯ সালে নির্ধারিত জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করেন।

অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর ক্ষমতা দখলের যৌক্তিকতা প্রমাণ ও গণসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামো নির্মাণে দ্রুত কতগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সরকারের শাসনামল এবং রাজনীতিবিদদের ক্ষমতালিপ্সু, স্বার্থান্ধ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে প্রমাণ করার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ নেন। ১৯৫৯ সালে Elective Bodies Disqualification Order 1959 (EBDO) এবং Public Office Disqualification Order (PODO) নামক দু'টি নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করা হয়।[৪৭] EBDO এর আওতায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩), খান আবদুল গাফ্ফার খান (১৮৯০-১৯৮৮) ও মিয়া মমতাজ দৌলতানাসহ ৮৭ জন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে অভিযুক্ত করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা।[৪৮] সামরিক সরকার EBDO আইনের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের যে ৪৩ জন রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এনে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এদের মধ্যে প্রাক্তন পরিষদ সদস্য বেগম আনোয়ারা খাতুন, রাজিয়া বানু এবং সেলিনা বানু প্রমুখ অন্যতম

---

৪৩. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ. ৬৪

৪৪. খোকা রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪

৪৫. A. Akanda, "The 1962 Constitution of Pakistan and the Reaction of the People of Bangladesh", *The Journal of the Institute of Bangaldesh Studies,* Vol. III (1978), p. 71.

৪৬. Goverment of Pakistan, *Constitutional Documents (Pakistan) Volume IV-B* (Karachi, Ministry of Law and Parliamentary Affairs (Law Division), 1964, p. 1507

৪৭. EBDO ও PODO সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, *২য় খণ্ড*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৫-১৯ পরবর্তীতে *স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র* হিসেবে উল্লেখ করা হবে।

৪৮. EBDO এর তালিকায় সাজাপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদদের তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, *২য় খণ্ড*, পৃ. ২০- ২২

ছিলেন।[৪৯] শুধু রাজনীতিবিদ নয় শিক্ষাঙ্গণে ছাত্র শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সংসদগুলো বাতিল করা হয়। অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টির 'উস্কানিদাতা' বলে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর অফিস কক্ষগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।[৫০]

আইয়ুব খান সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থেই ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন–এটি প্রমাণের জন্যও কিছু ত্বরিত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল মজুতদারি ও কালোবাজারি বন্ধ করে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভূমি সংস্কার ১৯৬১' উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা প্রণয়ন, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন প্রথা চালু এবং বহু বিবাহ প্রথার ওপর নিয়ন্ত্রণারোপ ইত্যাদি।[৫১] উল্লেখ্য যে, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলের নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ভূমি সংস্কার। এ লক্ষ্যে আখতার হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আইয়ুব খান জমিদারদের জন্য ভূমির সিলিং নির্ধারণ করে জমিদার ও জায়গিরদারদের কাছ থেকে বিনা ক্ষতিপূরণে ২২ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করে তা দেড় লক্ষ ভূমিহীন কৃষক পরিবারের মধ্যে বণ্টন করে দেন।[৫২] আইয়ুব খানের শাসনামলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১'–যা এখনও বাংলাদেশে চলমান। এ আইনে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, বহু বিবাহ, তালাক, দেনমোহর, স্ত্রীর ভরণপোষণ ইত্যাদি বিষয়ের বিধান সন্নিবেশিত আছে। মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এ আইনের বিরুদ্ধ মত আসলেও প্রগতিশীল বিশেষ করে নারীসমাজ এ আইনটি সাদরে গ্রহণ করে। জাতীয় পরিষদ সদস্য বেগম রোকাইয়া আনোয়ারের পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন:

> যদিও ইসলামে নারীদের পুরুষের মতোই অধিকার ও সমতা দেওয়া হয়েছে, তথাপি যুগ যুগ ধরে পুরুষশাসিত সমাজ দ্বারা নারীরা অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হয়ে আসছে।...এ অত্যাচার এবং উৎপীড়নের মূলোৎপাটন করার জন্যই ১৯৫৫ সালের ৪ আগস্ট তারিখে পাকিস্তান সরকার মুসলিম পারিবারিক আইন কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে এ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মুসলিম পরিবার অর্ডিন্যান্সটি প্রবর্তিত হয়।...যারা বলেন মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সটি কোরান ও সুন্নাহবিরোধী- আমি বলবো হয় তারা ভুল বলেন, আর না হয় তারা ইচ্ছে করেই অর্ডিন্যান্স করেই মিথ্যা কথা বলেন।[৫৩]

---

৪৯. শেখ হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট*, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১০৯-১১০

৫০. মোহাম্মদ হান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

৫১. মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ এখনো বাংলাদেশে বলবৎ আছে। এ আইনটি সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা রয়েছে, ডি এফ মুল্লা, *মুসলিম আইনের মূলনীতি* (শেখ মতলুব আহমদ অনূদিত), ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ .৪৯৬-৫০১

৫২. Khalid Bin Sayeed, *The Political System of Pakistan,* Oxford University Press, Dacca,1967 pp. 95-97

৫৩. *সাপ্তাহিক বেগম*, ১৩ জানুয়ারি, ১৯৬৩, মালেকা বেগম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *নির্বাচিত বেগম: অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০*, ১ম খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪১৫

তবে এ সময় আইয়ুব খানের গৃহীত রাজনৈতিক পদক্ষেপসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বিতর্কিত পদক্ষেপ ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে 'মৌলিক গণতন্ত্র' (Basic Democracy) নামক এক উদ্ভট গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুকরণ।[৫৪] নিজ ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করতে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান তৃণমূল পর্যায়ে 'মৌলিক গণতন্ত্র' (Basic Democracy) নামে অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। মৌলিক গণতন্ত্র হলো চার স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। এ গণতন্ত্রের চারটি স্তর ছিল। নিচের দিক থেকে এই স্তরগুলো ছিল : (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল (গ্রাম এলাকায়) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহর এলাকায়), (২) থানা কাউন্সিল (পূর্ব পাকিস্তানে) বা তহশিল কাউন্সিল (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা কাউন্সিল এবং (৪) বিভাগীয় কাউন্সিল।[৫৫] ১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারি সারাদেশে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে জনসাধারণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণকে অর্থাৎ তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীগণকে (Basic Democrats বা B.D. Member) নির্বাচিত করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০,০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হন।[৫৬] এ ব্যবস্থায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় মৌলিক গণতন্ত্রীদের ওপর। ফলে সাধারণ ভোটাররা জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনের পর আইয়ুব খান ১৯৬০ সালের ১৩ জানুয়ারি The Presidential (Election and Constitutional) Order, 1960' জারি করে এর আওতায় তাঁর ক্ষমতাকে আইনসিদ্ধ করার পদক্ষেপ হিসেবে একটি রেফারেন্ডাম বা গণভোটের ব্যবস্থা করেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এ গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা হ্যাঁ-না ভোট দিয়ে আইয়ুব খানকে এক বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেন।[৫৭] এর মধ্য দিয়ে আইয়ুব খান পাকিস্তানের একটি ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নেরও ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে আইয়ুব খান পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। মৌলিক গণতন্ত্রীগণের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ নির্বাচিত হন।

পূর্ব বাংলায় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ও নারীসমাজ: ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারির মাধ্যমে কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলোতে গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় শাসনব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে আইয়ুব খান দেশের সকল

---

৫৪. আইয়ুব খান কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্র আইন ঘোষিত হয়েছিল ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর। এতদবিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মো: মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৫৪-১৫৬

৫৫. President's Order no.18 27th October, 1959, Basic Democracies Order, 1959, in *Constitutional Documents, vol. IB-V*, Government of Pakistan, pp. 1534, 1623

৫৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬-৫৯

৫৭. গণভোটে ৮০ হাজার ভোটের মধ্যে ৭৮,৭২০ টি ভোট পড়ে, তন্মধ্যে হ্যাঁ-ভোট ছিল ৭৫,২৮২ টি। S.A.Akand, "Was Parliamentary system of Government a Failure in Pakistan? A Case Study of a Constitutional Debate in Pakistan during Martial Law, 1958-62" *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. Vi*, 1982-83, p.163

প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দেশে সামরিক স্বৈরশাসন প্রবর্তন করেন। রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করায়, দুর্নীতি দমনের নামে দেশের জনপ্রিয় ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের উপর উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তদুপরি মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে নিজস্ব অনুগত বাহিনী গঠন করার ফলে সামরিক শাসনামলের ৪৪ মাসে তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কোনো আন্দোলন সংঘটিত হয়নি, কিংবা কোনো বক্তব্য-বিবৃতি উচ্চারিত হয়নি। এ কথাও বলা হয় যে, আইয়ুব খান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিবেন। প্রশাসনকে কলুষমুক্ত করার জন্য সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। এ কাজটি সম্পন্ন হলে গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করে তিনি দেশকে একটি সংবিধান উপহার দিবেন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে।[৫৮] ১৮ অক্টোবর ৩ জন ব্রিটিশ সাংবাদিককে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তাতেও এরকমই ইঙ্গিত ছিল।[৫৯] ফলে সম্ভবত জনগণের মধ্যে এক রকমের আস্থা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে আইয়ুব শাসন সম্পর্কে জনগণের মোহমুক্তি ঘটে। এ সময়কার জনপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় *The Pakistan Observer* পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় থেকে। সেখানে বলা হয়:

> From the tone of the letters we are receiving daily, it would appear that the common man is much more optimistic in airing his complaints and grievances now-a days than he has been in the past. Previously they added in riders saying such things as, of course, nothing will be done about it, or it is probably waste of time fir me to bring this matter to the attention authorities through your columns etc.... It remind a fact, however, their pessimism was justified since, in almost every case, no action whatsoever, was taken to rectify them.[৬০]

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, আইয়ুবী সামরিক শাসনামলের প্রথম ৪৪ মাস তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো আন্দোলন হতে পারেনি। তবে জামালপুরের কতিপয় তরুণ আলী আছাদের (ওরফে কালো খোকা) নেতৃত্বে, 'পূর্ববাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট' নামে একটি বিপ্লবী দল গঠন করে, এ দলের লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করা।[৬১] সরকারি এক গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এ বিপ্লবী দলের সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী লেখা সংবলিত অসংখ্য প্রচারপত্র প্রকাশ ও প্রচারের কাজ করেন।[৬২] প্রকাশ্যত আইয়ুব বিরোধী কোনো আন্দোলন সংঘটিত হতে না পারলেও তাঁর গৃহীত কিছু ইস্যু নিয়ে পরোক্ষভাবে

---

৫৮. সালাহ্উদ্দিন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৯১-৯২

৫৯. *Dwan (Karachi),* 9 October, 1958

৬০. *The Pakistan Observer,* 12 November, 1958

৬১. পূর্ব বাংলার লিবারেশন ফ্রন্ট সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক তৎপরতার উপর সরকারি গোপন প্রতিবেদন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২

৬২. Secretary, Ministry of Home affairs, Goverments of Pakistan, the note, entitled, "The Poster Campaign in East pakistan" for Governors Conference, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩-৪১

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আবরণে নানান কৌশলে নীরব আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫৮-১৯৬১ সাল পর্যন্ত আইয়ুব বিরোধী যে আন্দোলন হয়েছিল তার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময়কার আন্দোলনগুলো ছিল মূল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং এসব আন্দোলনে পূর্ব বাংলার নারীসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। এ পর্যায়ের আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় 'সংস্কৃতি সংসদ', ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের 'শিল্প সাহিত্য পার্টি, খেলাফত রাব্বানীর 'সাংস্কৃতিক পরিষদ', ঢাকা মেডিকেল কলেজের 'অগ্রগামী' এবং চট্টগ্রামের 'ইউ.এস.পি.পি' প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংগঠন অন্যতম ছিল। এসব সংগঠনের নেতা কর্মীরা সাংস্কৃতিক তৎপরতার আবরণে গোপন রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু করেছিলেন। কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বাধীন 'সর্বদলীয় মহিলা কর্মপরিষদ'ও এ সময় গোপনে ও নীরব কৌশলে সরকারবিরোধী প্রতিবাদী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিলেন।[৬৩]

১৯৫৮ সালে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ করা হলেও ১৯৫৯ সালে এসে নারীসমাজ কিছু কিছু সভা সমাবেশ ও মিলাদ মাহফিলে অংশ নিতে পারতো। ১৯৬০ সালের শুরুতে নারী সংগঠনগুলো যেমন, গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, ওয়ারী মহিলা সমিতি, আপওয়া নিখিল পাকিস্তান সমাজকল্যাণ সমিতি প্রমুখ তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করে।[৬৪] ১৯৬০ সালের ২১ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান নারীসমাজের উদ্যোগে বেগম রোকেয়া স্মৃতি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি নারীদের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকরণ, নারীশিক্ষা সংকোচন বন্ধকরণ, অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধকরণ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধকরণ, নির্বাচনে নারীদের জন্য জাতীয় পরিষদে ৩ টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৫ টি আসন সংরক্ষণ ও মুসলিম পারিবারিক আইন প্রবর্তন ইত্যাদি কিছু দাবি তুলে ধরেন।[৬৫] আইয়ুব সরকারের শুরুর দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নানা রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন আনার জন্য নানা রকম উদ্ভট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের কপালে টিপ পরা নিষিদ্ধ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কপালে টিপ পরলে ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিস্কারসহ বিভিন্ন রকমের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রীসমাজের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় তা তাদের আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে মনে হয়।

বাংলা ভাষার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাবের কথা সুবিধিত। পূর্বসূরিদের মতো আইয়ুব খানও একই রকম বৈরী মনোভাবাপন্ন ছিলেন। পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে সংহতি বিধানের প্রয়োজনীয়তার অজুহাত দেখিয়ে তিনিও পাকিস্তানে ভাষা সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।[৬৬] এ লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে 'বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য একটি কমিটি'

---

৬৩. আসমা পারভীন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৮
৬৪. অদিতি ফাল্গুনী, *বাংলার নারী সংগ্রামের ইতিহাস*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯৬-৯৭
৬৫. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
৬৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৪৮-৫৩

গঠনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার সংস্কার ও রোমান হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়।[৬৭] এ আইয়ুবী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়। এ হীন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রতিবাদলিপি ছাপা হয়। *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি 'হরফ পরিবর্তন প্রসঙ্গে' শীর্ষক দু'টো সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।[৬৮] জনপ্রিয় *মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা*ও রোমান হরফে বাংলা লেখার সরকারি উদ্যোগের প্রতিবাদ জানায়।[৬৯] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এবং ১৯৬০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষা সংস্কারের বিষয়ে সামরিক জান্তার প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করা হয়।[৭০] এইসব প্রতিবাদের মুখে আইয়ুব খানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ সময় সামরিক সরকার কবি নজরুলের কবিতাসহ প্রচলিত কিছু বাংলা কবিতার শব্দ পরিবর্তন করে পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করলে পূর্ব বাংলায় তারও প্রতিবাদ করা হয়।[৭১]

১৯৬১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পালনকে কেন্দ্র করেও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা দেয়। সরকারের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে দিবসটি যথাযথাভাবে পালনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ উদ্যোগ নেয়। ৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী ও ডাকসু'র সহ-সভানেত্রী জাহানারা আক্তারের সভাপতিত্বে ছাত্র প্রতিনিধিদের এক সভা ডাকসু অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শহীদ দিবস ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দিবসটি উদযাপনে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। তাছাড়া ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা, শহীদ মিনারের নির্মাণকাজ সমাপ্তকরণ এবং জাতীয় জীবন ও প্রশাসনের সর্বস্তরের বাংলা ভাষা চালু করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান সংবলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন হলের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদানেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৭২]

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনকে কেন্দ্র করেও পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে এ কিংবদন্তী কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কারণে পূর্ব বাংলার স্কুল কলেজ এমনকি পাড়া-মহল্লায়ও রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী পালন ছিল একটি দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য। রবীন্দ্র বিদ্বেষী আইয়ুব খান ও তাঁর অনুচরেরা রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সরাসরি বন্ধ না করলেও এর

---

৬৭. সাঈদ-উর-রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

৬৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯

৬৯. *মাসিক মোহাম্মদী*, চৈত্র ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫০১; সাঈদ-উর-রহমান প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৭০. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩

৭১. সরকারের ভাষায় অমুসলিম শব্দের পরিবর্তে মুসলিম শব্দ প্রতিস্থাপন। যেমন নজরুল রচিত বাংলাদেশের বর্তমান রণ সংগীত হিসেবে গৃহীত 'চল চল চল' কবিতার 'মহাশ্মশান' শব্দের স্থলে ' গোরস্থান' শব্দ বসানো হয়। আরো দৃষ্টান্তের জন্য দ্রষ্টব্য মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩

৭২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, ছাত্রদের শহীদ দিবস পালন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন চিঠি, গোয়েন্দা শাখা, পূর্ব পাকিস্তান, লালবাগ, ঢাকা, তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি , ১৯৬১ নং- ৩৫৮২; শেখর দত্ত, ষাটের দশকের গণজাগরণ, ঘটনা, পর্যালোচনা প্রভাব, সমাজ বিকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৮৯

বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। পূর্ব পাকিস্তানের তথ্য সেক্রেটারি খাজা শাহাবুদ্দিনের জামাতা মুসা আহমেদ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন না করার জন্য ঢাকার শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী মহলকে ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করেন। সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সামরিক সরকার কে.জি. মোস্তফা, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকারি মনোভাবের কারণে বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কোনো অনুষ্ঠান পালন করেনি।[৭৩] অবশ্য কিছু কিছু জেলায় বিভিন্ন স্কুল কলেজে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়। সরকারের সরাসরি নিষেধাজ্ঞা না থাকায় কোনো কোনো জেলায় জেলা প্রশাসকসহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকতাগণও এসব আয়োজনে যুক্ত হয়েছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি এস এম মুর্শেদকে সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক ড. খান সারওয়ার মোর্শেদকে সম্পাদক করে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ৪ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান করে।[৭৪] ডাকসুর সহ-সভাপতি বেগম জাহানারা আক্তার ও সাধারণ সম্পাদক অমূল্য কুমার রায়ের উদ্যোগে কার্জন হলে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল।[৭৫] উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সকল রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে মহান কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৭৬] রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী সন্‌জীদা খাতুন বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ বছরই তাঁর উদ্যোগে সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসার ছিল এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং এর বিকাশে সন্‌জীদা খাতুনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ওয়াহিদুল হক ও আহমেদুর রহমান প্রমুখ।[৭৭] কবি বেগম সুফিয়া কামালকে সভাপতি ও ফরিদা হাসানকে সম্পাদিকা করে ছায়ানটের একটি কমিটি গঠন করা হয়। সরকারি চাকরিজীবী বলে কমিটিতে সনজীদা খাতুনের নাম অন্তর্ভুক্ত রাখা সম্ভব হয়নি। সন্‌জীদা খাতুন সেই থেকে ছায়ানটের হাল ধরে আছেন এবং শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সমাজ প্রগতির ধারাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।[৭৮]

ময়মনসিংহে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পণ্ড করার জন্য মোনায়েম খাঁ অনুসারীগণ সর্বাত্মক চেষ্টা করে। ওয়াহিদুল হক ও সন্‌জীদা খাতুনের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী আলোকময় নাহা প্রমুখ এর প্রতিবাদে আন্দোলনের হাল ধরেন। প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে শিল্পী সুমিতা নাহা প্রমুখ এ অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন।[৭৯] সরকারি বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে খাদিজা

---

৭৩. রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
৭৪. শেখর দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫-৯৬
৭৫. সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ. ৮১
৭৬. *দৈনিক আজাদ*, ২৩ এপ্রিল, ১৯৬১
৭৭. শেখর দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬
৭৮. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০
৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭

সিদ্দিকী। তিনি রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের অন্যতম সংগঠক হিসেবেও কাজ করেন। এ বিষয়ে তাঁর সহযোগী হিসেবে যে সকল নারীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিবেদিতা মণ্ডল, কমলা ঘোষ, শামসুন্নাহার খান, অঞ্জলী অধিকারী, তৃপ্তি, সুপ্তি ও নার্গিস প্রমুখ অন্যতম ছিলেন।[৮০]

এভাবেই প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা হয়। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা ছিল দুঃসাহসিক কাজ। আর পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা এ দুঃসাহসিক কাজটি করেন এবং এ কাজে নারী সমাজও গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আর এ কাজের মধ্য দিয়ে সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ভবিষ্যত রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

৫.৩ পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম (১৯৬২-৬৪) ও নারীসমাজ

বাংলার ইতিহাসে ১৯৬২-৬৫ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময় পূর্ব বাংলায় আইয়ুবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধান জারি, জাতীয় নির্বাচন, শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন পর্যালোচনাধীন সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত আন্দোলন সংগ্রামে বাঙালি নারীসমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এখনকার আলোচনায় আলোচ্য সময়কালের আন্দোলন কর্মসূচিতে নারীসমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকবে।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ থাকায় শুরুতে পূর্ব বাংলায় কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময় পরিচালিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রভাবে বাঙালির মনোজগতে ও বহির্জগতে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মনোভাব জোরালো হতে থাকে। ১৯৬২ সালে এসে তা প্রকাশ্যরূপ পরিগ্রহ করে। তবে ১৯৬১ সাল থেকেই গোপনে আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক তৎপরতার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৯৬১ সালের শেষের দিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, কমেরড মণি সিংহ ও খোকা রায়ের এক গোপন বৈঠকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হন। সিদ্ধান্ত হয় যে, আইয়ুব খান কর্তৃক শাসনতন্ত্র ঘোষণার সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করবে এবং তারপর ক্রমান্বয়ে তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ঐ বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন এ বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করবে।[৮১]

---

৮০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯

৮১. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৪

১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সামরিক সরকার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করে। এর প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ প্রতিবাদী রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রদান করে। ১-৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছাত্র ধর্মঘট ও রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। এসব কর্মসূচিতে ছাত্রীরাও অংশ নিয়েছিল। ছাত্র আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে ৫ ফেব্রুয়ারি কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান ও তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রমুখ রাজনীতিবিদসহ অনেক ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৮২] তবে এতে করে রাজনৈতিক আন্দোলন একেবারে প্রশমন করা সম্ভব হয়নি। বরং ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ ও ইচ্ছা অনুযায়ী পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান জারি করলে এর প্রতিক্রিয়া পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন পরিচালিত হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির সময় ১৯৫৬ সালে কার্যকর হওয়া পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানটি বাতিল করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের অবস্থান ও ক্ষমতা সুসংহত করার পর আইয়ুব খান একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শাহাবুদ্দিনকে প্রধান করে 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন' (BNR) নামে এগারো সদস্যবিশিষ্ট একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিশন গঠন করেন।[৮৩] প্রেসিডেন্টের খবরদারিসহ নানা জটিলতার মধ্যে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে কমিশন একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে এবং ১৯৬১ সালের ৬ মে তা প্রেসিডেন্টের নিকট জমা দেয়। কমিশন তার রিপোর্টে সংবিধান সংক্রান্ত সুপারিশমালায় পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন রাষ্ট্র করার এবং একইসঙ্গে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পরামর্শ দেয়। কমিশন মৌলিক গণতন্ত্রব্যবস্থাকে দৃঢ় সমর্থন প্রদান করে। রিপোর্টে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার পদ্ধতির এবং শক্তিশালী আইন পরিষদ এবং শাসন বিভাগের ওপর আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ রাখার সুপারিশ করা হয়। কমিশন দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ এবং পাকিস্তানের এক অংশ থেকে প্রেসিডেন্ট ও অন্য অংশ থেকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেরও সুপারিশ করে। কমিশন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর তা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিসভায় পর্যালোচনা করা হয়। তাছাড়া এটি রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত গভর্নরদের সভায়ও এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়। কিন্তু কমিশনের সুপারিশকৃত খসড়া সংবিধানটি প্রেসিডেন্টের মনঃপূত- না হওয়ায় এটি তিনি গ্রহণ করেননি।

---

৮২. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

৮৩. এ কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন: পূর্ব পাকিস্তান থেকে আজিজ উদ্দিন আহমদ (প্রথম গণপরিষদ সদস্য এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী), ডি. এ. বারুই (সংখ্যালঘু প্রতিনিধি এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মন্ত্রী), আবু সাঈদ চৌধুরী (পূর্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেল), ওবায়দুর রহমান নিজাম (ব্যবসায়ী প্রতিনিধি) এবং আফতাব উদ্দিন আহমদ (কৃষিজীবী প্রতিনিধি)। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচারপতি মোহাম্মদ শরীফ (সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি), নাসির উদ্দীন (শিল্পপতি), আরবাব আহমদ আলী জান (একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ), সরদার হাবিবুল্লাহ (কৃষি প্রতিনিধি), এবং তোফায়েল আলী, এ. রহমান (সিন্ধুর একজন এডভোকেট)। বিস্তারিত দেখুন, S.A.Akand, "Was Parliamentary system of Government a Failure in Pakistan ? A Case Study of a Constitutional Debate in Pakistan during Martial Law, 1958-62" *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. Vi*, 1982-83, p.163 ; *দৈনিক আজাদ*, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০।

১৯৬১ সালের ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত গভর্নরদের সভায় সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আরেকটি নতুন একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি জনগণ কী চায় তাকে প্রাধান্য না দিয়ে 'জনগণের জন্য কী মঙ্গলজনক' এই নীতির ভিত্তিতে সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করে প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করে। প্রেসিডেন্ট এটি গ্রহণ এবং ১৯৬২ সালের ১ মার্চ নতুন সংবিধান ঘোষণা করেন। ১৯৬২ সালের ৮ জুন নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয়।[৮৪]

১৯৬২ সালের সংবিধান ছিল একটি প্রতিক্রিয়াশীল ও অগণতান্ত্রিক সংবিধান। এ সংবিধানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রকে সাংবিধানিক রূপ দেন। জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে পাকিস্তানে একনায়কতন্ত্র ও কায়েমী স্বার্থের ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সকল স্বীকৃত নীতিকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সরকার তথা রাষ্ট্রপতির হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। এ সংবিধানের মাধ্যমে নাগরিক স্বাধীনতা এবং মৌলিক অধিকার খর্ব করার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৬২ সালের সংবিধান ছিল মূলত ব্যক্তি আইয়ুব খান দ্বারা নিজের স্বার্থে প্রণীত একটি সংবিধান। এতে পূর্ব পাকিস্তানিদের দাবি-দাওয়া চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়। এ অবস্থায় এ সংবিধান ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৬১ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মধ্যে একটি গোপন রাজনৈতিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংবিধান জারির পরপরই ছাত্রসমাজ নতুন শাসনতন্ত্র বাতিল, পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সকল রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে।[৮৫] সরকারও আন্দোলন প্রশমনের জন্য প্রচণ্ড ছাত্র-দলন শুরু করে। বহু সংখ্যক ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। উল্লেখ্য যে, সংবিধানের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছাত্র আন্দোলনে সচেতন ছাত্রীরাও অংশ নিয়েছিলেন। তবে এ আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ আরো বেশি কাম্য ছিল। কেননা ১৯৬২ সালের সংবিধানে সরকার নারীদের অধিকার সংকুচিত করেছিল। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে নারীদের জন্য ১০টি করে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এসব আসনে নারীরা প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারতেন। কিন্তু নতুন সংবিধানে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা কমিয়ে ৬ টি করে করা হয়। তাছাড়া এসব সংরক্ষিত আসনে প্রতিনিধি নির্বাচনে নারীদের প্রাপ্ত ভোটাধিকারও হরণ করা হয়। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদের সংরক্ষিত ৬ টি নারী আসনে সদস্য মনোনয়ন দেওয়া হতো।[৮৬] বলা বাহুল্য যে, সংবিধানের এ নতুন

---

৮৪. এ সংবিধান ও এর প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য Susheela Kaushik, Constitution of Pakistan at Work, *Asian Survey*, Vol. 3, No. 8 (Aug., 1963), pp. 384-389; মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯-৬২

৮৫. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ৩৮

৮৬. Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (Eds.), *Women of Pakistan;* Zed Books Ltd, London & New Jersey, USA, 1987, p. 60

বিধানটি নারীসমাজকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। তবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকায় সম্ভবত নারীসমাজ প্রত্যাশিত পর্যায়ে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেনি।

আইয়ুব খানের জারিকৃত সংবিধান নিয়ে যখন জনমনে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজমান, এর মধ্যেই তিনি জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ও তফসিল ঘোষণা করেন। ১৯৬২ সালের ২৩ মার্চ *'The National and Provincial Assemblies (First Elections) Order, 1962'* জারির মাধ্যমে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পরোক্ষ ভোটের এ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ পুনরায় আন্দোলনের' ডাক দেয়। ছাত্রদের নির্বাচন বিরোধী আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। তবে সরকার যথা সময়ে নির্বাচন আয়োজন করে। সব দলের অংশগ্রহণ না থাকা সত্ত্বেও এ নির্বাচনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণই হয়েছিল।[৮৭] এ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে সংরক্ষিত ৬টি নারী আসনের মধ্যে পূর্ব বাংলার জন্য নির্ধারিত আসন ছিল ৩টি। এ তিনটি আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যগণ ছিলেন ঢাকা থেকে বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ ও বেগম রোকেয়া আনোয়ার এবং সিলেট থেকে বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্ধারিত সংরক্ষিত নারী আসনে প্রতিনিধি হয়েছিলেন:

১. সংসদীয় নির্বাচনি এলাকা দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা: হামিদা চৌধুরী।
২. কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও বাকেরগঞ্জ: আয়শা সরদার
৩. ফরিদপুর ও ঢাকা: আখতার জাহান খান
৪. টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ: খালেদা হাবিব
৫. কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম: তোফাতুন্নেসা।[৮৮]

উল্লেখ্য যে, এ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসন ছাড়া সাধারণ আসনে নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। ১৯৬২ সালের নির্বাচনেই প্রথম যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর দেশে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি চালু থাকার পর এ নির্বাচনেই প্রথম সকল ধর্মের লোক যৌথ নির্বাচন পদ্ধতিতে একত্রে ভোট প্রদান করে। এছাড়া ১৯১৯ সাল থেকে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে হওয়া আইন পরিষদের নির্বাচন এ প্রথম পরোক্ষ পদ্ধতিতে হয়।[৮৯]

---

৮৭. Karl Von Vorys, *Political Develop in Pakistan,* Princeton University Press, New jersey, 1965. p. 238

৮৮. এডভোকেট এ. বি. এম রিয়াজুল কবীর কাওছার, *আইন বিধিমালা তথ্য ও ফলাফল*, বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা উপজেলা পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০১২), বাংলাদেশ নির্বাচন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৮০৬

৮৯. M. Mahfuzul Huq, *Electoral Problems in Pakistan*. Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1966, p. 164-165

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বাঙালি নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল এবং এ বিষয়ে অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। তবে ১৯৬২ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে এমনটা হয়নি। কারণ এ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসনে নারীদের কোনো ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ ছিল না। তদুপরি সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতারও কোনো সুযোগ না থাকায় এ নির্বাচনের ব্যাপারে বাঙালি নারীসমাজের তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়নি।

পূর্ব বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ছাড়াই ১৯৬২ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলার ছাত্র জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নিকট বিবৃতির মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তিদান, গ্রেপ্তারি পরওয়ানা প্রত্যাহার, সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মুক্তি, রাজনৈতিক কর্মী ও বন্দিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ প্রত্যাহার, রাজনৈতিক নেতাদের ওপর আরোপিত EBDO ও PODO প্রভৃতি কালাকানুনের প্রত্যাহার, বাক ও সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা প্রদানসহ ছাত্রদের স্বার্থ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ১৫ দফা দাবি উত্থাপন করে। ছাত্রদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে আইনসভায় সরকারবিরোধী গ্রুপ নিজেদের জন্য ৮ দফা নীতিমালা গ্রহণ করে। এগুলো হলো মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, বিনা বিচারে ডিটেনশনের বিরোধিতা, সকল রাজনৈতিক বন্দির আশু মুক্তি ইত্যাদি। ৮ জুন রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের ৭৮ জন সদস্যের ৬০ জন সদস্যই সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়াসহ দলীয় রাজনীতি উন্মুক্ত করার দাবি জানায়।[৯০] ২৪ জুন পূর্ব পাকিস্তানের ৯ জন নেতা একটি যৌথ বিবৃতি দেয় যা 'নয় নেতার বিবৃতি' নামে পরিচিত।[৯১] বিবৃতিতে মৌলিক গণতন্ত্রকে প্রত্যাখান করা হয়। পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক ও অকার্যকর সংবিধান বাতিল করে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পরিষদের মাধ্যমে ছয় মাসের মধ্যে নতুন সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানানো হয়। তাছাড়া বিবৃতিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগসহ পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিরাজমান বিপুল অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।[৯২] প্রত্যক্ষ কর্মতৎপরতা দেখা না গেলেও ছাত্রসমাজ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রাগুক্ত দাবিসমূহের প্রতি নারীসমাজের যে সমর্থন ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৬২ সালে প্রথম প্রকাশ্যে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আন্দোলন করা হয় যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা ও

---

৯০. S. A. Akand, *op.cit.* p. 89; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-১৭২

৯১. এ বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীগণ হলেন, আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমান খান, কে এস পি এর হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) ও পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ, মুসলিম লীগের ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ও নূরুল আমীন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মাহমুদ আলী।

৯২. S. A. Akand, *op.cit.*, p. 91

জনমত গড়ে তোলা ছিল দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জের কাজ যে চ্যালেঞ্জ ছাত্রসমাজ গ্রহণ করেছিল। মূলত আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করে এবডোর আওতায় প্রায় ৪৩ জন নেতাকর্মীকে আটক করে রাখেন। সেখানে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তীতে সোহরাওয়ার্দীকে করাচী থেকে গ্রেপ্তার করার খবর পূর্ব বাংলায় পৌঁছার সাথে সাথে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যার ফলে ৬২'র ছাত্র আন্দোলন যা আইয়ুব বিরোধী বৃহত্তর রাজনীতির পথ উন্মুক্ত করে দেয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের উভয় অংশে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াই শুরু করেছিলেন। তার গ্রেপ্তার পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। পরবর্তীতে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন ৩১ জানুয়ারি এক বৈঠকে ১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। ১ তারিখ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। পর পর কয়েকদিন এভাবে ধর্মঘট চলতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এক মাসের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৯৩]

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন ও নারীসমাজঃ বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে বিশ শতকের ষাটের দশক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ দশকে পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের ঘটনাসমূহের মধ্যে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি ছিল পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক গঠিত শরীফ শিক্ষা কমিশনের অগণতান্ত্রিক এবং শিক্ষা ও শিক্ষার্থী স্বার্থবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ পরিচালিত আন্দোলন। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ১৭ সেপ্টেম্বর এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। এটি 'শিক্ষা আন্দোলন' হিসেবে পরিচিত হলেও এ আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্বও কম ছিল না। বস্তুত, পঞ্চাশের দশকের স্বাধিকার আন্দোলন ও ষাটের দশকের শেষ দিকের স্বাধীনতার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণে যোগসূত্র ও সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেছিল এ শিক্ষা আন্দোলন। এ আন্দোলনের পথ ধরেই পূর্ব বাংলায় আইয়ুব খানের সামরিক শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পুনরায় রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম শুরু হয়। এ বিবেচনায় ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচ্য। জাতীয় জীবনের এ তাৎপর্যবাহী বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার ছাত্রদের পাশাপাশি নারী শিক্ষার্থী ও কর্মীদেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল। সে সময়কার স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্যহারে অংশগ্রহণ করে।

সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে অসাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর আইয়ুব খান বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব উদ্যোগ ও সংস্কার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এর মধ্যে শিক্ষা সংস্কার পদক্ষেপ অন্যতম। একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের দুই মাস পরই একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

---

৯৩. মাহমুদুর রহমান মান্না, *বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪৭-৪৮; সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতিবাদে ছাত্ররা যে আন্দোলন করে সে সম্পর্কে সরকারের প্রেসনোট দ্রষ্টব্য: হাসান হাফিজুর রহমান, স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭

প্রেসিডেন্টের নির্দেশে ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের তদানিন্তন শিক্ষা সচিব এস.এম শরীফকে সভাপতি করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট 'The Commission on National Education' বা 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করে। কমিশনের সভাপতির নামানুসারে এই কমিশন 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' নামেই সমধিক পরিচিত।[৯৪] ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কমিশনের কার্যক্রম উদ্বোধন করার সময়ই এর ম্যান্ডেট নির্ধারণ করে দেন। তিনি নির্দেশনা দেন যে, কমিশন যেন এমন একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে, যাতে স্বাধীন পাকিস্তানের অন্তর্জাগতিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আরো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় এবং এ শিক্ষাব্যবস্থা কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়নে সহায়তা করে জাতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে পারে।[৯৫] জাতীয় শিক্ষা কমিশন ফোর্ড ফাউন্ডেশনের[৯৬] উপদেষ্টা এবং মার্কিন শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রায় আট মাস নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ১৯৫৯ সালের ২৬ আগষ্ট অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট হিসেবে এর সুপারিশ প্রেসিডেন্টের কাছে দাখিল করে।[৯৭] এ রিপোর্টটি পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা দপ্তর ১৯৬১ সালে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে করাচি থেকে *Report of the Commission on National Education,* 1959 শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে।

শরীফ কমিশনের রিপোর্ট ছিল শিক্ষার বহুতর বিষয় সংবলিত একটি পরিধিবহুল পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। মুখবন্ধ ও ভূমিকা ছাড়াও এটি ২৭ টি অধ্যায় এবং ৩ টি পরিশিষ্ট অধ্যায়ে বিন্যস্ত ছিল।[৯৮] শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদি প্রাথমিক, মাধ্যমিক (নবম-দ্বাদশ শ্রেণি) ও উচ্চতর -এ তিন স্তরে ভাগ করা হয়। কমিশন রিপোর্টে উচ্চশিক্ষাকে Distinct Stage হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের

---

৯৪. জাতীয় শিক্ষা কমিশনের অন্য সদস্যরা ছিলেন: (১) রমিজউদ্দিন সিদ্দিকী, সদস্য, পাকিস্তান আনবিক শক্তি কমিশন; (২) কর্ণেল এম কে আফ্রিদি, উপাচার্য, পেশওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) বি.এ হাসমী, উপাচার্য, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) ডঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) ডঃ এ এফ এম আব্দুল হক, চেয়ারম্যান, ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, (৬) ড. এ এফ আতোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (৭) ডঃ এ রশিদ, অধ্যক্ষ, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, (৮) আর. এম. ইউইং, অধ্যক্ষ, ফরমান খ্রীস্টান কলেজ, লাহোর, (৯) কর্ণেল হামিদ খান, পরিচালক, সামরিক শিক্ষা, এবং (১০) ব্রিগেডিয়ার এম, হামিদ শাহ, ডাইরেক্টর অব অরগানাইজেশন, জেনারেল হেড কোয়ার্টার। Ministry of Education Resolution, Karachi, 30th December, 1958 in *Report of the Commission on National Education,* 1959, Government of Pakistan, Ministry of Education, Karachi, 1961, p. 347

৯৫. *Summary Report of the Commission on National Education, 1959,* available at: https://www.academia.edu/27668516/Commission_on_National_Education_1959, cited on 15.7.2002

৯৬. ফোর্ড ফাউন্ডেশন (The Ford Foundation) হলো একটি আমেরিকান বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। মানব কল্যাণের অগ্রগতি সাধনে কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে এডসেল ফোর্ড (Edsel Ford) এবং তার বাবা হেনরি ফোর্ড (Henry Ford) ১৯৩৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৯৭. কমিশন রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তাকারী মার্কিন শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন ব্রমিংটন ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. হারম্যান বি ওয়েলস টিসারবার্গ কার্ণেগী ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ড. জন সি ওয়ার্ণার। *Report of the Commission on National Education,* 1959, Govenment Pakistan, Ministry of Education, Karachi, 1961, p. 2

৯৮. রিপোর্ট সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য *Report of the Commission on National Education,* 1959, *op.cit.*

জন্য স্নাতক ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদকাল দুই থেকে তিন বছরে এবং স্নাতকোত্তর কোর্সের মেয়াদ দুই বছর করার সুপারিশ করা হয়। শিক্ষাকে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষাকে মুষ্টিমেয় লোকের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল আইয়ুব সরকার। কমিশন রিপোর্টের সুপারিশের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন দেখা যায়। জাতীয় ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও ইংরেজি ভাষার বৈশ্বিক গুরুত্ব বিবেচনায় শরীফ কমিশনের প্রতিবেদনে ষষ্ঠ শ্রেণি হতে ডিগ্রিস্তর পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করে এবং এতে পর্যায়ক্রমে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়।[৯৯] কমিশনের প্রতিবেদনে উর্দু ও বাংলা ভাষার সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠতর করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ ও পাকিস্তানের জন্য অভিন্ন বর্ণমালা প্রবর্তনেরও সুপারিশ করা হয়। কমিশন প্রতিবেদনে বলা হয় যে, "রোমান বর্ণমালার এমন একটি আকারের উদ্ভব ও মান নির্ধারণ করা উচিত যাহা পাকিস্তানি ভাষাসমূহকে অক্ষরান্তর করার উপযোগী হবে।"[১০০]

শরীফ কমিশনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নারী শিক্ষা বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রতিবেদনে নারী শিক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সার-সংক্ষেপ আকারে ১০টি সুপারিশ করা হয়।[১০১] সুপারিশসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় এর মধ্যেও নারী শিক্ষার ব্যাপারে এক ধরনের সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এতে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য নারী শিক্ষার প্রসারের উপর জোর দেওয়া হয় বটে, তবে একই সাথে বলা হয় যে, উপযুক্ত মা ও গৃহিণী হিসেবে নারীকে গড়ে তোলাই হবে নারী শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এ জন্য মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রমে অন্যান্য বিষয়ের সাথে গৃহজাতশিল্প (homecraft) সেলাই, বুনন, রান্না-বান্না এবং গৃহ ও শিশু যত্নের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। উচ্চশিক্ষা স্তরে নারীদের জন্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি (Home Economics) পাঠের সুযোগ সম্প্রসারণের সুপারিশ করা হয়।[১০২] কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল 'অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে অবাস্তব বলে' উল্লেখ করা। প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষার সম্প্রসারণ বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা অনেকাংশে ব্যক্তি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফল। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা নেহাতই কম। কমিশন জনগণের প্রতি আহ্বান জানায় যে, তারা এ যাবতকালে শিক্ষা সম্প্রসারণে যে দায়িত্বভার বহন করে এসেছেন, এখন যেন তার চেয়েও বেশি দায়ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষাকে একটি বিনিয়োগ তথা লাভ লোকসানের হাতিয়ার হিসেবে দেখানো হয়। বলা হয় যে, শিক্ষা হচ্ছে এক ধরনের মূলধন বিনিয়োগ, অর্থনীতির সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, শিল্পে মূলধন বিনিয়োগকে (Investment)

---

৯৯. *Report of the Commission on National Education, 1959, op.cit.* pp. 290, 296
১০০. *Ibid,* p. 317-319
১০১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, *Report of the Commission on National Education, 1959, op.cit.* pp. 195-196
১০২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, *Ibid,* pp. 191-193

আমরা যে নজরে দেখি অনেকটা সেই নজরে শিক্ষাবাবদ অর্থ ব্যয়কে অর্থাৎ উহাকে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির একটি অপরিহার্য উপায় হিসেবে দেখার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হয়।[১০৩]

কমিশন রিপোর্টে স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষকদের ওপর সরকারের তীক্ষ্ণ নজরদারি বৃদ্ধি, তাঁদের দৈনিক কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি ইত্যাদির সুপারিশ করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ছাত্র রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়। তদুপরি কমিশন ধর্মীয় শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গণ্য করে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং উচ্চতর পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা ঐচ্ছিক করার প্রস্তাব করে।[১০৪] শরীফ কমিশনের সুপারিশমালা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এতে শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপারে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সার্বিক দিক বিবেচনায় নিলে এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, এটি ছিল একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী শিক্ষানীতি। রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত সাধারণ, পেশামূলক শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রসঙ্গ, শিক্ষার মাধ্যম, পাঠ্যপুস্তক, বর্ণমালা সমস্যা, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষাব্যয় সংক্রান্ত যেসব সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়, এতে আইয়ুব সরকারের ধর্মান্ধ, পুঁজিবাদী, রক্ষণশীল, সাম্রাজ্যবাদী ও শিক্ষাসংকোচন নীতির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল। এতে আইয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরচারী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার সংকোচনমূলক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের উচ্চশ্রেণির উপযোগী শিক্ষা প্রসার। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ এবং ছাত্র-শিক্ষকদের কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার প্রস্তাবনার মাধ্যমে শুধু ক্লাসের মাঝে এক ধ্যানে মনোনিবিষ্ট রেখে তারা রোবোটিক শিক্ষক-ছাত্র তৈরির চক্রান্ত করেছিল। আহমদ ছফা যথার্থই বলেছেন যে, পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতারা নিজেদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্যই এ শিক্ষানীতির মাধ্যমে একটি উগ্র অসহিষ্ণু এবং অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে চেষ্টা করেছিল।[১০৫]

পূর্ব বাংলার কিছু প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মান্ধ মানুষ এ শিক্ষানীতির প্রতি সমর্থন জানালেও অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে এদেশের ছাত্রসমাজ এটি মেনে নেয়নি। বলা হয়, শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের গণবিরোধী সুপারিশগুলো ছিল 'ভীমরুলের চাকে খোঁচা' দেওয়ার মতো।[১০৬] শরীফ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পরপরই শিক্ষার্থীরা সরকারের সমস্ত বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে আন্দোলন শুরু করে। এমনিতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা ও বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব বাংলা শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমশ পিছিয়ে

---

১০৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, *Report of the Commission on National Education, 1959, op.cit.,* p.342
১০৪. *Ibid,* p. 215
১০৫. আহমদ ছফা, *পাকিস্তানের শিক্ষানীতি: রক্তাক্ত বাংলা*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২৭২
১০৬. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮০০-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ২০১৩, পৃ. ২৫০

পড়ছিল।[১০৭] এ অবস্থায় ঘোষিত শিক্ষানীতির মধ্যে সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতি, শিক্ষাকে ব্যয়বহুল পণ্যে পরিণত করার মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের পথরুদ্ধ করা ইত্যাদি পূর্ব বাংলার মানুষকে বিশেষ করে ছাত্রসমাজকে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনকে তারা অগ্রহণযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন রোধে শিক্ষার্থীরা ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে থেকেই অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে আন্দোলন শুরু করে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার্থীরা এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। দুই বছরের পরিবর্তে ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছরে রূপান্তরের সুপারিশের প্রতিবাদে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পরে এ আন্দোলনে জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আজম কলেজের (বতর্মান সোহরাওয়ার্দী কলেজ) শিক্ষার্থীরা যোগ দেয়। স্বতঃস্ফূর্ত এ আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১০৮] এক পর্যায়ে আন্দোলনে ইডেন কলেজ ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের শিক্ষার্থীদের যোগদানের মধ্য দিয়ে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ সূচিত হয়। উল্লেখ্য যে, কেবল ডিগ্রির শিক্ষার্থী নয়, ইংরেজি বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরাও আন্দোলনে যুক্ত হয়। তারা ইংরেজি ক্লাস বর্জন করার মধ্য দিয়ে আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করে। শিক্ষার্থীরা সরকারের গণবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে উল্লেখিত কলেজসমূহে প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে। এক পর্যায়ে আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যোগ দেয়। কলেজ শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সংগঠিত ও ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে কলেজ শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠিত ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরামকে 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম'-এ রূপান্তরিত করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী ফারুক ও ছাত্রলীগের ওয়ারেশ ইমামকে এ সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়। আরো পরে একে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এ পরিণত করা হয়।[১০৯]

শুধু তিন বছরে ডিগ্রি কোর্স বাতিল বা পাঠক্রম থেকে বাধ্যতামূলক ইংরেজি শিক্ষার বোঝা কমানোই নয়, ঘোষিত শিক্ষানীতি বাতিল করে সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম' ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। এ লক্ষ্যে গোটা আগস্ট মাসজুড়ে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। ৬ আগস্ট থেকে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবিরাম ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়। আন্দোলনের প্রকৃতি ও বৃহত্তর কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য স্টুডেন্টস ফোরামে একটি বৈঠক ডাকা হয়। এতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু'র পক্ষে এনায়েতুর রহমান, জামাল আনোয়ার, ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক আহমদ (বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনের নেতা)

---

১০৭. শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদতার চিত্র পাওয়া যায় *Education for All, East Pakistan Education Week, 1966-67,* p.54; *Report of the Commission on the Students problem and welfare,* Ministry of Education, Pakistan, 1966, p. 54;

১০৮. মাহবুব উল্লাহ, *ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা ২০০১, পৃ. ১৩

১০৯. নিতাই দাস, *বাংলাদেশে শিক্ষা আন্দোলন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৭৭

ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি মতিয়া চৌধুরী (সাবেক মন্ত্রী ও বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য) ও সদস্য নাজমা বেগম প্রমুখ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।[১১০]

১৯৬২ সালের ১১ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব এনায়েতুর রহমানের সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করে দেশে সর্বজনীন ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়। এ সভায় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের পাশাপাশি অনেক নারী শিক্ষার্থীও অংশ নিয়েছিলেন এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে ইডেন কলেজের জনৈক ছাত্রী শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৩ আগস্ট ১৯৬২ সালের *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যে জনৈক ইডেন কলেজের ছাত্রী কথাটি উল্লেখ রয়েছে।[১১১] তবে এ ছাত্রীর নাম কী ছিল, তা অন্য কোনো সূত্র থেকে জানা সম্ভব হয়নি।

১৫ আগস্ট থেকে আন্দোলন আরো তীব্ররূপ ধারণ করে। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবনের (বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) সামনে ঐতিহাসিক আমতলায় এক বিরাট ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্রলীগ নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী জাফর আহমেদসহ অনেকেই বক্তব্য রাখেন। সমাবেশের পর প্রায় পঁচিশ হাজার শিক্ষার্থী বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়েন। এ বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে বিপুল সংখ্যক নারী শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এমনকি নয় দশ বছরের স্কুলের বালিকা শিক্ষার্থীদের অনেকেই এ মিছিলে সামিল হয়েছিলেন বলে তথ্য সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।[১১২] নাসিমুন আরা হক মিনু ছিলেন তখন আজিমপুর গার্লস স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। তিনি এ গবেষককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সহপাঠী ও সতীর্থ এ কর্মসূচিসহ শিক্ষা আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তবে তিনি এখন সে সময়কার শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেওয়া তাঁর স্কুলের সহপাঠী ও সতীর্থদের নাম মনে করতে পারেননি। নাসিমুন আরা হক জানান যে, তিনি এবং তাঁর সহপাঠী বন্ধুরা কেন্দ্রীয় সংগঠন কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মিছিল-সমাবেশ অংশ নিতেন এবং শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন বাতিলসহ আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিতেন। তাঁরা মিছিল সমাবেশে কেন্দ্রীয় সংগঠনের বিভিন্ন শ্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন করতেন ।[১১৩]

দুই বছরের স্নাতক কোর্স পুনঃপ্রবর্তন, সকল স্তরে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ইংরেজি সিলেবাসের বইয়ের সংখ্যা হ্রাস, শিক্ষা খাতে অধিক বরাদ্দ, ছাত্রদের বেতন হ্রাস সিলেবাসের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ প্রতি বছর নবম শ্রেণি থেকে ডিগ্রি ক্লাশ পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে

---

১১০. মাহমুদুর রহমান মান্না, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১
১১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ আগস্ট ১৯৬২
১১২. মোহাম্মদ হান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫১-৫২
১১৩. নাসিমুন আরা হক (মিনু) এর নিজের দেওয়া তথ্য। বর্তমান গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ। তারিখ: ৩০.০৮.২০১৯

১৯৬২ সালের ১৬ আগস্ট থেকে প্রদেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রার আহ্বান জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজ সংসদের দশ নেতা সংবাদ পত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সংসদের ভিপি রফিকুল হক, সাধারণ সম্পাদক এনায়েতুর রহমান এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী ছাত্রী নেতাদের মধ্যে ছিলেন ইডেন গালর্স কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মিস নাজমা রহমান ও হোম ইকনোমিক্স কলেজ ছাত্রী সংসদের সম্পাদিকা নাজমা আহমেদ।[১১৪]

১৯৬২ সালের ১৬ আগস্টেও শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। এই দিন ইডেন মহিলা কলেজ, সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়, লালবাগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পলাশি বালিকা বিদ্যালয়, আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়, বাংলা বাজার বালিকা বিদ্যালয়, আনন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয় ও নারী শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশ ও সমাবেশ শেষে বের হওয়া শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। ১৭ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকসহ সকল দৈনিক পত্রিকায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কিছুটা দীর্ঘ হলেও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হলো:

> ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমতলায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট ছাত্রসভার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জাগ্রত ছাত্রসমাজ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে তাদের অভিমত ব্যক্ত করে। সারা দেশের ছাত্রসমাজ ঐদিন পূর্ণ ধর্মঘট পালন ও শোভাযাত্রা বের করে। ১৬ আগস্টের এ ধর্মঘট প্রায় প্রতিটি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও বিস্তার লাভ করে। নটরডেম কলেজও যোগদান করে। সকাল সাড়ে ১১ টায় হইতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসমাজ শোভাযাত্রা সহকারে স্লোগান দিতে দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে থাকে। দ্বিপ্রহর ১টায় আমতলায় ফজলুল হক হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াজেদ মিয়ার সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণের অন্যতম বৃহৎ ছাত্রসভা শুরু হয়। সভাপতির ভাষণে আব্দুল ওয়াজেদ মিয়া ঘোষণা করেন যে, ছাত্রদের এ আন্দোলন দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন নয় বরং উহা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আর একটি ধারা মাত্র।
>
> ছাত্রসভার শেষে দ্বিপ্রহর দেড়টার সময়ে একটি বিরাট শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণে বাহির হয়। শোভাযাত্রার মধ্যে ছাত্রীদেরকে সুন্দরভাবে ঘেরাও করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। শোভাযাত্রাটি শহর প্রদক্ষিণকালে কোথাও কোন বাধার সম্মুখীন হয়নি। রাস্তার দুইপার্শ্বে বিপুল জনতাও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সমর্থন জানায়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় এবং শোভাযাত্রায় নিম্নোক্ত শ্লোগান দেয়: 'তোঘলকী শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল কর','শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল কর', বৈষম্যমূলক শিক্ষা পদ্ধতি চলবে না', দেশোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন কর', 'ছাত্র নির্যাতন চলবেনা' ও 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ'।
>
> ছাত্ররা সারা শোভাযাত্রায় বহু ফেস্টুন বহন করে। ফেস্টুনে দাবিগুলো নিম্নরুপ: শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল কর', 'দুই বৎসরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন কর', 'দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজী বই ৭টির স্থলে ৩টি কর', 'বোর্ডের অধীনে

১১৪. বিবৃতিটি দ্রষ্টব্য *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ আগস্ট, ১৯৬২

নবম ও একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা বন্ধ কর', 'শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি কর', 'স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি কর, শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য চলবেনা, শিক্ষার মান উন্নয়ন কর', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিল কর', 'অতিরিক্ত পরীক্ষার বোঝা হ্রাস কর', 'ছাত্র বেতন হ্রাস কর, 'ধৃত ছাত্রদের মুক্তি চাই', 'সকল রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', 'গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েম কর' প্রভৃতি। শোভাযাত্রাটি ভিক্টোরিয়া পার্কে পৌঁছলে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয় তা উপেক্ষা করে শোভাযাত্রা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এগিয়ে যায়।

ইডেন গার্লস কলেজ, সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস হাই স্কুল, লালবাগ গার্লস স্কুল,পলাশী গার্লস স্কুল, আজিমপুর গার্লস স্কুল, বাংলাবাজার গার্লস স্কুল, আনন্দময়ী গার্লস স্কুল ও নারী শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সভায় যোগ দেয় এবং শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। এ শোভাযাত্রায় রাস্তার দুই পার্শ্বে জনতা ও অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি লাভ করে। এছাড়া এদিন সিটি 'ল কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ ও গভর্নমন্ট-কমার্স কলেজ, সিলেটের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাজশাহী কলেজ, কলেজিয়েট স্কুল, পি,এন গার্লস স্কুলে ও ধর্মঘট শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।[১১৫]

উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, ১৬ আগস্টের ধর্মঘটে শুধু ঢাকায় নয় ঢাকার বাইরেও দেশে বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মসূচিতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাড়াও স্কুলের ছাত্রীরাও ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। ১৭ আগস্ট *দৈনিক ইত্তেফাক* এবং একই তারিখের *The Pakistan Observer* পত্রিকায় প্রকাশিত দু'টি আলোকচিত্রে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের প্রমাণ রয়েছে।

১৭ আগস্ট শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিসহ ছাত্রদের ১৫ দফা দাবি[১১৬] আদায়ের জন্য আহুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ও ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।[১১৭] শুধু ঢাকাতে নয়, পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জেরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা এ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। শিক্ষা আন্দোলনে ফরিদপুরের শিক্ষার্থীরাও বেশ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। যশোরে ধর্মঘট অব্যাহত থাকে এবং সেখানেও ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদেরও অংশ নেওয়ার কথা জানা যায়। ময়মনসিংহেও ছাত্রীরা শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ময়মনসিংহ গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা বের করা হয়েছিল।[১১৮] রংপুর শহরে বিভিন্ন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সাফল্যের সহিত 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করে। এদিন বিভিন্ন বিদ্যায়তনে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে যোগদানে বিরত থাকে এবং 'বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন চাই', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল কর', 'দুই বৎসরের ডিগ্রি কোর্স পুনঃপ্রবর্তন কর' ও 'বছরে বছরে পরীক্ষার নামে অর্থ শোষণ চলবে না' ইত্যাদি

---

১১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট, ১৯৬২

১১৬. ছাত্রদের ১৫ দফা দাবি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৬২

১১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৬২

১১৮. *ঐ*

শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাসমূহ প্রদক্ষিণ করে। পরে তারা স্থানীয় জেলা কাউন্সিলের আমতলায় এক সমাবেশে মিলিত হয়। ছাত্রনেতা আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে ছাত্রসমাজের ১৫ দফা দাবির সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। শরীফ কমিশনের রিপোর্টের আলোকে প্রণীত শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ভৈরব, নাজিরহাট, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা এবং চৌমুহনীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। এসব শহরের ছাত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও ধর্মঘটে অংশ নেয় এবং ধর্মঘটের সমর্থনে আয়োজিত সমাবেশে যোগ দিয়ে শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি জানায়।[১১৯] রাজশাহী বিভাগের নওগাঁর ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের পাশাপাশি মিছিল-সমাবেশেরও আয়োজন করেছিল। এসব কর্মসূচিতে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও ব্যাপকহারে অংশ নেয়। খুলনা ও পার্শ্ববর্তী দৌলতপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছাত্র আন্দোলন পরিচালিত হয়। শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে পালিত ধর্মঘট ছাড়াও মিছিল-সমাবেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।[১২০] বন্দরনগরী চট্টগ্রামে চলমান শিক্ষা আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপকরূপ পরিগ্রহ করেছিল। শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে জে. এম. সেন হলে একটি ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সভায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন মেহেরুন্নেসা নামক একজন নেত্রী।[১২১] চট্টগ্রামে শিক্ষা আন্দোলনে বেগম মুশতারী শফীও অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[১২২]

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও ধর্মঘট চলাকালে এ আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ এবং শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পুর্নবিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের চাহিদার সাথে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গতি বিধানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানিয়ে ঢাকার আটজন নেতৃস্থানীয় নারী একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছিল: "সর্বজনীনভাবে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার পরিবর্তে শুধুমাত্র সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইলে শিক্ষার অঙ্গন আরও অধিকতর নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত হইয়া পড়িবে।" বিবৃতিদাতারা বলেন যে, "জাতির ভবিষ্যৎ অপরিহার্যভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত।" এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা নব পর্যায়ে সমস্যার মূলানুসন্ধান এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ও জাতীয় স্বার্থের আলোকে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি নতুন শিক্ষা কমিশন নিয়োগের দাবি জানান। উক্ত বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে, "কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয় নাই এবং রিপোর্টে শিক্ষা ফি যেভাবে বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে উহাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছেলে-মেয়েদের প্রেরণের সুযোগ হইতে জনসাধারণের বিরাট অংশকে বঞ্চিত করা হইবে।"[১২৩]

---

১১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ আগস্ট ১৯৬২

১২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ আগস্ট ১৯৬২

১২১. নিবেদতা দাশ পুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

১২২. শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৯

১২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ আগস্ট ১৯৬২; সাপ্তাহিক বেগম, মহিলা জগত, ২৮ জানুয়ারি, ১৯৬২, মালেকা বেগম সংকলিত ও সম্পাদিত, *নির্বাচিত বেগম অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০*,পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪১৪। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারী ৮ জন নারীনেত্রী ছিলেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য বেগম রোকাইয়া আনোয়ার, কবি বেগম সুফিয়া

৫ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে পূর্ব বাংলায় প্রদেশব্যাপী আহূত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করা হয়। ঢাকার গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ও ইডেন গার্লস কলেজের ছাত্রীরাও ক্লাস বর্জন করে ধর্মঘট পালন করে।[১২৪] ঢাকার বাইরেও প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে যশোরে তারাপ্রসন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একটি মিছিল বের করেছিলেন। এ মিছিলে সেখানকার মোমেন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও অংশ নিয়েছিলেন। ঝিনাইদহেও ধর্মঘট পালিত হয়। এ উপলক্ষে ঝিনাইদহ ডাক বাংলোর সামনে ঝিনাইদহ মহকুমা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঝিনাইদহ কলেজের ছাত্রী মিস বদরুন্নেসা এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সম্মেলনে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল ও বর্তমান ব্যয়বহুল শিক্ষা পদ্ধতির নিন্দা করে কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল।[১২৫]

১৯৬২ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের ছাত্রদের আন্দোলন ও বিক্ষোভ সর্বাত্মক রূপ লাভ করে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আন্দোলনের মূল কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। প্রায় প্রতিদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছিল। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবনের আমতলায় অনেকগুলো ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসব সভা ও সভা শেষে পরিচালিত বিক্ষোভ মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও ঢাকা বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী যোগ দিতেন। এসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইডেন কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ছাত্রী নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সাধারণ ছাত্রীরাও অংশ নিতেন। এদের মধ্যে ইডেন কলেজের নেত্রী মতিয়া চৌধুরী, জি এস মিস নাজমা রহমান এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের নাজমা আহমদের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের বাইরেও আরো কয়েকজনের ছাত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মমতাজ বেগম (১৯৪৬-২০২০ খ্রি.)। শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে পরিচালিত আন্দোলনে তিনিও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।[১২৬] বর্তমান গবেষকের কাছে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে মমতাজ বেগম বলেন, কলেজ কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে পরিচালিত ইডেন কলেজ শিক্ষার্থীদের মিছিল মিটিং এ তিনি নিয়মিত অংশ নিয়েছেন। এ সময় তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিতে যেয়ে তিনি সে বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। পরে তিনি কুমিল্লা মহিলা কলেজ

কামাল (১৯১১-১৯৯৯), বেগম হাজেরা মাহমুদ, বদরুন্নেসা আহমদ (১৯২৪-১৯৭৪), বেগম নূরজাহান মোর্শেদ (১৯২৪-২০০৩), মিসেস আমেনা বেগম, বেগম কামরুন্নাহার লাইলী ও বেগম রায়সা হারুন।

১২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

১২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

১২৬. অধ্যাপক মমতাজ বেগম ছিলেন একজন সুপরিচিত রাজনীতিবিদ। তিনি কমিল্লা মহিলা কলেজের প্রথম নির্বাচিত ভিপি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের ছাত্রলীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের এমএনএ নির্বাচিত হন। তাঁর সম্পর্কে আরো বিস্তারিত দ্রষ্টব্য মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলার নারী*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৬০-৬৬

থেকে এইচএসসি ও স্নাতক সম্পন্ন করেন।[১২৭] তবে মমতাজ বেগম তাঁর সাক্ষাৎকার প্রদানের সময় বার বার 'হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের' বিরুদ্ধে শিক্ষা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। এমনকি তাঁর নিজের রচিত গ্রন্থেও ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৮] এ শিক্ষা আন্দোলনে যুক্ত আরেক নারী ছিলেন রওশন আরা বেগম।[১২৯] তিনিও ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ইডেন কলেজের ভেতর ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ মিছিল মিটিং কর্মসূচিতে রওশন আরা বেগম নিয়মিত অংশ নিতেন। শিক্ষা আন্দোলনের সময় তিনি ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহফুজা খানম, হোসনে আরা বেবী ও লুৎফুন্নেসাসহ অনেকের সাথে কাজ করতেন।[১৩০]

ডাকসুর সাবেক ভিপি (১৯৬৬-১৯৬৭) এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাহফুজা খানম (বর্তমানে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি) স্বনামেই পরিচিত। ১৯৬২ সালে তিনি ইডেন কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। মাহফুজা খানম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান থেকে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে ছাত্র ইউনিয়নের প্রার্থী হিসেবে ডাকসু'র ভিপি নির্বাচিত হন। গবেষককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক মাহফুজা খানম জানান, তিনি বাংলা বাজার গার্লস স্কুলে পড়ার সময়ই ছাত্র রাজনীতির প্রতি উৎসাহিত হন। ইডেন কলেজে পড়ার সময় তিনি মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ছাত্র ইউনিয়ন প্যানেল থেকে কলেজ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মাহফুজা খানম ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থেও লিখেছেন "সভা, সমাবেশ ও মিছিলে কলেজ থেকে যাওয়া শুরু করলাম মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে। তখন সভা হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (যা এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অংশ)।"[১৩১] মিছিলে অংশ নিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জে মাহফুজা খানমের ডান হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল।

ইডেন কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী আরেকজন ছিলেন কাজী তামান্না। নোয়াখালী রামগঞ্জের এডলিন মালাকার চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রী ছিলেন। এ সময় ছাত্রনেতা ও কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী গোপেশ মালাকারের সাথে তাঁর বিয়ে হয় এবং স্বামীর উৎসাহে তিনি

---

১২৭. গবেষককে দেয়া মমতাজ বেগমের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য। সাক্ষাৎ গ্রহণের তারিখ: ১৯.০৬.২০১৯

১২৮. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০, ৬১

১২৯. মাদারিপুর জেলার কালকিনীর মেয়ে রওশন আরা বেগম ইডেন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি প্রথমে ঢাকা টিএণ্ডটি কলেজ এবং পরে শহীদ স্মরণী কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর এ মুজিবভক্ত মহিয়সী নারীর জীবনে চরম দুর্যোগ নেমে আসে। তাঁকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। পরবর্তীতে বিএডিসির ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন বিভাগে চাকুরি করেন। তিনি মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য ও একজন সক্রিয় নারী নেত্রী হিসেবে সুপরিচিত। সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৭

১৩০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫

১৩১. মাহফুজা খানমের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৯.০৮.২০১৯ এবং মাহফুজা খানম রচিত গ্রন্থ, *ছাত্র রাজনীতি: মুক্তিযুদ্ধ আগে ও পরে*, আগামী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ৩৭

কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন। বাংলাদেশের প্রগতিশীল এ নারী নেত্রী ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনের সকল সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।[১৩২] এ প্রসঙ্গে ইডেন কলেজের ছাত্রী মঞ্জুশ্রী (নিয়োগী) দাশগুপ্তের কথাও স্মরণ করা যায়। ময়মনসিংহের শেরপুরের মেয়ে মঞ্জুশ্রীর মা জোৎস্না নিয়োগী ছিলেন তেভাগা, টংক ও ভাওয়ালী আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় সংগঠক ও নেত্রী। প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী আশোক দাসগুপ্তের সাথে পরিণয়সূত্রে তিনি মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তা নামে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৬২ সালে মঞ্জুশ্রী ইডেন কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। তিনি একজন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। ১৯৬২ সালে ইডেন কলেজে তাঁর সহপাঠী কাজী তামান্নাসহ তিনি শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। তিনি আন্দোলন কর্মসূচির মিছিল-সমাবেশে নিয়মিত অংশ নিতেন। তাছাড়াও একজন সংস্কৃতি কর্মী হিসেবে আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করার জন্য আয়োজিত প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন।[১৩৩] ইডেন কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে এ আন্দোলনে অংশ নেওয়া আরেকজন ছিলেন আইভি রহমান (জেবুননাহার আইভি)। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ ও সাবেক রাষ্ট্রপতি এডভোকেট জিল্লুর রহমানের সহধর্মিনী ছিলেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আইভি রহমান নিজেও বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইডেন কলেজের ছাত্রী ও একজন সক্রিয় নারী কর্মী হিসেবে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেন।[১৩৪] শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেওয়া ইডেন কলেজের আরেকজন ছাত্রী ছিলেন লিলি রহমান। মতিয়া চৌধুরীর সাথে তিনিও সকল কর্মসূচিতে অংশ নিতেন এবং আন্দোলনকে উজ্জীবিতকরণে ভূমিকা রাখেন।[১৩৫]

শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেওয়া দিনাজপুরে আজাদী হাই নামে একজন নেতৃস্থানীয় নারী কর্মীর কথা জানা যায়। ১৯৬২ সালে স্থানীয় এন এস কলেজের ছাত্রী আজাদী হাই আন্দোলনের সব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ছাড়াও আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার হওয়া শিক্ষার্থীদের মুক্তির জন্যও কাজ করেছিলেন। গ্রেপ্তারকৃত মুক্তির জন্য তিনি ফেরদৌসী ছদ্মনামে বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে অর্থ সংগ্রহের কাজ করতেন। তাছাড়াও প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন।[১৩৬] উল্লেখ্য যে, শিক্ষা আন্দোলনে

---

১৩২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০

১৩৩. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩২

১৩৪. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউ-এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনসভায় ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

১৩৫. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

১৩৬. আজাদী হাই দিনাজপুরের প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের এক পরিচিত মুখ। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত আজাদী হাই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানেও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ না নিলেও এর সংগঠনে তিনি নানাভাবে ভূমিকা রাখেন। তাঁর স্বামী দিনাজপুরের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ। সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১

আজাদী হাইয়ের সাথে তাঁর আরো ১০/১২ জন সহপাঠী নারী শিক্ষার্থী যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মম এবং মঞ্জু। ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় শিক্ষা আন্দোলনেও ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও অংশ নিয়েছিলেন বলে সমকালীন সংবাদপত্র ও অন্যান্য কয়েকটি সূত্র থেকে জানা যায়। নেত্রকোণা উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন শিক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া ছাড়াও আন্দোলনের পক্ষে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, পোস্টার লাগানো ও ছাত্রীদের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১৩৭] এ বিদ্যালয়েরই নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন আয়েশা খানম। তিনি শিক্ষা আন্দোলনে নিয়মিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ছাড়াও আন্দোলনের পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড লেখা ও আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য ছাত্রীদের সংগঠিত করারও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১৩৮] এছাড়াও শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেওয়া নেত্রকোণার আর যেসব ছাত্রীদের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে দিপালী চক্রবর্তী ও গৌরী বিশ্বাস অন্যতম।[১৩৯] যশোর এবং বগুড়াতেও এ আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল। বগুড়ার আন্দোলনে সক্রিয় একজন নারী শিক্ষার্থী ছিলেন বেগম মমতা হেনা। অন্যদিকে যশোরে নেতৃত্বস্থানীয় নারী আন্দোলনকারীর নাম ছিল রওশন জাহান সাথী।[১৪০]

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ১৯৬২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। তবে সরকার ঐদিন সবিচালয় ঐ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করলে সংঘাত এড়ানোর লক্ষ্যে এ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে ১৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলায় এক সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচি সফল করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যেসব প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল এতে ইডেন কলেজসহ ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজসমূহ অংশ নেয়। হরতাল কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে ডাকসু অফিসে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় ডাকসু নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। এ সভায় ইডেন কলেজের ছাত্রী সংসদের ভিপি ও ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী মতিয়া চৌধুরী ও জিএস নাজমা বেগমও উপস্থিত ছিলেন।[১৪১]

১৭ সেপ্টেম্বর খুব ভোর থেকেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে জমায়েত হতে শুরু করে। সকাল ১০ টায় নির্ধারিত সমাবেশ শুরুর আগেই ক্যাম্পাসে খবর আসে যে নবাবপুর

১৩৭. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২

১৩৮. আয়েশা খানম বাংলাদেশের নারী প্রগতি আন্দোলনের একজন অগ্রসেনানী। বীর মুক্তিযোদ্ধা আয়েশা খানম বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। এছাড়া রোকেয়া হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি হিসেবেও আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন।

১৩৯. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

১৪০. *ঐ*

১৪১. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

এলাকায় মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে একজন শাহাদাৎ বরণ করেছেন। ফলে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা উত্তেজিত হয়ে উঠলে ছাত্র ইউনিয়নের কাজী জাফর আহমেদের এক সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর তিনি নিজে সিরাজুল আলম খান, মফিজুর রহমান, মহিউদ্দিন আহমেদ, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন, আইয়ুব রেজা চৌধুরী ও রেজা আলী প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মিছিলসহ নবাবপুরের দিকে অগ্রসর হন। আবদুল গণি রোড ধরে মিছিলটি অগ্রসর হওয়ার সময় হাইকোর্ট ভবনের সামনে পুলিশ পিছন থেকে মিছিলের ওপর গুলি চালায়। এ কর্মসূচিতে অন্য নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশ নিয়েছিলেন বিশিষ্ট নারী নেত্রী অধ্যাপক ড. মালেকা বেগম। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সম্মান শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। ইডেন কলেজে অধ্যয়নের সময় থেকেই তিনি ছাত্র আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের ১৭ সেপ্টেম্বর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> ছাত্র সংগঠনের ডাকে শিক্ষাদিবসে প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা আজও মনে আছে। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালে সশস্ত্র পুলিশ ও ছাত্রীরা মুখোমুখি, পেছনে ছাত্র নেতারা আক্রমণের মুখে সকলেই পিছু হটলেন। আমি অনভিজ্ঞ, পিছু হটার কথা মোটেও ভাবিনি । হঠাৎ শুনি 'পালাও পালাও' এবং একটানে একজন আমাকে নিয়ে চলে গেলেন পথের ধারে বড় ড্রেনের আবডালে। ময়লা পানি , কাচে পা কেটে রক্ত পড়ছে, সেই অবস্থায় দেখি যিনি আমাকে টেনে এনেছেন তিনি সাংবাদিক- লেখক ফয়েজ আহমেদ। তাঁকে চিনতাম ছোটবেলা থেকে। ডা. মন্মথনাথ নন্দীর পারিবারিক বন্ধুর মতো, ছেলের মতো ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। সেই সূত্রে আমিও ডাকতাম ফয়েজ দা বলে। --- সব পুলিশ চলে গেলে তিনি আমাকে বললেন রোকেয়া হলে বা বাসায় চলে যেতে। বহু কষ্টে হেঁটে হেঁটে রোকেয়া হলে গেলাম। মিসেস মেহের কবীর তখন হলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রভোস্ট ছিলেন। তাঁর কাছে বাড়ি থেকে আমার খোঁজ জানতে চাচ্ছিলেন ভাই ও মা। বাড়িতে আমার খোঁজে গিয়েছিল ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মতিউর রহমান। বাড়িতে ওর যাতায়াত ছিল রাজনীতি সূত্রে। ছাত্র ইউনিয়নের কেউ কেউ চিন্তিত ছিল আমাকে দেখতে না পেয়ে। আমার খোঁজ পেয়ে সবাই আশ্বস্ত হলেন।[১৪২]

১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল কর্মসূচি পালনকালে সরকারি প্রেসনোট মতে ১ জন নিহত, ৭৩ জন আহত এবং ৪৯ জন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।[১৪৩] তবে আন্দোলনকারীরা বাবুল, বাস কন্ডাক্টর গোলাম মোস্তফা এবং গৃহভৃত্য ওয়াজিউল্লাহ এই তিনজনের শাহাদাৎ বরণ এবং প্রায় আড়াই'শ জন আহত হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ১৭ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন জেলায় ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করে। ময়মনসিংহে ছাত্র ও জনসাধারণ হরতাল পালন করে। আনন্দমোহন কলেজ হতে ১০ হাজার ছাত্র ও জনতার যে মিছিল বের হয়েছিল তাতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ছাত্রীরা এসে যোগ দিয়েছিল। মেহেরপুরে ছাত্ররা এক শোভাযাত্রা বের করে এবং এতে বহু ছাত্রী যোগ দেয়। আন্দোলনকারীরা স্থানীয় আইন পরিষদ সদস্য জনাব আবুল হায়াতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে ছাত্রদের দাবি সমর্থন করবেন বলে তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন। শোভাযাত্রাকারীরা

---

১৪২. মালেকা বেগম, *নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক*, অন্য প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৩৮
১৪৩. *The Pakistan Observer,* September 18, 1962

আকবর আলীর সভাপতিত্বে এক সমাবেশ করেন এতে অন্যান্যদের মধ্যে মোসাম্মৎ রোকসানা খাতুন নামক এক ছাত্রীও বক্তব্য রেখে ছিলেন।[১৪৪] উল্লেখ্য যে, ১৮ সেপ্টেম্বর দেশের দৈনিক পত্রিকাসমূহে ১৭ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচির সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়। এসব প্রতিবেদনে ছাত্রদের পাশাপাশী নারী শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়।[১৪৫]

১৭ই সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড ও সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ প্রদেশব্যাপী তিন দিনের শোক পালন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৮ সেপ্টেম্বর সকালে সলিমুল্লাহ হলে নিহতদের গায়েবানা জানাজা আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন ও হলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৮ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচি সম্পর্কে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রতিবেদনে লেখা হয়:

> এই দিন সকাল ৯ টা হইতে ছাত্র-ছাত্রী ও জনতা নগ্নপদে কাল ব্যাজ পরিধান করিয়া সলিমুল্লাহ হল প্রাঙ্গনে আসিয়া পৌঁছিতে থাকে। ইডেন কলেজের ছাত্রীরা নিজেদের কলেজে কাল পতাকা উত্তোলনের পর নগ্নপদে সলিমুল্লা হলের দিকে রওয়ানা হয়। ইহাদের অনেকের পরনে কাল শাড়ী, কাল ব্লাউজ, কাল ওড়না এবং কাহারও কাহারও কাল পাড় শাড়ী ছিল। সকাল ১০ টায় সলিমুল্লা হল প্রাঙ্গনে সমবেত ছাত্রছাত্রী ও জনতা শহীদ গোলাম মোস্তফার লাশ দাবি করিয়া শ্লোগান দিতে থাকে। বেলা সাড়ে ১০ টায় সলিমুল্লা হল মসজিদের ইমামের ইমামতিতে দশ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী ও জনতা গায়েবী জানাজা আদায় করে।---জানাজা শেষে তারা একসভায় মিলিত হয়। সভায় শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকায় ছাত্ররা ৪ জনের ছোট ছোট গ্রুপে ১০ ফুট ব্যবধানে শোক শোভাযাত্রা বাহির করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মেডিক্যাল কলেজের আউটডোর গেইটের সামনে সামরিক বাহিনী ছাত্রছাত্রীদের বাঁধা দেয়। তাহারা হাতে ছড়ি লইয়া দ্রুত পদে ছাত্রীদের দিকে আগাইয়া আসে এবং তাহাদেরকে পিছু হটাতে বাধ্য করে। তাহারা ছাত্রীদের পেছনে বন্ধুক তাক করে আগাইতে থাকে।[১৪৬]

নগ্নপায়ে শোক র‍্যালিতে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের একটি আলোকচিত্র ১৮ সেপ্টেম্বর *The Pakistan Observer* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১৪৭]

সরকারি নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য তোফাতুন্নেসা আজিম একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাও একটি বিবৃতিতে এ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি প্রদান এবং আহত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। অবিলম্বে সরকারকে ছাত্র ও অভিভাবকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয় যে, অন্যথায় পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে।[১৪৮] ঢাকা ও পূর্ব বাংলার অন্যান্য স্থানে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও

---

১৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২
১৪৫. কয়েককটি আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-১২
১৪৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২
১৪৭. আলোকচিত্রটি দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-১২
১৪৮. এ বিবৃতি দাতাদের ছিলেন নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া, মাহমুদ আলী, মোহসীনউদ্দীন দুদু মিয়া, আজিজুল হক নান্না মিয়া ও শাহ আজিজুর রহমান প্রমুখ। *দৈনিক আজাদ*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২; নিতাই দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১০

হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ এবং এ শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি ও অন্যান্য শহরেও ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ ও ১৯ বিখ্যাত *Dawn* পত্রিকায় এ বিষয়ে গুরত্বের সাথে সচিত্র সংবাদ ছাপা হয়। ১৭ সেপ্টেম্বরের পুলিশি নিপীড়নের প্রতিবাদে ১৯ সেপ্টেম্বর বিকালে রাজধানী ঢাকার পুরানা পল্টনে এক নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে:

> ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ, বেয়নেট ও বেটন চার্জ, কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চার্জের প্রতিবাদে গতকল্য (বুধবার) বেলা ৫ টায় ৩২ নং পুরানা পল্টনে মহিলাগণের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত মহিলা সমাজসেবী কবি বেগম সুফিয়া কামাল সভায় সভানেতৃত্ব করেন। সভায় এক প্রস্তাবে গত মঙ্গলবার ছাত্র সাধারণের শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের উপর নির্যাতন এবং তাহাদের প্রতি মিলিটারির দুর্ব্যবহারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সভায় অপর প্রস্তাবে সরকারের নিকট সমগ্র পরিস্থিতির নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করা হয়। মহিলাগণ শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং আহত নিহতদের ক্ষতিপূরণ দাবি করেন ও তাদের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জানান।[১৪৯]

১৭ তারিখের ঘটনার প্রতিবাদে ২০ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে এক শোক শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, এতে বহুসংখ্যক ছাত্রী যোগদান করেছিল। শোভাযাত্রা শেষে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় ছাত্রীরাও উপস্থিত ছিল। আনন্দ মোহন কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট হাবিবুল আলম ও ছাত্রীদের কমনরুম সেক্রেটারী হাবিবা বেগম সভায় বক্তৃতা করেন।[১৫০] ২১ সেপ্টেম্বরও দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২২ সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী পাঞ্জাবী লেন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন মেহেরুন্নেসা, আসমা খাতুন, রুনু, শিরিন, মিনু প্রমুখ ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ।[১৫১] ছাত্ররা খুলনার মহিলা কলেজের ছাত্রীদের ক্লাশ বর্জন করে মিছিলে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানালে কাজী মমতা হেনা (আই. এ. ক্লাশের ছাত্রী) তাতে সাড়া দেন এবং অধ্যক্ষের নিষেধ অমান্য করে ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন। খুলনা পিটিআই স্কুলের ছাত্রী কৃষ্ণা দাশও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন।[১৫২] সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ছাত্রনেতাদের আহ্বানে শত শত ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ত্যাগ করে 'শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল কর', 'ছাত্র বহিষ্কার আদেশ বাতিল কর', 'দুই বৎসরের ডিগ্রি কোর্স চালু কর' প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। পরে আবুল মনসুর খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা থেকে কুমিল্লার ৫ জন ছাত্রী ও করাচির ১২জন ছাত্রের উপর বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।[১৫৩]

---

১৪৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২
১৫০. *দৈনিক আজাদ*, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২
১৫১. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
১৫২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০
১৫৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

ঢাকায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কর্মসূচিতে গুলিবর্ষণ ও হতাহতের ঘটনার প্রতিবাদে ২২ সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানে সাধারণ ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। এদিন রাজধানী করাচি, পিন্ডি ও অন্যান্য শহরে ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এসব সমাবেশ থেকে ঢাকার ঘটনায় নিন্দা এবং শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবি জানানো হয়। করাচির ৮ জন ছাত্র প্রতিনিধি শিক্ষা ও তথ্যমন্ত্রী ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া তুলে ধরে।[১৫৪]

১৯৬২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা পল্টন ময়দানে এক ছাত্রসমাবেশ আহ্বান করে। সমাবেশ থেকে আইয়ুব খানের শিক্ষা নীতি বাতিল ও হত্যার বিচারসহ আরো কিছু দাবি মানার জন্য সরকারের উদ্দেশ্যে চরমপত্র জারি করে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খান নতি স্বীকারে বাধ্য হন। শরীফ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন স্থগিত করা হয়। এতে শিক্ষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লেও ছাত্রদের আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান অক্ষুণ্ন থাকে। ডিসেম্বর মাসে গভর্নর মোনেম খান শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধন করতে ঢাকা কলেজে গেলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তাঁকে কালো পতাকা দেখায়। ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসকে সামনে রেখে ঢাকা শহরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিদের একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রচারপত্র আকারে প্রকাশিত হয়। এ প্রচারপত্রে ছাত্র নির্যাতন ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করার সরকারি ব্যবস্থার নিন্দা জানানো হয়। এ প্রচারপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে সৈয়দ শমসে আরা সহ-সভানেত্রী, মহিলা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; রওশন আক্তার বানু সাধারণ সম্পাদিকা, মহিলা হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মতিয়া চৌধুরী সহ-সভানেত্রী, ইডেন কলেজ; জাহানারা বেগম সাধারণ সম্পাদক, ইডেন কলেজ; তাহমিদা খানম -সহ সভানেত্রী, ইডেন কলেজ (ইন্টারমিডিয়েট সেকশন); মাজেদা খাতুন সাধারণ সম্পাদক, ইডেন কলেজ (ইন্টারমিডিয়েট সেকশন) ছিলেন অন্যতম।[১৫৫]

১৯৬৪ সালেও পূর্ব বাংলায় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এ বছর কয়েকটি ইস্যুতে আন্দোলন হয়। চৌষট্টির এসব আন্দোলনের মধ্যে প্রথম আন্দোলন ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন। অভিযোগ করা হয় যে, এ সময় সরকারের উস্কানিতে পূর্ব বাংলায় এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। ১৯৬৪ সালের ৭ জানুয়ারি থেকে ঢাকা, আদমজী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে পেশাদার গুণ্ডাবাহিনীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিম; বাঙালি ও বিহারীদের মধ্যে এক বীভৎস দাঙ্গায় শত শত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৫ জানুয়ারি দাঙ্গা বিধ্বস্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঁচাতে গিয়ে আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের চেয়ারম্যান কবি আমির হোসেন চৌধুরী (বেগম রোকেয়ার বোন হোমায়রা বেগমের ছেলে) নবাবপুর রেল ক্রসিং-এর সামনে নিহত হন। ১৬ জানুয়ারি

---

১৫৪. *দৈনিক আজাদ*, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

১৫৫. ছাত্র-সংসদ প্রতিনিধিদের প্রচারপত্র (শহীদ দিবস উপলক্ষে), ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩; মাহমুদ উল্লাহ (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র*, গতিধারা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৯৪-১৯৫

বিহারীদের আক্রমণে নিহত হন নটরডেম কলেজের অধ্যাপক ফাদার নোভাক। মোহাম্মদপুরে অবস্থানরত বিহারীরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীনিবাসে হামলা চালিয়ে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে। দেশের এমনি ভয়াবহ অবস্থায় ঢাকার সচেতন ছাত্রসমাজ এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং দাঙ্গায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ঢাকায় আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সভাপতিত্বে নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে। কমিটির পক্ষ থেকে ১৭ জানুয়ারি *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক আজাদ* ও *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে দাঙ্গা প্রতিরোধের আহ্বান সংবলিত একটি এক ইশতেহার প্রকাশিত হয়।[১৫৬] দাঙ্গা প্রতিরোধে নারী সমাজ এগিয়ে আসে এবং সাহসিকতার সাথে সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বেগম সুফিয়া কামাল, সন্‌জীদা খাতুন, রোকেয়া রহমান কবীরসহ অনেক মহিলা পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজ করেন।[১৫৭] এ দাঙ্গা প্রতিরোধে ছাত্রী ও নারীসমাজও মাঠে নেমেছিলেন। এমন একটি তথ্য ও অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন মালেকা বেগম। তাঁর ভাষায়:

> লারমিনি স্ট্রীটের বাড়ির উল্টোদিকেই থাকতেন ব্রাহ্ম সমাজের নেতা শ্রীযুক্ত মানিক ঘোষ (প্রয়াত)। তাঁর বাড়িটিতে আক্রমণ চালাতে এসেছিল দাঙ্গাবাজরা। পাড়ার সংগঠিত ছাত্র-ছাত্রী, মহিলা নেত্রীবৃন্দ, ছায়ানটের নেতৃবৃন্দ সকলেই খালি হাতে সাহসের সাথে সেই দাঙ্গাবাজদের রুখে দাঁড়ালে মুষ্টিমেয় সশস্ত্র কসাই পালিয়ে যায়। আমার জীবনে এই প্রতিরোধের সাফল্য মনোবল ও সাহস সঞ্চয় করতে সাহায্য করেছিল। আজও সেই সাহসের জন্যই নানা প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে পারছি।[১৫৮]

এ সময় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মিছিলে নারীদের অংশগ্রহণের কথাও জানা যায়। এ জানা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দাঙ্গাকারীদের মোকাবিলা করে দাঙ্গা প্রতিরোধ ঘটাবার জন্য বিরাট মিছিল বের হলো। মিছিলের পুরোভাগে থাকা নেতৃবৃন্দকে বহনকারী ট্রাকে উঠতে চাইলেন রোকেয়া রহমান কবীর। কিন্তু এ লড়াইয়ের সময় তাঁকে ট্রাকে উঠতে নিরুৎসাহিত করা হলে তিনি জেদ ধরেন। শেষে শেখ মুজিব রোকেয়া রহমানসহ মিছিলে অংশ নেওয়া অন্যা নারীদের পিছনে আসা একটি জীপে উঠতে বললেন। রোকেয়া রহমান বসলেন ড্রাইভারের পাশে। মালেকা বেগম লিখেছেন, "দু'পাশে উৎসাহী জনতাকে রেখে মিছিল এগিয়ে চলল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রথম গণবিদ্রোহ ঢাকায়। জীপ গাড়িতে মহিলারা।"[১৫৯] দাঙ্গার প্রেক্ষিতে ঢাকার ১৬ জন নেতৃস্থানীয় নারী এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। এতে তাঁরা পাকিস্তান ও ভারতের নারীসমাজের প্রতি এক আবেদনে সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতিকারীদের সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্রকে

---

১৫৬. *দৈনিক আজাদ*, *১৭ জানুয়ারি*, *১৯৬৪; দৈনিক ইত্তেফাক*, *১৭ জানুয়ারি*, *১৯৬৪*, ইশতেহারটি দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫।

১৫৭. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *পৃ. ১৫২*

১৫৮. মালেকা বেগম, *নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪২

১৫৯. *ঐ*

প্রতিহত করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান ও ২৪ পরগনায় এবং সেই সাথে খুলনার দুঃখজনক ঘটনার বিষয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।[১৬০]

১৯৬৪ সালে রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবকে কেন্দ্র করে যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল এতেও ছাত্রী তথা নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। পূর্ব বাংলার গণধিকৃত গভর্নর মোনায়েম খান বিশ্ববিদ্যায়ের চ্যান্সেলর হিসেবে সমাবর্তনে যোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদানের কথা ছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছ থেকে ডিগ্রি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ১৬ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ছিল। রাজশাহী উৎসব প্যাণ্ডেলে ছাত্ররা কালো পতাকা টাঙিয়ে দেয় এবং ডিগ্রি হাতে মোনায়েম খানের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়। শিক্ষার্থীরা সমাবর্তন বর্জনের আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনে নেতৃস্থানীদের অন্যতম ছিলেন তৎকালীন ডাকসুর জিএস মতিয়া চৌধুরী। এ সময় ডাকসুর ভিপি রাশেদ খান মেনন ও জিএস মতিয়া চৌধুরীর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও হল সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একটি যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে গভর্নর মোনায়েম খানের পরিবর্তে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বিশ্ববিদ্যালযের চ্যান্সেলর নিয়োগের দাবি জানায়। সমাবর্তনের আগের দিন ২১ মার্চ ডাকসু অফিসে সমাবর্তন বিরোধীদের একটি সভা চলাকালে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন এর NSF (National Student Federation) অতর্কিত হামলা চালিয়ে সভা পণ্ড করে দেয়। ২২ মার্চ কার্জন হলে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয় 'মোনায়েম খান ফিরে যাও' ধ্বনি দিয়ে ছাত্ররা তুমুল বিক্ষোভ শুরু করলে পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লে মোনায়েম খান সমাবর্তনস্থল ত্যাগ করেন। ঘটনার জের হিসেবে পুলিশ ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে ১৫০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। রাশেদ খান মেনন ও মতিয়া চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতা এ ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দেন।[১৬১] পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হলে পুলিশ ও এন.এস.এফ সম্মিলিতভাবে সরকারবিরোধী ছাত্রদের ওপর চরম নির্যাতন শুরু করে। ডিগ্রি প্রত্যাহার, বহিষ্কার, গ্রেপ্তার, হুলিয়াজারি সব মিলিয়ে এক তাণ্ডব-নৃত্য চলে সারা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে। ২২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। চাপের মুখে বহিষ্কৃত ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হলেও ব্যতিক্রম ঘটে মতিয়া চৌধুরীর বেলায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুতেই তাঁর ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়নি।[১৬২] তবে সরকারি দমন-নিপীড়ন পূর্ব বাংলার ছাত্র আন্দোলন দমাতে পারেনি। ১৯৬৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা

---

১৬০. বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম রোকেয়া আনোয়ার (এম.এন.এ), সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য বেগম দৌলতনন্নেছা খাতুন, বদরুন্নেছা আহমেদ, নুরজাহান বেগম, আমেনা বেগম, ডাঃ নীলিমা ইব্রাহিম, বেগম রাইসা হারুন, শামসুন্নাহার রহমান, বেগম হাজেরা মাহমুদ, বেগম রাজিয়া মতিন, বেগম সায়েরা আহমদ, অধ্যাপিকা আফিফা হক, বেগম কামরুন্নাহার লাইলী, ডাঃ নীলুফার ইসলাম ও মিসেস রোকেয়া কবীর। *দৈনিক আজাদ*, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৬৪

১৬১. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১১৬-১১৭

১৬২. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

মিলিতভাবে ২২ দফা দাবিনামা প্রণয়ন করে।[১৬৩] ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালনকে কেন্দ্র করে সরকার ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। ছাত্র আন্দোলনের খবর প্রকাশ না করার জন্য সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সরকারের এসব ঘটনার বিরুদ্ধে ২৯ সেপ্টেম্বর প্রতিবাদ দিবস পালনকালে পুলিশ জগন্নাথ কলেজে গুলি চালায়। তবে এতেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬২-৬৪ সাল পর্যন্ত সময়কাল ছিল পূর্ব বাংলার জন্য অত্যন্ত ঘটনাবহুল। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন ছিল প্রথম গণআন্দোলন। ছাত্রদের এ আন্দোলনের ফলে সামরিক শাসন সম্পর্কে জনগণের ভয়ভীতি দূর হয়। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলনের দ্বার উন্মুক্ত হয়। পর্যালোচনাধীন সময়ে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়। শুধু রাজধানী ঢাকায় নয়, সারা প্রদেশেই আন্দোলন কর্মসূচিতে নারীদের সরব উপস্থিতি দেখা যায়। এসব আন্দোলনে তারা কেবল কর্মী হিসেবে নয়, ক্ষেত্রবিশেষে সংগঠক ও নেতৃস্থানীয় পর্যায়েও ভূমিকা রেখে ছিলেন।

৫.৪: ১৯৬৫ সালের পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও পূর্ব বাংলার নারীসমাজ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইয়ুব খান ১৯৬০ সালেই মৌলিক গণতন্ত্রীদের হ্যাঁ-না ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল পাঁচ বছর। এই যুক্তিতে আইয়ুব তার প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদকাল ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিলেন। সেই সূত্রে প্রেসিডেন্ট ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি পাকিস্তানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। নির্বাচনকে ঘিরে দেশের রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় আইয়ুব বিরোধী রাজনীতিবিদদের একটি প্লাটফর্ম তৈরির সুযোগ তৈরি হয়েছিল।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ছিল মৌলিক গণতন্ত্রের অধীন একটি পরোক্ষ নির্বাচন। সংবিধান অনুসারে এ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ১৯৬৫ সালের ৭ জুন। কিন্তু ১৯৬৪ সালের জুন মাসে আইয়ুব খান Constitution (Second Amendment) Act 1964 এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কয়েক মাস এগিয়ে আনেন। উদ্দেশ্য ছিল সংসদ ও পরিষদের ক্ষমতাসীনদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে স্বীয় বিজয় নিশ্চিত করা।[১৬৪] উল্লেখ্য যে, ১৯৬৪ সালের সংবিধান সংশোধনীতে নির্বাচন বিধিতে সরকারি কর্মচারীর স্ত্রীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে আইন পরিষদে এ বিধির

১৬৩. বিস্তারিত দেখুন *Report of the Commission on Student Problem and Welfare*, Govt. of Pakistan, Ministry of Education, Karachi,1966, pp. 228-234

১৬৪. শেখর দত্ত, *ষাটের দশকের গণজাগরণ*, *ঘটনা পর্যালোচনা*, *প্রভাব*, সমাজ বিকাশ প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ১৮৭

সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন পরিষদ সদস্য শামসুন্নাহার মাহমুদ। আইন পরিষদে সে সময় সংরক্ষিত নারী আসন ও নির্বাচন বিধিতে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ায় সরকারি দলের সদস্য হয়েও বেগম শামসুন্নাহর মাহমুদ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এর আগে আইন পরিষদের অপর সদস্য রোকাইয়া আনোয়ার নির্বাচন কমিটি ও আইন পরিষদে নারীদের জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। আইন পরিষদের অন্যতম সদস্য সিরাজুন্নেসা চৌধুরী তাঁর এ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের আইন পরিষদ সদস্য বেগম জি. এ. খান ও বেগম মমিনুন্নেসা আহাদ তখন এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। এভাবেই দেখা যায় যে, নারীর অধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ ১৯৬৪ সাল থেকেই ভিন্নতর হয়ে দেখা দিল।[১৬৫]

আগেই বলা হয়েছে যে, নির্বাচনের ঘোষণা পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল পরোক্ষ পদ্ধতির এ নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিপক্ষে জয়লাভ সহজ না হলেও এর মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এরই অংশ হিসেবে ১২ জুলাই ১৯৬৪ সালে সারা পূর্ব বাংলায় 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালন করা হয়। এদিন ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে পাকিস্তানের দুই অংশের বিরাজমান ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে আইয়ুব শাসনের প্রতি ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের গুরুত্বারোপ করেন। তারা 'লাহোর প্রস্তাবের' ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণআন্দোলন ও সর্বাত্মক সংগ্রামের ডাক দেন।[১৬৬] বিরোধী দলগুলো এ নির্বাচনকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে এবং আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালের ২২ জুলাই খাজা নাজিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী একত্রিত হয়ে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party বা COP) নামক একটি নির্বাচনি ঐক্যজোট গঠন করেন। 'কপ' এর পক্ষ থেকে ৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। দফাগুলো ছিল: (১) একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন; (২) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা; (৩) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আইন ও বাজেট প্রণয়নের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান; (৪) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান; (৫) প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাসকরণ; (৬) শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ; (৭) আইনের সাংবিধানিক বৈধতা যাচাইয়ের ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টকে প্রদান; (৮) সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি; (৯) নিবর্তনমূলক সকল আইনের বিলুপ্তি।[১৬৭] কপ গঠন ও এর নয় দফা কর্মসূচির সমর্থন জ্ঞাপন করে ২৯ জুলাই ঢাকা

---

১৬৫. J.P Bhattacharia, *Ranaisance and Freedom Movement in Bangladesh*, Minarva Associates, Calculta 1973, p. 202

১৬৬. মালেকা বেগম, *নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক*, পৃ. ৪১-৪২

১৬৭. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭

বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদের নারী নেত্রীগণ একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তবে বিবৃতিতে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের সংশোধনী দাবি করেন। নারীসমাজের ব্যাপক সমর্থনের প্রয়োজনে এটি সংশোধন জরুরি বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন মতিয়া চৌধুরী, রওশন আখতার বানু, আনোয়ারা বেগম, হাসনা বানু, জেলিয়া রেহাতুন্নেসা ও লুৎফুন্নেসা।[১৬৮] পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি এক বিবৃতিতে নয় দফা সমর্থন করে। তবে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া, সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তি থেকে পাকিস্তানের সরে আসার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না করা এবং নারীসমাজের মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ সংশোধনীর প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[১৬৯]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে আইয়ুব খান (ফুল প্রতীক) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে কপ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহকে (১৯৯৪-১৯৬৭) (হারিকেন প্রতীক) নিজেদের প্রার্থী করে। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জনাব কে.এম কামাল (সাইকেল প্রতীক) এবং মিয়া বশীর আহমদও (প্লেন প্রতীক) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[১৭০] কপভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলো তাঁদের প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে সর্বাত্মক প্রচারণা চালিয়েছিল। কোনো কোনো দল নির্বাচনি পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করেন। ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক হাজি মোহাম্মদ দানেশের নামে একটি দীর্ঘ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।[১৭১] সম্মিলিত বিরোধীদলের পক্ষে মৌলিক গণতন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়।[১৭২] পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানীও এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে বিশ দফা দাবি এবং কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং মিস ফাতিমা জিন্নাহকে ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট পদে জয়যুক্ত করার জন্য মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।[১৭৩]
'কপ' এর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও মিস ফাতিমা জিন্নাহ ৪৩ টি বড় বড় জনসভায় বক্তব্য রাখেন। প্রতিটি জনসভায় বিপুল পরিমাণে জনসমাবেশ হয়েছিল। অন্যদিকে আইয়ুব খানের পক্ষেও ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। তারা প্রচার করতে থাকে ফাতিমা জিন্নাহ জয়ী হলে 'মৌলিক গণতন্ত্রী প্রথা' ও ফুড ফর ওয়ার্কস'সহ আইয়ুব প্রণীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাতিল করা হবে। যদিও শেখ মুজিবুর রহমান এ অপপ্রচারকে 'অসত্য' ও 'ভিত্তিহীন' বলে সংযুক্ত বিরোধী দলের প্রচারপত্র শিরোনামে 'কপ' এর অবস্থান সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা প্রদান করেন।[১৭৪] এ সময়

১৬৮. *The Pakistan Observer*, 30 July, 1964
১৬৯. *The Pakistan Observer*, 2 August, 1964
১৭০. *দৈনিক আজাদ*, ২ জানুয়ারি, ১৯৬৫
১৭১. পুস্তিকাটি দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *স্বাধীনতার যুদ্ধ দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ২২০-২৩২
১৭২. *স্বাধীনতার যুদ্ধ দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ২৩৩
১৭৩. দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *স্বাধীনতার যুদ্ধ দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ২৩৫-২৩৬
১৭৪. J.P Bhattacharia, *op.cit,* p. 203

সরকারি নির্দেশে কতিপয় আলেম ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে কোনো নারীর নির্বাচনকে অবৈধ বলে ফতোয়া প্রদান করে। প্রতিক্রিয়া হিসেবে কপের পক্ষ থেকে 'রাষ্ট্র প্রধানের পদে মহিলা নির্বাচন জায়েজ' এ সম্পর্কিত দশ জন বিশ্ববিখ্যাত ও দেশবরেণ্য আলেমের বক্তব্য সংবলিত একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়।[১৭৫]
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্যোগে যে সর্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তাতে নারীসমাজ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। তারা ফাতেমা জিন্নাহকে ব্যাপকহারে সমর্থন করেন। অবশ্য কপের নির্বাচনি ম্যানিফেস্টোয় ৮ নং ধারায় নারী অধিকার সংকোচন বিষয়ে নারীরা প্রতিবাদও করেন। নারীসমাজ এ ধারাটি প্রত্যাহারের দাবিতে সারাদেশে সভা মিছিল করেছিল। আপওয়া, শিশুরক্ষা সমিতি, নারিন্দা মহিলা সমিতি, গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংসদ, বেগম ক্লাব, লেডিস ক্লাব প্রভৃতি সংগঠনের উদ্যোগে বহু প্রতিবাদ সভা হয়। কবি সুফিয়া কামাল, আশালতা সেন, দৌলতননেছা, তুবা খানম, রোকেয়া রহমান কবীর, কামরুন্নাহার লাইলী, রাইসা হারুন, লায়লা সামাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদ জানান।[১৭৬] ফাতিমা জিন্নাহ নির্বাচন প্রচারণায় পূর্ব পাকিস্তানে আসলে একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি উপস্থাপন করলে তিনি এ নিয়ে কপ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। কবি বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের সাথে সাক্ষাত করে বিরোধী দলের এ ধরনের পদক্ষেপকে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ওয়াদাবিরোধী বলে উল্লেখ করেন। সংশ্লিষ্ট ধারাটি প্রত্যাহার না হলে নারীসমাজ নির্বাচনে তাদের সমর্থন দেবেন না বলেও হুমকি দেন।[১৭৭]

ফাতেমা জিন্নাহর সমর্থনে নারীরা নির্বাচনি প্রচারণাও অংশ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আওয়ামী লীগের সাজেদা চৌধুরী। ফাতিমা জিন্নাহর চট্টগ্রামে নির্বাচনি সফরের সময় লালদিঘীর ময়দানে যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এতে নারীদের সংগঠিত করে সাজেদা চৌধুরী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। খুলনায় রোকেয়া মাহবুব ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা ও অন্যান্য কাজে অংশ নিয়েছিলেন। আইয়ুব বিরোধী ও ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের মতলবগঞ্জ কলেজ ছাত্রী মুকুল মজুমদার দীপা। তিনি ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[১৭৮] ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় কাজ করেন যশোর এস এস কলেজের ছাত্রী মমতা হেনা।[১৭৯] মতিয়া চৌধুরীর সাথে দক্ষিণাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে গণজাগরণী গান গেয়ে সাধারণ মানুষকে

---

১৭৫. *দৈনিক আজাদ*, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪; হাসান হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২
১৭৬. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
১৭৭. কবি সুফিয়া কামালের সাক্ষাৎ উদ্ধৃত মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৫৪
১৭৮. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, পৃ. ৬৬, ৭২,১৯৩
১৭৯. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২

উদ্বুদ্ধ করার কাজ করেন শিশির কণা ভদ্র।[১৮০] এ নির্বাচনে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে ফাতিমা জিন্নাহকে ভোট দেবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ ও ছাত্র শক্তি এই তিন ছাত্র সংগঠনের পক্ষে 'সংগ্রামী ছাত্রসমাজ' এর নামে প্রচারপত্র বিলি করা হয়।[১৮১]

নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার প্রচারণার সময় সাধারণ জনগণের মধ্যে মিস ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে বিপুল সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। তবে ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, আইয়ুব খান যেখানে ভোট পান ৪৯,৯৫১ সেখানে মিস ফাতেমা জিন্নাহর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮,৬৯১।[১৮২] ফাতেমা জিন্নাহর পরাজয় ও আইয়ুব খানের বিজয়ের পিছনে মূল কারণ ছিল মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পরোক্ষ ভোট। জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীবৃন্দ মিস ফাতিমা জিন্নাহকে বিপুলভাবে সমর্থন জানালেও তারা নয় বরং ভোট দিয়েছেন মৌলিক গণতন্ত্রীবৃন্দ। আইয়ুব খান অতি সহজেই ঐসব গণতন্ত্রীদের নিজ পক্ষভুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাছাড়া সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ মৌলিক গণতন্ত্রীদের অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আইয়ুব খানের পক্ষে তাঁদের ভোট নিশ্চিত করেন।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পরপরই আইয়ুব খান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন আয়োজন করেন। ১৯৬৫ সালের ২১ মার্চ জাতীয় পরিষদ এবং ১৬ মে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মৌলিক গণতন্ত্রীরাই এই নির্বাচনের ভোটার ছিলেন। প্রতিটি জাতীয় পরিষদের ভোটার সংখ্যা ছিল ৫৫০ এবং প্রাদেশিক পরিষদে এ সংখ্যা ছিল ২৭৫। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতো এ নির্বাচনেও এ ভোটারদের প্রভাবিত করে আইয়ুব খান তাঁর কনভেনশন মুসলিম লীগের পক্ষে নির্বাচনি জয় নিশ্চিত করেন। জাতীয় পরিষদে কনভেনশন মুসলিম লীগ ১১৫, কপ ৯, এনডিএফ ৪ এবং স্বতন্ত্র সদস্যসংখ্যা ছিল ১৮।[১৮৩] ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলার জন্য সংরক্ষিত তিনটি নারী আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যগণ ছিলেন: ১. বেগম রাজিয়া ফয়েজ (খুলনা), ২. বেগম ডলি আজাদ (ঢাকা), ৩. বেগম মরিয়ম হাশিমুদ্দিন (ময়মনসিংহ)।[১৮৪] পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যবৃন্দ ছিলেন: (১) হামিদা চৌধুরী: দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া,

---

১৮০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩

১৮১. শেখর দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬

১৮২. পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব খান প্রদত্ত ভোটের ৭৩.৭ % ভোট এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৫৩.১% ভোট লাভ করেছিলেন। Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971*, Academic Publichers, Dhaka: 1990, pp. 105-196.

১৮৩. S.A. Akanda, *op. cit.*, p. 99

১৮৪. এডভোকেট এ. বি. এম রিয়াজুল কবীর কাওছার, *আইন বিধিমালা তথ্য ও ফলাফল, বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ সিটি কর্পোরেশন, জেলা উপজেলা পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০১২)*, বাংলাদেশ নির্বাচন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা ২০১৬, পৃ. ৮০৭: আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

রাজশাহী, পাবনা নির্বাচনি এলাকা; (২) আয়শা সরদারঃ কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বাকেরগঞ্জ; (৩) আখতার জাহান খানঃ ফরিদপুর, ঢাকা; (৪.) খালেদা হাবিবঃ ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং (৫). নূরজাহান বেগমঃ কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম।[১৮৫]

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন প্রমাণ করে যে, মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে নির্বাচন করে আইয়ুব খানকে পরাজিত করে প্রকৃত গণতন্ত্র উদ্ধার সম্ভব নয়। এ নির্বাচন প্রমাণ করে স্বৈরাচার কবলিত দেশে ভোট একটি প্রহসন এবং একধরনের একটা স্বৈরাচার।[১৮৬] এসব নির্বাচনে জয়লাভ করে আইয়ুব খান ও তার অনুসারীদের কার্যক্রম আগের চেয়ে আরো বেশি স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নির্বাচনের পরাজয় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে হতাশাগ্রস্ত করলেও তারা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন থেকে সরে যায়নি। তাদের মনে আইয়ুব বিরোধী ক্ষোভ আরো জোরালো হয়। ফলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যক্ষ ভোটের দাবিতে তারা ক্রমশ সোচ্চার হয়ে ওঠে। এমন একটি পরিস্থিতিতে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলতে যে কিছুই ছিল তা এই যুদ্ধে স্পষ্ট হয়। এই অবস্থা পাকিস্তানের কেন্দ্রীভূত প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার অসারতাও প্রমাণ করে। ফলে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব বাংলায় প্রত্যক্ষ ভোটের দাবি আরো জোরালো হয়। সর্বাত্মক বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় স্বাধিকার আন্দোলন।

উপরের আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ১৯৫৫-১৯৬৫ সাল পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতি ও পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এক ঘটনাবহুল দশক। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান, সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাত করে ১৯৫৮ সালে সামরিক স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা, ১৯৬২ সালের সংবিধান, ১৯৬২-৬৪ সাল পর্যন্ত আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরসরকারে শিক্ষানীতি ও অন্যান্য কতিপয় নীতি ও পদক্ষেপের প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক ছাত্র-গণআন্দোলন, ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী এ দশক। এসময় উপযুক্ত ঘটনাবহুল রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে পূর্ব বাংলার নারী সমাজ স্বতঃস্ফূর্ত, সক্রিয় ও গৌরবময় ভূমিকা পালন করে। বস্তুত ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে বাঙালি নারীসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সময় নারীসমাজ উপলব্ধি করেছিল যে, তাদের সার্বিক মুক্তি ও অধিকার অর্জনের বিষয়টি গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে যুক্ত। তাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং রাজনীতিতে নিজেদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা বেশি করে আন্দোলন ও সংগ্রামে যুক্ত হয়। কেবল কর্মী-সমর্থক হিসেবে নয়, ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় সংগঠকের ভূমিকাও পালন করে। এ পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তী ধাপের স্বাধিকার সংগ্রামে নারীসমাজ আরো জোরালো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

---

১৮৫. এডভোকেট এ. বি. এম রিয়াজুল কবীর কাওছার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০৮

১৮৬. জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১০০

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার নারীসমাজ

১৯৬৬ সাল বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বছর। এ বছরটি ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবির জন্য বাঙালি জাতির ইতিহাসে বিশেষভাবে তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে আছে। রাষ্ট্রভাষা ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ইতিহাসের গর্ভে বাঙালি জাতিসত্তার যে ভ্রুণ সৃষ্টি হয়েছিল তা ১৯৬৬ সালে ছয় দফার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়ে পরিস্ফূটিত হয়ে ওঠে। 'আমাদের বাঁচার দাবি' খ্যাত ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির মহাসনদ। এটি বাঙালির জাতীয় মুক্তির 'ম্যাগনাকার্টা' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। আইয়ুব খানের 'তাসখন্দ চুক্তি'[১] স্বাক্ষরের প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের জাতীয় সম্মেলনের প্রথমদিনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান কনভেনশনের সাবজেক্ট কমিটির বিবেচনার্থে তাঁর বিখ্যাত ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। সম্মেলনে যোগদানকারী ৭৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৭৩৫ জন প্রতিনিধি তা তাৎক্ষণিকভাবে নাকচ করে দেন।[২] এর প্রতিবাদে একটি ছোট প্রতিনিধি দলসহ সম্মেলন বর্জন করে দেশে ফিরে এসে ১১ ফেব্রুয়ারি তেজগাঁও বিমান বন্দরে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে তাঁর ছয় দফা কর্মসূচির প্রধান প্রধান দিক তুলে ধরেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ছয় দফা জনগণের কাছে তুলে ধরে এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন এবং এই ছয় দফাকে জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এ দিন আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে এবং পরে ১৮ ও ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত দলীয় কাউন্সিলে ছয় দফা কর্মসূচি অনুমোদিত হয়।[৩] মূলত ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ও পরিণতির ইঙ্গিতবহ একটি প্রামাণ্য দলিল। এক ঔপনিবেশিক প্রভুর বিদায়ের মধ্য দিয়ে যে নব্য ঔপনিবেশিক শক্তি বাঙালির ওপর জগদ্দল পাথরের মতো বসেছিল তাদের বৈষম্যমূলক নীতি ও শোষণের ফলে বাঙালির জীবনে যে বঞ্চনা, দুর্দশা ও

১. ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় তাসখন্দে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিটি 'তাসখন্দ চুক্তি' নামে পরিচিত। এ চুক্তিতে পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের স্বার্থের বা নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়।
২. ৭৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে লাহোরের ১২৪ জন, পূর্ব পাকিস্তানের ২১ জন ও অপর ৫৯৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছিলেন বলে জানা যায়। *The Pakistan Observer (Dacca),* February 6, 1966; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
৩. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৩৪-১৩৫

নিরাপত্তাহীনতাহীন দেখা দিয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে ছয় দফা উত্থাপিত হয়। এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি, রাষ্ট্রীয় সম্পদের ন্যায্য অংশ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাসহ প্রাদেশিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন মূর্তরূপে প্রকাশ পায়।[৪] অবিভক্ত পাকিস্তানের সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জোরালো ও খোলাখুলি প্রস্তাবনা এ ছয় দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। একে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের উভয় অংশে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছাড়াই আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় ছয় দফা আওয়ামী লীগের দলীয় কর্মসূচি ও প্রচারণার প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের প্রচেষ্টায় পূর্ব বাংলায় ছয় দফা ব্যাপক জনসমর্থন ধন্য গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এ ছয় দফাকেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং পরিশেষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ছয় দফা দাবিকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এতে কেবল পুরুষ নেতা-কর্মী নয়, নারীদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সরকারি দমননীতির ফলে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার ও কারান্তরীণ হওয়ার ফলে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমেনা বেগম, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, বেগম মতিয়া চৌধুরীসহ নারীসমাজের একটি অংশ ছয় দফা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা কেবল ছয় দফা কর্মসূচির প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ নয়, বরং আন্দোলনে সংগঠকের ভূমিকা পালনসহ এর পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এমনকি প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলনে অন্যতম পুরোধার ভূমিকা পালন করেছিলেন আমেনা বেগম। অবশ্য অন্যান্য আন্দোলন সংগ্রামের মত ছয় দফা আন্দোলনেও নারীসমাজের ভূমিকা ইতিহাসে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পায়নি। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে আলোচ্য অধ্যায়ে ঐতিহাসিক ছয় দফা, ছয় দফাকেন্দ্রিক আন্দোলন ও এতে নারী সমাজের ভূমিকা তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কারণেই এতে প্রেক্ষাপটসহ ছয় দফা কর্মসূচি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

৬.১: উত্থাপনের পটভূমি ও ছয় দফা কর্মসূচি

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপনের তাৎক্ষণিক পটভূমি বা প্রেক্ষাপট হলেও এর পিছনে সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বস্তুত ভৌগোলিক অবাস্তবতা নিয়ে যে পাকিস্তান গড়ে উঠেছিল তাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে একটি সমতাভিত্তিক উন্নয়ন এবং পারস্পরিক আস্থা তৈরির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দুভাষীদের

---

৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *আমাদের বাচাঁর দাবি ৬- দফা কর্মসূচী*, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২৫৯-২৬৯

হাতে থাকায় তারা এ কাজটি করেননি। জাত্যাভিমানী উর্দুভাষী শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই বাঙালি মুসলমানদের নিচু শ্রেণির মুসলমান[৫] গণ্য করে এদের প্রতি রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিমা শাসকচক্রের এ নীতিকে নব্য উপনিবেশবাদের সাথে তুলনা করা হয়। ১৯৪৮ সালেই পূর্ব বাংলার গণপরিষদ প্রতিনিধি বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ পূর্ব বাংলায় আভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ কায়েম হচ্ছে বলে অভিযোগ উপস্থাপন করেছিলেন।[৬] পশ্চিমা শাসকচক্রের পূর্ব বাংলার অনুদার কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতার প্রথম পরিচয় পাওয়ায় যায় রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাকে উপেক্ষাকরণের মধ্য দিয়ে। পূর্ব বাংলার প্রতি তাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অগণতান্ত্রিক স্বৈরমানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অকার্যকর করণের মাধ্যমে। বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে পাকিস্তানের অপর অংশের সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যা সাম্যনীতি (Parity) মেনে নেয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানের সংবিধানটিও তারা রচনা করতে দেয়নি। দীর্ঘ নয় বছর প্রতীক্ষার পর ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত সংবিধানটিও মাত্র ২ বছর ৬ মাসের মাথায় বাতিল করা হয়। গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক সরকার উৎখাত করে পাকিস্তানে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ ও পাকাপোক্ত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই যে বৈষম্য শুরু হয়েছিল বিগত শতকের ষাটের দশকে এসে তা আরো প্রবল হয়। আলোচ্য সময়কাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে পাচার হয়।[৭] পাচারকৃত অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যের লোকসান পূরণের কাজে ব্যবহার করা হয়। শুরুর দিকে পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার অবদান বেশি ছিল। কিন্তু ষাটের দশকের শুরুতে পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয় পূর্ব বাংলাকে ছাড়িয়ে যায়। সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির ফলে পূর্ব বাংলার মাথাপিছু আয় হ্রাস পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৪-৬৫ সালে দু'অঞ্চলের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য দাঁড়ায় ৪৬%।[৮] অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাপক বৈষম্য, পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে অধিক হারে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়, পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ ও প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ

---

৫. Mohammad Ayub Khan, *Friends Not Masters: A Political Autobiography,* Kharachi, 1967, p. 187; Talukder Maniruzzaman, *Group interests and Political Changes: Studies of Pakistan and Bangladesh,* New Delhi, 1982, p. 24

৬. Begum Shaista Ikramull's Speech in Constituent Assembly of Pakistan Debates, 11, No. 1-4 February, 1948, p. 7

৭. সম্পদ পাচারের চিত্র সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Mahbub ul Haq, *The Strategy of Economic Planning A Case Study of Pakistan,* Oxford University Press, Lahore, 1963, p.100

৮. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ৩য় পরিমার্জিত সংস্করণ, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১০৩

পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় ইত্যাদির ফলে পূর্ব পাকিস্তান ক্রমশ অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে।[৯] সরকারের বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক নীতির কারণে পশ্চিম পাকিস্তান দ্রুত শিল্পোন্নত অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার অর্থনৈতিক উপনিবেশ বা সংরক্ষিত বাজারে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে, পর্যালোচনাধীন সময়ে পূর্ব বাংলায় যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, এদের মালিকানাও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানেও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল পশ্চিমাদের।

পূর্ব বাংলার পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের বিষয়ে বাঙালির মনে যে ক্ষোভ ও হতাশা ১৯৫০ এর দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়নি। পূর্ব বাংলার অর্থনীতিবিদরাও ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এ নিয়ে প্রশ্ন উঠায়নি। তারা কেবল দু'অঞ্চলের জন্য আলাদা অর্থনীতি চালু করার জন্য ক্ষমতাসীনদের নিকট দাবি জানান। উল্লেখ্য যে, '৫০ দশকের শেষ ও '৬০ দশকের শুরুতে প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপক পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে এর প্রতিকারে 'দুই অর্থনীতি তত্ত্ব' (Two Economy Theory)[১০] তুলে ধরেছিলেন। অন্যদিকে ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান ও অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ জাতীয় পরিষদের ১৯৫৫-৫৬ অধিবেশনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি জোরালোভাবে উল্লেখ করেন।[১১] এর পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে কেন স্বায়ত্তশাসন? নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয় যেখানে অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিষয়টি স্পষ্ট তুলে ধরে পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয়।

শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রকট বৈষম্য ছিল। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ৪ জন রাষ্ট্রপ্রধানের (গভর্নর জেনারেল ও প্রেসিডেন্ট) মধ্যে মাত্র একজন (খাজা নাজিমুদ্দীন) ছিলেন পূর্ব বাংলার। একই সময়ে ৭ জন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ৩ জন ছিলেন পূর্ব বাংলার।

---

৯. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে– Mahbub ul Haq, *The Strategy of Economic Planning A Case Study of Pakistan*, Oxford University Press, 1963; Syed Humayun, *Sheikh Mujib's 6- point Formula An Analytical Study for the Break up of Pakistan,* Royal Book Company, Karachi, 1965; Mohiuddin Khan Alamgir & Lodewijk, J.J.Berlage, *Bangladesh National Income and Expenditure 1949-50-1969-70* , Bangladesh Institute of Development Studies, Dacca, 1979; Anwar Ikbal Qureshi, *Mr.Mujib's Six Point: An Economic Appraisal*, Haniya Publishing House, Lahore, 1970 ইত্যাদি গ্রন্থে।

১০. এরা হলেন- অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, অধ্যাপক মোশারফ হোসেন প্রমুখ। 'দুই অর্থনীতি তত্ত্ব' সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য 'Concept of Two Economics: First Encounter with the Pakistani Establishment' Nurul Islam, Making of A Nation Bangladesh: An Economist Tale, UPL, 2003, Chapter 2, pp. 23-59; also Rehman Sobhan, From Two Economies To Two Nations: My Journey to Bangladesh, Dhaka, 2015, pp. 3-28

১১. Government of Pakistan, *Constituent Assembly of Pakistan Debates*, vol. 1, 9, 17,27 & 28, January, 1956, pp. 18-19

মন্ত্রিপরিষদে স্বল্প সংখ্যক মন্ত্রী স্থান পেলেও তাঁদের প্রতিরক্ষা, অর্থ, পররাষ্ট্র, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হতো না। প্রাদেশিক পর্যায়ের অবস্থাও একই রকম ছিল। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব বাংলার গভর্নরদের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন বাঙালি। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় পূর্ব বাংলায় বাঙালিদের যে অপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়েছিল নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রের কারণে তাও নস্যাৎ হয়ে যায়। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এক কথায় বলতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ম্যাকিয়াভেলীয় ষড়যন্ত্রের কারণে পাকিস্তানের রাজনীতিতে বাঙালিদের কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল না।[১২]

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণও ছিল পশ্চিমাদের হাতে। পাকিস্তানের প্রথম এক যুগের কেন্দ্রীয় ও পূর্ব বাংলার সচিবালয়ে সকল মুখ্য পদই ছিল অবাঙালি কর্মকর্তাদের দখলে। ১৯৫৬ সালের পরিসংখ্যান মতে, কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের মোট ১৯৩ জন সচিব, যুগ্ম সচিব ও উপসচিবের মধ্যে বাঙালি কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩ জন। তবে তাঁদের মধ্যে একজনও সচিব ছিলেন না।[১৩] ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব বাংলার ওপর 'সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মানুষের স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে আইয়ুব খান রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সীমিত করে দেওয়ায় রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামরিক ও বেসামরিক আমলাগণ মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু আমলাতন্ত্রে বাঙালিদের গৌণ অবস্থানের কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয়ে ১৭ জন সচিবের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন বাঙালি। সচিবালয়ে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্যে শতকরা ২১ ভাগ ছিলেন বাঙালি।[১৪] ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরিতে বাঙালির অংশিদারিত্ব ছিল মাত্র ২৪%।[১৫] সামরিক আমলাতন্ত্রে বাঙালিদের অবস্থান ছিল আরো নাজুক। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৭জন জেনারেল, লে. জেনারেল ও মেজর জেনারেল পদমর্যাদার কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১ জন মেজর জেনারেল ছিলেন বাঙালি। সেনাবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনীর অফিসার পর্যায়ে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে ৫%, ১০% ও ১৬%।[১৬]

উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক শোষণ, সামাজিক- সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও অত্যাচারে

---

১২. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
১৩. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৩৪
১৪. Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integrity*, UPL, Dacca, 1973, p. 99
১৫. Government of Pakistan, *National Assembly of Pakistan Debates*, vol. 2, No. 2, 1966, p. 1329
১৬. Government of Pakistan, *Constituent Assembly of Pakistan Debates*, vol. 1, 1953, pp. 29-30

পূর্ব বাংলার জনগণ যখন অতিষ্ঠ, তখন পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এর সাথে যুক্ত হলো নিরাপত্তার ব্যাপারে চরম অবহেলা ও উদাসীনতার অভিযোগ। বছরের পর বছর আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও ছাত্রদের মধ্যে বিরাজমান ক্ষোভ ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসন্তোষের পটভূমিতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত 'ছয় দফা' কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। আগেই বলা হয়েছে যে, লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলীয় নেতাদের কনভেনশনে ৬ দফা কর্মসূচি উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ১১ ফেব্রুয়ারি তেজগাঁও বিমানবন্দরে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে এ ঐতিহাসিক কর্মসূচি বা দাবিনামা উপস্থাপন করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরেন।[১৭] তাঁর উত্থাপিত ছয় দফা দাবিগুলো ছিল:

দফা-১: লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশনরূপে গড়তে হবে। তাতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে ও আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

দফা-২: কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে ন্যস্ত থাকবে। এতদব্যতীত অবশিষ্ট সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকবে অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশের হাতে।

দফা-৩: এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়। (ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিয়োগযোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, বরং আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। দুই অঞ্চলের জন্য দু'টি স্বতন্ত্র 'স্টেট ব্যাংক' থাকবে। (খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। এ ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

দফা-৪: সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হয়ে যাবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হবে।

---

১৭. ব্যাখ্যাসহ ছয় দফা দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯-২৬৯; হারুন-অর-রশিদ, *'আমাদের বাঁচার দাবী' ৬ দফার ৫০ বছর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৫-৩৮

দফা-৫: এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়। এতে বলা হয় যে, (১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে; (২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে; (৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে; (৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলবে; এবং (৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যাস্ত করে শাসনতান্ত্রিক বিধান করতে হবে।

দফা-৬: নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রদেশগুলো প্যারামিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে। এতে প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে এখানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করার কথাও বলা হয়।

৬.২: ছয় দফার প্রতিক্রিয়া

ছয় দফা উত্থাপনের পরপরই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে এটা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী আব্দুল হাই চৌধুরী ১৪ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে তাঁর ভাষায় ‘কনফেডারেশন’ গঠনের প্রস্তাবকে দেশদ্রোহিতার নামান্তর বলে অভিহিত করেন।[১৮] যদিও ছয় দফার কোথাও কনফেডারেশন গঠনের কথা বলা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের কাউন্সিল মুসলিম লীগের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম ও ঐ দলের সহ-সভাপতি খাজা খয়েরউদ্দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছয় দফাকে ‘ভয়াবহ পরিণতি সম্পন্ন’ এবং ‘পাকিস্তানের সংহতির জন্য মারাত্মক’ বলে আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাখান করেন।[১৯] পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা আরশাদ চৌধুরী ছয় দফাকে আওয়ামী লীগের জন্য অশুভ কর্মসূচি এবং পাকিস্তানের জন্য সংহতি বিনষ্টকারী হিসেবে উল্লেখ করেন। ছয় দফা পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় পরিণত হলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা ছয় দফার তীব্র সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়।

ছয় দফা কর্মসূচি পাকিস্তান শাসকগাষ্ঠৌকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। এ কর্মসূচি ঘোষণার পর আইয়ুব সরকারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত কঠোর। জেনারেল আইয়ুব ছয় দফাকে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ ‘বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী’, ধ্বংসাত্মক’, ‘বিদেশি মদদপুষ্ট’ ও ‘বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং এর প্রবক্তা শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের এক নম্বর ‘দুশমন’ হিসেবে চিহ্নিত করে ছয় দফাপন্থিদের দমনে ‘অস্ত্রের ভাষা’ প্রয়োগের

---

১৮. *দৈনিক আজাদ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬; *The Pakistan Observer (Dacca),* February 16, 1966

হুমকি দেন। আমেরিকার মতো (১৮৬৩) পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে বলেও তিনি সবাইকে সতর্ক করে দেন।[২০] তিনি আরো বলেন, ছয় দফার ভিত্তিতে দেশে কখনো সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাঁর মতে, এতে পাকিস্তানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।[২১] পূর্ব বাংলার গভর্নর আবদুল মোনেম খানও ছয় দফার তীব্র সমালোচনা করে সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দিতে থাকেন। ১৫ মার্চ তিনি চট্টগ্রামের দুলাহাজরায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার সঙ্গে প্রদেশের জনগণের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও নীতি আদর্শের কোনোই সামঞ্জস্য নেই।[২২] পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় রাজস্বমন্ত্রী ফজলুল বারী ছয় দফার তীব্র সমালোচনা করেন। একইভাবে বাঙালি কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী আব্দুস সবুর খানও ছয় দফার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি ১০ এপ্রিল (১৯৬৬) ঢাকা কনভেনশন মুসলিম লীগ এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবির অর্থ পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এবং এক পর্যায়ে তা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়া।[২৩]

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার ও তাদের সমর্থক রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দই কেবল নয়, পূর্ব বাংলার বিরোধী দলসমূহের কাছ থেকেও শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যাশিত সমর্থন পাননি। এমনকি শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের দল আওয়ামী লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশসহ অনেক প্রবীণ নেতৃত্বের কেউ কেউ ছয় দফার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন।[২৪] এদের মধ্যে একটি অংশ পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট–পিডিএম পন্থি আওয়ামী লীগ গঠনের চেষ্টাও করেছিলেন।[২৫] ন্যাপের বর্ষীয়ান নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও এ বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন দেননি। তিনি বলেছিলেন, তার দল পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গৃহীত কোনো প্রচেষ্টায় শরিক হবে না।[২৬] নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী খুলনা শহরে অনুষ্ঠিত জনসভায় ছয় দফাকে পাকিস্তানের জন্য ভীতিকর প্রস্তাব বলে উল্লেখ করেন। ১১ মে (১৯৬৬) পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী পার্টির প্রধান মাওলানা আব্দুর রহিম, ১৫ মে (১৯৬৬) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল হাই চৌধুরী এবং ৭ জুন (১৯৬৬) পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী পার্টির সম্পাদক গোলাম আজম এবং ঢাকার জামায়াতে ইসলামী পার্টির সভাপতি খুররম শাহ ছয় দফার তীব্র সমালোচনা করেন এবং এর বিপক্ষে প্রচারণা চালান।[২৭]

---

২০. দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
২১. *The Pakistan Observer*, 9, 10, 15, 17 March and 4 April, 1966
২২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ মার্চ, ১৯৬৬
২৩. *The Pakistan Observer,* 5 April, 1966
২৪ . এ দলভুক্ত নেতাদের নামের তালিকা দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, তথ্যনির্দেশ, নং ১৩, পৃ. ৫২-৫৩
২৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪১-১৪৪
২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল, ১৯৬৬
২৭. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, *Dawn (*Karachi), 13, 17, 18 May & 8 June, 1966

পূর্বোক্ত বিরোধিতার বিপরীতে ছয় দফার প্রতি সমর্থনকারীর সংখ্যাও কম ছিল না। ১৯৬৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বার কাউন্সিলের ২১ জন আইনজীবী ছয় দফার সমর্থনে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। এতে তাঁরা বলেন, ছয় দফায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় পাঁচ কোটি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।[২৮] খুলনা জেলার আইনজীবী সমিতির ৩২ জন ছয় দফার সমর্থনে যুক্ত বিবৃতি দেন এবং বলেন এখানে জনগণের প্রাণের দাবি প্রতিফলিত হয়েছে।[২৯] পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরীও ছয় দফাকে সমর্থন দিয়ে এর দাবি দাওয়া সংবলিত এক প্রস্তাব জাতীয় পরিষদে উত্থাপনের জন্য নোটিশ প্রদান করেছিলেন।[৩০] *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ছয় দফাকে সমর্থন করেন এবং একে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। ছয় দফা সম্পর্কে আলোচনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় এসেছিলেন। এ প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে বেগম আখতার সোলায়মান নামে একজন নারী প্রতিনিধিও ছিলেন।[৩১]

৬.৩: ছয় দফাকেন্দ্রিক আন্দোলন ও নারীসমাজ

ছয় দফাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্ক বিশেষ করে এ বিষয়ে সরকারের মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেন যে, এ কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে খুব সহজ হবে না। এমতাবস্থায় সম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে তিনি একে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নেন। আর এ জন্যই আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে অনুমোদনের আগেই তিনি দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও সর্বসাধারণের জন্য বোধগম্য করে দফাভিত্তিক ব্যাখ্যাসহ সহজ ভাষায় ছয় দফা কর্মসূচিকে পুস্তিকা আকারে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। একই সাথে ছয় দফার পক্ষে জনমত সংগঠনে ব্যাপক গণসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেন। ১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে অনুষ্ঠিত একটি জনসভার মাধ্যমে তিনি জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেন। এ জনসমাবেশে তিনি ছয় দফা কর্মসূচিকে 'নতুন দিগন্তের নতুনদের মুক্তির সনদ' বলে আখ্যা দেন। তিনি চট্টগ্রাম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের জন্য দাবি আদায়ের সংগ্রামী পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।[৩২] ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের আগেই শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জনসংযোগ কর্মসূচির অংশ হিসেবে নোয়াখালীর মাইজদী, বেগমগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছাও সিলেটে জনসভা করেন। ২০ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ছয় দফা কর্মসূচি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এই কাউন্সিল

২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ মার্চ, ১৯৬৬
৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
৩২. শেখ মুজিবুর রহমানের চট্টগ্রামের প্রদত্ত ভাষণ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

অধিবেশনেই শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কাউন্সিল অধিবেশনের পর ঐদিনই পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে একে চার দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উপস্থিত জনতার প্রতি আহ্বান জানান।[৩৩] এরপর তিনি ছয় দফা কর্মসূচির পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘুরে বেড়ান। প্রচারণার এক পর্যায়ে ৮ মে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার পূর্বে ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত ৫০ দিনে তিনি ৩২ টি জনসভায় ভাষণ দিয়ে ছয় দফার পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করেন।[৩৪] আওয়ামী লীগের পরীক্ষিত নেতা কর্মী, দলের অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্ব ও ছাত্র যুব সম্প্রদায় তাঁর ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি আকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে।

শুধু আওয়ামী লীগ ও তাঁর অঙ্গ সংগঠন নয়, মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ছাত্র ইউনিয়নের একাংশও ছয় দফাকে সমর্থন দিয়েছিল। ১১ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী মতিয়া চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক এক বিবৃতিতে বলেন, তাদের সংগঠন আওয়ামী লীগের ছয় দফার বিরোধিতা করবে না, কারণ এতে জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরা আরো বলেন যে, অপরাপর বিষয় নিয়ে তাদের মতভেদ থাকলেও ছয় দফা প্রচারে তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অর্জনে তারা কাজ করবেন।[৩৫]

ছয় দফার জনপ্রিয়তা যতই বৃদ্ধি পায় পাকিস্তান সরকারের নির্যাতন- নিপীড়ন ততই বাড়তে থাকে। আ্ওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও আওয়ামী লীগের প্রায় ৩৫০০ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৩৬] তবে এসব দমন নিপীড়ন ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনকে বন্ধ করতে পারেনি বরং শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতেও তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত কর্মীবাহিনী এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ক্রমে এ আন্দোলন জোরদার হতে থাকে এবং তা পৌছে যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৩ মে ‘প্রতিবাদ দিবস’ পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ওসমান গণির অপসারণ, শিক্ষক আবু আহমদ ও জয় কুমার সারোগীর ওপর হামলা এবং শিক্ষক নিবর্তনের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ও শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছয় দফার প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন আদায়ের জন্য ১৩ মে ঢাকায় এক জনসভার

---

৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ মার্চ, ১৯৬৬

৩৪. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯৪৭-৭১, সময়, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৮৯

৩৫. বীনা রাণী রায়, *জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী (১৯৪৭-৭১)*, অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১০০

৩৬. আবু আল সাইদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

আয়োজন করা হয়। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ কারাগারে থাকায় তাঁদের অনুপস্থিতিতে দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ২০ মে তিনি ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভার আহ্বান করেন। সভায় সারা দেশে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর অত্যাচার ও শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৭ জুন (১৯৬৬) সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করা হয়।[৩৭]

আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং জাতীয় পরিষদে দলের পার্লামেন্টারি সদস্যগণ এক বিবৃতিতে হরতাল সফল করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।[৩৮] পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান এক পাল্টা বিবৃতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনে না জড়ানোর অনুরোধ করেন।[৩৯] তাছাড়া তিনি নারায়ণগঞ্জের এক জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবির তীব্র সমালোচনা করেন। সমাবেশে উপস্থিত মুসলিম লীগ ঢাকা শাখার সভাপতি শামছুল হুদাও জনগণকে ৭ জুনের হরতাল কর্মসূচি পালন না করার আহ্বান জানান। কিন্তু উপস্থিত জনগণ তাঁদের সম্মুখেই তাঁদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁদের বক্তৃতার বিরোধিতা করে শ্লোগান দেন।[৪০] মূলত আওয়ামী লীগের আহূত ও ছাত্রলীগের সমর্থিত ৭ জুন হরতালের পক্ষে রুশপন্থি কমিউনিস্ট ও ন্যাপের একাংশ এবং ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোনো দল ও সংগঠনের সমর্থন ছিল না।[৪১] ছাত্র ইউনিয়ন ছয় দফা কর্মসূচিকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করলেও একে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন বলে মনে করতো। এজন্যই সম্ভবত ৭ জুন হরতালকে সমর্থন ও সফল করতে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কর্মী, ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি মতিয়া চৌধুরী ছয় দফা কর্মসূচির সমর্থক ছিলেন। তিনি এর সপক্ষে পরিচালিত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। মতিয়া চৌধুরী ছয় দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সমগ্র পূর্ব বাংলা সফরে নেমেছিলেন। বিভিন্ন জনসমাবেশে তাঁর জ্বালাময়ী যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য লাখ লাখ জনতাকে উদ্দীপ্ত করে। এসময় আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতারা কারাগারে থাকায় রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিসহ ছয় দফার পক্ষে প্রচারণা ও আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ বিষয়ে তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন বেগম বদরুন্নেছা, সৈয়দা

৩৭. মফিদা বেগম, *আওয়ামী লীগ রাজনীতি নারী নেতৃত্ব (১৯৪৯-২০০৯)*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা ২০১০, পৃ. ১০৬
৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ মে, ১৯৬৬ ও ৩১ মে, ১৯৬৬
৩৯. *Dawn (Karachi)*, 7 June, 1966
৪০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫, ৬ ও ৭ জুন, ১৯৬৬
৪১. শেখর দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯০

সাজেদা চৌধুরী ও আমেনা বেগমসহ আরো অনেক নারী। তাঁরা ছয় দফার পক্ষে জনমত তৈরি এবং ৭ জুনের হরতালকে সফল করতে নেতা-কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণে ভূমিকা পালন করেন।[৪২]

৭ জুনের হরতালকে আইয়ুব সরকার এবং তার বংশবদ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। হরতাল প্রতিহত করতে মোনায়েম খানের নির্দেশে আওয়ামী লীগের নেতাদের আরেক দফা গ্রেপ্তার করা হয়। হরতাল বন্ধের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কিন্তু সরকারের নির্যাতন ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ৭ জুন পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাট-বাজার, কল-কারখানা, দোকান-পাট বন্ধ থাকে। হরতালের খবর সংবাদপত্রে ছাপানো নিষিদ্ধ ছিল, তাই ৭ জুনের হরতালের বিবরণ কোনো সংবাদপত্রে পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, হরতাল চলাকালে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ঢাকা, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জে অন্তত ১১ জন নিহিত এবং বহুলোক আহত হয়।[৪৩] আওয়ামী লীগের প্রথম সারির প্রায় সকল নেতাসহ প্রায় ৮০০ জন রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংবাদপত্র *দৈনিক ইত্তেফাক* এর প্রকাশনা বন্ধ এবং সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে কারারুদ্ধ করা হয়।

সরকারি দমননীতি যে গণবিস্ফোরণকে প্রতিহত করতে পারে না, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো ছয় দফাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত আন্দোলন ও হরতাল কর্মসূচিতে। হরতাল কর্মসূচিটি অভাবনীয়ভাবে সফল হয়েছিল। এ কর্মসূচিতে ছাত্র-জনতার সাথে পূর্ব-বাংলার শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণে রাজনীতিতে এক ভিন্ন মাত্রার সংযোজন হয়েছিল। এদিকে হরতাল কর্মসূচিতে পুলিশ-ইপিআর এর গুলিবর্ষণ ও মানুষ হত্যা এবং ব্যাপক নির্যাতনের ঘটনায় পূর্ব বাংলায় ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়। হরতালের দিন গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের মুলতবি প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে সদস্যরা এর প্রতিবাদে পরিষদ কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন।[৪৪] ১৬ জুন প্রদত্ত এ বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি এবং অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে দেশবাসীর কল্যাণ সাধন ও স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[৪৫] জাতীয় পরিষদের সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা নুরুল আমিন ২০ জুন রাওয়ালপিন্ডিতে এক বিবৃতিতে ৭ জুন হরতালের দিন হত্যাকাণ্ডকে নির্বিচারে রাজনৈতিক তৎপরতাকে গতিরোধ করার শামিল বলে উল্লেখ করেন।

---

৪২. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারী*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা ২০১৮, পৃ. ১৫

৪৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জুন, ১৯৬৬; *দৈনিক সংবাদ*, ৯ জুন, ১৯৬৬; *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ জুন, ১৯৬৬; *The Pakistan Observer,* 8 June, 1966

৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জুন, ১৯৬৬

৪৫. *Dawn (Karachi),* 17 June, 1966

১৯৬৬ সালের ১০ ও ১১ জুন সৈয়দ নজরুল ইসলামের দেশব্যাপী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৪৬] ছয় দফা আন্দোলনকে সাংবিধানিকভাবে প্রতিহত করতে কনভেনশন মুসলিম লীগ তাদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করে। এই সময় কেন্দ্রীয় যোগযোগমন্ত্রী আবদুস সবুর খান যে কোন পন্থায় ছয় দফা ভিত্তিক দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।[৪৭] এরূপ বাস্তবতায় ১৯৬৬ সালের ২৩ ও ২৪ জুলাই আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আন্দোলন অব্যাহত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রতিটি জেলা শাখার নেতৃবৃন্দকে ছয় দফার প্রতি সমর্থন আদায় করার জন্য প্রতিটি গ্রামে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাবার অনুরোধ করা হয়।[৪৮]

উল্লেখ্য যে, ২২ জুন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরীকে তাঁর চাঁদপুর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এ অবস্থায় ২৭ জুলাই দলের তৎকালীন মহিলা সম্পাদিকা আমেনা বেগমকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৭ জুন পরবর্তী ছয় দফা আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব দেন আমেনা বেগম। উল্লেখ্য যে, শুরু থেকেই তিনি ছয় দফা কর্মসূচির প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। ৭ জুন হরতাল কর্মসূচি সংগঠিত করতে মিজানুর রহমান চৌধুরীর সাথে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন।[৪৯] এবার দল ও জাতির চরম দুর্দিনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁর প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক পতাকা সমুন্নত থাকে। তাঁর একনিষ্ঠ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় শীর্ষ নেতাদের অনুপস্থিতিতেও ছয় দফার আন্দোলন শুধু অব্যাহতই থাকেনি, এর গণভিত্তি সম্প্রসারিত হয়।[৫০]

এদিকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দ্বিতীয় পর্যায়ে ছয় দফা আন্দোলনে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পূর্ব বাংলা সফরকালে ১৯৬৬ সালের ৮ আগস্ট ঢাকা বিমান বন্দরে প্রদত্ত এক বক্তব্যে আন্দোলন প্রতিহতকরণে কঠোরপন্থা অবলম্বনের হুঁশিয়ারি উচ্চারণসহ দেশপ্রেমিক জনগণকে ছয় দফা আন্দোলনকারীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ না করার অনুরোধ জানান।[৫১] ১২ আগষ্ট প্রদত্ত অপর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, যদি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিবিদদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছয় দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, তবে দ্রুত তারা নিজেদের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে না।[৫২]

---

৪৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ জুন, ১৯৬৬
৪৭. *Morning News (Dacca)*, July 14, 1966
৪৮. *The Pakistan Observer (Dacca)*, 25 July, 1966
৪৯. https://en.wikipedia.org/wiki/amenabegum
৫০. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ.২৯২
৫১. *Morning News (Dacca)*, 8 & 13 August, 1966
৫২. *Dawn (Karachi)*, 13 August, 1966

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছয় দফার আন্দোলনকারীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও তাদেরকে বিকল্পপন্থা অবলম্বন করে সমুচিত শাস্তি প্রদানের যে ঘোষণা দেন তার প্রতিবাদ জানিয়ে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম বলেন যে, রাষ্ট্রপ্রধানের এ ধরনের মন্তব্য করা দেশের জন্য মানহানিকর এবং তা বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। তিনি আরো বলেন, দেশের জনগণকে ছয় দফা আন্দোলন থেকে দূরে রাখার জন্য আইয়ুব খান এ ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে তার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ছয় দফা আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি, এতে কোনো প্রকারের বিচ্ছিন্নতার স্থান নেই।[৫৩]

আইয়ুব খানের পূর্বোক্ত বক্তব্যের পর আওয়ামী লীগ ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে এক প্রতিবাদ সভার আহ্বান করে। কিন্তু সরকার এ সভা অনুষ্ঠানের অনুমতি না দেয়া ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আমেনা বেগম এক বিবৃতির মাধ্যমে দলের জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা- কর্মীদের শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ছয় দফার দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[৫৪] এ সময় চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এক জনসভা থেকে তিনি ছয় দফার ভিত্তিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন পরিচালনার কর্মসূচিও ঘোষণা করেন। সভায় আমেনা বেগম আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি, ছয় দফার বৈশিষ্ট্য ও পাকিস্তানের রাজনীতিতে এর গুরুত্ব, পাকিস্তান অর্জনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অবদান তুলে ধরেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রয়াসের নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ছয় দফার সমর্থনে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।[৫৫] ১৯৬৬ সালের ১৬ অক্টোবর দিনাজপুরের গোরাশহিদ ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় আমেনা বেগম ছয় দফার আন্দোলনকারীদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদীর পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী বলে উল্লেখ করতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের প্রতি আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছয় দফাকেন্দ্রিক দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন একটি দূর্বার আন্দোলনে রূপ নিতে পারে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য 'ম্যাগনাকার্টা' বলে মন্তব্য করেন এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ছয় দফার ভিত্তিতে গড়ে তোলা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চালিয়ে যাবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[৫৬]

---

৫৩. *The Pakistan Observer (Dacca),* 17 August, 1966

৫৪. *The Pakistan Observer (Dacca)* , 16 August, 1966

৫৫. *The Pakistan Observer (Dacca),* 17 August, 1966

৫৬. *The Pakistan Observer (Dacca),* 17 October, 1966

১৯৬৬ সালের ২৩ অক্টোবর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে আমেনা বেগম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় বলেন যে, ছয় দফা পাকিস্তানকে দুর্বল করার অর্থ প্রকাশ করে না। তা কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি বাস্তবায়নের অর্থ প্রকাশ করে। তাঁদের মতে, ছয় দফা জনগণেরই দাবি।[৫৭] পরের দিন ঢাকার আউটার স্টেডিয়াম ময়দানে সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আরো একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় আমেনা বেগম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তৃতায় ছয় দফার আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, 'ছয় দফা দাবি কেবল আওয়ামী লীগের দাবি হিসেবে থাকছে না, তা পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি জনগণের দাবিতে পরিণত হতে চলছে। তাঁরা বলেন ছয় দফা নয়, বরং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক ছয় দফা আন্দোলনকারীদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির পথ সুগম করছে।[৫৮]

শুধু ঢাকায় সভা-সমাবেশ ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে কার্যক্রম সীমাবদ্ধ না রেখে এ সময় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আমেনা বেগম পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা সফর করে দলের আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত সভা-সমাবেশে বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে ছয় দফার যৌক্তিকতা, কার্যকারিতা ও আইনগত বৈধতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁরা জনগণকে আইয়ুব সরকারের দমন-নিপীড়ন উপেক্ষা করে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। এ সকল সভা-সমাবেশ থেকে আমেনা বেগম ও সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ উপস্থিত নেতা-কর্মীরা ছয় দফার ওপর গণভোটের আয়োজন করতে আইয়ুব সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।[৫৯]

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ছয় দফাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে, আমেনা বেগম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমেনা বেগম ছাড়াও এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী কয়েকজনের নাম ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব (১৯৩০-৭৫খ্রি.)।[৬০] বাংলাদেশের ইতিহাসে

---

৫৭. *The Pakistan Obsever (Dacca)*, 24 October, 1966

৫৮. *Dawn (Karachi)*, 25 October, 1966

৫৯. Shymoli Ghosh, *op. cit*. p. 130

৬০. প্রকৃত নাম ফজিলাতুন নেছা রেণু। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চাচাতো বোন ছিলেন। মাত্র ৮ বছর বয়সে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশিদূর না থাকলেও স্বামী বঙ্গবন্ধুর সাহচার্যে থেকে তিনি রাজনীতির ব্যাপারেও অত্যন্ত পারদর্শিতা অর্জন করেন। স্বামী বঙ্গবন্ধুর ওপরও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেগম ফজিলাতুন নেছা ছিলেন অফুরান প্রেরণার উৎস। তিনি বাংলার ইতিহাসে নেতৃত্ব সৃষ্টিতে নীরবে নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এ নারী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বামী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। তিনি স্বামী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিটি কাজের প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করা, দলকে সুসংগঠিত রাখা, আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনায় সহযোগিতা করাসহ প্রত্যেকটি কাজ বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করতেন এ মহীয়সী নারী।[৬১] ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার প্রেক্ষাপটে বেগম মুজিব দলের শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে ৭ জুনের হরতাল সফলে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। জানা যায় যে, গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি এড়িয়ে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তাঁদের ছোট ফুফুর ফ্ল্যাট বাসায় চলে যেতেন। ওখানে গিয়ে নিজের স্যান্ডেল বদলাতেন, কাপড় বদলে, বোরকা পরে একটা স্কুটার ভাড়া করে ঢাকায় পড়ুয়া ছোট ভাইকে নিয়ে ছাত্রনেতা আর আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতেন। আন্দোলন চালাবে কিভাবে তার পরামর্শ, নির্দেশনা তিনি নিজেই দিতেন।[৬২] আন্দোলন চলাকালীন তিনি জেলখানায় সাক্ষাৎকারের সময় প্রতিটি ঘটনা স্বামী শেখ মুজিবুর রহমানকে জানাতেন এবং তাঁর কাছ থেকে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের জন্য করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা নিয়ে আসতেন। তিনি পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার চোখ এড়িয়ে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাসহ তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন।[৬৩]

ছয় দফা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ নেত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীও (বর্তমানে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা) সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছয় দফার প্রচারাভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ছয় দফার দাবিতে রাজপথের আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন আরেক নারী নেত্রী বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ। তিনি ছয় দফা বাস্তবায়ন এবং শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে পরিচালিত আন্দোলনে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। ছয় দফার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুসহ বহু নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হলে আন্দোলন কর্মসূচি নির্ধারণ ও দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিষয়ে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের উপস্থিতিতে বেগম বদরুন্নেছার বাড়িতে অনেক গোপন বৈঠক হতো।[৬৪]

ছয় দফা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী আরেক নারী ছিলেন মাহফুজা খানম। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু'র ভিপি ছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ইউনিয়নের প্রার্থী হিসেবে তিনি ডাকসু'র ভিপি নির্বাচিত হন। অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকায় ছয় দফাকে গণদাবিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে জনমত

রহমানসহ পরিবারের অন্যান্যদের সাথে শাহাদাৎ বরণ করেন। মমতাজ বেগম, মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা স্মরণিকা, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৬১. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৫ আগস্ট, ১৯৯৬

৬২. রিয়াজ আহমেদ. "বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব 'বঙ্গমাতা'", *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৮ আগস্ট ২০২০

৬৩. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৫ আগস্ট, ১৯৯৬

৬৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ মে, ১৯৭৪

গড়ে তোলার দায়িত্ব পালনে ডাকসুর ভিপি হিসেবে মাহফুজা খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছয় দফার সপক্ষে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত অনেক ছাত্র সমাবেশে অংশ নেন এবং তাতে সভাপতিত্ব করেন।[৬৫] তাছাড়াও ছয় দফার বিষয়ে সাধারণ মানুষকেও উদ্বুদ্ধকরণে মাহফুজা খানম নানাভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে ডাকসুর উদ্যোগে ছয় দফার সমর্থনে এক জনসভার আয়োজন করেন তিনি। এ সভা আয়োজন ও তাতে সভাপতিত্ব করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল।[৬৬]
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছয় দফা আন্দোলন কেবল ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল না। ঢাকা বাইরেও সারা পূর্ব বাংলায় এর ব্যাপ্তি প্রসারিত হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত এ আন্দোলনের কোথাও কোথাও পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছাত্রী ও নারী রাজনৈতিক কর্মীরাও ভূমিকা রেখেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, কুমিল্লা মহিলা কলেজ ছাত্রী সংসদের সহ-সভানেত্রী মমতাজ বেগম ছয় দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগেরও সহ-সভাপতি ছিলেন। কুমিল্লায় ছয় দফা আন্দোলন শুরু হলে তিনি এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছয় দফা কর্মসূচির অংশ হিসেবে পালিত মিছিল মিটিং- এ অংশ নিতেন।[৬৭] তাছাড়া তিনি নারী ও ছাত্রীদের ছয় দফার গুরুত্ব ও আবশ্যিকতা প্রচার করে এর সপক্ষে তাদের সংগঠিত করারও চেষ্টা করতেন। বিশ শতকের ষাটের দশকের শেষভাগে পটুয়াখালীর স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে আন্দোলন-সংগ্রামের অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন মনোয়ারা বেগম মনু (১৯৫৫-২০০৯ খ্রি.) ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই রাজনীতিতে তাঁর হাতে খড়ি হয়েছিল।[৬৮] ছয় দফা আন্দোলনের সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে তার বড় ভাইকে গ্রেপ্তার করা হলে স্কুল ছাত্রী মনোয়ারা বেগম মনু ও তার বোন আনোয়ারা বেগম তাদের স্কুলের সব ছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ করে ছয় দফা আন্দোলনের নেমে পড়েন। তার ছয় দফার সমর্থনের পাশাপাশি তাদের গ্রেপ্তারকৃত ভাইয়ের মুক্তির দাবিতে শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় মিছিল করেন। এ অপরাধে তাদের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তবে এতে করেও তাদের নিষ্ক্রিয় করা যায়নি। তাদের আহ্বানে স্থানীয় জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছয় দফা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।[৬৯]

রাজনীতিবিদ ও আওয়ামী লীগ নেত্রী নূরজাহান মোর্শেদও (১৯৫৪ সালে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) ছয় দফা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৭০] বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম নারী রাজনীতিবিদ জোবায়দা

---

৬৫. মাহফুজা খানমের সাক্ষাৎকার, ২২ মার্চ, ২০১৮ ইং; মাহফুজা খানম, *ছাত্র রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৬৯; মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮

৬৬. মাহফুজা খানমের সাক্ষাৎকার, তারিখঃ ০৬.০৬.১৯৯৮ ইং; উদ্ধৃতি শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমি, ২০০৭, পৃ. ৪১

৬৭. অধ্যাপক মমতাজ বেগমের সাক্ষাৎকার, ১৯.০৬.২০১৯; মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

৬৮. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

৬৯. মনোয়ারা বেগম মনু এর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য; ১৩.১২.১৯৯৭, উদ্ধৃত শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

৭০. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৮

খাতুন চৌধুরীও (১৯০১-১৯৮৫ খ্রি.) ছয় দফা আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। সিলেটের এ মহীয়সী নারী আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বৈরাচারবিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। ছয় দফা আন্দোলনেও তিনি সরব ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৭১]

যশোরে ছয় দফা আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রচারকর্মী ছিলেন কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা।[৭২] টাঙ্গাইলে এ আন্দোলনের এক সক্রিয় নারী কর্মী ও সংগঠক ছিলেন সুফিয়া খান। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে (১৯৪৮-৫২ খ্রি.) তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেন। এ পর্যায়ে তিনি ছয় দফা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন এবং পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে শোষণ ও বঞ্চিত করার চিত্র তুলে ধরে ছয় দফার পক্ষে জনমত সংগঠনসহ জনগণকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও আন্দোলনমুখী করার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করেন।[৭৩] টাঙ্গাইলে ছয় দফা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী আরেকজন হলেন রাফিয়া আক্তার ডলি।[৭৪] স্কুলছাত্রী থাকাকালীন শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি কুমুদিনী মহিলা কলেজের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি কলেজ ছাত্রী সংসদের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানসহ রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে তিনি তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেও তিনি সক্রিয় রাজনীতি ও আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নেন।[৭৫]

স্কুল জীবন থেকে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন ডাঃ লুৎফুন নেসা। তিনি ১৯৬৫-৬৬ সালে ঢাকা গভর্মেন্ট গার্লস কলেজ (প্রাক্তন ইডেন কলেজ) বকশী বাজার, ছাত্রলীগের সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন। তিনি ও ছয় দফা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন এবং ৬ দফার পক্ষে এবং তৎকালীন সরকারের বিপক্ষে বক্তব্য দেওয়ায় তাকে কলেজ থেকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি।[৭৬] ছয় দফা আন্দোলনে জড়িত আরেকজন নারী ছিলেন ইসাবেলা সিরাজী। ১৯৪২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণকারী ইসবেলা স্কুল জীবন থেকেই রাজনীতি ও আন্দোলন সংগ্রামের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি নিয়মিত রাজনৈতিক কর্মসূচি ও মিছিল মিটিং-এ অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৬২ সালের

৭১. বিস্তারিত দেখুন, তাজুল মোহাম্মদ, *সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮
৭২. কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা- এর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ: ২১.০৬.২০১৯
৭৩. সুফিয়া খান -এর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য; ০৮.০৮.১৯৯৮, উদ্ধৃত শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২
৭৪. রাফিয়া আক্তার ডলি একজন রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা। বিদ্যালয় চত্বর থেকে আন্দোলন-সংগ্রামের শুরু নারী নেত্রী রাফিয়া আক্তার ডলির। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনীত সাংসদ ছিলেন তিনি।ভারত পাড়ি দিয়ে প্রবাসী সরকারের নানা কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডলি।
৭৫. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬২-৬৩
৭৬. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮

শিক্ষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনে ছিল তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল বলে জানা যায়। ছয় দফা আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৭৭] ছয় দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী আরেক নারী ছিলেন বেগম আশরাফুন নেছা। তিনি ছিলেন একজন লেখিকা। লেখনীর মাধ্যমে তিনি ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি যশোরে ছিলেন এবং সেখানে ছয় দফা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। যশোর আওয়ামী লীগের ছয় দফাপন্থি নেতা শহীদ মোশাররফ হোসেন (এল এল বি) তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষাগুরু ছিলেন বলে জানা যায়।[৭৮] সম্ভবত তাঁর উৎসাহেই আশরাফুন নেছা ছয় দফা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন।

সাহিত্যিক, উদ্যোক্তা, নারীনেত্রী ও সমাজসংগঠক বেগম মুশতারী শফী একজন 'শহীদজায়া' ও 'শহীদভগ্নি'। তিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। চট্টগ্রাম উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ছয় দফা আন্দোলনেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে সময় ছয় দফার সমর্থনে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় যোগদনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এই প্রগতিশীল নারীনেত্রী।[৭৯] এছাড়া ছয় দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ডাঃ রেণু কণা বড়ুয়া ও দীপালী চক্রবর্তীও ছিলেন বলেন তাঁদের সাক্ষাৎকারে জানা যায়।[৮০] ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা নিহত বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী আইভি রহমান (১৯৪৪-২০০৪ খ্রি.) এবং সদ্য প্রয়াত আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন (১৯৪৩-২০২০খ্রি.) প্রমুখও ছয় দফা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।[৮১] ছয় দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আরেকজন ছিলেন সদ্য প্রয়াত প্রখ্যাত নারীনেত্রী বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়েশা খানম (১৯৪৭-২০২০ খ্রি.)। তিনি নেত্রকোণায় স্কুলছাত্রী থাকাকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর অধিকতর সক্রিয় পদাচারণা ঘটে। এ সময়ে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া গ্রুপের সাথে সংযুক্ত ছিলেন।[৮২] বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে ছয় দফা আন্দোলনে অংশ নেয়া আরো কয়েকজন নারীর কথা জানা যায়। তাঁদের মধ্যে বরিশালের সাহান আরা বেগম, চট্টগ্রামের মরিয়ম বেগম, বরিশালের জাহানারা বেগম বুলা,

---

৭৭. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০-২৮১

৭৮. বেগম আশরাফুন নেছার সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য উদ্ধৃত শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭

৭৯. বেগম মুশতারী শফীর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য উদ্ধৃত শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০৬- ৩০৭

৮০. ডাঃ রেণু কণা বড়ুয়া ও দীপালী চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য উদ্ধৃত শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯৩, ৩১০

৮১. বিস্তারিত মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭২,৮৯

৮২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ.২১৫

জোবেদা খাতুন পারুল, মাদারীপুরের রওশন আরা বেগম এবং সিরাজগঞ্জের আমিনা বেগম মীনা প্রমুখ অন্যতম।[৮৩]

বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে ছয় দফা কর্মসূচি এক গুরুত্বপুর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকার আদায়ের সনদ। আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তি সনদ হিসেবে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এমনকি পূর্ব বাংলায়ও এ ছয় দফা কর্মসূচি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ়তা এবং আওয়ামী লীগের তাঁর অনুগামী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের প্রচেষ্টায় ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব বাংলার জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে একমত হলেও পূর্ব বাংলার অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এমনকি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের একাংশেরও ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি সমর্থন ছিল না। নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান এবং আবু হোসেন সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অপেক্ষা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দিয়ে এ বিষয়ে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। ছয় দফার প্রতি মওলানা ভাসানীর মনোভাবও ইতিবাচক ছিল না। এ সময় ছয় দফার বিপরীতে ১৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। এভাবে দেখা যায় যে, ছয় দফাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ অন্যান্য দলগুলো থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি পূর্ব বাংলার বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের ইতিবাচক মনোভাব ও সমর্থন না পেলেও এর প্রবক্তা শেখ মুজিবুর রহমান মোটেই হতোদ্যম হননি বরং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি জনমত সংগঠনে এক সর্বাত্মক আন্দোলন কার্যক্রম শুরু করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বাত্মক প্রয়াস এবং আওয়ামী লীগে তাঁর অনুগামী নেতা-কর্মী বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের আন্তরিক উদ্যোগে ছয় দফার সমর্থনে প্রদেশব্যাপী এক গণআন্দোলন শুরু হয়। ছয় দফা কর্মসূচি এবং একে কেন্দ্র করে সূচিত আন্দোলন কর্মসূচিকে অকার্যকর ও ব্যর্থকরণে সরকারের গৃহীত নিবর্তনমূলক দমন নীতি, শেখ মুজিবুর রহমানসহ ছয় দফাপন্থি নেতা-কর্মীদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার ও কারাগারে নিক্ষেপ সত্ত্বেও ছয় দফা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। সর্বাত্মক আন্দোলনের ফলে ছয় দফা জনগণের ব্যাপক ম্যান্ডেট লাভ করে। ছয় দফা কর্মসূচি থেকে বাঙালি জাতির মধ্যে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা হয়।[৮৪] ছয় দফাকেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ ধরেই ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং পরিশেষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমেই শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি

৮৩. বিস্তারিত মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬-৯৭,১২৭, ১২৯ ও ১৫৬; সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, *২য় খণ্ড*, পৃ.১৯৭

৮৪. হারুন অর রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

জনগণের নিকট নির্ভীক, আপসহীন ও ত্যাগী নেতা হিসেবে বিপুলভাবে সমাদৃত হন। তিনি আবির্ভূত হন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা ও মুক্তির দূত হিসেবে।

বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের ঐতিহাসিক দলিল ও মুক্তির সনদ ছয় দফা আন্দোলনের পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের মানুষ যুক্ত ছিল। ষাটের দশকের অন্যান্য আন্দোলনের মতো ছয় দফা আন্দোলনেও বাঙালি নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, এ আন্দোলন সংগঠন ও বিকাশে শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে এ আন্দোলনে নারীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন আওয়ামী লীগের নেত্রী আমেনা বেগম। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর ও সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদসহ দলের শীর্ষ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর এক পর্যায়ে আমেনা বেগম দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার লাভ করেন। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার প্রাপ্তির পর আমেনা বেগম ছয় দফা আন্দোলনের বিশেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে আমেনা বেগম নেতৃত্ব দেন। তাঁর সাংগঠিনক তৎপরতার ফলে এ আন্দোলন কেবল অব্যাহত থাকেনি, বরং আরো বেগবান হয়েছিল। আমেনা বেগম ছাড়াও পূর্বে উল্লেখিত অনেক নারী ছাড়াও অসংখ্য নাম না জানা নারীও এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ছয় দফা আন্দোলন যুক্ত নারীরা আন্দোলনের প্রচার-প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। হরতাল-ধর্মঘটসহ আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে মিছিল সমাবেশে অংশ নিয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নিতে না পারলেও 'বাঙালির বাঁচার দাবী' ও 'মুক্তির সনদ' হিসেবে খ্যাত ছয় দফা কর্মসূচি ও একে কেন্দ্র করে সূচিত আন্দোলন কর্মসূচির প্রতি নিঃসন্দেহে বৃহত্তর বাঙালি নারীসমাজের নিরব সমর্থন ছিল।

১৯৪৭-১৯৫২ সাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি নারীসমাজ রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তার আলোকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। ছয় দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণ তাঁদের ছয় দফা পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষ করে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে আরো ব্যাপকহারে অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নারী

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে অত্যন্ত ঘটনাবহুল। এ সময় কালে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালে পূর্ব বাংলায় সরকারবিরোধী এক গণঅভ্যুত্থান ঘটে। ইতিহাসে এটি 'ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান' নামে পরিচিত। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। একে স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দু'দশকের বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার ফলে বাঙালির মনে যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বা গণবিস্ফোরণে। অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরম বৈষম্যমূলক নীতি ও শোষণের ফলে পূর্ব বাংলার জনমানুষের মনে যখন চরম অসন্তোষ বিরাজমান ছিল, তেমনি এক প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেছিলেন। শেখ মুজিবের এ ছয় দফা কর্মসূচি বাংলার গণমানুষকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করে এবং তারা একে তাদের বাঁচার দাবি ও মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। ছয় দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার রাজনীতি যখন উত্তাল ও সরগরম তখন আইয়ুব খানের স্বৈরসরকার ছয় দফা আন্দোলনকে নস্যাত করার জন্য কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করে। শেখ মুজিবুর রহমানসহ হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। ছয় দফা কর্মসূচি এবং এর পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেন। একে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এ ষড়যন্ত্রে আওয়ামী লীগ জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রথমে দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা ও দুইজন সিনিয়র বাঙালি সিভিল কর্মকর্তাসহ মোট ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে এ মামলার প্রধান আসামি করা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে দায়ের করা এ তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি করে। ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে গণআন্দোলনের উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলনের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে

চলমান আন্দোলন ক্রমশ জোরালো হতে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারবিরোধী আটটি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে Democratic Action Committee-DAC নামক একটি রাজনৈতিক মোর্চা গঠন করে। 'ডাক' গণতন্ত্র ও জনগণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার এবং চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও সমন্বিত করে একটি অহিংস, সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। অন্যদিকে ১৯৬৯ সালের শুরুতেই পূর্ব বাংলার ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যুক্তভাবে 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি' (Students Action Committee) গঠন করে এবং আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ১১ দফা দাবি ঘোষণা করে। একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনীতিবিদ ও ছাত্র-জনতার আন্দোলন অচিরেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে এ আন্দোলন প্রশমনে সরকারও কঠোর দমন নীতির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু এতে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি বরং ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং গণঅভ্যুত্থান রূপ পরিগ্রহ করে। আন্দোলনের তীব্রতার কাছে শেষ পর্যন্ত লৌহমানব আইয়ুব খান নতি স্বীকারে বাধ্য হন। তাঁর পদত্যাগের মধ্য দিয়ে আইয়ুব খানের এক দশকের আধিপত্যবাদী স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নিয়ে অনেক গবেষণা এবং সে সব গবেষণার কিছু কিছু গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয়েছে।[১] এসব গবেষণা ও গ্রন্থে গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা গুরুত্ব পেলেও এ আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়নি। কিন্তু এ ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমে বাংলার নারীসমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নারীসমাজের অংশগ্রহণ বিষয়ে অনুসন্ধান এবং বিচার-বিশ্লেষণ বর্তমান অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য। তবে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে এ অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে নারীসমাজের অংশগ্রহণ বিষয়েও আলোকপাত করার প্রয়াস থাকবে।

৭.১: গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং এর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে বিচারের নামে প্রহসন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের আশু পটভূমি তৈরি করলেও এর পিছনে বাঙালির দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ ফরহাদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়:

---

১. ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: মাহফুজ উল্লাহ রচিত *অভ্যুত্থানে ঊনসত্তর*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩; সেলিনা হোসেন, *ঊনসত্তরের গণআন্দোলন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৬; মেসবাহ কামাল, *আসাদ ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, বিবর্তন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬; মোহাম্মদ ফরহাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯ এবং লেনিন আজাদের '*ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান: রাষ্ট্রসমাজ* ও রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৭ ইত্যাদি।

> প্রকৃতপক্ষে কেবল আইয়ুব শাহীর ১০ বছরের স্বৈরাচারী শাসনেরই নয় বরং পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর থেকেই দীর্ঘ ২২ বছরব্যাপী মূলত একই শাসকশ্রেণির শাসন-শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে জনগণের জীবনের সঙ্কটসমূহ আইয়ুব শাসনামলে যে তীব্রতা লাভ করে গণঅভ্যুত্থানের সেটাই ছিল পটভূমি।[২]

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার বাঙালির প্রাণের দাবি স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি যখন নানা দমন নিপীড়ন ও সরকারি নির্যাতনের ফলে কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, তখন পূর্ব বাংলায় উদ্ভূত নানা ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ছয় দফার দাবিগুলো ছাত্রসমাজের ১১ দফায় সন্নিবেশিত হয়ে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের জন্ম হয়েছিল। এসব ঘটনাক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

পাকিস্তান সরকারের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন: পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিবিরোধী মনোভাব ও আগ্রাসন সম্পর্কে অভিসন্দর্ভের অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ছয় দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় চলমান সরকারবিরোধী মনোভাব যখন তুঙ্গে সে সময় ১৯৬৭ সালের মধ্যভাগে পাকিস্তান সরকার পুনরায় বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী আগ্রাসী তৎপরতা শুরু করে। সম্ভবত ছয় দফাকেন্দ্রিক আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপকৌশল হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার এ কাজটি করেছিল। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অংশ হিসেবে সরকার রবীন্দ্রবিদ্বেষী মনোভাবের প্রকাশ ঘটায়। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তান রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ ছিল। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এ সময় রাজশাহী থেকে নির্বাচিত বিরোধী দলীয় সদস্য মজিবর রহমান চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তানি আদর্শের সঙ্গে না মিললে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হবে। পরিষদে সরকারি দলের নেতা খান এ. সবুর পহেলা বৈশাখ উদযাপন এবং রবীন্দ্র সংগীতকে হিন্দু-সংস্কৃতির অংশ বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন:

> ইদানিং পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের অশুভ তৎপরতা আমি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি। পহেলা বৈশাখ ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনের নামে বিদেশি সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের মূলে আঘাত হানছে।[৩]

আইন পরিষদ সদস্য ডাঃ আলীম আল রাজীর এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বলেন, “রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার যে রচনা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থি বিবেচিত হবে সেগুলোর প্রচার ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে।”[৪] জাতীয় পরিষদের বিতর্ক এবং

---

২. মোহাম্মদ ফরহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৩. *National Assembly of Pakistan Debates,* Official Report, 20 June, 1967, pp. 1801-2

৪. *National Assembly of Pakistan Debates,* Official Report, 20 June, 1967, p. 1940

সরকারি দলের নেতা ও তথ্যমন্ত্রীর উপর্যুক্ত মন্তব্যের তথ্য ঢাকার সংবাদপত্রে[৫] প্রকাশিত হলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৪ সাল থেকেই পূর্ব বাংলায় পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল। মূলত পাকিস্তানি শাসকচক্রের বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী অপতৎপরতার প্রতিবাদ এবং অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারের লক্ষ্যেই এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছিল। তাই অনেকেই মনে করেন এটি নিছক কোনো নববর্ষ পালন ছিল না। এর লক্ষ্য ছিল সুদূরপ্রসারী এবং এর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নিঃসন্দেহে ছিল গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্যাভিমুখী।[৬] রাজনীতিতে যখন দমন-নিপীড়ন, ভাঙন, ষড়যন্ত্র, ও চক্রান্তের খেলা চলছিল তখন এ নববর্ষ অনুষ্ঠান শিক্ষিত ও অগ্রসর জনগণের মনোজগৎকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় এবং অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ভীতকে প্রসারিত ও মজবুত করে। বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের সন্ধানের পথ পরিক্রমায় এক নতুন সংযোজন বাংলা নববর্ষ পালন। ১৯৬৭ সালেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা হয়। এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ছায়ানট। ছায়ানটের ওয়াহিদুল হক ও সন্‌জীদা খাতুন রমনা বটমূলে অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা রাখেন।[৭] এ বছর শ্রমিক সমাজ মে দিবসও পালন করে। এসব কর্মসূচি পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি পালন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের আয়োজন জনপ্রিয়তা লাভ করে।

উপর্যুক্ত পটভূমিতে সরকারের বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আগ্রাসনের অংশ হিসেবে রবীন্দ্র সংগীত ও পহেলা বৈশাখ উদযাপন বিরোধী তৎপরতা পূর্ব বাংলার মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে। এ ক্ষোভ নারীসমাজকেও প্রভাবিত করে এবং সরকারের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিবাদ আন্দোলনে তারাও শামিল হন। জাতীয় পরিষদে রবীন্দ্র সংগীত বিষয়ক বিতর্ক এবং এতদবিষয়ে খান এ সবুর ও তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে পূর্ব বাংলার ১৮ জন বুদ্ধিজীবী একটি বিবৃতি প্রদান করেন। এতে বলা হয়:

> ... সরকারি মাধ্যম হতে রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত আমরা অত্যন্ত দুঃখজনক মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তার সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।[৮]

---

৫. ২৩-২৮ জুন ১৯৬৭ সালে *দৈনিক পাকিস্তান* ও *The Daily Observer* পত্রিকায় এতদসংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়।

৬. শেখর দত্ত, *ষাটের দশকের গণজাগরণ, ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা, প্রভাব*, সমাজ বিকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩১৯

৭. *ঐ*, পৃ. ৩১৯-২০

৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২৮২

উপর্যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারীদের মধ্যে দু'জন বিখ্যাত নারী অন্যতম ছিলেন এবং তাঁরা হলেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. নীলিমা ইব্রাহিম। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকসহ কতিপয় বুদ্ধিজীবী সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দু'টি বিবৃতি প্রদান করেন। এর মধ্যে ২৯ জুন ১৯৬৭ সালে ৪০ জন কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন তাতে কবি জাহানারা আরজু, বেগম হোসনে আরা, বেগম মাফরুহা চৌধুরী প্রমুখ নারীগণ স্বাক্ষর করেছিলেন।[৯] এভাবে কিছু বুদ্ধিজীবীর সমর্থন পেয়ে সরকার ১৩৭৪ সালের ২২ শ্রাবণের পূর্বমুহূর্তে (আগস্ট ১৯৬৭) বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা প্রেস ক্লাবে কবি সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটেও একটি প্রতিবাদ সভা হয়েছিল। এসব প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যদের সাথে বক্তৃতা করেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও লায়লা আরজুমান্দ বানু প্রমুখ।[১০] প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্র সংগীত ও পহেলা বৈশাখকে বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষিত হয়। এভাবে রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধকরণ বিরোধী আন্দোলন বাঙালি সংস্কৃতি সংরক্ষণ আন্দোলনে পরিণত হয়। রবীন্দ্র সংগীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীরা ঢাকায় তিন দিন ব্যাপী রবীন্দ্রনাথের ওপর অনুষ্ঠান করেন। এ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটক অভিনীত হয়। এতে অভিনয়ে অংশ নেন সংস্কৃতি কর্মী ও মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্রী কাজী তামান্না। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন বাংলা সংস্কৃতি রক্ষার উত্তাল আন্দোলনে কাজী তামান্না ছিলেন এক সক্রিয় কর্মী। মিছিল-মিটিং এ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি বাংলা সংস্কৃতি রক্ষা ও আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।[১১] এ ছাড়াও আইয়ুব শাহীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যাঁদের সাহসী সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার ফলে রবীন্দ্র সংগীতসহ বাঙালি সংস্কৃতি তার আপন গতিপথে অগ্রসর হতে পেরেছিল তাঁদের মধ্যে সন্‌জীদা খাতুন, বিলকিস নাসিরুদ্দিন, মালেকা আজিম, ফাহমিদা খাতুন, জাহানারা ইসলাম, হামিদা আতিক, ইফফাত আরা, মিলিয়া গণি, সেলিনা মালেক চৌধুরী ও ফ্লোরা আহমেদ প্রমুখের নামও প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।[১২]

শুধু ঢাকায় নয় ঢাকার বাইরেও সরকারের বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছিল এবং এসব প্রতিবাদী আন্দোলনে নারীরাও অংশ নিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে সিলেটের কথা বলা যায়। সেখানকার আন্দোলনে নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ যুক্ত ছিলেন।[১৩] উল্লেখ্য যে, ১৯৬৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে

---

৯. দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ জুন ১৯৬৭, উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ.২৯২-২৯৩

১০. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৩৬

১১. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, *১ম খণ্ড*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৯২

১২. রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

১৩. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, প্রিপট্রাস্ট প্রকাশনী , ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪২

নিয়ে কবিতা লেখার অপরাধে নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থকে সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা আন্দোলন দমনে সরকারের চরম দমনমূলক নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ব বাংলায় যে রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি ও হতাশার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, এর মধ্যে রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ ও বাঙালি সংস্কৃতিকে অবদমিত করার সরকারি অপচেষ্টাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাঙালি জাতীয়তবাদী চেতনার ভিত্তি প্রসারিত ও দৃঢ় হয়, অন্যদিকে তা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবেও কাজ করে।

আইয়ুব-মোনেম চক্র কেবল রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা বাংলাভাষা সংস্কার করে একটি জাতীয় ভাষা প্রচারেরও চেষ্টা শুরু করেছিল। সরকারের নির্দেশে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. ওসমান গণি বাংলা বিভাগের ড. কাজী দীন মুহাম্মদের নেতৃত্বে ভাষা ও বানান সংস্কারের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটির সুপারিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত হয়। ড . মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই এবং অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীও এর বিরোধিতা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত বাংলা বর্ণমালা লিখন নীতি ও বানান সংস্কার সংক্রান্ত উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ঢাকার ৪২ জন সাহিত্যিক চিন্তাবিদ, শিল্পী ও সাংবাদিক এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে কবি বেগম সুফিয়া কামাল, আফলাতুন, মিসেস লায়লা সামাদ, নূরজাহান বেগম প্রমুখ অন্যতম ছিলেন।[১৪] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার লক্ষ্যেই এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয়েছিল।

আরবী হরফে বাংলা লেখার একটি উদ্যোগ দেড় যুগ আগে উত্থাপিত হয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। এ প্রস্তাবটি আবার উত্থাপন করেন বিচারপতি হামুদুর রহমান। ১৯৬৭ সালে ১৩ আগস্ট লাহোরে অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের ২০ বছর' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে তিনি মন্তব্য করেন, "দুটো জাতীয় ভাষার জন্য আরবি হরফ চালু করা হলে তা জাতীয় সংহতি জোরদার করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।"[১৫] তার এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশের পর পরই পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরের জনতার মধ্যে থেকে প্রতিবাদের সুর উঠে এবং এ বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবি জানানো হয়। অন্যদিকে ১৯৬৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আইয়ুব খান হোটেল ইন্টারকন্টিনেটালে অনুষ্ঠিত 'নজরুল একাডেমির' অনুষ্ঠানে বাংলা ও উর্দু ভাষার সংমিশ্রণে এক কমন ল্যাঙ্গুয়েজ সৃষ্টির জোর ওকালতি করেন।[১৬] আইয়ুব খানের এ বক্তব্য নিয়ে ছাত্রসমাজ বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলে। চারটি

১৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ.৩৭০
১৫. ঐ, পৃ.২৮৩
১৬. *ঐ*, পৃ.২৮২

ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে এক যুক্ত বিবৃতিতে আইয়ুবের বক্তব্যকে দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর যে কোনো ধরনের হামলাকে প্রতিহত করা হবে বলে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা হয়।[১৭] মওলানা ভাসানীও আইয়ুবের এ বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ এবং আওয়ামী লীগ ন্যাপসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এ বক্তব্যের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও পূর্ব বাংলায় জনপ্রতিক্রিয়াঃ ছয় দফা আন্দোলন চলাকালে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তারের পর রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছুটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে আইয়ুব-বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ ১৯৬৭ সালের ২ মে ঢাকায় আতাউর রহমান খানের[১৮] বাসায় মিলিত হন এবং পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি.ডি.এম.) নামক ঐক্যজোট গঠন করেন।[১৯] পিডিএম আট দফা ভিত্তিক সরকারবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে।[২০] বস্তুত পি.ডি.এম- এর আট দফা দাবি ছিল আওয়ামী লীগের ছয় দফার বর্ধিত সংস্করণ। পিডিএম ৮ দফার ভিত্তিতে সত্যিকার অর্থে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিল। পিডিএম-এ অনেক পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা ছিলেন, ফলে এ জোট একটি জাতীয় বিরোধীদলের জোটের রূপ লাভ করে। ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগের উত্থাপিত স্বায়ত্তশাসনের দাবি পিডিএম-এর ৮ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে এখন একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয় এবং এটি পাকিস্তানে অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে আইয়ুব সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এ ষড়যন্ত্রে আওয়ামী লীগ জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়। ঐ ষড়যন্ত্রকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ এবং এর সভাপতি শেখ মুজিবকে ধ্বংস করা এবং আইয়ুব-বিরোধী রাজনীতিবিদদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করাই উক্ত ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের সরকারি উদ্দেশ্য ছিল। সরকার ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত ষড়যন্ত্র উদঘাটনের কথা ঘোষণা করে।[২১] রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং রাজনীতিবিদসহ মোট ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে[২২] প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করে একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটির

---

১৭. *সাপ্তাহিক জনতা*, ৬ অক্টোবর, ১৯৬৮

১৮. একসময় আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন এবং পরে এন.ডি.এফ.-এর সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯. এই জোটের অন্তর্ভুক্ত দলসমূহ ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে এছলামী, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, এন.ডি.এফ. এবং জামায়াতে ইসলামী। আওয়ামী লীগের ছয় দফা বিরোধী একটি রক্ষণশীল অংশও এতে যোগ দিয়েছিল।

২০. পিডিএম এর আট দফা কর্মসূচি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৯৮-১৯৯

২১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ জানুয়ারি ১৯৬৮

২২. ছয় দফা আন্দোলন চলাকালে ১৯৬৬ সালের মে মাস থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে বন্দি ছিলেন। আদালতে নির্দেশে ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি তিনি কারামুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ঐদিনই জেলগেট থেকে তাঁকে আটক করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে রাখা হয়।

অফিসিয়াল শিরোনাম ছিল “রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য” (State vs Sheikh Mujibur Rahman and others')। তবে এটি সাধারণ্যে ও বহুলভাবে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র’ মামলা নামেই পরিচিত।[২৩] মামলার অভিযোগ পত্রে বলা হয়েছিল যে, অভিযুক্ত আসামিগণ ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি পি এন ওঝার সহায়তায় রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা সীমান্ত দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য বৈষয়িক সাহায্যের জন্য ভারতীয় বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।[২৪]

মামলার বিচারের জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধি সংশোধন করে ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জাস্টিস এস এ রহমানকে প্রধান এবং বিচারপতি মুজিবুর রহমান খান ও বিচারপতি মুকসুদুল হাকিমের সমন্বয়ে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়।[২৫] সরকার পক্ষে প্রধান কৌসুলি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের ও অ্যাডভোকেট জেনারেল টি.এইচ খান। আসামি পক্ষের আইনজীবী প্যানেলের প্রধান ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য আইনজীবী টমাস উইলিয়ম। মামলা পরিচালনায় তাঁর সহযোগী ছিলেন আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ প্রমুখ। ১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে মামলার ৩৫ জন আসামির বিচার কাজ শুরু হয়। একশত প্যারাগ্রাফের একটি অভিযোগপত্র এবং ২২৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হবার পর থেকেই পূর্ব বাংলায় এর বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ তৈরি হয় এবং রাজনৈতিক অঙ্গন ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে। মামলার বিচার কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে এর কার্যবিবরণী ও সাক্ষীদের জেরার বিবরণ প্রভৃতি যতই প্রকাশিত হতে থাকে ততই পূর্ব বাংলার মানুষ ধারণা করতে শুরু করে যে, এটি একটি সরকারি ষড়যন্ত্র ও প্রহসনের বিচার বৈ কিছু নয়। এ মামলার উদ্দেশ্য হলো শেখ মুজিবসহ কয়েকজন সৎসাহসী বাঙালি অফিসারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে পূর্ব বাংলার স্বার্থ ও প্রগতিবাদী আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া।[২৬] এমতাবস্থায় পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ বিশেষত ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন ডাকসুসহ সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এ মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এ সময় পূর্ব বাংলায় সংঘটিত কয়েকটি ঘটনাক্রমের প্রতিক্রিয়া এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে।

---

২৩. এই মামলার আদ্যোপান্ত সম্পর্কে দ্রষ্টব্য কর্নেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫; এডভোকেট সাহিদা বেগম, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৫; ফয়েজ আহমেদ, *আগরতলা মামলা শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭ ও জাফর ওয়াজেদ (সম্পাদিত), সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ২ খণ্ড, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০২০ ইত্যাদি গ্রন্থ।

২৪. আরো বিস্তারিত দ্রষ্টব্য G.W. Choudhury, *The Last Days of United Pakistan,* UPL, Dhaka, 1988, pp.22-28

২৫. হারুন-অর-রশীদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ.১০৮ ও ১১৮

২৬. সালাহ উদ্দিন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৫৪-৫৬

পূর্ব বাংলায় বিরাজমান উপর্যুক্ত বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালের ২৭ অক্টোবর তাঁর ক্ষমতারোহণের দশম বর্ষকে পাকিস্তানের 'উন্নয়নের দশক' হিসেবে ঘোষণা করে তা পালনে নানাবিধ কর্মসূচির ঘোষণা করেন। পত্র-পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশনে প্রেসিডেন্টের ভাবমূর্তিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে সর্বাত্মক প্রচার চালানো হয়। আইয়ুব খানকে পাকিস্তানের উন্নয়ন অগ্রগতির সার্থক স্থপতি ও পাকিস্তানের ত্রাণকর্তা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[২৭] বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় বিরামহীন তাঁর অভাবনীয় সাফল্যের প্রচারণা চালানো হলেও পূর্ব বাংলার মানুষ এতে আরো ক্ষুব্ধ হয়। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য বিবেচনায় নিয়ে পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা এ কর্মসূচি পালনকে এদেশের জনগণের বিরুদ্ধে এক পৈশাচিক বিদ্রুপ বলে গ্রহণ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ ও রাজনৈতিক দল আইয়ুব খানের উন্নয়ন দশকের নতুন নামকরণ করেন 'স্বৈরাচারের কালো দশক'।[২৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যখন মহাসমারোহে আইয়ুব খানের উন্নয়ন দশক চলছিল, কার্যত দেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। তাই তাঁর এ আয়োজন মানুষের কাছে একটি প্রহসনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল। মূলত আইয়ুব খানের বিভিন্ন কালাকানুন পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করেছিল। তাই সেখানেও সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে সম্পদের পাহাড় জমলেও সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। ফলে তাদের মধ্যে সরকার বিরোধী মনোভাব প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। এতে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এরই মধ্যে ৭ নভেম্বর ১৯৬৮ সালে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাওয়ালপিন্ডিতে পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত হলে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয়। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং পরে ন্যাপ (ওয়ালী) সভাপতি ওয়ালী খানসহ অসংখ্য রাজনীতিক ও ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করা হলে ছাত্র আন্দোলন আরও জোরদার হয়। ২৫ নভেম্বর লাহোরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সেখানে বন্দিমুক্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি সামনে আসে। পশ্চিম পাকিস্তানের আইয়ুববিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে মতিয়া চৌধুরী লিখেছেন, "সরকারের চণ্ডানীতির দরুণ মানুষ রাস্তায় নামতে না পারলেও দেশ বারুদের মতো তেতে ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন যেন সেই বারুদে দেশলাইয়ের একটি জ্বলন্ত কাঠি ছুঁড়ে দিল।"[২৯] পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণকে ব্যাপক আলোড়িত করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে এ গণরোষ পূর্ব বাংলায় ১৯৬৯ এ গণঅভ্যুত্থানে সূচনায় ভূমিকা পালন করেছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন।

---

২৭. সালাহ উদ্দিন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪৯

২৮. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ১৮৩০ থেকে ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৩০

২৯. মতিয়া চৌধুরী, *দেয়াল দিয়ে ঘেরা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১১৮

বন্দি মুক্তি আন্দোলন ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ: ১৯৬৬ সালে ছয় দফাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার ইত্যাদি কারণে ১৯৬৭ সালে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলন কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ একে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও গুজবের কালো মেঘের আবরণে ঢাকা সময় হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে এটি ছিল নিতান্তই সাময়িক। অচিরেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে এবং বন্দি মুক্তি দিবস পালন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন নতুনরূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৬৮ সালের ২ আগস্ট বন্দি মুক্তি দিবস পালন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ছাত্রলীগ এ দিবসটি পালনে তৎপরত হয়েছিল।[৩০] বন্দি মুক্তি দিবসকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ দিবসকে কেন্দ্র করে মিছিল, ছাত্রসভা, হাতে লেখা পোস্টার ও প্রচারপত্র বিলি করা হয়। ১ ডিসেম্বর ঢাকায় সাংবাদিক সমাজ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসেন। ৬ ডিসেম্বর ভাসানী ন্যাপের পক্ষ থেকে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালিত হয়। ঐদিনই তিনি আইয়ুব সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আহ্বান জানান। অন্যদিকে ৭ ডিসেম্বর বেবী স্কুটার ড্রাইভারদের পক্ষ থেকে হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে নীলক্ষেতে পুলিশের গুলিতে মোহাম্মদ ইসহাক (২৮) এবং আব্দুল মজিদ (৩০) নামে দুজন নিরীহ দোকান কর্মচারী নিহত হওয়ার ঘটনায় সারা প্রদেশকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।[৩১]

দেশের বিদ্যমান এরূপ পরিস্থিতিতে নারীসমাজ নিশ্চুপ বসে থাকেননি। রাজবন্দিদের মুক্তি আন্দোলনের সময় রাজবন্দিদের পরিবার ও ঢাকা শহরের বিশিষ্ট নারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে বন্দি মুক্তি আন্দোলনে নারীদের সংগঠিত করতে একদল নারী বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদের মধ্যে মালেকা বেগম, আয়েশা খানম, মাহফুজা খানম, মুনিরা আক্তার, কাজী মমতা হেনা, রিনা খান, কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা, তরু আহমেদ, রোকেয়া কবীর, ফেরদৌস আরা মিনু, ফরিদা আক্তার, নাসিমুন আরা মিনু, রওশন আরা, আমিনা আক্তার, হোসনে আরা মিনু, ফৌজিয়া মোসলেম, মাখদুমা নার্গিস রত্না, কাজী তামান্না, গুলশান আরা ও নাজমুন নাহার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩২]

বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ১৯৬৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঐদিন পূর্ব বাংলায় হরতাল আহ্বান করা হয়। ন্যাপ ওয়ালী, পিডিএমভুক্ত সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি এ কর্মসূচিকে সমর্থন করে। মওলানা ভাসানীও ১৩ ডিসেম্বরের হরতালকে সমর্থন জানান। সংযুক্ত বিরোধী দলের ডাকা ১৩ ডিসেম্বরের হরতালের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ঢাকার নারীসমাজের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রদান করা হয়। এতে দেশে পুলিশি রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। দেশের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধভাবে দমননীতির

---

৩০. শেখর দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৫

৩১. মোহাম্মদ হান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭

৩২. হেনা দাস, *নারী-আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫০

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য বিবৃতিতে নারীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতেত স্বাক্ষরকারী নারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন– কবি বেগম সুফিয়া কামাল, মিসেস খোদেজা চৌধুরী, বেগম জোহরা তাজউদ্দিন, বেগম হুরমতুন্নেসা, বেগম আজিজা ইদ্রিস, খলিলা খানম, বেগম জসিম উদ্দিন, ফরিদা হাসান, মিসেস শামসুন্নাহার, হোসনে আরা চৌধুরী, মমতাজ আকসাদ, সুলতানা চৌধুরী, মিসেস নবী, মিসেস এস টি এস মাহমুদ ও মিসেস নিশাওয়াত নাহার চৌধুরী।[৩৩]

১৩ ডিসেম্বরের হরতাল প্রতিহত করার জন্য সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। ঢাকায় ব্যাপক পুলিশের সমাবেশ ঘটানো এবং ঢাকাসহ অধিকাংশ শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এতদসত্ত্বেও জুলুম প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচি হিসেবে আওয়ামী লীগের আহূত পূর্ব বাংলায় পরিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়। বলা হয় হরতালকে সফল করার জন্য সেদিন জেলেরা মাছ ধরেনি, কৃষকরা তাদের ক্ষেতে যায়নি। এমন পূর্ণাঙ্গ ও স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল এর পূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি।[৩৪] তবে হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে সর্বমোট ২৬ জন আহত হয়। রাজশাহী থেকে ১৭ জন এবং ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে এক হাজারের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।[৩৫] পুরো ডিসেম্বর মাসব্যাপী প্রদেশব্যাপী হরতাল মিছিল প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে।

এদিকে ১৯৬৭ সালে দায়েরকৃত একটি মামলার রায় এ সময় প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ মামলাটির আসামি ছিলেন মতিয়া চৌধুরী। তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে নেত্রকোণায় এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতাদানের অভিযোগ ছিল। এ অভিযোগে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৪৭ ধারা বলে আনীত মামলার রায়ে ময়মনসিংহের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম শামীম মতিয়া চৌধুরীকে ২ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ২১ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এ মামলা ছাড়াও দেশরক্ষা আইনের ৩২ ধারা বলে মতিয়া চৌধুরীকে আটক রাখা হয়।[৩৬] দীর্ঘদিন কারাগারে থাকায় মতিয়া চৌধুরী অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় তাঁর মুক্তির আবেদন জানিয়ে ঢাকার ৪২ জন নেতৃস্থানীয় নারী বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তাঁরা সম্পূর্ণ মানবিক কারণে বেগম মতিয়া চৌধুরীর মুক্তি দাবি করেন এবং অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দেবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী নারীগণ ছিলেন– কবি বেগম সুফিয়া কামাল, আমেনা বেগম, জোহরা তাজউদ্দিন, রাইসা হারুন, মিসেস ফরিদা হাসান, মিসেস খোদেজা চৌধুরী, কামরুন্নাহার লাইলী, রেবেকা মহিউদ্দিন, লুৎফুন্নেসা আলী, আজিজা ইদ্রিস, লায়লা কবির, খলিলা খানম, মিসেস শামসুন্নাহার করিম, হুরমাতুন্নেসা, হোসনে আরা চৌধুরী, আনোয়ারা হোসেন, রাণী চৌধুরী, মিসেস নবী, মমতাজ আকসাদ, ডাঃ সাহিদা আখতারী বানু, ডাঃ রাশেদা আখতার, ডাঃ নুরুন্নাহার, ডাঃ রহিমা

৩৩. মোহাম্মদ হান্নান, *প্রাগুক্ত*, , ৩৯
৩৪. *দৈনিক আজাদ*, ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯
৩৫. *দৈনিক আজাদ*, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৯
৩৬. *সংবাদ*, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

হাসান, ডাঃ লতিফা খাতুন, ডাঃ সুলতানা খানম, ডাঃ নাজমা আরা, ডাঃ ফরিদা বেগম, ডাঃ সিতারা মির্জা, ডাঃ মাখদুমা নার্গিস, মালেকা বেগম (সহ সভানেত্রী, রোকেয়া হল), ফেরদৌস আরা মিনু (সহ-সভানেত্রী, ইডেন কলেজ,) উম্মে সালমা (সাধারণ সম্পাদিকা (ইডেন কলেজ) রওশন আরা (সহ- সভানেত্রী, সরকারি মহিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়), মাহবুবা আহমদ (সাধারণ সম্পাদিকা, সরকারি মহিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়), আনফিসা ওসমান (সহ-সভানেত্রী, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ), রোকেয়া হায়দার, সাধারণ সম্পাদিকা (সিদ্ধেশ্বরী কলেজ), মনোয়ারা বেগম (সহ সভানেত্রী, নার্সিং স্কুল) ও সাজেদা খাতুন, সাধারণ সম্পাদিকা (নার্সিং স্কুল)।[৩৭] পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেত্রী মতিয়া চৌধুরীর মুক্তির আবেদন জানিয়ে সিলেট জেলার বানিয়াচং এলাকার ১২০ জন নারী একটি যুক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে মজিলা বিবি, সালেহা খাতুন, রাফিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, শামসুন্নাহার, রেণুবালা দেবী ও সাজেদা খানম প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিবৃতিদাতাদের অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর সাধারণ নারী। তারা বিবৃতিতে টিপসই দিয়ে তাদের একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন।[৩৮]

৭.২: গণঅভ্যুত্থানের পথে পূর্ব বাংলা

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ বা ডাক ও এর আট দফা দাবি: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পটভূমিতে পূর্বোক্ত পিডিএম-ভুক্ত পাঁচটি দল ও অপর তিনটি সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল মিলে 'ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি' (Democratic Action Committee সংক্ষেপে DAC) নামক একটি বিরোধী জোট গঠন করে।[৩৯] পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা ও পি.ডি.এম-এর প্রতিষ্ঠাতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ডাক গঠনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং তাঁকেই এর আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়েছিল। ডাক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিসহ জনসাধারণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও সমন্বিত করে একটি অহিংস, সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করে।[৪০] এ লক্ষ্যে ডাক ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৪১] ৮ দফা দাবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা কায়েম ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন। এসব দাবি আদায়ে ডাক-এর আহ্বানে ১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি দেশব্যাপী সভা, মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য যে, বামপন্থি ও ডানপন্থি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় এই জোটের পক্ষে আওয়ামী লীগের ছয় দফাকে পুরোপুরি সমর্থন করা সম্ভব ছিল না। ফলে

---

৩৭. *সংবাদ*, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

৩৮. *সংবাদ*, ১ অক্টোবর, ১৯৬৮

৩৯. জোটভূক্ত রাজনৈতিক দলগুলো ছিল এন.ডি.এফ., পি.ডি.এম., ছয় দফাপন্থি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী), কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী এবং নেজামে এছলামী ইত্যাদি দল।

৪০. Rangalal Sen, *Political Elites in Banglades*, UPL, Dhaka, 1986, p. 233

৪১. ৮ দফা কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৪০৫-৪০৬

পূর্ব বাংলায় ডাক-এর আট দফা ভিত্তিক আন্দোলন তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আর তাই ডাকের পক্ষে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এক ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন গড়ে তোলেন যা পরে গণআন্দোলনের রূপ নেয়।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এগারো দফাকেন্দ্রিক আন্দোলন: ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজকে আরো বেশি মাত্রায় যুক্ত করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসের কিছুদিন পরই ঢাকায় ছয় দফাপন্থি আওয়ামী লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস ও আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের পর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ঐক্যের সূত্র ধরেই সরকারবিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের মেনন ও মতিয়া গ্রুপসহ ছাত্র সংগঠনগুলো একটি 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' (Students Action Committee) গঠন করে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ ডাকসুর ভিপি (ছাত্রলীগের) তোফায়েল আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক (জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন) নাজিম কামরান চৌধুরী ও অন্যান্য কয়েকজন ছাত্রনেতা এ কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্য নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। চীনপন্থি ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সম্পাদিকা দীপা দত্তও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য ছিলেন।[৪২] আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা দাবি ঘোষণা করে।[৪৩]

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবি ছিল মূলত পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজসহ আপামর জনসাধারণেরই দাবি। ১১ দফার প্রথম দফায় ১৭ টি উপধারাতে ছাত্রসমাজের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি-দাওয়া উপস্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় দফায় ব্যক্তি-বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের দাবি জানানো হয়। তৃতীয় দফার একাধিক উপধারায় পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হয় এবং স্বায়ত্তশাসনের ব্যাখ্যা হিসেবে আওয়ামী লীগের ছয় দফাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৫, ৬, ৭, ও ৮ নং দফায় কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের নানা প্রসঙ্গ যুক্ত করা হয়। ৯ নং দফায় জরুরি আইন ও জননিরাপত্তা আইনসহ সকল নির্বতনমূলক আইন প্রত্যাহরের দাবি করা হয়। ১০ নং দফায় পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় এবং ১১ নং দফায় সকল রাজবন্দির মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক নির্বতনমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবি করা হয়। ১১ দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এতে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও

---

৪২. শেখর দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৩

৪৩. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঘোষিত ১১ দফা দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৪১০-৪১৩

ন্যাপের ১৪ দফা দাবির চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। এ কর্মসূচির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় প্রশ্নসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিষয়গুলোসহ ছাত্রসমাজ এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত ও কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১১ দফাকে একজন মাঝারি শিল্পপতি যেমন মেনে নিতে পেরেছে, গ্রামের একজন নির্যাতিত কৃষকও তেমনি সমর্থন করেছিল।[৪৪] এক কথায় বলতে গেলে ১১ দফা দাবি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। তাই ১১ দফাকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যখন গণআন্দোলনের ডাক দেয় তখন ছাত্রসমাজ সহ সারা দেশের জনগণও এ আন্দোলনে যোগ দেন।

এগারো দফা আন্দোলনে নারীসমাজঃ ১১ দফার প্রতি পূর্ব বাংলার ছাত্রী ও নারীসমাজও সমর্থন জানায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশ নেয়। ছাত্রসমাজের আহ্বানে আদমজী, বাওয়ানী, টঙ্গী ও তেজগাঁ প্রভৃতি শিল্প এলাকার শ্রমিকরা 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে আন্দোলনে যুক্ত হয়। ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে পরিচালনার জন্য নারীসমাজের উদ্যোগে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[৪৫] আইয়ুব শাসনবিরোধী স্বাধিকার আন্দোলনে দলমত ও আদর্শের পার্থক্য ভুলে সকল শ্রেণি ও স্তরের নারীদের সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য গঠন করা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'। এ সংগ্রাম কমিটির মূল নেতৃত্বে ছিলেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল। মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোক্তা হিসেবে অনেক ছাত্রীনেত্রীর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাজী মমতা হেনা, মুনিরা আক্তার, ফরিদা আক্তার, আয়েশা খানম, ফৌজিয়া মোসলেম, মাখদুমা নার্গিস প্রমুখ।[৪৬] মহিলা পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন মালেকা বেগম। সদস্যদের মধ্যে জোবেদা খাতুন চৌধুরী, বদরুন্নেছা আহমদ, জোহরা তাজউদ্দিন, কামরুন্নাহার লাইলি, লায়লা সামাদ, নুরুন্নাহার সামাদ, আমেনা আহমেদ, নূরজাহান মোর্শেদ, সেলিনা বানু, নূরজাহান কাদের, সেলিনা খালেক, হেনা দাস, সারা আলী ও রাজিয়া বানুর নাম উল্লেখযোগ্য।[৪৭] পরিষদ সদস্যদের অনেকেই বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আবার অনেকে ছিলেন নির্দলীয় সমাজসেবী এমনকি গৃহবধু।

৭.৩: ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও নারীসমাজ

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ আইয়ুব খানের সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ ও নিপীড়ন-নির্যাতন পূর্ব বাংলার বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। তবে নানা কারণে এসব রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক গণআন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার দাবির ভিত্তিতে পরিচালিত আন্দোলনে দেশের সর্বস্তরের জনগণ শামিল হন। পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের লক্ষ্যে পরিচালিত এ আন্দোলনের তীব্রতা অনুভব করে জানুয়ারি

৪৪. লেলিন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬১
৪৫. মোহাম্মদ ফরহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯
৪৬. *ঐ*, পৃ. ৫৭-৫৮
৪৭. মালেকা বেগম, *নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫৭

মাসের ৩য় সপ্তাহে সরকারি ছাত্র সংগঠন এনএসএফ- এর একাংশও ঐ আন্দোলনে যোগ দেয়। এ গণআন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে নানা বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে নারীসমাজ ও ছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ সম্পর্কে কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা বলেন, "আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে আমার অংশগ্রহণ ছিল, বলা যায় সরাসরি অংশগ্রহণে বিজয়কে সুনিশ্চিত করার লড়াইয়ে ছিলাম এক নম্বর কাতারে।"[৪৮]

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিক থেকে জেলখানায় রাজবন্দিদের অনেকে অনশন শুরু করেছিলেন। এ অনশনের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ছাত্রসমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশ শেষে ছাত্ররা মিছিল নিয়ে বের হতে চাইলে পুলিশি বাঁধার সম্মুখীন হয় এবং তাদের ওপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করা হয়। এতে অনেক ছাত্র আহত হয়। এ পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ ও রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে ১১ জানুয়ারি দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের বটতলায় অনুষ্ঠিত এক ছাত্র সমাবেশের পর শিক্ষার্থীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করেন। এ সমাবেশ ও মিছিলে ছাত্রদের সাথে ছাত্রীরাও অংশ নিয়েছিলেন। ১৪ জানুয়াারি লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটির পক্ষ থেকে "চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও হামলার প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়" শিরোনামে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। প্রচারপত্রে কমিটি আহূত ১৫ জানুয়ারি বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠেয় সভায় যোগদানের জন্য সর্বসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ডক্টর এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্যদের সাথে বেগম সুফিয়া কামালও বক্তৃতা করেছিলেন।[৪৯]

১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি ডাক-এর আহ্বানে পূর্ব বাংলায় দাবি দিবস পালিত হয়। একই দিনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। ডাক-এর কর্মসূচি পালনকালে পুলিশের লাঠিচার্জে ২৫ জন কর্মী আহত ও ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশি বাঁধার মুখে ডাক বার লাইব্রেরি মিলনায়তনে সংক্ষিপ্ত সভা করে। সভায় সংগ্রাম অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হলেও ডাক পরবর্তী কোনো কর্মসূচি দেয়নি।[৫০] অন্যদিকে পুলিশ ও ইপিআরের বাধা সত্ত্বেও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের বটতলায় ছাত্র সভা করে। সভা শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলসহ রেসকোর্স ময়দানের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ ও ইপিআর বিক্ষোভকারী ছাত্রদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। ছাত্ররা পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ বাহিনীর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছাত্ররা পিছু হটে এবং পুনরায় বটতলায় একত্রিত হয়ে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে শ্লোগান

---

৪৮. গবেষককে দেওয়া কাজী রোকেয়া সুলতানার সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ: ২১-০৬-২০১৯

৪৯. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৪০৮

৫০. লেলিন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬২-৫৬৩

দেয়। ছাত্রদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে সংগ্রাম পরিষদ ১৮ জানুয়ারি ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। পুলিশের শক্ত বাঁধা উপেক্ষা করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শত শত ছাত্র ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সমবেত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ইডেন কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা ধর্মঘটের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশে যোগ দেয়। সমাবেশ শেষে জনাব শামসুদ্দোহা, আব্দুল মান্নান, তোফায়েল আহমদ, আব্দুর রউফ ও মোস্তফা জামাল হায়দার প্রমুখের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।[৫১] এতে বিপুল সংখ্যক ছাত্রী অংশ নিয়েছিলেন। পুলিশ মিছিলে ব্যাপক লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়লে ছাত্ররাও ইটপাটকেল ছুড়ে। ফলে পুরো কলাভবন এলাকা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইটের আঘাত ও ধোঁয়া থেকে রক্ষা পেতে পুলিশ সদস্যরা রোকেয়া হলে আশ্রয় নিতে গেলে সেখানে রিনা খানের নেতৃত্বে ছাত্রীরা তাদের ওপর গরম পানি নিক্ষেপ করে।[৫২] বিক্ষুব্ধ পুলিশরা রোকেয়া হলেও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ১৮ জানুয়ারি ছাত্রদের কর্মসূচিতে ব্যাপক পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রাদেশিক আইন পরিষদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ এ বিষয়ে আলোচনার দাবি করেন। কিন্তু তাঁদের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় তাঁরা পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন।[৫৩] এই হামলার প্রতিবাদে ছয় দফাপন্থি আওয়ামী লীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মওলানা ভাসানী ও বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করেন।

১৮ জানুয়ারি পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ২০ জানুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করে। ১৯ জানুয়ারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সভার আয়োজন করে এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ১৯ জানুয়ারি ছাত্রীদের ওপরও পুলিশ লাঠিচার্জ করে।[৫৪] ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয় এবং ২০ জানুয়ারি ধর্মঘটের সপক্ষে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধকরণে তা বিশেষ ভূমিকা রাখে। গ্রেপ্তারকৃত ছাত্রদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি ও ১১ দফার সমর্থনে ২০ জানুয়ারি আহূত ধর্মঘট সফল করার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দ একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারী অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মালেকা বেগম (সহ-সভাপতি, রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদ), আয়েশা খানম, (সাধারণ সম্পাদিকা, রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদ) উম্মে সালমা, (সহ-সভাপতি, ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদ), হোসনে আরা দিলু (সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদ), মেহেরুন আলম চৌধুরী (সহ-সভাপতি ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ ছাত্রী সংসদ), মাহমুদা খাতুন, (সাধারণ সম্পাদিকা, ইন্টার মিডিয়েট গার্লস কলেজ ছাত্রী সংসদ)।[৫৫] ২০ জানুয়ারি ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব বাংলায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। কর্মসূচি

---

৫১. *দৈনিক সংবাদ*, ১৯ জানুয়ারি, ১৯৬৯

৫২. কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকার সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ: ২১.০৬.২০১৯

৫৩. *দৈনিক আজাদ*, ২০ জানুয়ারি, ১৯৬৯; লেলিন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৪

৫৪. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

৫৫. *দৈনিক সংবাদ*, ১৯ জানুয়ারি, ১৯৬৯

বানচালের জন্য সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছিলেন। তবে তা উপেক্ষা করেই ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীরা মিছিলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় উপস্থিত হয়। 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবেই' শ্লোগানে পুরো কলাভবন এলাকা মুখরিত হয়ে পড়ে। বটতলায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে ১১ দফার দাবিতে এবং ছাত্রদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৭ জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট ও ১ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এরপর ছাত্রছাত্রীরা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে মিছিল নিয়ে রাজপথে বের হয়ে যায়। ই.পি.আর, পুলিশ বাহিনী মিছিলে বাঁধা প্রদান করলে মিছিলটি কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। একটি অংশ ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান, গভর্নমেন্ট স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র বাবু, অবজারভার পত্রিকার স্টাফ ফটোগ্রাফার মোজাম্মেল হোসেন ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র আব্দুল মজিদসহ আরও একজন গুলিবিদ্ধ হন।[৫৬] ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকগণ আহত আসাদকে মৃত ঘোষণা করেন। আসাদ[৫৭] হচ্ছেন ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ। আসাদের মৃত্যুর খবর বিদ্যুৎগতিতে ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে ছাত্র ও জনগণের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হাসপাতালে এসে সমবেত হয়। অশ্রু ভারাক্রান্ত অবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা তাৎক্ষণিকভাবে এক শোকসভায় মিলিত হয়। সভা শেষে একটি শোক মিছিল বের হয়। এ প্রসঙ্গে ডাকসুর তৎকালীন ডাকসুর ভিপি ও আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন:

> আমি আমাদের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী ও আসাদুজ্জামান আমরা তিনজন একসাথে ছিলাম। আমাদেরকেই লক্ষ্য করে একজন পুলিশ গুলি ছোঁড়েন, গুলি লাগলো আসাদের বুকে, সাথে সাথে ঢলে পড়লো আসাদ ...একজন শহীদের শেষ নিঃশ্বাসটি আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত শার্টটি আমরা আমাদের সংগ্রামের ঝাণ্ডা করে আকাশে উড়িয়ে দিলাম। আমরা সবাই ছুটে গেলাম শহীদ মিনারের চত্বরে। শহীদ আসাদের মৃত্যুর খবর ঘোষণা করলাম শোকার্ত বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝে, আর সেই রক্তাক্ত ঝাণ্ডা সামনে রেখে আমরা শপথ করলাম আমাদের এই রক্ত আমরা বৃথা যেতে দিব না। আমাদের সকল সত্তা, সকল অস্তিত্ব, আসাদের রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হল। শহীদ মিনার থেকে শুরু হলো শোক মিছিল, সকলের সামনে আমি এবং অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ। তারপর হাজার হাজার মহিলা, গৃহবধূ, তরুণী, ছাত্রী তারপর ছাত্র এবং শোক মিছিল মুহূর্তে লক্ষ মানুষের মিছিলে পরিণত হয়েছে।[৫৮]

আসাদের শোকসভা থেকে ছাত্রনেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন, পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ আজ যে আন্দোলনের সূচনা করলো ১১ দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তা থামবে না। আসাদ স্মরণে এবং ছাত্রসমাজের ওপর পুলিশি

---

৫৬. *দৈনিক সংবাদ*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৬৯

৫৭. শহীদ আসাদের জন্মস্থান নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার হাতিরদিয়াতে। তিনি ঢাকা বিশাববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলেন। একই সাথে তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় আইন মহাবিদ্যালয়েও অধ্যয়ন করতেন। সাংগঠনিকভাবে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন(মেনন) গ্রুপের ঢাকা হল (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) শাখার সভাপতি ছিলেন। তিনি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির সাথেও যুক্ত ছিলেন। মোহাম্মদ হান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭০

৫৮. তোফায়েল আহমেদ, *ঊনসত্তরের গণআন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ২০-২১

নির্যাতনের প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ২১ জানুয়ারি রাজধানী ঢাকায় পূর্ণ হরতাল, ২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদসভা, কালো ব্যাজধারণ ও প্রতিবাদ মিছিল এবং ২৪ জানুয়ারি সারা দেশে হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলার এ দমনপীড়নের প্রতিবাদে লাহোরসহ পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানেও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

আসাদুজ্জামানের শাহাদাতের ঘটনা পূর্ব বাংলার নারীসমাজকেও যে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল এবং তাঁরা তাৎক্ষণিভাবে প্রতিবাদী আন্দোলন কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছিলেন তোফায়েল আহমদের উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতেই সে কথা উল্লেখ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের একজন ছাত্রী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন, "কেঁদে কী হবে আসাদের আরদ্ধ কাজ আমাদের শেষ করতে হবে। আসাদ যে পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে প্রাণ দিয়েছে সে পৃথিবী আমরা গড়বই।" 'আমরা কাঁদবোনা'– যে ছাত্রীটি বলেছিল, কিন্তু তার চোখ থেকেও তখন টপটপ পানি পড়তে দেখা যাচ্ছিলো।[৫৯] আসাদের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সরকারবিরোধী আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং এক পর্যায়ে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। আন্দোলনের কর্মসূচিতে গুণগত পরিবর্তন অনিবার্য করে তোলে এবং গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, ২০ জানুয়ারির কর্মসূচিসহ পরবর্তীতে গণঅভুত্থানের প্রতিটি কর্মসূচিতে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ও নারীসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে পূর্ববর্তী যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা গণঅভ্যুত্থান কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি ছিল। ২০ জানুয়ারি যে মিছিলে আসাদ নিহত হন সে মিছিলের অগ্রভাগে ছিল নারীরা।[৬০] আসাদের নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়া বের হওয়া মিছিলের সম্মুখভাগেও নারীরা ছিলেন। এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মালেকা বেগম লিখেছেন:

> ২০ জানুয়ারি মিছিলের গুলিতে শহীদ হলেন ছাত্র নেতা আসাদ। সে মিছিলে অনেকের সঙ্গে আমিও ছিলাম। বিশাল মিছিলের অগ্রভাগে আমরা তখন সদর ঘাটের কাছাকাছি আসাদ ছিলেন মিছিলের শেষভাগে। 'গুলিতে আসাদ নিহত' খবর আমরা পেয়েছি অনেক পরে। এই হত্যার বিরুদ্ধে হরতাল, সভা, মিছিল হতে থাকল, আমি তখন ছাত্র মিছিলে, সংগঠনে, আন্দোলনে যেমন ছিলাম তেমনি নারীসমাজকে সংগঠিত করার কাজেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলাম।[৬১]

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন আয়েশা খানম। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের অন্যতম নেত্রী ছিলেন। ছাত্রসমাজের ১১ দফা ভিত্তিক আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যূত্থানে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ২০ জানুয়ারি মিছিলসহ গণঅভুত্থানের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী আরেক নারী হলেন সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন।[৬২] তিনি ডাকসুর কার্যকরী

---

৫৯. মেসবাহ কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৬০. মাহমুদুর রহমান মান্না, *বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি*, *অতীত*, *বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭৪

৬১. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

৬২. নেত্রকোণা জেলার কাটলি গ্রামের সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলেন। রোকেয়া হলের আবাসিক ছাত্রী সৈয়দা মনিরা ডাকসুর কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলন। তিনি ছাত্রীদের

পরিষদের সদস্য হিসেবে সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।[৬৩] ২০ জানুয়ারির মিছিলসহ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যেকটি কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন নাসিমুন আরা মিনু।[৬৪] ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন রাশেদা খানম।[৬৫] ছাত্র ইউনিয়ন রোকেয়া হল শাখার সদস্য ও হল সংসদের সাহিত্য সম্পাদিকা ছিলেন বেবী মওদুদ। তিনি আইয়ুব বিরোধী সকল আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ২০ জানুয়ারি ছাত্রদের মিছিলে অংশগ্রহণসহ পরবর্তী কর্মসূচিতেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।[৬৬] ১১ দফা আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম দীপা দত্ত। তিনি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্বাহী কমিটির একমাত্র নারী সদস্য ছিলেন। গণঅভ্যুত্থানের সময়কালে ১১ দফার পক্ষে জনমত তৈরির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ব্যাপক গণসংযোগ করেন। এ সময়ে দীপা দত্ত তার দলের অন্যদের নিয়ে উত্তরবঙ্গে কাজ করেন। মিছিল মিটিং সমাবেশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গসহ রাজপথে ছিল দীপা দত্তের সরব পদচারণা। ২০ জানুয়ারি আসাদের মৃত্যুর পর যে বিশাল শোক মিছিল রাজপথ প্রদক্ষিণ করে তার সামনে ইপিআর ও পুলিশের বাঁধা অতিক্রম করে কালো পতাকা নিয়ে তেজোদীপ্ত পায়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন দীপা দত্ত।[৬৭] এই গণঅভ্যুত্থানেই শেষ পর্যন্ত এক নায়ক আইয়ুব খানের শাসনের অবসান হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন বেগম শামসুন্নাহার। তিনি ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি তার বোন মমতাজ শেফালিকে নিয়ে ২০ জানুয়ারির কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। বেগম শামসুন্নাহার শুধু মিছিল মিটিংয়েই অংশগ্রহণ করতেন না, বরং ঢাকার সূত্রাপুর, বকশিবাজার, এলাকার বস্তিতে গিয়ে নারীদের দেশের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করতেন। আসাদ হত্যার প্রতিবাদে আনোয়ার ও আলমের নেতৃত্বে নর্থব্রুক হল রোডে প্রতিবাদ মিছিলেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন।[৬৮] এদের ছাড়াও ১১ দফা আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কতিপয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নাম বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রওশন আরা বেগম, শিশির কণা ভদ্র, কাজী মমতা হেনা, মমতাজ বেগম, জিয়াউন্নাহার বেবী, কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা, সুমিতা নাহা, শামসুন্নাহার ইকো, ফরিদা খানম সাকী, নাসিমুন আরা হক মিনু এবং রোকেয়া কবীর প্রমুখ। এ আন্দোলন কর্মসূচিতে বঙ্গবন্ধুকন্যা এবং বর্তমান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও অংশ নিয়েছিলেন।[৬৯] তারা কেবল মিটিং ও সমাবেশে সক্রিয় অংশগ্রহণ

রাজনৈতিক সচেতন করার পাশাপাশি ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের শিক্ষা, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, রাজবন্দি মুক্তি ও গণতন্ত্রের দাবিতে সংগঠিতকরণে ভূমিকা রাখেন। মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারী*, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৫৪

৬৩. নিগার চৌধুরী, *উনসত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২১৫, ২২০, ২২১; মমতাজ বেগম মফিদা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪

৬৪. গবেষককে দেওয়া নাসিমুন আরা মিনুর সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ৩১.০৮.২০১৯

৬৫. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

৬৬. *ঐ*, পৃ. ২৪৩-২৪৪

৬৭. *ঐ*, পৃ. ১৯৯-২০০

৬৮. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *২য় খণ্ড*, পৃ. ১৪৯ ও ১৯৫

৬৯. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ২১০-২৬৪, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫

করতেন না, বরং সহপাঠী ছাত্রীদের সংগঠিত করে আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রী ছিলেন কাজী রোজী। কবি হলেও ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ১১ দফা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তিনি ছাত্রীদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার কাজও করতেন। গণঅভ্যুত্থানের প্রতিটি কর্মসূচিতে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।[৭০] উল্লেখ্য যে, কাজী রোজী পরবর্তীতে কবি সিকান্দার আবু জাফরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি দশম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, ইডেন কলেজের ছাত্রীরা। ইডেন কলেজের ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা হোসনে আরা ইসলাম বেবী সক্রিয় অংশ নিয়েছেন গণআন্দোলনে। ঊনসত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে মিছিল মিটিং থেকে শুরু করে সকল সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তাছাড়া ইডেন কলেজের আরো অনেক ছাত্রী কর্তৃপক্ষের নিষেধ অমান্য করে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন এ এন রাশেদা, আফরোজা হক রীনা, মমতাজ শেফালি প্রমুখ।[৭১] এছাড়া আরও আরো যাদের নাম জানা যায়, তাদের অন্যতম ছিলেন ইডেন কলেজের ছাত্রী সংসদে বার্ষিক সম্পাদিকা রাখী দাশ পুরকায়স্থ। গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন। শিবানী দাশ ২০ জানুয়ারি আসাদের শহীদ হওয়ার দিনে মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। শিবানী দাশ শ্লোগানের মাধ্যমে রাজপথ মুখরিত করে তোলা ও কর্মসূচির প্রচারণার জন্য পোস্টার লেখার দায়িত্ব পালন করতেন।[৭২]

সরকারি ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজের ছাত্রী ছিলেন বুলবুল মহালনবীশ। তিনি একজন সংস্কৃতি কর্মী ও গণসংগীত শিল্পী ছিলেন। তিনি ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং মিছিল ও সমাবেশে উদ্দীপনামূলক গণসংগীত পরিবেশন করতেন। প্রখ্যাত সুরকার সুখেন্দু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ট্রাকে করে তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে গণসংগীত পরিবেশন করতেন। আসাদের মৃত্যুর পর প্রতিটি প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছেন বুলবুল এবং একবার মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জে তিনি আহত হয়েছিলেন। একই কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নাজমুন নাহার মিনু। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে তিনিও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।[৭৩] জানা যায় যে, সরকারি ইন্টারমিডিয়েট স্কুলের ছাত্রী ছিলেন মিনারা বেগম ঝুনু। তিনি ছাত্রী নেত্রী ফোরকান বেগমের উৎসাহে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে গণঅভ্যুত্থানের মিছিল মিটিং এ অংশগ্রহণ করেন।[৭৪] নাজমা শাহীন বেবী তখন আজিমপুর গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলন

---

৭০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ২৩৪; মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

৭১. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ২০৩ ও ২৩৪

৭২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *২য় খণ্ড*, পৃ. ২০৯-২১১, ২৩৯-২৪১

৭৩. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *২য় খণ্ড*, পৃ.২৬৩-২৭০

৭৪. *ঐ*, পৃ.২২১

চূড়ান্ত রূপ ধারণ করলে এ স্কুলের ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মিছিল মিটিং এ অংশগ্রহণ করে। নিজ স্কুলের সহপাঠী ও অন্যান্য ছাত্রীদের সাথে নাজমা শাহীনও গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন।[৭৫]

এছাড়া মরিয়ম বেগম (চট্টগ্রাম), জাহানারা বেগম বুলা, জোবেদা খাতুন পারুল, এডলিন মালাকার (নারীনেত্রী) প্রমুখও ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের সাথে জড়িত ছিলেন। নোয়াখালীর এক রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য ছিলেন শিরিন জাহান দিলরুবা। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে তিনিও সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ছাত্রলীগ জেলা শাখার সদস্য হিসেবে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। এছাড়াও ১১ দফা ও গণঅভ্যুত্থানে জড়িত হিসেবে আর যাদের নাম পওয়ায় যায়, তাদের মধ্যে রোকেয়া কবির, শামসুন্নাহার বেগম ও মাহমুদা খানম প্রমুখ অন্যতম ছিলেন।[৭৬]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২ খ্রি.) আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে একজন পরিচিত মুখ ছিলেন। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করার সময় গোয়েন্দারা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নানাভাবে মানসিক হয়রানি করতেন। স্মর্তব্য যে, ছাত্রসমাজের ১১ দফা আন্দোলন ও পরবর্তীতে গণঅভ্যুত্থানে মূল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডাকসুর নেতৃবৃন্দ। এদের মধ্যে ছিলেন ভিপি তোফায়েল আহমদ, ছাত্রনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, আব্দুর রাজ্জাক, আসম আব্দুর রব, আমিনুল হক বাদশা, খালেদ মোহাম্মদ, নূরে আলম সিদ্দিকি ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিপদের সময় পুলিশি নির্যাতন ও গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য সেসব ছাত্র নেতারা নীলিমা ইব্রাহিমের বাসায় আশ্রয় নিতেন। ১৯৬৯ গণআন্দোলনের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আক্রান্ত হতো, তখন ছাত্রীরা হয় কমন রুমে না হয় নীলিমা ইব্রাহিমের বাংলা বিভাগের কক্ষে আশ্রয় নিতেন।[৭৭]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও ছাত্রীরাও আলোচ্য আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নিতেন বলে জানা যায়। নারীদের সংগঠিত করা থেকে শুরু করে স্বাক্ষর সংগ্রহ, সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা সেবা প্রদান ইত্যাদি কাজে যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়, তাদের মধ্যে ডাঃ মাখদুমা নার্গিস রত্না, মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ফৌজিয়া মোসলেম, কাজী তামান্না, গুলশান আরা মিনু, নাজমুন্নাহার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭৮]

২১ জানুয়ারি অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে পূর্ব বাংলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন পল্টন ময়দানে আসাদের জানাযায় আনুমানিক লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। আসাদের জানাযার পর তার রক্তভেজা শার্ট নিয়ে

---

৭৫. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

৭৬. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭, ১২৯, ১৫৬,১৬৫, ১৫৭, ১৭৬, ২০১, ২৪২

৭৭. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, পৃ.৫২-৫৩

৭৮. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ১৮৫, ২০১-২০৩

বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে ছাত্র ও নারীরাও এ বিক্ষেভে যোগদান করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই গণমিছিলে যোগ দেবার জন্য ইসলামপুর থেকে আগত একটি মিছিলের নেতৃত্ব দেন জনৈক বৃদ্ধা মাতা।[৭৯] এ বৃদ্ধা নারীর উপস্থিতি থেকে ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থানে ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সাধারণ মিছিল মিটিং- এ অংশগ্রহণের স্বতঃস্ফূর্ততা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ২১ জানুয়ারির প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্বদানকারীদের অন্যতম ছিলেন আওয়ামী লীগ নেত্রী আমেনা বেগম। তিনি বিপ্লবী শ্লোগানে চারদিক মুখরিত করে তুলেছিলেন।[৮০]

২১ জানুয়ারির প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিল আজিমপুর নিউমার্কেট এলাকায় আসলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইপিআর মিছিলকারীদের ওপর লাঠি ও বেয়নেট চার্জ ও গুলিবর্ষণ করলে ঘটনাস্থলে একজন প্রাণ হারায়। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইডেন কলেজের ছাত্রীরা হোস্টেলের ভিতরেই একত্রিত হয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। উত্তেজিত ছাত্রীরা পুলিশি জুলুম ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে শ্লোগান দিতে দিতে কলেজ গেটের সামনে উপস্থিত হলে সেখানে ছাত্র-জনতার জমায়েত ঘটে। পুলিশ ছাত্রীসহ উপস্থিত জনতার ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে। এতে কমপক্ষে ১৫ জন ছাত্রী আহত হয়েছিল। এদের মধ্যে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত নীলুফার ইয়াসমিন ও শাহানারা/শাহাদৎ আরা নামক দু'জন ছাত্রীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয়।[৮১]

২২ জানুয়ারি বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল শোক শোভাযাত্রা। আনুমানিক পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী এ শোভাযাত্রায় অংশ নেন এবং এদের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল পাঁচ শতাধিক। এ মিছিলে বিভিন্ন রাজনৈতিক শ্লোগান ও বিপ্লবাত্মক কবিতার লাইন দিয়ে লেখা অসংখ্য ফেস্টুন বহন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বুকে কালো ব্যাজে লেখা ছিল, রক্তের ডাকে সাড়া দাও।[৮২] এ শোক শোভাযাত্রায় কয়েকজন বিখ্যাত নারীও অংশ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে বেগম সুফিয়া কামাল, আজিজা ইদ্রিস, আয়শা খানম, মালেকা বেগম, দীপা দত্ত প্রমুখ শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন।[৮৩] এ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া নাসিমুন আরা মিনুর সাক্ষাৎকার থেকেও নারীদের বিপুল অংশগ্রহণের কথা জানা যায়।[৮৪]

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ২৩ জানুয়ারি মশাল মিছিল কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন সমগ্র ঢাকা নগরী মশালের শহরে পরিণত হয়েছিল। এ মশাল মিছিলে ছাত্রী ও নারীদেরও উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। এ কর্মসূচি সম্পর্কে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়:

---

৭৯. *সংবাদ*, ২২ জানুয়ারি, ১৯৬৯;

৮০. শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, ঢাকা, ভূমিকা গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ৭৩

৮১. *সংবাদ*, ২২ জানুয়ারি, ১৯৬৯; তবে সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকায় শেষোক্ত নামটি শাহাদৎ আরা লেখা হয়েছে। *সাপ্তাহিক বেগম*, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৬৯ উদ্ধৃত মালেকা বেগম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *নির্বাচিত বেগম*, *অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০*,পাঠক সমাবেশ,ঢাকা, ২০০৬, পৃ.৪২৩

৮২. লেলিন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭২

৮৩. *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ জানুয়ারি, ১৯৬৯

৮৪. নাসিমুন আরা মিনুর সাক্ষাৎকার, ৩১.০৮.২০১৯

> বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মত ছাত্র জনতার মিছিলটি যাত্রা শুরু করে সন্ধ্যা ছ'টা বেজে পনের মিনিটে বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম তাজউদ্দিন, বেগম কাজী আজিজা খাতুন, বেগম ফরিদা হাসান, ছাত্রী নেত্রী দীপা দত্ত ও মালেকা বেগমসহ কয়েকশত মা ও মেয়ে মিছিলের পুরোভাগে ছিল। কয়েক জন ছাত্র যাত্রার শুরুতে দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে মশালে কেরোসিন নিক্ষেপ করলে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে এবং এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয়। "মেয়ে ও মা'দের দু'হাতে বুলন্দ আওয়াজে শ্লোগান দিতে দেখেছি এই মিছিলে, দেখেছি মালেকা বেগমকে, দীপা দত্তকে, বেগম কামরুন্নাহার লাইলীকে, রাতের মিছিলে হাজার জনতার ভিড়ে দাঁড়িয়ে তারা শ্লোগান দিয়েছে।[৮৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এ কর্মসূচিতে অংশ নিলেও গেইট তালাবদ্ধ থাকায় ইডেন কলেজের ছাত্রীরা মিছিলে অংশ নিতে পারেনি। তবে হোস্টেলের ভিতরেই তারা মশাল হাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। ২৪ জানুয়ারি পূর্ব নির্ধারিত হরতাল কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গণবিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী ছিল। ড. কুদরাত এ খুদা ও সুফিয়া কামালসহ ৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি আন্দোলন কর্মসূচির প্রতি একাত্মতা জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন।[৮৬] ২৪ জানুয়ারি সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতাল প্রতিহত করতে পুলিশ বাহিনী জনতার মিছিলে গুলি চালালে নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণির ছাত্র কিশোর মতিউর রহমানসহ কয়েকজন নাগরিক নিহত ও অনেকে আহত হন। ঐদিন হরতালের সময় তরু আহমেদ নামক একজন ছাত্রী কালো পতাকা হাতে নিয়ে পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে এগিয়ে যান। তাঁকে অনুসরণ করে লক্ষ জনতা পুলিশি বেরিকেড অতিক্রম করে পল্টন ময়দানের দিকে এগিয়ে যায়।[৮৭] বিক্ষুব্ধ জনতা সরকার সমর্থক *দৈনিক পাকিস্তান* ও *মর্নিং নিউজ* অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঢাকা শহর সাময়িক সময়ের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ২৪ জানুয়ারি রাত ৮ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারি করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। ঢাকার বাইরে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও খুলনা প্রভৃতি স্থানে পুলিশের গুলিবর্ষণ করলে হতাহতের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য যে, এ পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানের মূল দাবি হয়ে পড়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ রাজবন্দিদের মুক্তি।

২৪ তারিখে হরতাল, মিছিল ও পিকেটিংয়েও নারীদের সরব উপস্থিতি ছিল। ঐ দিন বেগম সুফিয়া কামালের বাসভবনে নেতৃস্থানীয় নারীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভা থেকে ২৭ জানুয়ারি বেলা ১১ টায় ঢাকায় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এক নারী সমাবেশের কর্মসূচি প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় একটি শোক মিছিলেরও প্রস্তাব করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের নারীসমাজকে গণসংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রদান করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়:

---

৮৫. *দৈনিক আজাদ*, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯

৮৬. শেখর দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৩১

৮৭. হেনা দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১; মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২, পৃ. ১৫৯

> সরকার সমগ্র দেশে আজ গণহত্যা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির বর্বরনীতি অনুসরণ করে চলছেন। গত দুই মাস ঢাকা, চট্টগ্রাম, হাতিরদিয়া, নড়াইল, রাওয়ালপিন্ডি, পেশোয়ার, করাচী ও লাহোরে গোলাগুলি অসংখ্য ছাত্রজনতাকে আহত করা হয়েছে। ঢাকায় ছাত্র আসাদুজ্জামান হত্যা এই নৃশংস বর্বরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পুলিশ, ইপিআর বাহিনীর হিংস্র আক্রমণ থেকে ছাত্রীদেরকেও রেহাই দেওয়া হয় নাই। আমরা সরকারের এই ভণ্ডনীতির তীব্র নিন্দা, গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও নিহত শহীদ পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি। আমরা ইহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, কোনো দেশের কোনো মানুষের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক দাবি পশুশক্তি বলে দাবিয়ে দেয়া যায় নাই। পাকিস্তানের মানুষের অধিকার সংগ্রামকে রক্তের গঙ্গা বইয়ে ভাসিয়ে দেয়া যাবে না। আমরা ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমস্ত সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি এবং আগামীকাল সাধারণ হরতালকে সফল করে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। পূর্ব পাকিস্তান নারীসমাজের প্রতিও আমরা আজিকার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।[৮৮]

বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম জোহরা তাজউদ্দিন, বেগম রেবেকা মহিউদ্দিন, আজিজা ইদ্রিস, কামরুন্নাহার লাইলিসহ প্রায় ৪০ জন নেতৃস্থানীয় নারী এই যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

২৪ জানুয়ারি গণজোয়ারের প্রেক্ষিতে জারিকৃত সান্ধ্য আইন ও সরকারের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে ২৫ জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী পূর্ণ ধর্মঘট পালন করা হয়। নারায়ণগঞ্জসহ আদমজী, ডেমরা, সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় গণঅভ্যুত্থান চরমরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঐদিন সেনাবাহিনী ও ইপিআরের বেপরোয়াভাবে গুলিতে অনেকেই আহত হয়। নাখালপাড়ায় আনোয়ারা বেগম নামে এক মা তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।[৮৯] ২৬ জানুয়ারিতেও কারফিউ বহাল থাকে। তবুও ঐদিন প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা রাস্তায় নেমে আসেন। এদিনও সেনাবাহিনীর গুলিতে অন্তত আরও তিনজন নিহত এবং বহুলোক আহত হয়। ২৭ জানুয়ারি সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো আন্দোলন না হলেও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একটি বিবৃতি প্রদান করে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার এক ঘোষণায় বিবৃতি প্রকাশের বিষয়ে সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ২৮ জানুয়ারি পূর্ব ও পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র হত্যা নির্যাতন, কারফিউ ও ১৪৪ ধারা জারি ইত্যাদির প্রতিবাদে ডাকসু ছাত্রলীগ, দুই ছাত্র ইউনিয়ন (দোলন গ্রুপ), এনএসএফ'র ১০ নেতার বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৮ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫২ জন শিক্ষকের স্ত্রীদের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। ১৭ জানুয়ারি থেকে চলমান ছাত্রসমাজের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপর পুলিশ ইপিআর ও সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত হামলার নিন্দা জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয় যে, "দমননীতি ও সন্ত্রাস দ্বারা গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও মানুষের বাঁচার দাবিকে স্তব্ধ করা যাবে না"। বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে, ছাত্র জনতার ন্যায্য দাবি মেনে নিয়ে অবিলম্বে সান্ধ্য আইনসহ সকল প্রকার নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ প্রত্যাহার করে

---

৮৮. *দৈনিক সংবাদ*, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯

৮৯. মেসবাহ কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

আরো রক্তপাতের আশংকা দূর করা হোক। অন্যথায় এর ভয়াবহ পরিণামের জন্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে।[৯০]

২৮ জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১ নম্বর আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের একটি পূর্ণাঙ্গ জবানবন্দি প্রকাশিত হয়– যাতে তিনি স্পষ্ট করে তাঁর রাজনীতির কথা তুলে ধরেন এবং এটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন যে, তাঁকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ও ষড়যন্ত্র করে এ মামলার সাথে জড়ানো হয়েছে।[৯১] শেখ মুজিবুর রহমানের জবানবন্দিটি প্রকাশিত হলে আওয়ামী লীগের প্রতি জনমত আরো অনেক সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। এদিকে পূর্ব বাংলার ঘটনাপ্রবাহ পশ্চিম পাকিস্তানের বিবেকবান মানুষকে নাড়া দিয়েছিল। ফলে পূর্ব বাংলায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ দমনে পুলিশি ভূমিকায় সেখানেও পুলিশ জনতা সংঘর্ষ হয়। করাচিতে সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে ৩ জন নিহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানে কারফিউ জারি করা হয়। ২৮ জানুয়ারি পেশোয়ার ও লাহোরে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। ২৯ জানুয়ারি পাঞ্জাবের গুজরান ওয়ালায় পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত। এভাবে পূর্ব বাংলার গণঅভ্যুত্থানের তরঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়ে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের জবানবন্দি প্রকাশিত হওয়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ৩০ জানুয়ারি মওলানা ভাসানী তীব্র ভাষায় আইয়ুব সরকারের সমালোচনা করেন এবং কারফিউ প্রত্যাহার ও ১১ দফা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। এই সময় কিংবদন্তি নারীনেত্রী বরিশালের মনোরমা বসু [মাসিমা নামে সমাধিক পরিচিত (১৮৯৭-১৯৮৬খ্রি.)] ছাত্রদের ওপর পুলিশি নির্যাতন ও গুলিবষণের প্রতিবাদে কালো পতাকা হাতে রাজপথে মিছিলে নেমে আসেন।[৯২] উল্লেখ্য যে, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে তিনি একজন স্থানীয় সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি এ অভ্যুত্থানে যোগদানের জন্য নারীদের সংগঠিত করেছিলেন। ৩১ জানুয়ারি পুলিশি হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ডাক-এর উদ্যোগে ঢাকা বার লাইব্রেরির হলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ নেত্রী আমেনা বেগম।[৯৩]

পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আইয়ুব সরকার পূর্ব বাংলার বিরোধী দলীয় নেতাদের সাথে গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানান। ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান এক বেতার ভাষণে এ প্রস্তাব করেন। ডাক রাজবন্দিদের মুক্তি এ শর্তে এ বৈঠকে রাজি হলেও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল আইয়ুব খানের

---

৯০. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৬৯

৯১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ.৩৫৯-৩৬৩

৯২. *দৈনিক সংবাদ*, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

৯৩. *দৈনিক সংবাদ*, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ৩ ফেব্রুয়ারি ১১ দফা বাস্তবায়নের প্রশ্নে কোন আপসরফা নয় বলে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বিবৃতি প্রদান করা হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপস বিরোধী শ্লোগানে ১০ সহস্রাধিক ছাত্র ছাত্রীর মিছিল বের হয়। মিছিলে দুটি শ্লোগান বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। তা হচ্ছে: 'আপস না সংগ্রাম- সংগ্রাম, সংগ্রাম এবং গোলটেবিল না রাজপথ- রাজপথ, রাজপথ'। এদিন অর্থাৎ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ বিকাল ৪ টায় সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে ঢাকা শহরের নেতৃস্থানীয় নারী ও ছাত্রীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ৭ ফেব্রুয়ারিতে নারী সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।[৯৪] এদিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৬ ফেব্রুয়ারি কালো দিবস এবং ৯ ফেব্রুয়ারি শপথ দিবস পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ৬ ফেব্রুয়ারি কালো দিবস পালন উপলক্ষে ঢাকার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উড়ানো হয়। কালো ব্যাজ ধারণ এবং কালো পতাকা বহন করে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী শ্লোগান মুখর অবস্থায় মিছিল সহযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সমবেত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে সংক্ষিপ্ত সভার পর রাজপথে একটি মিছিল বের করা হলে বহু সাধারণ মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করে। সংবাদ সংগ্রহের কাজে আগত বিদেশি সাংবাদিকরাও কর্মসূচির সাথে সংহতি প্রকাশ করে কালো ব্যাজ ধারণ করেছিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছাত্র গণহত্যার প্রতিবাদ ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একটি নারী সমাবেশ আহ্বান করা হয়েছিল।। এ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ২০ জন বিশিষ্ট নারী ও ছাত্রীনেত্রী বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, আমেনা বেগম, কামরুন্নাহার লাইলি, জোহরা তাজউদ্দিন, খোদেজা চৌধুরী, রেবেকা মহিউদ্দিন, ফরিদা জামান, লায়লা কবির, বদরুন্নেছা আহমেদ, হুরমতুন্নেসা ওদুদ, খালেদা খানম প্রমুখ। ছাত্রীদের পক্ষে স্বাক্ষর করেছিলেন মালেকা বেগম, আয়েশা খানম, হুসনে আরা বেগম, উম্মে সালমা, মাহমুদা বেগম, মেহরোজ আলম চৌধুরী প্রমুখ।[৯৫] ১৯৬৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি পালনে সকালেই নারীরা শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে সকাল সাড়ে দশটায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। এটি ছিল স্মরণকালের নারীদের বৃহত্তম বিক্ষোভ মিছিল। এতে বিভিন্ন বয়সের সহস্রাধিক নারী অংশ নেন। বিক্ষোভ মিছিলটি রাজপথ দিয়ে অগ্রসরকালে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছাত্র জনতা ফুল ও গোলাপ পানি ছিটিয়ে মিছিলকারীদের অভিনন্দন জানায়। এ মিছিলে অংশ নেওয়া বিপুল সংখ্যক নারীর মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন ছিলেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল, মিসেস আমেনা বেগম, আমেনা মোজাফফর, বেগম জোহরা তাজউদ্দিন, বেগম নূরজাহান মোর্শেদ, বদরুন্নেছা বেগম, বেগম কামরুন্নাহার লাইলি এবং বেগম

৯৪. *দৈনিক সংবাদ*, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
৯৫. *দৈনিক সংবাদ*, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

আজিজা ইদ্রিস, বেগম মমতাজ আকসাদ প্রমুখ। মিছিলে অংশ নেওয়া ছাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছিলেন মালেকা বেগম, আয়েশা খানম, হুসনে আরা বেগম (সাধারণ সম্পাদিকা রোকেয়া হল সংসদ), উম্মে সালমা (সহ-সভানেত্রী ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদ), মাহমুদা বেগম (সাধারণ সম্পাদিকা ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদ) মেহরাজ আলম চৌধুরী (সহ-সভানেত্রী, মহিলা মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়) প্রমুখ।।[৯৬] বিক্ষোভ শেষে কবি সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে বাহাদুর শাহ পার্কে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্রসমাজের ১১ দফার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা হয় এবং ছাত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ ও হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের বিচারের দাবি করা হয়। তাছাড়া দেশে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি করা হয়।[৯৭]

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ইতিমধ্যে আইয়ুব খান ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আসেন এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়াসহ জারিকৃত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। তিনি দেশরক্ষা আইন ও অধ্যাদেশ প্রয়োগ বন্ধ রাখারও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এতে ডাক-এর নেতৃত্বের অধিকাংশই গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে সম্মত হলেও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবকে ছাড়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। এ সময় ৬৫ জন রাজবন্দিকে মুক্তি দেওয়া হলেও শেখ মুজিবের মুক্তির বিষয়টির সাথে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত বলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পূর্ব নির্ধারিত শপথ দিবস উপলক্ষ্যে পল্টন ময়দানে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুই লক্ষাধিক ছাত্র-জনতার সমাবেশ ঘটে। এ সমাবেশে বিপুল সংখ্যক ছাত্রী ও নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত, এ কর্মসূচির মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থান নব অধ্যায়ে প্রবেশ করে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রসমাজ আইয়ুব সরকারকে কোণঠাসা করে ফেলে। এ সমাবেশ থেকে ১১ দফার আন্দোলন আপসহীনভাবে চালিয়ে নেবার শপথ গ্রহণ করা হয়।

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার নানা স্তরের মানুষ নিজ নিজ দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে স্বাধিকারের দাবি জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক দলমত ও আদর্শ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও স্তরের নারীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান নারী সংগ্রাম পরিষদ। এ সংগ্রাম পরিষদের প্রধান উদ্যোক্তা ও নেত্রী ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। কার্যনির্বাহী কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন মালেকা বেগম। সদস্যদের মধ্যে বদরুন্নেছা আহমেদ, জোহরা তাজউদ্দিন, আমেনা আহমেদ, নূরজাহান মোর্শেদ, সেলিনা বানু, নূরজাহান কাদের, সারা আলী ও রাজিয়া বানু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। নারী সংগ্রাম পরিষদ গঠনে আয়েশা খানম, ফওজিয়া মোসলেম, মাখদুমা নার্গিস, কাজী মমতা হেনা, মুনিরা আক্তার প্রমুখ ছাত্রীনেতৃবৃন্দেরও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

গণনিপীড়নের প্রতিবাদ ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। রাজনৈতিক মোর্চা 'ডাক'ও ঐ দিন ৮ দফা দাবি ও গণনির্যাতনের প্রতিবাদে

---

৯৬. *দৈনিক সংবাদ*, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

৯৭. লেলিন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৯১

হরতাল আহ্বান করে। ১৪ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী এক অভূতপূর্ব হরতাল পালিত হয়। পল্টন ময়দানে ডাক-এর কেন্দ্রীয় সমাবেশে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। তিন লক্ষাধিক জনতার এ সভা 'আপস না সংগ্রাম-সংগ্রাম, সংগ্রাম এবং গোলটেবিল না রাজপথ- রাজপথ' ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ জনসভায় অন্যান্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা আমেনা বেগমও বক্তব্য রেখে ছিলেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন যে, ছাত্র শ্রমিক কৃষক জনতার সংগ্রামের বলেই জনগণের ন্যায্য অধিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া প্রতিষ্ঠিত হবে। মুজিবসহ সকল রাজবন্দি মুক্তিলাভ করবে।[৯৮]

সরকার বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন চরম উত্তেজনাকর, ঠিক সেই সময় ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দি অবস্থায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাঁর এ হত্যাকাণ্ড পূর্ব বাংলায় চলমান গণঅভ্যুত্থানের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতির ন্যায় কাজ করে। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পূর্ব বাংলা মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে নেমে পড়ে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকালে পল্টন ময়দানে জহুরুল হকের গায়েবানা জানাযা ও মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ মিছিলে নারী অংশের নেতৃত্ব দেন আমেনা বেগম। তাছাড়া ঐদিন কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল ও বাংলা বাজার গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা ঢাকার রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলে তারা ১১ দফা দাবির সমর্থনে এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। এ সময় মওলানা ভাসানী ঘোষণা দেন যে, দু'মাসের মধ্যে ১১ দফা বাস্তবায়ন এবং সকল রাজবন্দির মুক্তি দেওয়া না হলে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হবে। তিনি দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করেন, প্রয়োজন হলে ফরাসি বিপ্লবের মতো জেল খানা ভেঙ্গে শেখ মুজিবকে ছিনিয়ে আনা হবে।

উপর্যুক্ত বিস্ফোরণ্মুখ পরিস্থিতির মধ্যেই ১৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার ইতিহাসে ঘটে যায় আরেক হৃদয় বিদারক ঘটনা। ঐদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন শেষে বিক্ষুব্ধ ছাত্র শিক্ষক জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে অংশ নেন ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী জাকিয়া আখতার। তিনি মিছিলের প্রথম সারিতে ছিলেন। তার সাথে ছিল বীথি (প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের স্ত্রী) ও মনোয়ারা। এছাড়াও আরো অনেক ছাত্রী মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন।[৯৯] মিছিলটি কিছুদূর অগ্রসর হলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাবাহিনী ও পুলিশের সাথে মিছিলকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে এক সেনাসদস্যের গুলিতে রসায়ন বিভাগের রিডার ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা আহত হন। পরে তাঁকে বেয়নেট বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। সেখানে ২ জন ছাত্র শহীদ এবং ৩ জন অধ্যাপকও আহত হন। এতে রাজশাহীর পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। রাজশাহীর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে ঢাকায় হাজার হাজার ছাত্রজনতা রাজপথে নেমে পড়ে। সরকারি বাহিনীর গুলিবর্ষণ ও

৯৮. *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
৯৯. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৮

বেয়নেট চার্জে সরকারি হিসাব অনুযায়ীই ঐ রাতে ২০ জন নিহত হয় এবং শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। শুধু নয় ঢাকা বা রাজশাহীতে নয়, চট্টগ্রাম, বরিশাল, কুষ্টিয়াসহ সমগ্র প্রদেশে একই অবস্থা তৈরি হয়। ড. শামসুজ্জোহা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজশাহীতে জনতা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলে নারীদের নেতৃত্ব দেন জিনাতুন নেসা তালুকদার। তিনি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নারীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা রাখেন।[১০০] ড. জোহা হত্যার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মৌন মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক ছাড়াও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা অংশ নিয়েছিলেন।[১০১]

১৯ ফেব্রুয়ারি সরকার বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগকে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানে সম্মত করার চেষ্টা করা হয়। তবে নিঃশর্ত মুক্ত ছাড়া গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করার বিষয়ে শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবার অনঢ় ছিল। জানা যায় যে, বেগম মুজিব তাঁর স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করে প্যারোলে মুক্ত হয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দান করলে তিনি আত্মহত্যা করবেন বলে জেদ ধরেন। ফলে শেখ মুজিবের পক্ষে সিদ্ধান্তে অটল থাকা সম্ভব হয়।[১০২] এ প্রসঙ্গে 'সংগ্রামে আন্দোলনে গৌরব গাথায়' প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা লিখেছেন:

> বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে আলোচনা করার পক্ষে তখন অনেকে ছিলেন...। আমরা, আমাদের পরিবার এবং আমার মা এ ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। অনেক কথা আমাদের শুনতে হয়েছে।... প্লেন রেডি অনেক নেতা চলে গেছেন, ক্যান্টনমেন্টের যে মেসে আব্বাকে রাখা হয়েছে সেখানে। সেখান থেকেই তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। আমার মা খবর পাবার সাথে সাথে আমাকে পাঠালেন যে তুমি ঐখানে গিয়ে দাঁড়াও যদি দেখা করতে পার। মা কিছু ম্যাসেজ দিয়েছিলেন, ম্যাসেজটি যেন পৌঁছে দেই, আমি বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম, ভেতরে যাবার আমার কোনো পারমিশন ছিল না। তবে আমাদের অনেক নেতা, অনেক বড় বড় আইনজীবী, অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিকে সেখানে আমি দেখেছি। আব্বাকে বুঝাচ্ছিলেন যে, গাড়িও রেডি, প্লেন রেডি, গেলে কোনো ক্ষতি হবে না। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অনেক চেষ্টা করে আব্বার সাথে দেখা করার সুযোগ পেলাম, আব্বা বেরিয়ে এলেন। গেটের বাইরে আসা তার সম্ভব নয়। তিনি গেটের ভিতরে আমি গেটের বাইরে। শুধু আমি মার ম্যাসেজটি তাকে পৌঁছালাম। হাতে একটি চিঠিও ছিল। কিন্তু ঠিক চিঠি দেবার সুযোগ ছিল না। আব্বা বললেন চিঠি দেবার দরকার নেই, কি ম্যাসেজ বলে যাও। আমি আব্বাকে বললাম, মা দেখা করার চেষ্টা করছেন। মার সাথে দেখা না করা পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমাদের সে নেতারা বুঝলেন যে, আমার মা কখনোই প্যারোলে যাবার পক্ষে ছিলেন না। আর আমার বাবাতো ছিলেনই না। তাই যারা চাচ্ছিলেন প্যারোলে নিতে তাদের প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হল।[১০৩]

---

১০০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ.২০৫

১০১. *ঐ*, পৃ.১৩৭

১০২. সেলিনা হোসেন, 'ইতিহাসের পথ যাত্রায় নারীর প্রতিরোধ', *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতা* ২০১৬, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৬ পৃ.৮

১০৩. শেখ হাসিনা, 'সংগ্রামে আন্দোলনে গৌরব গাথায়', *শেখ হাসিনা রচনাসমগ্র* ১, পৃ.২৬১; শেখর দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৬৩-৬৪

মূলত বেগম মুজিব স্বামীর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন সংগ্রামী নারী। এ ব্যাপারে শেখ হাসিনা লিখেছেন, "আমার বাবা যখন কারান্তরালে বন্দী থাকতেন, তাঁর অবর্তমানে আমার মা পরামর্শ, অর্থ সাহায্য করে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা এবং কর্মীদের সংগঠিত করার কাজে পর্দার আড়াল থেকে হাল ধরতেন।"[১০৪] ২০১৪ সালে দিল্লী থেকে প্রকাশিত সৈয়দ বদরুল আহসানের গ্রন্থেও মুজিব পত্নী বেগম ফজিলাতুন নেছার এমন দৃঢ় ভূমিকার কথা উদ্ধৃত হয়েছে।[১০৫] যাহোক বেগম মুজিব ও তার পরিবারের একান্ত প্রচেষ্টা, উদ্দীপনা ছিল শেখ মুজিবের জন্য বিশেষ অনুপ্রেরণার বিষয়। স্ত্রীর ইস্পাত দৃঢ় মনোবল শেখ মুজিবুর রহমানকে আরও বলীয়ান করে তুলেছিল। আর এ জন্যই তিনি প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৬৯ সালে এক সংগ্রাম মুখর পরিস্থিতির মধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদ দিবস পালিত হয়। জনতার রুদ্ররোষের কাছে নতি স্বীকার করে ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সরকার কারফিউ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। সন্ধ্যায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহূত মশাল মিছিলে লক্ষাধিক লোক অংশগ্রহণ করে। এ মিছিল থেকেই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া হয় যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি এবং ১১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছাড়া সরকারের সাথে কোনো আপস আলোচনা হবে না।[১০৬]

২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতা বিজয়ীর বেশে শহীদদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করতে নগ্ন পায়ে প্রভাত ফেরিতে শামিল হয়। সাংস্কৃতিক সামাজিক ও শ্রেণি পেশার সংগঠন এবং পাড়া- মহল্লা থেকে আগত সংগ্রামী ছাত্র জনতার গান আর শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে শহীদ মিনার। বলা যায় যে, এ ২১ ফেব্রুয়ারি পালনের ভেতর দিয়ে পূর্ব বাংলায় চলমান গণঅভ্যুত্থান যেন চূড়ান্ত বিজয় করে। এ দিনই ঢাকার পল্টন ময়দানে মূল গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্রনেতারা বক্তৃতা করেন। ঢাকার বাইরেও প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশাল বিশাল গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে বলা যায় যে, এ সময় বলতে গেলে পূর্ব বাংলার কোথাও সরকারের আর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। প্রবল গণঅভ্যুত্থানে সরকার জনসাধারণের কাছে হার মানে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঘোষণা করেন, গোলটেবিল বৈঠকে অনুষ্ঠিত না হলে তিনি স্বয়ং শাসনতন্ত্র সংশোধন করবেন এবং ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেবেন, পার্লামেন্টারি সরকারও প্রবর্তন করবেন। ২২ ফেব্রুয়ারি এক সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ রাজবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মতিয়া চৌধুরী। তিনি লিখেছেন, "আমরা রাজবন্দিদের একটা দল জেলের বাইরে মুক্তির সীমানায় পা ফেললাম, সামনে জনতার মিছিল, মিছিল নয় যেন জনতার সমুদ্র। এই জনতার

---

১০৪. *শেখ হাসিনা রচনাসমগ্র*, পৃ.২৫৯

১০৫. Syed Badrul Ahsan, *From Rebel to Founding Father: Sheikh Mujibur Rahmen*, Niyogi Books, New Delhi, 2014

১০৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে ভেসে গেছে আইয়ুবের বিরোধী নিপীড়নের বেড়ি, আমরা এসেছিলাম একা যাচ্ছি মিছিলে।"[১০৭] আর এভাবেই পূর্ব বাংলায় সূচিত গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য অর্জিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনের জোয়ার শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ ছিল না, এ আন্দোলন সমগ্র পূর্ব বাংলার জেলা মহকুমা থেকে গ্রামাঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও বরিশালসহ প্রভৃতি স্থানে গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। এসব কর্মসূচিতে ছাত্র জনতার সাথে ছাত্রী ও নারীসমাজেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এ পর্যায়ে ঢাকার বাইরে গণঅভ্যুত্থান কর্মসূচি পালনের চিত্র এবং এতে নারীসমাজের অংশগ্রহণ বিষয়ে কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

ঢাকার বাইরে খুলনাতেও গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ক্লাশ বর্জন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ২ মিনিট নিরবতা পালন কর্মসূচি পালন করেন।[১০৮] ছাত্র-জনতার আন্দোলন কর্মসূচিতে পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর গুলিবর্ষণ ও দমননীতির প্রতিবাদে ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি খুলনায় নারীরা একটি শোভাযাত্রা বের করেন। স্কুলের ছাত্রীরা এতেও অংশগ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে নারীরা মিছিল সহকারে বন্দর নগরী খুলনার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণকালে সরকার বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান প্রদান করেন।[১০৯] ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার আন্দোলনকে সফল করার জন্য শিরিন বানু ও নাসিমা বেগমের নেতৃত্বে খুলনা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ শহীদ মিনারে শপথ গ্রহণ করে।[১১০] ১৫ ফেব্রুয়ারি অসংখ্য প্ল্যাকার্ড হাতে শত শত নারী কালো পতাকাসহ বিক্ষোভ মিছিল বের করে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে।[১১১] খুলনায় গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী একজন পরিচিত নারীনেত্রী ছিলেন কৃষ্ণা রহমান। খুলনা জেলার ছাত্র ইউনিয়নের তদানিন্তন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিক কৃষ্ণা রহমান সব মিছিল মিটিং এ অংশ নিতেন। এ অভিযোগে তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হয়েছিল। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গেলেও সেখান থেকেই তিনি আন্দোলনের কাজকর্ম চালিয়ে যান। আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন অলোকান্দা দাশ। তিনি তখন খুলনা পাইওনিয়ার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। ছাত্রলীগের স্কুল শাখার সভানেত্রী ও ওয়ার্ড শাখার সদস্য অলোকান্দা গণঅভ্যুত্থানের সময় সংগঠন কর্তৃক অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১১২]

---

১০৭. মতিয়া চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৭-১২৮
১০৮. *সংবাদ*, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
১০৯. *সংবাদ*, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
১১০. *সংবাদ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
১১১. *সংবাদ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
১১২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০ ও ২৭৮

যশোরেও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান জোরালোভাবে সংঘটিত হয়েছিল এবং এতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও প্রশংসনীয় অংশগ্রহণ ছিল। যশোর জেলা ছাত্রলীগের অন্যতম নেত্রী ছিলেন রওশন জাহান সাথী (শহীদ মীর মোশাররফ হোসেনের মেয়ে)। গণঅভ্যুত্থানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেত্রী রওশন হাসিনা।[১১৩] সেবা সংঘ গার্লস হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী শামসুন্নাহারও গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রীনেত্রী ছালেহা বেগম ও রওশন জাহান সাথী এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করেছিলেন। সে সময় শামসুন্নাহার স্কুলের ছাত্রীদের এবং পাড়ায় নারীদেরকে ৬ দফা ও ১১ দফা সম্পর্কে সচেতন এবং তাদেরকে সংগঠিত করে বিভিন্ন সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ করাতেন। স্কুল ছাত্রী মমতাজ বেগমও গণঅভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমেই তার প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয়েছিল। আইয়ুব শাহীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যশোরে পরিচালিত গণআন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীদের মধ্যে আরেকজনের নাম জানা যায় এবং তিনি হলেন ফিরোজা বেগম।[১১৪]

১৯৬৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি যশোর জেলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ঐদিন বেলা প্রায় ১১ টায় বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে একটি মিছিল শহরের প্রধান সড়ক পরিভ্রমণকালে রাস্তার পাশে দণ্ডায়মান জনতা এবং বাড়ি থেকে নারীরা করতালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানায়।[১১৫] ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা হত্যার প্রতিবাদে যশোর মহিলা সমিতির সভাপতি জিনাতুন্নেসার নেতৃত্বে প্রায় তিন সহস্রাধিক নারী ও ছাত্রীর অংশগ্রহণে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়েছিল। বিক্ষোভ মিছিল শেষে তারা ঈদগাহ ময়দানে এক সমাবেশ করে। এতে সরকারের তীব্র দমননীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করে অগ্নিঝরা বক্তৃতা প্রদান করা হয় হয়। বক্তাদের মধ্যে মধ্যে ছিলেন যশোর মহিলা কলেজের ছাত্রী খালেদা বেগম, নীলুফার বেগম, সেবা সংঘ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মিসেস মীনা বেগম, শওকত আরা সিদ্দিকী ও ফয়জুন্নেসা সিদ্দিকী প্রমুখ।[১১৬] বেগম আশরাফুন্নেসা ছিলেন যশোরে কর্মরত একজন সরকারি চাকুরিজীবী। সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে গণআন্দোলনে যোগ দেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি সাংবাদিকতা ও রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন।[১১৭]

---

১১৩. *ঐ*, *১ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৪ ও ১১১

১১৪. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫, ২৪৫ ও ২৮১

১১৫. *সংবাদ*, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

১১৬. *দৈনিক আজাদ*, ১ মার্চ,১৯৬৯

১১৭. শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ.৪৬

ঢাকায় সূচিত গণঅভ্যুত্থানের গণজোয়ার চট্টগ্রামেও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ১৯৬৯ সালের ২৭ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চট্টগ্রামে ধর্মঘট পালিত হয় এবং আইন কলেজ প্রাঙ্গণে সর্বদলীয় ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অন্যান্যদের সাথে বক্তব্য রাখেন খালেদা খানম, দীনা জাহেদ, হামিদা চৌধুরী প্রমুখ।[১১৮] ২৮ জানুয়ারি কালো দিবস পালন উপলক্ষ্যে খালেদা খানমের নেতৃত্বে ছাত্রীরা এক বিশাল মিছিল বের করে। মিছিল শেষে জে এম সেন হলে একটি সভা করা হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন তাসমিন আরা, রাশেদা খানম, হান্নানা বেগম, মমতাজ বেগম, নাজমা আরা বেগম, রওশন আরা বেগম (আনার), স্কুল ছাত্রী নিশাত পারভীন, দীনা জাহেদ, সাবেরা শবনম, নাজনীন জাহান, আয়েশা বেগম ও শিরিন কামাল প্রমুখ। এরা সবাই ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপের নেত্রী ও কর্মী ছিলেন।[১১৯] চট্টগ্রামে পরিচালিত গণআন্দোলনে সক্রিয় ও নেতৃস্থানীয় নারী ছিলেন বেগম মুশতারী শফী। তিনি সে সময় মিছিলে অংশগ্রহণ বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করতেন।[১২০]

সিলেটেও ব্যাপকভাবে গণঅভ্যুত্থান কর্মসূচি পালিত হয় এবং এতে নারীরা অংশ নেয়। ১৯৬৯ সালের ২৮ জানুয়ারি পুলিশের নির্যাতন, গুলিবর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে সিলেটের নারীরা এক শোভাযাত্রাসহ ১১ দফার দাবিতে ছাত্রদের আয়োজিত জনসভায় যোগ দেয়। কনভেনশন মুসলিম লীগ দলীয় এমএনএ মোয়াজ্জেম হোসেনের মাতা বেগম ফরিদ গাজী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নারী এ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলিজা সিরাজী।[১২১] এর আগের দিন হবিগঞ্জে প্রায় ৫০০ স্কুল-কলেজের ছাত্রী ও নারী ক্ষমতাসীন সরকারের স্বৈরাচার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে একটি শোভাযাত্রা বের করে। শোভাযাত্রা শেষে তারা মিসেস জাহানারা বেগমের সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হয়ে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। নিহত শহীদদের স্মরণে সভায় দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।[১২২] সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদে ১ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে সিলেটে নারীরা এক বিরাট মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে সরকারবিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান প্রদান করে।[১২৩] ২ ফেব্রুয়ারিও সিলেটের নারীসমাজ আরেকটি একটি প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল। মিছিলকারীরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং সকল রাজবন্দির অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান। সিলেটে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া নারীনেত্রীদের মধ্যে

---

১১৮. মাহফুজুর রহমান, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম* (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম ও গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩) পৃ. ২১৫

১১৯. *ঐ*

১২০. বেগম মুশতারী শফী সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য ২৪-৫-১৯৯৮; শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

১২১. *দৈনিক সংবাদ*, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৬৯

১২২. *দৈনিক সংবাদ*,৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯

১২৩. *দৈনিক সংবাদ*, ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৯

উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রীতি রাণী দাশপুরকায়স্থ, ঊষা দাশ পুরকায়স্থ এবং দীপালী চৌধুরী প্রমুখ।[১২৪] তাঁরা কেবল মিছিল মিটিং এ অংশ নেননি অন্যান্য নারীসহ জনগণকে গণঅভ্যুত্থান কর্মসূচিতে যোগ দেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিতও করেছিলেন।

ঢাকার অদূরবর্তী নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতেও গণঅভ্যুত্থানে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। নারয়ণগঞ্জ মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা ফরিদা আক্তার সেখানে গণঅভ্যুত্থানের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। জনগণকে গণআন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি খোলা জিপে দাঁড়িয়ে মাইক হাতে শহরময় প্রচার প্রচারণা চালাতেন। তোলারাম কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী দীপা ইসলাম। তিনি ছাত্রদের ১১ দফার আন্দোলন কর্মসূচির প্রতিটি মিছিল মিটিং এ অংশ নিতেন। লক্ষ্মী চক্রবর্তী নামে এক নারীও গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জ ঢাকেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।[১২৫] ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নরসিংদীতে নারীদের এক ঐতিহাসিক মিছিল হয়েছিল। এতে প্রায় পাঁচ হাজার স্কুল-কলেজের ছাত্রী ও নারী অংশ নিয়েছিলেন। মিছিল শেষে তারা জিন্নাহ পার্কে এক সভায় মিলিত হয়। নূরজাহান বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তৃতা করেন যুথিকা চ্যাটার্জী, পিয়ারী বেগম, আরতি চক্রবর্তী, আয়েশা বেগম, শিরিন, দোলনা ও তাহেরা বেগম প্রমুখ।[১২৬]

বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলিবর্ষণ ছাত্র গণহত্যা সরকারি নির্যাতন দমননীতি ও ব্যাপক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৯৬৯ সালের ২৯ জানুয়ারি ময়নমনসিংহের জামালপুরে নারীরা একটি বিরাট মিছিল বের করেন।[১২৭] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৬ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের মহিলা কলেজসহ শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয় এবং ঐ দিন ছাত্রীরা এক বিরাট মিছিল নিয়ে বিভিন্ন শ্লোগানসহ শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে।[১২৮] ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ টাঙ্গাইলের মির্জাপুর ভারতেশ্বরী হোমসের সহস্রাধিক ছাত্রী এক বিরাট শোক মিছিল বের করে।[১২৯] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জোহা হত্যার প্রতিবাদে মিসেস জোহার নেতৃত্বে রাজশাহীতে নারীদের একটি বিরাট মিছিল বের করে। মিছিলটি স্থানীয় শহীদ মিনার থেকে নগ্নপদে ও কালো পতাকা নিয়ে ড. শামসুজ্জোহার সমাধিতে গিয়ে শেষ হয়।[১৩০] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদে ঈশ্বরদীতে ১৯ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র

১২৪. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ.৬৬, ১০৭,ও ১৪৮
১২৫. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ.২২৫,২৪২,২৯১
১২৬. *দৈনিক সংবাদ*, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
১২৭. *দৈনিক সংবাদ*, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৬৯
১২৮. *দৈনিক সংবাদ*, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
১২৯. *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
১৩০. *দৈনিক আজাদ*, ২ মার্চ, ১৯৬৯

ছাত্রীবৃন্দ একটি বিরাট মিছিল বের করে। ঐ মিছিলের পুরোভাগে প্রায় ৭ শতাধিক নারী ও ছাত্রীর অংশগ্রহণ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।[১৩১]

বরিশালে অনুষ্ঠিত গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া নারীদের মধ্যে চারুবালা গাঙ্গুলী এবং ঊষা রাণী চক্রবর্তী নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এ সময় মহিলা পরিষদ গঠনে ভূমিকা রাখেন। গণআন্দোলনে অংশ নেন মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার সহ সভাপতি জীবন প্রভা বিশ্বাস। তাছাড়া উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রতিটি মিছিল মিটিং ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন উম্মেহানী খানম। বরিশাল আলতাফ মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা সুফিয়া ইসলামও উনসত্তরের আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। কিংবদন্তী নেত্রী চারুবালা গাঙ্গুলীর মেয়ে অঞ্জু গাঙ্গুলীও গণআন্দোলনে অংশ নেন। তিনি অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন ছাত্রদের সংগঠিত করা ও মিছিলে অংশ নিয়ে। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি পুলিশি নির্যাতনেরও শিকার হয়েছিলেন। পূর্ব জলাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন সবিতা চন্দ। তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে ছাত্রীদের স্কুল থেকে বের করে এনে মিছিলে নেতৃত্ব দেন।[১৩২] পটুয়াখালীর মনোয়ারা বেগম মনু ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্রলীগের স্কুল শাখার সভানেত্রী হয়ে রাজনৈতিকভাবে সবাইকে গণআন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। ১১ দফা আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অপরাধে তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।[১৩৩]

খুলনায় গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেন কৃষ্ণা রহমান। সে সময় কৃষ্ণা রহমান খুলনা জেলার ছাত্র ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে মিছিল মিটিং এ অংশ নেন। আর এজন্য তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জাফর করা হলে তিনি আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকে কাজ কর্ম চালিয়ে যান। আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনে অংশ নেওয়া আরেক নারী হলেন অলোকান্দা দাশ। স্কুল শাখার সভানেত্রীও ছাত্রলীগের ওয়ার্ড শাখার সদস্য হিসাবে তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সে সময় পাইওনিয়ার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। স্কুল শাখার সভানেত্রী ও ছাত্রলীগের ওয়ার্ড শাখার সদস্য হিসেবে তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।[১৩৪] সুনামগঞ্জের দীপালী চক্রবর্তী ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। তৎকালীন সুনামগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন থানার ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী সভায় ও দলীয় সভায় বক্তৃতা করে আন্দোলন সংগঠিত করেন।[১৩৫] তাছাড়া ২ ফেব্রুয়ারি সৈয়দপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ হাজার ছাত্রী পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে এক বিরাট মিছিল সহকারে রাস্তা প্রদক্ষিণ করেছিল। সৈয়দপুরের রেলওয়ে কর্মচারীদের স্ত্রীগণও ছাত্র জনতা শ্রমিকদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ঐদিন কালো পতাকা ও বিভিন্ন দাবি সংবলিত

---

১৩১. *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

১৩২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *২য় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৩,২৯-৩০, ১০৭, ১২৪ ও ২৭৬

১৩৩. মনোয়ারা বেগম মনু এর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ১৩-১২-১৯৯৮; উদ্ধৃত শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

১৩৪. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *২য় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০, ২৭৮

১৩৫. দীপালী চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার, ২০-১১-১৯৯৮; উদ্ধৃত শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

প্ল্যাকার্ড নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের করেছিল।[১৩৬] ২ ফেব্রুয়ারি রংপুরেও নারীরা সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি শোভাযাত্রা বের করেছিল। কালো ব্যাজ পরিহিত প্রায় তিন শত নারী রংপুরের রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়েছিল।[১৩৭] ১৯৬৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরে শপথ দিবস উপলক্ষ্যে স্থানীয় মহিলা কলেজ এবং সারদেশ্বরী গার্লস স্কুলের ছাত্রীগণ মিছিলসহকারে শহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে ১১ দফা দাবি আদায়ের জন্য শপথ গ্রহণ করে।[১৩৮]

পাকিস্তান সরকারের স্বৈরাচারী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে উভয় অংশের জনগণের সরকারবিরোধী আন্দোলন ছিল ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক অধ্যায়। জনসাধারণের ওপর অন্যায় শোষণ অগণতান্ত্রিক শাসনবিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণের এ আন্দোলন ছিল ইতিহাসে অনন্য তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বস্তুত ছয় দফাকেন্দ্রিক আন্দোলন পূর্ব বাংলায় আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের যে জোয়ার সৃষ্টি করেছিল, তা প্রশমন ও প্রতিহত করার জন্য সরকার পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের স্টিম রোলার চালিয়েছিল। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের শোষণ ও পূর্ব বাংলার প্রতি সর্বাত্মক এবং চরম বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণের প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফূরণ ঘটেছিল। ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এমন এক পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার ও মুক্তি সংগ্রামের প্রাণ পুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান এবং দেশপ্রেমিক বাঙালি রাজনীতিবিদ ও সামরিক-বেসরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রহসনের বিচার কার্যক্রম পরিচালনা বাঙালি ছাত্র-জনতার মধ্যে যে ক্ষোভের আগুন তৈরি করেছিল, তা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান হিসেবে বিস্ফোরিত হয়। সংগঠিত রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও ছাত্রসমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারবিরোধী আন্দোলনটি একটি গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিল। ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানের কাছে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ১৪৪ ধারা জারি, গুলিবর্ষণের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের হত্যা ও সান্ধ্য আইন প্রয়োগ কোনো কিছুই জনতার উত্থাল তরঙ্গকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি বরং সরকার যত বেশি আগ্রাসী হয়েছিল, মুক্তিকামী জনতার প্রতিরোধও ততবেশি শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য রূপ ধারণ করেছিল। জনরোষ মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিলাভে ঢাকায় আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে ডাকসু'র ভিপি ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাবনায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে

১৩৬. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
১৩৭. *সংবাদ*, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
১৩৮. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

ভূষিত করা হয়।[১৩৯] উক্ত সভাতেই 'জয় বাংলা' শ্লোগানের উদ্ভব ঘটে। অবশ্য মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়েও আইয়ুব খানের শেষ রক্ষা হয়নি। গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে লৌহমানব নামে খ্যাত আইয়ুব খানের পতন ও তাঁর এক দশকের স্বৈরশাসনেরও অবসান ঘটে। তিনি ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনা প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের অনুকূলে ক্ষমতা ত্যাগ করেন এবং ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি করেন। এইভাবে পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন জারি হয়।

আইয়ুব খানের ক্ষমতা ত্যাগের মাধ্যমে পাকিস্তানে তাৎক্ষণিকভাবে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, পাকিস্তান দ্বিতীয়বারের মতো সেনা শাসনের কবলে পড়েছিল বটে। তবে তা ছিল নিতান্তই সাময়িক। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালি স্বাধিকার আদায়ের যে অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছিল, তারই ফল হিসেবে সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় অর্জিত হয়। আর বিজয়ের সূত্র ধরেই ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের নাগপাশ ছিন্ন করে তারা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

উপরের সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, বাঙালির স্বাধিকার ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এক সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাঙালি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এ গণঅভ্যুত্থানের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ষাটের দশকের পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারীদের যে অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত গণঅভ্যুত্থানে তা আরো ব্যাপক ও সার্বত্মক রূপ লাভ করে। দীর্ঘ দিন আন্দোলন সংগ্রামের সাথে যুক্ত থাকার ফলে নারীসমাজের মধ্যে যে রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয়েছিল, তা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে তাদের শামিল হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। গণঅভ্যুত্থানের সংগঠক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নেতৃত্বদান থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী হিসেবে রাজনৈতিক সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ–সর্বত্রই নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় নারীসমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ'। সরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক, পারিবারিক ও সামাজিক চাপ ও ক্ষেত্র বিশেষে নিপীড়ন ও নির্যাতন উপেক্ষা করে নারীরা গণঅভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছেন। স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য অনেক ছাত্রী বহিষ্কৃত হয়েছেন এবং জরিমানা দিয়েছেন। পুলিশি নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু তাতেও তারা দমে যাননি, আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াননি। সামাজিক রাজনৈতিক ও সরকারি সবধরনের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ রেখে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। নারীসমাজের এ স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সফলতার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রভাবক ভূমিকা রেখেছিল। এ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছিল, তেমনি পরবর্তীকালে নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের আন্দোলনের ক্ষেত্রও প্রসারিত করেছিল। সার্বিক দিক বিবেচনায় ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নারীসমাজের অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

---

১৩৯. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ, ৪৩৮

অষ্টম অধ্যায়

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও নারীসমাজ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে শেষ সাধারণ নির্বাচন। অভিসন্দর্ভের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৭ বছর পর প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার ও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী–এই দু'নীতির ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর ১৯৬০ ও ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে পরোক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অধীনেই অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাকিস্তানের জনগণ সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টসহ জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পরোক্ষ ভোটাধিকারের নীতি পরিহার করা হয় এবং 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এ নীতির ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার জনগণ দীর্ঘদিন ধরে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রত্যাশা করছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচন তাদের সে প্রত্যাশা পূরণ করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একাধিক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত নারী আসনসহ জাতীয় পরিষদের ৩১৩ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয় লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগের এ বিজয় ছয় দফা ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়। এ বিজয় স্পষ্টতই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। বস্তুত, নিয়মানুযায়ী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা সৃষ্টি করে নানা অজুহাতে টালবাহানা শুরু করে। এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক বেড়াজাল ছিন্ন করে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার সুযোগ পায়। অবশ্য এ জন্য তাদের পাড়ি দিতে হয় রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের এক কঠিন পথ। তবে এ সংকটময় ও রক্তাক্ত পথ যাত্রায় হারে মানেনি বাঙালি জাতি। শেষপর্যন্ত লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিশ্চিত হয়। ১৯৭০

সালের নির্বাচন মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল। আর এ দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ঐতিহাসিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাঙালির জাতীয় জীবনের এ ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যবাহী নির্বাচনে নারীসমাজের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সূচিত প্রতিটি প্রতিবাদ আন্দোলনে নারীসমাজের যে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল, তারই ক্রমধারায় এ নির্বাচনেও বাঙালি নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্য অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নারীসমাজের অংশগ্রহণ এবং নির্বাচন পরবর্তী পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্রে সংসদের অধিবেশন স্থগিতের প্রেক্ষিতে নারীসমাজের ভূমিকা সম্পর্কে মূল আলোকপাত করা হবে। তবে প্রসঙ্গক্রমে এ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ও নির্বাচন পদ্ধতিসহ আরো কিছু বিষয় আলোচনার প্রয়াস থাকবে।

৮.১: ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী এই দুই নীতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার পর বায়ান্নোর একুশের প্রতীক ২১ দফার ভিত্তিতে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট[১] সরকার গঠন করেছিল। যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের অভূতপূর্ব বিজয় স্বাভাবিক কারণেই জনগণকে আশান্বিত করেছিল।[২] জনগণের ধারণা হয়েছিল যে, "অতঃপর ২১-দফা বাস্তবায়িত হবে, বঞ্চনার অবসান হবে এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সমাজে শান্তি, স্বস্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে।"[৩] কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হলেও নানা কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকার জনপ্রত্যাশা পূরণ বা রাজনীতিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেনি। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন চালু করা হলে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি বাঙালির বিজয় ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালে প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ সংবিধানের গুরুত্বকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এ সংবিধান অনুযায়ী ১৯৫৯ সালে নির্বাচন

---

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৪৫-২৫০; হারুন- অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৯-২৩

২. যুক্তফ্রন্ট ৩০৯ টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯ টি আসন। নির্বাচনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১২৮৫ জন। সংরক্ষিত নারী আসনে ৩৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: *Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954,* Dhaka, (Secretary, Bangladesh Election Commission), May, 1977, pp. 2-3

৩. আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি: প্রকৃতি ও প্রবণতা ২১ দফা থেকে ৫ দফা*, সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪

হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার মোহ স্বার্থান্ধতা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, উপদলীয় কোন্দল প্রভৃতি কারণে পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। ফলে ১৯৫৪-৫৮ সাল এ সময়কালে পূর্ব বাংলায় তিনটি এবং কেন্দ্রে পাঁচটি সরকার গঠিত হয়। ঐ সময়ে পূর্ব বাংলা দু'বছরের জন্য সরাসরি গভর্নরের শাসনাধীনও ছিল।[৪] এরূপ একটি পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দর মীর্জা গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত করে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। তবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ইস্কান্দর মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাপ্রধান আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন।[৫] ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' ঘোষণা করে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে পরোক্ষ গণতন্ত্র চালু করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ একটি সংবিধান জারি করেন। এ সংবিধানের আওতায় ১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে পরোক্ষ পদ্ধতির নির্বাচন। এ নির্বাচনে পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে নির্বাচিত ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী (বিডি মেম্বার) ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬২ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচন কেবল পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়নি; বরং আইয়ুব খান কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রবর্তিত EBDO (Elective Bodies Disqualification Order 1959) বিধির আওতায় অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের ৩৯৭৮ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৩০০০ জন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অযোগ্য বলে ঘোষিত হন।[৬] ১৯৬৫ সালে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেটিও মৌলিক গণতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী পরোক্ষ ভোটাধিকারের মাধ্যমে হয়েছিল। আর এ নির্বাচনে নিজের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য আইয়ুব খান সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী আইন (Second Amendment Act 1964) এর মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের আগেই নির্বাচন অয়োজনসহ নানা কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।[৭]

মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে পরোক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলেও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণায় সমগ্র দেশের রাজনীতিতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কারণ এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিধি-নিষেধ শিথিল হওয়ায় রাজনীতিবিদরা আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনবিরোধী প্লাটফর্মে এক হওয়ার সুযোগ পায়। এ নির্বাচনকে

---

৪. Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration,* Dacca, 1977, p. 48

৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ.১৫-১৯

৬. আইয়ুব খান ১০ মে ১৯৬২ তে 'রাজনৈতিক সংগঠন অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ অধ্যাদেশ' (Political Organization Prohibition of Unregulated Activities Ordinance 1962), নামে এক নতুন আইন জারি করে সামরিক আইন প্রত্যাহারের পরও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে রাখেন। S. A Akanda, The Working of the Ayub Constitution and the people of Bangladesh *'The Journal of the institute of Bangladesh Studies,* vol. IV (1979-80), p. 83 ; *The Pakistan Observer*, 12-15 July, 1962

৭. শেখর দত্ত, *ষাটের দশকের গণজাগরণ*, *ঘটনা*, *পর্যালোচনা*, *প্রভাব*, সমাজ বিকাশ প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ১৮০; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-৭২

কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানষের মধ্যে উৎসাহের গণজোয়ার দেখা যায়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানকে মোকাবিলার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল 'কপ' (Combined Opposition Party-COP)[৮] এর ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়। মিস ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কপ- এর প্রার্থী করা হয়। নির্বাচনি প্রচারণায় ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হলেও যেহেতু ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল বিডি মেম্বারদের, তাই শেষ পর্যন্ত এ নির্বাচনে আইয়ুব খানই বিজয়ী হন। আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৩.৩% এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৫২.৯% ভোট পান। অপরপক্ষে মিস ফাতেমা জিন্নাহ পশ্চিম পাকিস্তানে ২৬.৭% এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৪৬.৫% ভোট অর্জন করেন।[৯] উল্লেখ্য এ নির্বাচনে আইয়ুব খান জয়লাভ করলেও ঢাকা ও করাচি শহরে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরপরই কাশ্মির প্রশ্নে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে। আর এ নিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তথা স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরালো হয়। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের এ দাবি শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিতে স্পষ্টরূপ লাভ করে। স্মর্তব্য যে, ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে তা অনুমোদন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এ ছয় দফা হয়ে উঠে বাঙালির প্রাণের দাবি, বাঙালির মুক্তির সনদ। দেশে এবং বিদেশে অবস্থিত সর্বস্তরের বাঙালি এর মধ্যে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির ইঙ্গিত খুঁজে পায়। বস্তুত এ ছয় দফাকে বাংলার জনগণ তাদের 'প্রাণের দাবি' ও 'বাঁচার দাবি' হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই ছয় দফার দাবিতে সমগ্র পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শেখ মুজিবসহ প্রায় নেতৃস্থানীয় সকল নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারান্তরীণের মাধ্যমে একে অকার্যকর ও ব্যর্থ করতে প্রয়াস চালায়। তবে তাঁর এ অপ্রয়াস ব্যর্থ হয়। সরকারের দমন নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলায় আইয়ুবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি হয়। যার ফল হিসেবে আইয়ুব খানের মতো একজন শক্তিশালী স্বৈরশাসকের পতন ঘটে এবং তাঁর এক দশকের শাসনের অবসান হয়। বস্তুত ১৯৬৯- এর গণআন্দোলন ছিল কেন্দ্রীভূত সামরিক আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও গণভিত্তিক আন্দোলন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব

৮. ১৯৬৪ সালের ২২ জুলাই আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী একত্রিত হয়ে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party) নামে একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করে এবং নয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। *The Pakistan Observer* (Dacca), 24 July, 1964

৯. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Sharif al-Muzahid , 'Pakistan's Presidential Elections', *Asian Survey, vol. 5* (June 1965) pp. 240-294; S.S Akand, *op.cit.* pp. 83-116

বাংলার বিভিন্ন জাতি, শ্রেণি ও পেশাজীবী মানুষের ওপর যে আগ্রাসী নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছিল তার ফলে সৃষ্ট গণরোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে গণঅভ্যুত্থানে। পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র ও জনগণের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত গণঅভ্যুত্থানের মুখে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

৮.২: ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন এবং নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন। ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে[১০] ঘোষণা করেন যত শীঘ্র সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইয়াহিয়া খান দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমত তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়ত 'এক ব্যক্তি এক ভোট'- এই নীতিতে সাধারণ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেন।[১১] প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে পাকিস্তানে ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কথা বলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর ভাষণে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনের একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ এর মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন আইনগত কাঠামো এবং জুন মাস নাগাদ ভোটার তালিকা তৈরিরও ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট। নির্বাচনি প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হবে বলেও প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দেন।[১২] তবে নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব পালন এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যন্ত দেশে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসেবে সামরিক আইন বহাল থাকবে বলে প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন।[১৩] সকল সঙ্কীর্ণ স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত ও স্থানীয়

---

১০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮০-৪৮৪

১১. পাকিস্তান সরকার, *পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র*, ৫ আগস্ট, ১৯৭১, পৃ. ১

১২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ নভেম্বর, ১৯৬৯

১৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ নভেম্বর, ১৯৬৯

পর্যায়ের বিষয়গুলো বড় করে দেখা পরিহারের জন্য সকলের কাছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আহ্বান জানান।[১৪]

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ঘোষণাকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয়াংশের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ স্বাগত জানায়। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন, "ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সূচী ও উহার বাস্তবায়ন পদ্ধতির প্রশ্নে মতানৈক্যের অবকাশ দেখা দিলেও দেশের সমস্যা অনুধাবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।"[১৫]

১৯৭০ সালের নির্বাচন বিধি আইনগত কাঠামো আদেশ ও এর প্রতিক্রিয়া

১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের বিধি 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal frame work order) এর মূলধারাগুলো ঘোষণা করেন। উক্ত আদেশে নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদ গঠন ও এর কার্যাবলি কেমন হবে তা ঘোষণা করা হয়।[১৬] আইনগত কাঠামো আদেশে বলা হয় যে, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ১৩টি সংরক্ষিত নারী আসনসহ মোট ৩১৩ টি আসন সমন্বয়ে গঠিত হবে। সংরক্ষিত ১৩ টি আসন ছাড়াও নারীরা সাধারণ আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। প্রদেশ ভিত্তিক আসন বণ্টন হবে নিম্নরূপ:

প্রদেশের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত নারী আসন
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	১
কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকা	৭	
মোট আসন সংখ্যা	৩০০	১৩

আইনগত কাঠামো আদেশে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

প্রদেশের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত নারী আসন	মোট আসন
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০	৩১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬	১৮৬

১৪. *Dawn,* 29 November, 1969

১৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য মাযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৫৩৯

১৬. আইনগত কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০২-৫১৯

সিন্ধু	৬০	২	৬২
বেলুচিস্তান	২০	১	২১
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২	৪২
মোট আসন সংখ্যা	৬০০	২১	৬২১

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১০ টি সংরক্ষিত নারী আসন ছিল নিম্নরূপ:[১৭]

সংরক্ষিত নারী আসন -৩০১: ফরিদপুর জেলা. ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ মহকুমা।

সংরক্ষিত নারী আসন -৩০২: ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ মহকুমা ব্যতীত অন্যান্য মহকুমা এবং টাঙ্গাইল জেলা।

সংরক্ষিত নারী আসন -৩০৩: ময়মনসিংহ জেলা।

সংরক্ষিত নারী আসন -৩০৪: চট্টগ্রাম জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমা ।

সংরক্ষিত নারী আসন -৩০৫: নোয়াখালী জেলার সদর মহকুমা এবং ব্রাক্ষনবাড়ীয়া মহকুমা ব্যতীত কুমিল্লা জেলা।

সংরক্ষিত নারী আসন -৩০৬: কুমিল্লা জেলার ব্রাক্ষনবাড়ীয়া মহকুমা এবং চট্রগ্রাম বিভাগের সিলেট জেলা।

সংরক্ষিত নারী আসন -৩০৭: কুষ্টিয়া জেলা যশোর জেলা এবং খুলনা জেলার সদর ও সাতক্ষীরা মহকুমা।

সংরক্ষিত নারী আসন -৩০৮: খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমা বাকেরগঞ্জ জেলা এবং পটুয়াখালী জেলা।

সংরক্ষিত নারী আসন -৩০৯: দিনাজপুর জেলা এবং রংপুর জেলা।

সংরক্ষিত নারী আসন -৩১০: রাজশাহী জেলা পাবনা জেলা এবং বগুড়া জেলা।

জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ ছাড়া ২৫ বৎসর বয়স্ক যে কোনো পাকিস্তানি নাগরিক যার নাম ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন বলে আইনগত কাঠামো আদেশে বলা হয়। কোনো ব্যক্তি একইসঙ্গে কোনো পরিষদের একাধিক নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থী হতে পারবেন তবে একাধিক আসনে নির্বাচিত হলে তাকে নির্বাচনের সরকারি ফলাফল ঘোষণার পনেরো দিনের মধ্যে একটি আসন রেখে বাকিগুলো ছেড়ে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি তা করতে ব্যর্থ হলে তাঁর নির্বাচিত সবগুলো আসন শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

আইনগত কাঠামো আদেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নারী আসন সম্পর্কে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ স্ব-স্ব প্রদেশের সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ সেই প্রদেশের জন্য সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন। এই বিধানের মাধ্যমে কার্যতঃ সংরক্ষিত নারী আসনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হয়।

---

১৭. *The Dacca Gazette Extraordinary* , Dacca,The East Pakistan Government, 1970, p.530

ইয়াহিয়া খান ঘোষিত 'আইন কাঠামো আদেশ'- এর উপক্রমণিকায় উল্লেখ করা হয় যে, এই আদেশের সাথে সঙ্গতি রেখে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে হবে। আদেশের ১৪ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার জন্য প্রেসিডেন্ট তাঁর বিবেচনামতো উপযুক্ত তারিখ, সময় ও স্থানে পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন। জাতীয় পরিষদ তাঁর প্রথম অধিবেশনের সময় থেকে ১২০ দিনের মধ্যে 'শাসনতন্ত্র বিল' নামক একটি বিলের আকারে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। জাতীয় পরিষদে পাসকৃত বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। উক্ত বিলে প্রেসিডেন্ট অনুমোদন না-দেওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ আইনসভা হিসেবে তার কাজ শুরু করতে পারবেন না। উক্ত বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলে জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শাসনতন্ত্র বিলে প্রেসিডেন্ট অনুমোদন না- দেওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদগুলোর অধিবেশন ডাকা হবে না।

আইনগত কাঠামো আদেশের বিধানাবলির সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যে জাতীয় সংসদের রূপরেখা প্রণয়ন করেন তাতে প্রেসিডেন্টই ছিল সর্বময় ক্ষমতার উৎস। বস্তুত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মতো ইয়াহিয়া খানও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল নির্বাচনে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। তিনি সংবিধানে প্রণয়নের যে ১২০ দিনের বাধ্যবাধকতা দিয়েছিলেন তা কোনো দলের পক্ষেই সম্ভব হবে না বলে মনে করেন। আর তাই এ আদেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপসহ (উভয় গ্রুপ) গণতন্ত্রমনা দলগুলো আইন কাঠামো আদেশ থেকে অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাদ দেওয়ার দাবি জানায়। তারা জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্নকারী ধারা ও জাতীয় সংসদের ক্ষমতা সংকোচন করে এমন ধারাসমূহেরও বিরোধিতা করেন। এ দাবি ও রাজবন্দিদের মুক্তি চেয়ে ন্যাপ (ওয়ালী) ১৯৭০ সালের ২৬ এপ্রিল 'দাবি দিবস' পালন করে।[১৮] প্রাদেশিক ন্যাপ (ওয়ালী) প্রধান অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ আইনগত কাঠামোর ২৫ এবং ২৬ ধারার[১৯] তীব্র সমালোচনা করে তা বাতিলের দাবি জানান।[২০] একইভাবে আইনগত কাঠামোর বিরোধিতা করে

---

১৮. হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৬-৫২৭

১৯. আইনগত কাঠামোর ২৫ এবং ২৭ ধারা ছিল নিম্নরূপঃ ধারা ২৫ঃ Authentication of constitution: The Constition Bill, as passed by the National Assembly, shall be presented to the president for authentication. The National Assembly shall stand dissolved in the event that authentication is refused. ধারা ২৭: Interpretation and Amendment of Order, etc.: (a) Any question or doubt as to the interpretation of any provision of this order shall be resolved by a decision of the President and such decision shall be final and not liable to be questioned in any Court. (b) The President, and not the National Assembly, shall have the power to make any amendment in this Order.; *The Pakistan Observer*, 30 March, 1969; শ্যামলী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করেন। তাছাড়া এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৭ এপ্রিল, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ১৩ এপ্রিল প্রতিবাদ দিবস পালন করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগও তাদের জরুরি সভায় এ আইনগত কাঠামো আদেশের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার বিরোধিতা করে।[২১] ছাত্রসমাজ আইনগত কাঠামো আদেশ জারির মাধ্যমে 'গণতন্ত্র দিয়ে আবার গণতন্ত্র নিয়ে যাওয়ার' আইনগত প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে এ্যাকশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

তবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাজনৈতিক দলসমূহের উপর্যুক্ত দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি বরং সপ্তাহব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষ করে ১০ এপ্রিল ঢাকা ত্যাগ করার সময়ে তিনি বলেন আইনগত কাঠামো আদেশ শতকরা ৯৯ ভাগ জনগণ কর্তৃক গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়েছে। আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধন না হলে নির্বাচনে অংশ নেবেন না এ কথা তাকে কোনো দলই বলেননি বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা সংকোচন করার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই।[২২]

৮.৩: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দল

আইনগত কাঠামো আদেশের ব্যাপক সমালোচনা থাকলেও মওলানা ভাসানীর ন্যাপ ছাড়া বাকি দলগুলো এর অধীনেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নির্বাচনে ব্যাপক জনসমর্থনের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। তিনি নির্বাচনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে সকল শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদ করার সুযোগ বলে মনে করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, আসন্ন নির্বাচন হচ্ছে ব্যালটের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের দাবি আদায়ের সর্বশেষ সংগ্রাম। এ কারণেই আওয়ামী লীগ এ আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করা সত্ত্বেও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সামরিক বাহিনীর সাথে সংঘাতে যাওয়াকে অবিবেচক বলে বিবেচনা করেন। কারণ এ সংঘাত নির্বাচনের অপমৃত্যু ডেকে আনবে। তাই তারা এ সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশের একটি কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেন।[২৩] ন্যাপ (ওয়ালী) নেতা অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ঘোষণা করেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সংসদ প্রতিষ্ঠা করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের দাবি আদায় করতে হবে। তাই তিনি জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বলেন।

---

২০. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩ এপ্রিল, ১৯৭০

২১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ এপ্রিল, ১৯৭০

২২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১১ এপ্রিল, ১৯৭০

২৩. Talukder Moniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Bangladesh Books, International, Dhaka, 1980 p. 26

বেশ কিছু রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, ন্যাপ (ওয়ালী), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলামি প্রভৃতি। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, ন্যাপ (ওয়ালী) ছিল জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। তবে এ দলগুলো ছিল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল। সর্বভারতীয় পর্যায়ে এদের গণভিত্তি ছিল না। এর বাইরে সর্বপাকিস্তান ভিত্তিক যে- দলগুলো এ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল সেগুলো কেবল নামেই ছিল সর্বপাকিস্তানি, বাস্তবে কোনো প্রদেশেই এগুলো কোনো ব্যাপক জনসমর্থন ছিল না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭০- এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আসনসংখ্যা ছিল ৩১৩টি এর মধ্যে সাধারণ আসন ছিল ৩০০ এবং সংরক্ষিত নারী আসন ১৩টি। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল সাধারণ আসন ১৬২ এবং সংরক্ষিত নারী আসন ৭ টি। পূর্ব পাকিস্তানের নির্ধারিত ১৬২ টি সাধারণ আসনে বিভিন্ন দলের মোট ৭৬৯ প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেয়। তবে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য আর কোনো দলই পূর্ব পাকিস্তানে সবকয়টি সাধারণ আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক নিয়ে ১৬২টি সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আইয়ুব খানের মুসলিম লীগ (কনভেনশন) ৯৩টি আসনে প্রার্থী দিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। দলটি সাইকেল প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল।[২৪] ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নারীদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের কোনো সুযোগ ছিল না। সংরক্ষিত নারী আসনগুলোতে সাধারণ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচনের বিধান করা হয়। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি প্রার্থী নির্বাচিত করার বিধান করা হয়েছিল। সে নির্বাচনে ১২ টি সংরক্ষিত নারী আসনে ৩৫ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের অধিকার রহিত করা হয়। তবে সাধারণ আসনগুলোতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ ছিল। এ বিধান অনুসারে এ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ টি আসনের জন্য যে ৭৬৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তন্মধ্যে ৩ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এরা হলেন জাতীয় লীগ প্রার্থী আমেনা বেগম এবং ন্যাপ (ওয়ালী) দলীয় প্রার্থী সেলিনা বানু ও প্রাক্তন প্রাদেশিক সদস্য খালেদা হাবীব।[২৫] উল্লেখ্য যে, তিন জন নারী প্রার্থীর মধ্যে আমেনা বেগম (১৯২৫-১৯৮৯) বাংলার রাজনীতিতে এক সুপরিচিত মুখ ছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালের

---

২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩০০টি সাধারণ আসনে প্রার্থী তালিকা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: *Report on General Election in Pakistan (1970-71),* Election Commission, Pakistan, Islamabad,1972, pp. 75-100

২৫. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ অক্টোবর, ১৯৭০

প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদসহ শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের বন্দিত্বের সময় তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের এগারো দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[২৬] ১৯৭০- এর কাউন্সিলে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ দাবি করেছিলেন। কিন্তু তা না করায় পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন ও আতাউর রহমান খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নতুন দল জাতীয় লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৮৪ সালে এ দলের সভাপতি হন।[২৭] সেলিনা বানু (১৯২৬-১৯৮৩ খ্রি.) কমিউনিস্ট রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ব্রিটিশবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করেন। আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন এবং মওলানা ভাসানী কর্তৃক ন্যাপ গঠিত হওয়ার পর তিনি ন্যাপের রাজনীতিতে যোগ দেন।[২৮] ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যুক্তিবাদী সুবক্তা সেলিনা বানু ন্যাপ (ওয়ালী) প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সাবেক পালামেন্টারি সেক্রেটারি বেগম খালেদা হাবিব এ নির্বাচনে টাঙ্গাইল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি এ নির্বাচনে নারীদের জন্য আরো আসন সংরক্ষণের দাবি জানানোসহ নারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সাধারণ আসনে যেসব নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তাদের ভোটদানে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান।[২৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের মনোনীত জাতীয় পরিষদের ১৬২টি ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের ৩০০টি সাধারণ আসনে ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় একজনও নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয় নি।[৩০] নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের জন্য যে নির্বাচনি মনোনয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছিল এতেও কোনো নারী সদস্য ছিলেন না।[৩১]

৮.৪: **নির্বাচনি প্রচারণা ও নারীসমাজ**

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সরকার সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে রাজনৈতিক দলগুলো প্রচারণায় নামে। পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। নানা কারণে দলটি এ নির্বাচনে কোনো জোটবদ্ধ না হয়ে এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭০ সালের ৪ জুন মতিঝিলের ইডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৩২] ছয় দফাকে ভিত্তি করে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করা হয়।[৩৩] নির্বাচনে জয়লাভের পর

---

২৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০১৭, পৃ. ২৯২

২৭. http://bn.banglapedia.org/index.php?title=

২৮. হেনা দাস, *নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৪

২৯. *সাপ্তাহিক বেগম*, ১ নভেম্বর, ১৯৭০; উদ্ধৃত মালেকা বেগম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *নির্বাচিত বেগম: অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০*,পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪২৭

৩০. মফিদা বেগম, *আওয়ামী লীগ রাজনীতি- নারী নেতৃত্ব (১৯৪৯-২০০৯)*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০ পৃ. ১০৯

৩১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭-১৬৯

৩২. আবু আল সাইদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৬৪

ছয় দফার ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন করা হবে বলে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনি ঘোষণায় 'সমাজতন্ত্রকে' অন্তর্ভুক্ত করে এবং শেখ মুজিবুর রহমান এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'আমি একজন সমাজতন্ত্রী, দরিদ্র জনগণের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যই আমার এ সংগ্রাম'।[৩৪] তবে তাঁর সমাজতন্ত্রের ধারণা যে চীন ও রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের ন্যায় হবে না, এ কথা বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় স্পষ্ট করেই বলেছিলেন।[৩৫] বঙ্গবন্ধু অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তবে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে ইসলামি নীতিমালা বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না বলে অঙ্গীকার করা হয়।[৩৬] ছয় দফাকেন্দ্রিক দাবির উল্লেখ ছাড়াও আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে আর্থ-সামাজিক, সামাজিক প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রবিষয় সংক্রান্ত নানা ব্যবস্থার উল্লেখ ছিল।[৩৭] আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনি ইশতেহারকে সামনে রেখে সমগ্র পূর্ব বাংলায় তাঁর নির্বাচনি প্রচারণার সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রচারণা চালান। তিনি ১৯৭০ সালের ২৭ জুন করাচিতে রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে সাংবাদিকদের বলেন, "উভয় অংশের দরিদ্র মানুষের হক আদায়ই আমার লক্ষ্য। করাচিতে পৌঁছে তিনি বলেন, পাকিস্তান, ২২ পরিবারের নয় ১২ কোটি মানুষের এবারের নির্বাচনে সে প্রশ্নের মীমাংসা হবে"।[৩৮]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়া ন্যাপ (ওয়ালী), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), জামায়াতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টির পক্ষ থেকেও নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়।

নিজ নিজ নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রচার-প্রচারণা শুরু করে। জনসভা, পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারাভিযান চালানো হয়। তাছাড়া দেয়াল লিখনও ছিল তাদের প্রচারণার একটি বড় মাধ্যম। অন্যান্য দলগুলো নির্বাচনি প্রচারণায় থাকলেও নির্বাচনি প্রচারণার আকর্ষণ ছিলেন শেখ

---

৩৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, এএইচ এম কামরুজ্জামান, *সাধারণ সম্পাদক*, *নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ*, *নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো*, (ঢাকা, ১৯৭০)। কামরুজ্জামান মুখবন্ধে লেখেন: ১৯৬৯ সালের ৯ আগস্ট করাচিতে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটির এক বৈঠকে এক ম্যানিফেস্টো উপকমিটি গঠিত হয়। এ উপকমিটির দলের বিভিন্ন ইউনিট থেকে বিভিন্ন প্রস্তাব আহ্বান করে তারপর এক খসড়া ম্যানিফেস্টো তৈরি করে তা ১৯৭০ সালের ৩ জুন সাংগঠনিক কমিটিতে পেশ করা হয়। ৫ জুন সাংগঠনিক কমিটি তা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পেশ করলে সেখানে ১৯৭০ সালের ৬ জুন সর্বসম্মতিক্রমে ম্যানিফেস্টোটি গ্রহণ করা হয়।

৩৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৯ জুলাই, ১৯৬৯

৩৫. *The Morning News*, 1 september, 1970

৩৬. দ্রষ্টব্য, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, *সাধারণ সম্পাদক*, *নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ*, *নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো*, (ঢাকা, ১৯৭০)।

৩৭. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য *নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো*, (ঢাকা, ১৯৭০); শ্যামলী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪-২০৫

৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ জুন, ১৯৭০

মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ম্যানিফেস্টো জনগণের সামনে তুলে ধরার লক্ষে সরকার রেডিও পাকিস্তান ও পাকিস্তান টেলিভিশনে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করে। এ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনি ভাষণ দেন। দেশবাসীর উদ্দেশ্য এ ভাষণ প্রদানকালে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোনো উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতেই ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে'। তিনি আরো বলেন, 'ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশে সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্য প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। আওয়ামী লীগ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাল্লাহ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হব।[৩৯] শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নির্বাচনি প্রচারণায় আসন্ন নির্বাচনকে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে গণভোট বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীও ১৯৭০ সালের ৫ নভেম্বর রেডিও পাকিস্তান ও পাকিস্তান টেলিভিশনে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় আগামী শাসনতন্ত্রে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা যথাযথরূপে গৃহীত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।[৪০]

১৯৭০ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান জেলা মহকুমা ও থানা পর্যায়ে নির্বাচনি জনসভায় অনলবর্ষী বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রায় সকল জেলা, ৫৫ টি শহর ও মহকুমা সদর ও ৪০০টি থানায় জনসভা করেছিলেন।[৪১] আওয়ামী লীগের প্রচারণার আকর্ষণীয় প্রচারপত্র ছিল 'সোনার বাংলা শশ্মান কেন?' কৃষক, শ্রমিক, নিম্মবিত্ত জনতা, দেশ প্রেমিক শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সবাই পোস্টারটি লুফে নেয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রচারকার্যে ছাত্রসমাজ ও যুব সম্প্রদায় বলিষ্ঠ অবদান রাখে এবং দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন পূর্ণমাত্রায় উজ্জীবিত হয়ে উঠে।

১৯৭০ সালের এ নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ–যা শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে জেগে উঠা ও স্বায়ত্তশাসনের আদায়ের মূল চাবিকাঠি। পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে একে একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ প্রতিবাদী নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণায় পূর্ববর্তী

---

৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ নভেম্বর, ১৯৭০

৪০. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ নভেম্বর, ১৯৭০

৪১. Talukder Moniruzzaman, *Radical Politics and the Emergences of Bangladesh,* Bangladesh book International, Dhaka,1995, p.75

আন্দোলন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বাঙালি নারীসমাজও উল্লেখযোগ্যহারে অংশ নেয়। যদিও এ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ আসনে নারীদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়নি বললেই চলে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে মাত্র ৩জন নারী প্রার্থী ছিলেন। এছাড়া সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রহিত করা হয়েছিল। যদিও এর প্রতিবাদস্বরুপ রাজধানী ঢাকার ১০৬ জন নেতৃস্থানীয় নারী এক যুক্ত বিবৃতিতে আসন্ন নির্বাচনে নারীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নারী সদস্য নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিল। পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নারীদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ জানিয়ে তারা বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন: বেগম সুফিয়া কামাল, মিসেস আমিনা বেগম, বেগম ফিরোজা বারী, বেগম মতিয়া, বেগম খালেদা হাবিব, বেগম আনোয়ারা খাতুন, কামরুন নাহার লায়লী ও মালেকা বেগম প্রমুখ।[৪২] এতে নারীসমাজের মধ্যে অসন্তোষ ছিল বটে, তথাপি প্রচারণায় তারাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিজ দলীয় প্রার্থীদের বিজয়ী করার যে প্রচারণা তাতে অন্যান্য দলের নারী সমর্থকরা অল্পবিস্তর অংশ নেয়। তবে এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ছিল এগিয়ে। এ দলের সমর্থক নারীরা নির্বাচনি প্রচারণায় অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা ছিলেন অধ্যাপক বদরুন্নেসা আহমদ। ১৯৭০ সালের ৩ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের নারীসমাজকে লক্ষ্য করে বলেন:

> দীর্ঘ ২৩ বৎসরের বিরামহীন সংগ্রামের ফল হিসেবে পাওয়া আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে নারীসমাজের অনেক কিছু করার আছে।... অতীত ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া আগামী সাধারণ নির্বাচনে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীগণকে আগাইয়া আসিতে হইবে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচন প্রচার অভিযান চালাইয়া গণবিরোধী শক্তিসমূহকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন হইতে চিরদিনের মতো উৎখাত করার মহান সংগ্রামে নারীসমাজকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।[৪৩]

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় স্মরণকালের বৃহত্তম এক নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের নারীসমাজের দায়িত্বের কথা পুর্নব্যক্ত করেন। তাঁর মতে,

> একটি জাতির অর্ধেক অংশকে গৃহকোণে আবদ্ধ রেখে কোন জাতিই উন্নতি করতে পারে না। নারী পুরুষের ভাগ্য রাষ্ট্রীয় জীবনে একই সূত্রে গ্রথিত। তাই দেশের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে পুরুষদের পাশাপাশি মা বোনদেরকে ও স্বাধিকার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।[৪৪]

---

৪২. *সাপ্তাহিক বেগম*, ২৬ এপ্রিল, ১৯৭০; উদ্ধৃত মালেকা বেগম (সংকলিত ও সম্পাদিত) *নির্বাচিত বেগম: অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০*, প্রথম খণ্ড , পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ.৪২৫-৪২৬

৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ নভেম্বর ১৯৭০

৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ১৯৭০

নির্বাচনকে সামনে রেখে নারীদের সংগঠিত করে স্বাধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে গঠিত ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'। এ পরিষদের পক্ষ থেকে নির্বাচনের সময় সার্বভৌম সক্ষমতাসম্পন্ন পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা ও নারীদের সংরক্ষিত আসনে গণভোটে সরাসরি নির্বাচন, রাজবন্দিদের মুক্তি, নারী শ্রমিকদের মুজুরিগত বৈষম্য দূর করা, পর্যাপ্ত সংখ্যক মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা, শিশু হাসপাতাল স্থাপন, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করা, জিনিসের দাম কমানো ও নারী নির্যাতন বন্ধের পাশাপাশি নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হয়েছিল।[৪৫]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা হিসেবে বেগম বদরুন্নেছা নির্বাচনি প্রচারণায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া তিনি অন্যান্য নারীদেরও প্রচারণায় এগিয়ে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত একটি বিবৃতির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনি প্রচারণায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাজেদা চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁকে মহানগর আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হয়। এ বৈঠকে বঙ্গবন্ধু নূরজাহান মোর্শেদ, বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ ও সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে নির্বাচনি পর্যবেক্ষক রাখার প্রস্তাব দেন এবং সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। এ নির্বাচনে ঢাকার তেজগাঁও অঞ্চল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রার্থী ছিলেন। এখানে তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জাতীয় লীগের আমেনা বেগম। সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে এ নির্বাচনি এলাকায় নারীরা ব্যাপকভাবে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেয়। এমনকি নৌকা মাথায় নিয়ে তারা রাজপথে নির্বাচনি মিছিলে অংশগ্রহণ করে বলে জানা যায়।[৪৬] সমকালীন বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত পরিচিত মুখ ছিলেন নূরজাহান মোর্শেদ। তিনিও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচার কাজে অংশ নেওয়া ছাড়াও নির্বাচনি পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (ইনু) এর সহযোগী নারী সংগঠন নারী জোটের কেন্দ্রীয় নেত্রী আফরোজা হক রীনা (হাসানুল হক ইনুর স্ত্রী) এক প্রগতিশীল রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। ইডেন কলেজের ছাত্রী থাকাবস্থায় তিনি ছাত্রলীগে যোগ দেন। তিনি আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও তিনি একজন সক্রিয় প্রচারকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পুরান ঢাকার নির্বাচনি এলাকায় আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থীর নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে

৪৫. মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩৮

৪৬. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম , *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৮ ; সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ.৬৭

সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে প্রচারকাজসহ নির্বাচনি তৎপরতায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত আরেকজন নারী ছিলেন সদ্য প্রয়াত এডভোকেট সাহারা খাতুন। এডভোকেট সাহারা খাতুন বাংলাদেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত সুপরিচিত। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপালনকারী এডভোকেট সাহারা খাতুন বিগত শতকের ষাটের দশকের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাঠেও তাঁকে সরব ভূমিকায় দেখা যায়। তিনি এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তাঁর নির্বাচনি এলাকা তেজগাঁও-এ নির্বাচনি প্রচার প্রচারণা চালিয়েছিলেন।[৪৭] প্রয়াত রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রামী নারীনেত্রী আইভী রহমান (১৯৪৪-২০০৪ খ্রি.)। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।[৪৮] নারীনেত্রী মমতাজ শেফালীও (জন্ম: ১৯৫৩ সালের ১ মার্চ মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে) ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তিনি নির্বাচনের সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ঢাকার সূত্রাপুরের কসাই পল্লী, পাঁচভাই ঘাট লেন, কোতায়ালী, লক্ষ্মীবাজার প্রভৃতি এলাকায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা চালান। শুধু তাই নয় নির্বাচনের দিন তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে একটি কেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[৪৯] শামসুন নাহার বেগম নামক একজন নারীনেত্রী ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী সৈয়দ নজরুল ইসলামের নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও তিনি তৎপর ছিলেন।[৫০]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনি প্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন মমতাজ বেগম। পরে তিনি সংরক্ষিত নারী আসনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে এম.এন মনোনীত হন।[৫১] বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সহ-সভানেত্রী ডা. ফৌজিয়া মোসলেমও ১৯৭০- এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ন্যাপ প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন।[৫২] ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় পটুয়াখালীর রাজনৈতিক অঙ্গনে তৎপর একজন নারীনেত্রী

৪৭. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *২য় খণ্ড*, *পৃ. ২০২*

৪৮. মতাজ বেগম , মফিদা বেগম , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯- ৯০; সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৮-১১৯

৪৯. মমতাজ বেগম , মফিদা বেগম , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭; সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪-২৩৫

৫০. মমতাজ বেগম , মফিদা বেগম , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

৫১. মমতাজ বেগমের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য ১৯.০৬.১৯ ইং

৫২. ১৯৪৬ সালে ভারতের বাঁকুড়া জেলায় জন্মগ্রহণকারী ফৌজিয়া মোসলেম ১৯৭০ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি এস ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের সকল মিটিং- মিছিলে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৪

ছিলেন এস. এম মনোয়ারা মনু। তিনি পটুয়াখালী অঞ্চলে মিছিল সমাবেশে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সপক্ষে জনমত গঠনে অক্লান্তভাবে কাজ করে তাঁকে বিজয়ী করতে ভূমিকা রাখেন।[৫৩] আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রী এবং শহীদ জাতীয় চার নেতার অন্যতম এ.এইচ কামরুজ্জামান। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় তাঁর রাজশাহী নির্বাচনি এলাকায় তাঁর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে প্রচার কাজে অংশ নিয়েছিলেন জিন্নাতুন্নেসা তালুকদার। জিন্নাতুন্নেসা তালুকদার ১৯৬৮ সালে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রচারসহ নির্বাচনি কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পক্ষে সমর্থন আদায় ও দলকে বিজয়ী করতে রাজশাহীর অলি-গলি ও গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এছাড়া তিনি নির্বাচনের দিন আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[৫৪] ১৯৭০ এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সংগ্রহের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সকল সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিলেন ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না।[৫৫] সিরাজগঞ্জ মহিলা কলেজ ছাত্র সংসদের যুগ্ম সম্পাদিকা ছাত্রলীগ নেত্রী (পরে তিনি সিরাজগঞ্জ জেলা মহিলা সম্পাদিকা হয়েছিলেন) মিসেস আমিনা বেগম এবং সৈয়দা ইসাবেলা সিরাজী প্রমুখও এ নির্বাচনি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে শেষোক্ত সৈয়দা ইসাবেলা সিরাজী পিতৃকুলের দিক থেকে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১ খ্রি.) পরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মেজো ভাইয়ের কন্যা। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। '৬২- এর ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল আন্দোলন সংগ্রামের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা ও নির্বাচনি কাজে অংশ নিয়েছিলেন।[৫৬] বরিশালের উজিরপুরের রুনু দাসের জন্ম হয়েছিল রাজনৈতিক পরিবারে। পারিবারিক আদর্শে ও চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় রুনু দাস নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন।

সালে মেডিকেল কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্রী থাকাবস্থায় তিনি ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ২৪ জানুয়ারির মিছিলের তিনি সামনের সারির একজন। শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৫৩-২৫৪

৫৩. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬৭

৫৪. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ.২০৫; শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭১

৫৫. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২ ; শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭৪

৫৬. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৯-৮০

বেগম আশরাফুন নেছা ছিলেন একজন ভাষা সংগ্রামী ও রাজনীতিবিদ। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। তাঁর স্বামী ডা. মোশাররফ হোসেন প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের স্বাস্থ্য পরিচালক ছিলেন। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে একজন আওয়ামী লীগ কর্মী হিসেবে পাকিস্তানের স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে তৎপর ছিলেন। এ সময় তিনি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মিটিং করতেন, পাকিস্তানিদের শোষণ ও বঞ্চনার কথাগুলো সাধারণ মানুষকে বোঝাতেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেন।[৫৭] উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক প্রাদেশিক আইন পরিষদের মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও তেজগাঁও এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনে সদস্য মনোনীত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি ১৯৭৩ ও ২০০৮ সালেও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা ও নির্বাচনি অন্যান্য কাজে ভূমিকা পালনকারীদের অন্যতম একজন ছিলেন টাঙ্গাইলের সুফিয়া খান।[৫৮] প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে যুক্ত সুফিয়া খান একজন ভাষা সংগ্রামী ছিলেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন এবং ঊনসত্তরের গণআন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। রংপুরের কণক প্রভা সরকার পারিবারিকভাবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। নার্সিং পেশায় যুক্ত কনক প্রভা সরকার ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পক্ষে জনমত সংগঠিত করার লক্ষ্যে জনসংযোগসহ অন্যান্য কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন।[৫৯]

ষাটের দশকে নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন বেগম মুশতারী শফী। নারী মুক্তির জন্য তিনি চট্টগ্রামে 'বান্ধবী সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের চট্টগ্রাম শাখা আহ্বায়ক ছিলেন বেগম মুশতারী শফী। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যাপক নির্বাচনি তৎপরতা চালিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে নারীদের সংগঠিত করে বিভিন্ন ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচন তদারক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তিনি তাঁর নারী সহকর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন মিছিল

---

৫৭. বেগম আশরাফুন নেছা এর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ১. ১১. ১৯৯৭; উদ্ধৃত শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮৭

৫৮. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭

৫৯. *ঐ*, পৃ. ২৯৯

মিটিং অংশগ্রহণ করতেন।[৬০] বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী ও ছায়ানটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. সন্‌জীদা খাতুন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী আইয়ুব বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন এ সংস্কৃতিজীবী মহীয়সী নারী। ১৯৭০ সালে তিনি রংপুরের কারমাইকেল কলেজের শিক্ষক ছিলেন। এখানে তিনি একটি নির্বাচনি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৬১]

আব্দুর রাজ্জাক গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁর কন্যা ছিলেন রাশেদা খানম রীনা। আওয়ামী পরিবারের সদস্য হলেও তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক ছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি ন্যাপের প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করেন।[৬২] ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন কংগ্রেস সদস্য নারায়ণগঞ্জের নলিনীরঞ্জন কর। তাঁর কন্যা কমলাকর লক্ষ্মী ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং এ সংগঠনের প্রার্থী হিসেবে নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজের ছাত্র সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জের ন্যাপ প্রার্থী এ্যাড. মাইনউদ্দিন আহমেদ এবং গোকুল চন্দ্র পোদ্দারের পক্ষে নির্বাচনি প্রচার ও অন্যান্য কাজে অংশ নিয়েছিলেন।।[৬৩] ব্রিটিশবিরোধী অন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের নির্বাচিত সদস্য বিজয় ভূষণ চ্যাটার্জী এবং কমিউিনিস্ট নেত্রী ও কৃষক সমিতির সদস্য নীহার কণা চ্যাটার্জীর কন্যা লীনা চক্রবর্তী শিক্ষা জীবনে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রথমে ন্যাপ এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। বায়ান্নোর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনে চাকুরিতে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের সময় ভারতীয় চর হিসেবে তাকে ব্ল্যাকলিস্টেট করা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় তাকে কোনো সরকারি দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি। তাই তিনি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় গিয়ে ন্যাপের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় অংশ নেন।[৬৪] নেত্রকোণার রেখা সাহা একজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। তিনি নিজে ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতি করতেন। তিনি মহিলা পরিষদ এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাঁর বাবা নেত্রকোণা নির্বাচনি ঐ এলাকা থেকে ন্যাপ প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

---

৬০. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬
৬১. *ঐ*, পৃ. ৩০৪
৬২. *ঐ*, পৃ. ৩০২
৬৩. *ঐ*, পৃ. ২৯৫
৬৪. *ঐ*, পৃ. ২৮৪

করেন। রেখা সাহা তাঁরা বাবার পক্ষে প্রচারণাসহ নির্বাচনি কাজে অংশ নিয়েছিলেন।[৬৫] তৎকালীন নোয়াখালীর জেলার রামগতি (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা) এলাকার শ্রী আশুতোষ মজমুদার ব্রিটিশবিরোধী গুপ্ত সংগঠন অনুশীলন দলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কন্যা শিবানী দাস ছাত্র ইউনিয়ন ইডেন কলেজ শাখার সেক্রেটারি ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী হিসেবে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও তিনি নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণায় সক্রিয় ছিলেন।[৬৬] ১৯৭০ সালের নির্বাচনি তৎপরতার সাথে যুক্ত আর যে সকল নারী সম্পর্কে জানা যায় তাদের মধ্যে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক বেবী মওদুদ। সে সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের সাহিত্য সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষে জনমত সংগঠন এবং ভোটারদের উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষভাবে কাজ করেন।[৬৭] আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রাজশাহীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. লায়লা পারভীন বানু (বর্তমানে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য), বরগুনার ফরিদা খানম সাকী, যশোরের রওশন জাহান সাথী, জীবন প্রভা বিশ্বাস, রওশন আরা বেগম, টাঙ্গাইলের খাদিজা সিদ্দিকী, বেগম শামছুন্নাহার ও হাসিনা পারভীন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৬৮]

৮.৫: ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও এর ফলাফল

প্রথমে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল বন্যাজনিত অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় অনুষ্ঠিত এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় প্রায় দুই লক্ষ লোকের জীবনহানির ঘটনা ও ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির মুখে আওয়ামী লীগ ব্যতীত সকল দল নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন:

> If the polls are frustrated, the people of Bangladesh will owe it to the million who have died to make the supreme sacrifice of another million lives, if need be, so that we can live as a free people and so that Bangladesh can be the master of its own destiny.[৬৯]

---

৬৫. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৩

৬৬. *ঐ*, পৃ. ২৮৭

৬৭. *ঐ*, পৃ. ২৫৮

৬৮. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ.২২৫, ২৩৭ ও ২৫৩; ২য় খণ্ড, পৃ.১২৫, ১২৯, ১৪৮, ২৯, ১৯৫

৬৯. *Morning News*, Nov. 27, 1970

বস্তুত এই ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার মানুষের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও উপেক্ষার মনোভাবের ফলে বাঙালিদের মনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধু নির্বাচনি ফলাফলে এর প্রতিফলন দেখার রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই ভোট গ্রহণের তারিখ অপরিবর্তিত রাখার দাবি করেন। অবশেষে নির্বাচন পূর্বঘোষিত সময় অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি আসনের নির্বাচন স্থগিত করে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি এসব আসনে নির্বাচন করা হয়।

নানা সন্দেহ-সংশয় ও তর্ক-বিতর্কের পর পূর্বোক্ত কয়েকটি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসন ব্যতীত নির্ধারিত সময়েই বহুল কাঙ্ক্ষিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের দিন *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় বিশেষ সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> পাকিস্তানে আজ যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে তাহা একটা গতানুগতিক নির্বাচন নয়। এই সাধারণ নির্বাচনের রহিয়াছে অসাধারণ গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য। কারণ পাকিস্তানের সাংবিধানিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার রূপরেখা কিরূপ হইবে তদসম্পর্কে জনগণ এই নির্বাচনের মাধ্যমেই রায় প্রদান করিবেন।[৭০]

সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, দেশের জনসংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল তেইশ-চব্বিশটি বছর ধরে নির্মমভাবে শোষিত, বঞ্চিত হয়েছে। দুই অঞ্চলের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট অর্থনৈতিক অসাম্য ও ব্যবধান। জনগণ ভোটের মাধ্যমে এর সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে। একটি উৎসবমুখর পরিবেশে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যে এ নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৮ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকসহ সকল জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সংবাদে তা দেখা যায়। *দৈনিক ইত্তেফাকের* ভাষ্য মতে,

> স্বাধীনতা উত্তরকালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে গতকাল সোমবার (৭-১২-১৯৭০) ঢাকায় গণতন্ত্রাভিলাষী ও স্বাধিকারকামী নারী, পুরুষ, ছাত্র, শ্রমিক তথা আপামর জনসাধারণ অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য, উৎসাহ-উদ্দীপনা লইয়া ভোট দান করেন।--- ছাত্র, শ্রমিক, কুলি-মজুর, রিকশাচালক, যানবাহন চালক, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী তথা সকল শ্রেণির নারী-পুরুষ সকাল সাড়ে ৮ টা বাজিবার পূর্বেই সকল কাজকর্ম ফেলিয়া স্ব-স্ব এলাকার ভোটকেন্দ্রের দিকে ছুটিতে থাকেন। ফলে দুপুরের আগেই শহরের ভোটকেন্দ্রগুলিতে অধিকাংশ ভোটদান সম্পন্ন হয়।[৭১]

যাহোক ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত স্থগিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যে ফলাফল হয় তা হলো:

---

৭০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০

৭১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ক. জাতীয় পরিষদ: প্রদেশভিত্তিক ফলাফল নিম্নরূপ[৭২]

দলের নাম	প্রদেশ অনুসারে ফলাফল							মোট আসন
	পূর্ব পাক	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উ.প.সী.প্র	বেলুচিস্তান	উপজাতি এলাকা	নারী আসন	
আওয়ামী লীগ	১৬০						৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি		৬৪	১৮	১			৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)		১	১	৭				৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)		৭						৭
জামায়াত উল উলামায়ে ইসলাম				৬	১			৭
মারকাজ-ই-জামায়াত-উল-উলামা ইসলাম		৪	৩					৭
ন্যাপ (ওয়ালী)				৩	৩		১	৭
জামায়াতে ইসলাম		১	২	১				৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)		২						২
পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	১							১
স্বতন্ত্র প্রার্থী	১	৩	৩			৭		১৪
মোট	১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

খ. প্রাদেশিক পরিষদ: ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের পাঁচটি প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিধায় কেবল পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ফলাফল উল্লেখ করা হলো।[৭৩]

দলের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত নারী আসন	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	২		২

---

৭২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৮৬

৭৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৮৬

পাকিস্তান পিপলস পার্টি			
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)			
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)			
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)			
ন্যাপ (ওয়ালী)	১		১
জামায়াতে ইসলামী	১		১
নেজামে ইসলামী	১		১
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম			
মারকাজে আহলে হাদীস			
জামায়াত-ই উলামায়ে ইসলাম (হাজারী)			
জামায়াত-ই উলামায়ে ইসলাম (নূরানী)			
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৭		৭
মোট	**৩০০**	**১০**	**৩১০**

নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি (সংরক্ষিত ৭টি নারী আসনসহ) আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ টি সাধারণ আসনের মধ্যে ২৮৮ টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪ টি আসনের মধ্যে ৮৮ টি (৫টি সংরক্ষিত নারী আসনসহ) আসন লাভ করে।

জাতীয় পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসনে বিজয়ী সদস্যগণ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ আসনে তিনজন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নির্বাচনে তাদের তিনজনই পরাজিত হন। এদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিপক্ষে ঢাকা জাতীয় লীগ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন আমেনা বেগম। যিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছেন একই দলে। পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে জাতীয় লীগে যোগ দেন এবং বঙ্গবন্ধুর বিপক্ষে ঢাকা-৯ নির্বাচনি আসন থেকে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন ১ লাখ ২৭ হাজার ৮৪৩ ভোট। অপরদিকে আমেনা বেগমের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ছিল ২ হাজার ২৪৫টি।[৭৪] পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসনে

৭৪. দ্রষ্টব্য 'বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংসদে নারী' *দৈনিক যুগান্তর*, ১৬ মার্চ, ২০২০

সরাসরি ভোটের বিধান রহিত করা হয়। ফলে জাতীয় পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন প্রদানের রীতি প্রবর্তিত হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ছিল ১৩টি। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ছিল ৭টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৬টি। পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সুবাদে এ অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ৭টি আসনের সবকয়টিতেই আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীগণ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ সংরক্ষিত নারী আসনে ৭ জন নারী এম.এন.এ (Member of the National Assembly) নির্বাচিত হন। নির্বাচিত এ নারী সদস্যগণ হলেন:

সংরক্ষিত নারী আসন-১ (ঢাকা জেলা ও ফরিদপুর জেলা নিয়ে ঢাকা বিভাগ): নির্বাচিত সদস্য নূরজাহান মোর্শেদ। মিসেস নূরজাহান মোর্শেদ (১৯২৪-২০০৩ খ্রি.) একজন শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ, নারীমুক্তি আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণকারী নূরজাহান মোর্শেদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেন। তাঁর স্বামী অধ্যাপক খান সারওয়ার মোর্শেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে নূরজাহান মোর্শেদ রাজনীতিতে সক্রিয় হন এবং দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হন। তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকুরি করতেন।[৭৫] স্বাধীন বাংলাদেশে নারী মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু যে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেছিলেন নূরজাহান মোর্শেদ এর অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তাছাড়া ১৯৭৩ সালে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের মন্ত্রিপরিষদে সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৭৬]

সংরক্ষিত নারী আসন-২ (ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে ঢাকা বিভাগ): নির্বাচিত সদস্য রাফিয়া আখতার ডলি। প্রগতিশীল রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মিসেস রাফিয়া আখতার ডলি (১৯৪৫ সালের টাঙ্গাইল জেলায়) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। স্কুলজীবন থেকেই ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনসহ ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সর্বোপরি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।[৭৭]

সংরক্ষিত নারী আসন-৩ (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলা নিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগ): নির্বাচিত সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। মিসেস সাজেদা চৌধুরী ১৯৩৫ সালের মে মাসে ফরিদপুর জেলার

৭৫. সেলিনা হোসেন, মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, মাওলা ব্রাদাস, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৮০০-৮০১

৭৬. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারী*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৫৯

৭৭. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

নগরকান্দা থানার চন্দ্রপাড়া গ্রামে সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামী ছিলেন চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা ও ভাষা সৈনিক গোলাম আকবর চৌধুরী। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময়ে রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। স্বামীর অনুপ্রেরণায় তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, '৬৬- ছয় দফা, '৬৯- গণঅভ্যুত্থান এবং মহান গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালনকারী এ নারী ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনে তিনি নির্বাচনি পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করাসহ প্রচারণায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[৭৮]

সংরক্ষিত নারী আসন-৪ (কুমিল্লা ও সিলেট জেলা নিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগ): নির্বাচিত সদস্য মমতাজ বেগম। নারী মুক্তিযোদ্ধা মিসেস মমতাজ বেগম ১৯৪৬ সালের ১৩ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার শিমরাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রলীগ কর্মী মমতাজ বেগম ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ছয় দফা আন্দোলনে মিছিল মিটিং অংশগ্রহণ করা ছাড়াও নারী ও ছাত্রীদের মাঝে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তাছাড়া এ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচনি প্রচারণায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।[৭৯]

সংরক্ষিত নারী আসন-৫ (কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও যশোর জেলা নিয়ে খুলনা বিভাগ): নির্বাচিত সদস্য রাজিয়া বানু। ১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসেবে পরিচিত মিসেস রাজিয়া বানু ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট হিসেবে তিনি নির্বাচিত হন।

সংরক্ষিত নারী আসন-৬ (রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া নিয়ে রাজশাহী বিভাগ): নির্বাচিত সদস্য তসলিমা আবেদ। শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিত ১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত মিসেস তসলিমা আবেদ ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।[৮০]

সংরক্ষিত নারী আসন-৭ (রাজশাহী ও পাবনা নিয়ে রাজশাহী বিভাগ এবং ঝিনাইদহ ও মাগুরা নিয়ে যশোর ও খুলনা বিভাগ): নির্বাচিত সদস্য বদরুন্নেছা আহমেদ। বাংলাদেশের শিক্ষাজগত ও রাজনীতিতে সুপরিচিত মিসেস বদরুন্নেছা আহমেদ (১৯২৪-১৯৭৩ খ্রি.)। প্রগতিশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী কিংবদন্তি শিক্ষাবিদ, সামাজিক কর্মী ও রাজনীতিবিদ বদরুন্নেছা আহমেদের দৃঢ়তা, কর্মোদ্যোগ ও আত্মবিশ্বাসে মুগ্ধ

---

৭৮. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৯

৭৯. *ঐ*, পৃ. ৬০-৬১

৮০. এডভোকেট এ. বি. এম রিয়াজুল কবীর কাওছার, *আইন বিধিমালা তথ্য ও ফলাফল*, বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা উপজেলা পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০১২), বাংলাদেশ নির্বাচন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৮১২

হয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁকে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রিপরিষদে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।[৮১]

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন

পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য যে ছয়টি সংরক্ষিত নারী আসন ছিল এর মধ্যে ৫টি পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং ১টি ন্যাপ (ওয়ালী) দলীয় নারী সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত এ নারী সদস্যগণ ছিলেন:[৮২]

সংরক্ষিত নারী আসন-১: নির্বাচিত সদস্য শিরীন ওয়াহাব।

সংরক্ষিত নারী আসন-২: নির্বাচিত সদস্য মিসেস নারগিস নায়ীম।

সংরক্ষিত নারী আসন-৩: নির্বাচিত সদস্য নাসিম জাহান বেগম।

সংরক্ষিত নারী আসন-৪: নির্বাচিত সদস্য জাহিদা সুলতানা।

সংরক্ষিত নারী আসন-৫: নির্বাচিত সদস্য ড. মিসেস আশরাফ খাতুন এবং

সংরক্ষিত নারী আসন-৬: নির্বাচিত সদস্য মিসেস জেহান জেবা (ন্যাপ ওয়ালী)।

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ১০টি সংরক্ষিত নারী আসনের সবকটিতেই মনোনয়নের অধিকারী হয়। তবে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের কার্যকারিতা থাকেনি। অবশ্য নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদ অনুষ্ঠিত হয়। এ গণপরিষদ ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। এ সংবিধানের আওতায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ৩০০ সাধারণ আসনের সাথে ১৫ টি সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এ নির্বাচনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সব কয়টি সংরক্ষিত নারী আসন লাভ করে। প্রসঙ্গক্রমে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের নামোল্লেখ করা হলো: সংসদীয় আসন ৩০১: বেগম তসলিমা আবেদ (রংপুর); ৩০২. অধ্যাপিকা নাজমা শামীমা লাইজু (দিনাজপুর-রংপুর); ৩০৩. বেগম জাহানারা রব (বগুড়া-পাবনা); ৩০৪. বদরুন্নেছা আহমেদ (যশোর-কুষ্টিয়া); ৩০৫. অধ্যাপিকা ফরিদা রহমান (খুলনা-বাকেরগঞ্জ); ৩০৬. অধ্যাপিকা আজরা আলী (পটুয়াখালী-ফিরোজপুর ছাড়া বাকেরগঞ্জ); ৩০৭. রাফিয়া আখতার ডলি টাঙ্গাইল-জামালপুর); ৩০৮. খুরশীদা ময়েজ উদ্দীন (জামালপুর ছাড়া ময়মনসিংহ); ৩০৯. সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী (নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা সদর উত্তর); ৩১০. নূরজাহান মোর্শেদ (নারায়ণগঞ্জ ও সদর উত্তর ছাড়া ঢাকা) ; ৩১১. কনিকা বিশ্বাস (ফরিদপুর); ৩১২.

৮১. *The Daily Star*, April 25, 2018

৮২. Elections Ordinance, 1970, The Election Commission, Islamabad, 18th December, 1970

আবেদা চৌধুরী (সিলেট); ৩১৩. অধ্যাপিকা মমতাজ বেগম (চাঁদপুর ছাড়া কুমিল্লা); ৩১৪. আর্জুমান্দ বানু (চাঁদপুর-নোয়াখালী) এবং ৩১৫. সুদীপ্তা দেওয়ান (চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম)।[৮৩] উল্লেখ্য যে ১৯৭৩ সালের নির্বাচিত ১৫ জন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের মধ্যে তসলিমা আবেদ, রাজিয়া বানু, নূরজাহান মুরশিদ, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ও অধ্যাপিকা মমতাজ বেগম ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনের বিজয়ী প্রার্থী ছিলেন।

৮.৬: নির্বাচনের ফলাফল পরবর্তী ঘটনা ও নারীসমাজ

পূর্ব পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টকে মিথ্যা ও ভুল প্রতিপন্ন করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রতি বিপুল এ রায় প্রকারান্তে ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি বাঙালির গণরায় বলে অভিহিত করা হয়। যা ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাঙালির ম্যান্ডেটস্বরূপ। নির্বাচনের এ বিজয়কে *দৈনিক ইত্তেফাকে* 'ভূমিধ্বস বিজয়' বলে চিহ্নিত করে, 'অভিনন্দন হে বীর নেতা ও জনতা ' শিরোনামে নামে ৮ ডিসেম্বর (১৯৭০) সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখা হয়:

> ---এ যেন চুয়ান্ন সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয় ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। কায়েমী স্বার্থের দুর্গ প্রকরণ বিধ্বস্ত। গণতন্ত্রের দুশমন ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন ভিন্ন---আমলাতন্ত্রের শিরোমণি চূড়ামণিদের সমস্ত কারচুপি ধূলায় লুণ্ঠিত। গণদুশমনদের কোটি কোটি রজত মুদ্রার ঝনঝনানি, পূর্ব বাংলার কণ্ঠকর্তনকারীদের কুটিল কলা, কৌশল ও ছলচাতুরী, ধর্মব্যবসায়ীদের ধর্মের নামে ধূম্রজাল বিস্তার কোনটাই পূর্ব বাংলার জাগ্রত জনগণকে এতটুকু বিভ্রান্ত করতে পারে নাই। জনগণ নির্ভুল পথই বাছিয়া লইয়াছেন এবং ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের পক্ষে কার্যত সর্বসম্মত রায় দিয়েছেন। সেজন্য জাগ্রত বাংলার তুলনাহীন গণচেতনাকে অভিনন্দন।[৮৪]

নির্বাচনের ফলাফল শুধু আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত বিজয় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য বজায় রাখেনি, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে একটি গণভোটের বিজয়রূপে স্বীকৃত হয়। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত ভোটের ৭৫.১১ শতাংশ এবং প্রাদেশিক পরিষদে প্রদত্ত ভোটের ৭০.৪৫ শতাংশ লাভ করে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় পরিষদের মোট ভোট প্রদানের হার ছিল ৪৮.২৮% এবং প্রাদেশিক পরিষদে এ হার ছিল ৫৭.৬৯%।[৮৫]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি না থাকায় পাকিস্তানে এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে

---

৮৩. দ্রষ্টব্য মালেকা বেগম (সংকলিত ও সম্পাদিত), নির্বাচিত বেগম: অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০, ১ম খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪৩৭। 'বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংসদে নারী' শিরোনামে *দৈনিক যুগান্তর*, ১৬ মার্চ, ২০২০ সংখ্যার এক নিবন্ধে ৩০৪ নং সংসদীয় আসনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির নাম উল্লেখ রয়েছে রাজিয়া বানু।

৮৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭০

৮৫. *Election Commission pakistan, Report on General Election Pakistan 1970-71* (Islambad,1972), vol.I, pp.202-203, 216-217

সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের অধিকারী আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের নতুন সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো আতংকিত হয়ে পড়ে এবং জনগণের রায়কে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, ছয় দফার রদবদল না হলে তিনি জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিবেন না এবং অন্যান্য দলগুলোকে যোগ না দেওয়ার জন্য পরামর্শ ও হুমকি প্রদান করেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত বাঙালি জনগণ স্বাভাবিক ভাবে নেয়নি এবং তাঁরা প্রেসিডেন্টের ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এ প্রতিবাদের নারীসমাজও সরব ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার নিন্দা জানিয়ে মুসলিম ছাত্রী সংঘের সভানেত্রী শওকত আরা ও সাধারণ সম্পাদিকা শাহানা এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানান।[৮৬] ঐদিনই ওয়ালী ন্যাপের নেত্রী ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মতিয়া চৌধুরী গুলিস্তানের এক প্রতিবাদী পথসভায় বলেন, আজ আর কোনো একদল নয়, কোনো মত নয়, নেই কোনো ভেদাভেদ, শেখ সাহেব আপনার কাছে আমাদের আবেদন, আপনি সিদ্ধান্ত নিন, বাংলার প্রতিটি মানুষ আপনার সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আপনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, আজ আর ন্যাপ নেই, আওয়ামী লীগ নেই, সবাই কাধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করতে হবে। এখন থেকে পাড়ায় জঙ্গি ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেই।[৮৭] জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঐদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক বটতলায় ছাত্র জনতার বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সভায় সর্বপ্রথম বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়।[৮৮] এ সভায় অনেক ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন আয়েশা খানম, কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা, রীনা খান, রাখী দাশ পুরকায়স্থ, বেগম শামসুন্নাহার, নাসিমুন আরা হক মিনু ও বেগম শামসুন্নাহার ইকো প্রমুখ।[৮৯]

জাতীয় পরিষদ স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সারা দেশে হরতালের ডাক দেওয়া হয়। ৩ মার্চ (১৯৭১) থেকে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যহত থাকে। এ সময় বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রবল চাপ ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার জন্য কিন্তু তিনি শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী ছিলেন। যদিও ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তিনি বিশাল জনসভায় বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম

---

৮৬. আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.৮৫; মালেকা বেগম, মুক্তিযুদ্ধে নারী , প্রাগুক্ত, পৃ.৪১

৮৭. আতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০

৮৮. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *মুক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধিজীবী*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১২

৮৯. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৯ ও ২৩৫

মুক্তির সংগ্রাম’ এবং তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ প্রায় প্রতিদিন মিছিল, মিটিং শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হতো। প্রত্যেকটি সভা, মিছিল, মিটিং এ নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। এ সময় স্বাধিকার আন্দোলনে নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য নারীরা নানা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণরত নারীদের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব নারী প্রশিক্ষণ নেন তারা হলেন- কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা, রোকেয়া কবীর, রোকেয়া খানম, মমতাজ শেফালী, আভা মণ্ডল, নাজমা শাহীন বেবী, ডাঃ মেহরোজ, ডা. নেলী চৌধুরী, নাজমুন আরা নিনু, তাজিন সুলতানা, রতন হেলেন, শামীমা এবং আরো অনেকে।[৯০] ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়াম মাঠে তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে ও কলা ভবনের বারান্দায় বন্দুক দিয়ে প্রশিক্ষণে অংশ নেন- ফোরকান বেগম, ফরিদা খানম সাকী, মমতাজ বেগম, রাশেদা আমিন, হাসমত জাহান, রোজী বেবী, মিনারা বেগম ঝুনু, রওশন আরা বেগম, আফরোজা হক রীনা, বকুল মোস্তফা, নেলী চৌধুরী, রোকেয়া খাতুন রেখা, সালেহা বেগম, সালমা বেগম, সুরাইয়া ও রাফিয়া আখতার ডলি প্রমুখ।[৯১] এ ছাড়া মহিলা পরিষদের উদ্যোগে নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর ‘মরিচা হাউসে’ প্রায় দু’শ নারী প্রশিক্ষণ নেয়।

পূর্ব বাংলায় চলমান রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেই সংকট সমাধানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানসহ পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সাথে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধারাবাহিক আলোচনা চলে। কিন্তু এতে সংকটের কোনো শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়নি। উপরন্তু বঙ্গবন্ধুকে না জানিয়ে আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। ঐদিনই তাঁর নির্দেশে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ করে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে এতে করেও শেষ রক্ষা হয়নি। গ্রেপ্তারের পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে সমূলে উৎখাত করে বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন।[৯২] এর মধ্য দিয়ে শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ,

---

৯০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড*, পৃ. ২১৩, ২১৭, ২৪৪, ২৬২, ২৬৫ এবং *২য় খণ্ড*, পৃ. ২১০ ২৩৪, ২৯৩

৯১. *প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড*, পৃ. ১৯৫, ২২৯, ২৫১, ২৫৬,; এবং *২য় খণ্ড*, পৃ.১২৬, ১৪৯, ২০২,২২২

৯২. ২৫ মার্চ (১৯৭১) রাতে ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা অভিযান শুরু করলে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে পাঠিয়ে দেন। এই স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তিনি তাঁর সহকর্মীদের ও দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান: “This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last.You fight must go on until the last soldier of the

অবসান হয় যুক্ত পাকিস্তানের এবং অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের। পরবর্তী অধ্যায়ে বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং এতে নারীসমাজের ভূমিকা বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা হবে।

১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলায় শাসন করার বৈধতা হারায়। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় যে স্বাতন্ত্র্যবাদ ও পৃথক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তা আওয়ামী লীগের পক্ষেই কাজ করে। বস্তুত বাঙালির জাতীয় জীবনে গণচেতনা জাগাতে মাইলফলক হিসেবে কাজ করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে। এ নির্বাচনের প্রচারণায় আওয়ামী লীগ সারা দেশে ছয় দফা তুলে ধরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা বাঙালিরা যে শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে তা আপামর জনগণের কাছে তুলে ধরতে এবং তার প্রতিকারকল্পে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় পাকিস্তানিদের প্রতি বাঙালি জনগোষ্ঠীর আস্থাহীনতা ও অসন্তোষ প্রমাণ করে। এ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী প্রার্থী না হলেও এবং সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান রহিত করা হলে নারীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। নির্বাচনি ইশতেহারগুলোতে নারীদের অধিকারের বিষয়ে তেমন কিছু অন্তর্ভুক্ত ছিল না বরং ১৯৫৪ সালের তুলনায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নারীদের অধিকার সংকুচিত করে ফেলা হয়। সাধারণ আসনে পূর্ব বাংলায় সব দল মিলে ৩ জন নারী প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। তবে সার্বিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এ নির্বাচনে নারীরা ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ করে। স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তারা প্রচারণায় নামে এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিতকরণে সর্বাত্মক প্রয়াস চালায়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় নস্যাতে শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র এবং ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা প্রতিক্রিয়ায় বাঙালিদের পরিচালিত আন্দোলনেও নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। নারী-পুরুষের সর্বাত্মক আন্দোলন ও পরিশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পরিশেষে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved." ; উদ্ধৃতঃ হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। এই মুক্তিযুদ্ধ কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, বরং পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানি শাসকচক্রের অগণতান্ত্রিক আচরণ ও শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন শোষণ ও নির্যাতনে বিপর্যস্ত বাঙালি জাতির সকল বঞ্চনারই কেবল অবসান ঘটেনি, এই মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালি জাতির বহুল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে এটি ছিল একটি জনযুদ্ধ।[১] বাঙালি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এ জনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান। মুক্তিযুদ্ধের (মার্চ-ডিসেম্বর ১৯৭১) দীর্ঘ পটভূমি থেকে শুরু করে এর প্রতিটি পর্যায়ে নারীসমাজের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত নারীসমাজ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে অসহযোগ আন্দোলন, ট্রেনিংগ্রহণ, শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ এবং পরবর্তীতে রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ যুদ্ধসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন সেক্টরে সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি দেশের ভেতর ও বাইরে জনমত গঠন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি, বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা প্রশিক্ষণ শিবিরে অস্ত্র পরিচালনা, প্রশিক্ষণ গ্রহণ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষা প্রদান, গোপনে সংবাদ সরবরাহকরণ ইত্যাদি বহুবিধ ভূমিকা পালনে এদেশের নারীসমাজ সক্রিয় ছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের গৌরবোজ্জ্বল ও ঐতিহাসিক ভূমিকা এক সময় লেখক, ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। তবে গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শেষ দিক

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সত্যিকার অর্থেই ছিল জনযুদ্ধ। এতে কৃষক, শ্রমিক, জেলে, মজুর, তাঁতি, নৌকার মাঝি, নারী, পুরুষ, গৃহিনী, ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বেসামরিক আমলা, বাঙালি সেনাসদস্য, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, পাহাড়ি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রবাসী বাঙালি, কূটনীতিক, নির্বিশেষে সকলস্তরের মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বসম্প্রদায়ের ও ছিল গভীর সহানুভূতি। হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০২০, পৃ. ১০

থেকে এ বিষয়ে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইতোমধ্যে এতদবিষয়ে কিছু মূল্যবান প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এসব গবেষণা কর্মের কিছু কিছু ইতোমধ্যেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয়েছে। এসব গ্রন্থের মধ্যে শাহনাজ পারভিন রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭) এবং আসমা পারভীন রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ* (বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত মালেকা বেগম রচিত *মুক্তিযুদ্ধে নারী* (প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১) এবং মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম প্রণীত *স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারী* (হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮) প্রভৃতি গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের ভূমিকা সামগ্রিকভাবে চিত্রায়ণের প্রয়াস রয়েছে। এসব তথ্যসূত্রসহ প্রাপ্ত অন্যান্য প্রাথমিক ও দ্বৈতায়িক সূত্রের আলোকে আলোচ্য অধ্যায়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীসমাজের অংশগ্রহণ ও তাঁদের ভূমিকা পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের প্রয়াস থাকবে।

৯.১: মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব ও নারীসমাজ

স্মর্তব্য যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসের কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে এর পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয়েছে। বায়ান্নোর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই মূলত বাঙালির পশ্চিমা শাসকচক্রের নাগপাশ থেকে মুক্তির সংগ্রামের সূচনা। এরপর দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলে মুক্তি সংগ্রামের নানা পর্যায়। আর মুক্তি সংগ্রামের এ প্রতিটি পর্যায়েই বাঙালি নারীসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে এতদবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ নির্বাচন এবং নির্বাচনি ফলাফলকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি শাসকচক্রের ভূমিকায় বাঙালি জনসমাজে স্বাধীনতার দাবিটি গণদাবিতে পরিণত হয়। বস্তুত ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সত্ত্বেও দলপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠন ও সংবিধান প্রণয়ন করতে না দিয়ে জনরায়ের প্রতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রমুখের অসম্মান প্রদর্শনের ঘটনাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তাৎক্ষণিক পটভূমি তৈরি করে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল পাকিস্তানি বিশেষ করে বাঙালি জাতির কাছে একটি বহুল আকাঙ্ক্ষিত নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পর পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ের পর ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে জনতার সামনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নবনির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জাতীয় পরিষদের ১৫১ জন ও প্রাদেশিক পরিষদের ২৬৭ জন সদস্যসহ মোট ৪১৮ জন শপথ গ্রহণ করেন। ঘূর্ণিঝড়

বিধ্বস্ত এলাকায় তখনও নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় সে সব আসনের প্রতিনিধি এখানে ছিলেন না।[২] এ শপথ অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক নারী অংশ নিয়েছিলেন। জানা যায় যে, আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাসযোগে নারীদের সমাবেশে উপস্থিত করা হয়েছিল।[৩] শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং জাতির উদ্দেশ্যে এক দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণ দিয়েছিলেন।[৪] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ ভাষণের মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং ১২ ও ১৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দু' দফা বৈঠক করেন। ১৪ জানুয়ারি ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে 'শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন' বলে উল্লেখ করেন।[৫] প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পর পিপিপি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোও ঢাকায় আসেন এবং ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন। কিন্তু পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সাথে তাঁর মতানৈক্য দেখা দেয়। এরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই ১৩ ফেব্রুয়ারি এক সরকারি ঘোষণা জানানো হয় যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকাস্থ প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে ৩ মার্চ বুধবার সকাল নয়টায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন।[৬] ঢাকার রাজনৈতিক মহল প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণাকে অভিনন্দিত করলেও ভুট্টো এ বিষয় কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো জানান, ছয় দফার ব্যাপারে আপস রফা বা পুনর্বিন্যাসের আশ্বাস পাওয়া না গেলে তাঁর দল আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে না। এরপর ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডিতে ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠক করেন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশনে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার তাঁর কোন ইচ্ছা নেই। ভুট্টোর সাথে আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেন। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান এক বেতার ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চ ঢাকায় আহূত জাতীয় অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

ইয়াহিয়া খানের এ ঘোষণাটি ছিল বাঙালিদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। তাই এ ঘোষণার সাথে সাথে ঢাকায় মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং তারা রাস্তায় বেরিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। ঢাকা একটি বিক্ষুব্ধ

---

২. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাবমহল, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫৪১

৩. *সংবাদ*, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১

৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১

৫. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭১

৬. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ.৯৯

মিছিল নগরীতে পরিণত হয়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত, কলকারখানা, দোকান-পাট, যানবাহন সব বন্ধ হয়ে যায়। রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্লাব, ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণ রাস্তায় নেমে আসে। চারদিক থেকে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল সহকারে হোটেল পূর্বাণীর সামনে এসে জড়ো হয়। পূর্বাণী হোটেলে তখন আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির সভা চলছিল। বঙ্গবন্ধু জনগণকে ধৈর্য ধারণ করে পরিস্থিতি মোকাবিলার আহ্বান জানান কিন্তু জনতা অবিলম্বে স্বাধীনতার ঘোষণা দাবি করেন। ঐদিন বিকেলে পল্টন ময়দানের এক জনসভায় তোফায়েল আহমদ, আব্দুল মান্নান, সিরাজুল আলম খান, আ. স. ম আব্দুর রব ও নুরে আলম প্রমুখ ছাত্র ও শ্রমিক নেতাগণ বক্তৃতা করেন। হোটেল পূর্বাণীতে সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ২ মার্চ ঢাকা শহর ও ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন।[৭] এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সরকারি কর্মচারীসহ প্রত্যেক বাঙালিকে গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা না করা এবং সর্বশক্তি দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়ার আহ্বান জানান।[৮] বস্তুত এসব কর্মসূচির মাধ্যমেই অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বের সূচনা হয়।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার নিন্দা জানিয়ে মুসলিম ছাত্রী সংঘের সভানেত্রী শওকত আরা ও সাধারণ সম্পাদিকা শাহানা এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানান।[৯] ঐ দিনই ওয়ালী ন্যাপের নেত্রী ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভানেত্রী মতিয়া চৌধুরী গুলিস্তানে এক পথসভায় বলেন, "আজ আর কোনো এক দল নয়, কোনো মত নয়, নেই কোনো ভেদাভেদ। শেখ সাহেব আপনার কাছে আমাদের আবেদন, আপনি সিদ্ধান্ত নিন। বাংলার প্রতিটি মানুষ আপনার সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আপনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে।" তিনি আরো বলেন, "আজ আর ন্যাপ নেই, আওয়ামী লীগ নেই, সবাই কাধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করতে হবে এখন থেকে পাড়ায় পাড়ায় জঙ্গি ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে, বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেই করবে।"[১০] ২ মার্চ (১৯৭১) ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঐদিন হরতাল কর্মসূচি পালনকালে জনতার ওপর সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণ ও বেয়নেট চার্জে অন্তত ৯ ব্যক্তি হতাহত হয়। ঐদিন জাতীয় লীগের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে ও ন্যাপের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে দুটি প্রতিবাদ সভা হয়। ন্যাপের সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তৃতা করেন ন্যাপ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী। মতিয়া চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায়

---

৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ মার্চ, ১৯৭১ ; *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ মার্চ, ১৯৭১

৮. পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত *শ্বেতপত্র*, ৫, আগস্ট, ১৯৭১, পৃ. ১১

৯. আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি: মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৮৫; মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪১

১০. আতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০

পাড়ায় মহল্লায় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে ঐ কমিটির মাধ্যমে সঠিকভাবে ও শৃঙ্খলার সঙ্গে আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার এবং সেভাবে জনগণকে প্রতিজ্ঞা, ধৈর্য ও প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হবার আহ্বান জানান।[১১] ২ মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় ছাত্র-জনতার বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। এ সভাতেই ডাকসু সভাপতি আ স ম আদুর রবের নেতৃত্বে ছাত্র নেতৃবৃন্দ কলাভবনে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। শিল্পী শিবনারায়ণ দাস পতাকাটির পরিকল্পনা ও ডিজাইন করেছিলেন।[১২] কাপড় কেটে এ পতাকাটি তৈরি করে দিয়েছিলেন আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত আহমদ ফজলুল রহমানের সহধর্মিনী হাসিনা রহমান।[১৩] বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সভায় অনেক ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে আয়েশা খানম, রাখী দাস পুরকায়স্থ, বেগম শামছুন্নাহার, নাসিমুন আরা হক মিনু, বেগম শামছুন্নাহার ইকো প্রমুখ অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিলেন।[১৪]

২ মার্চের হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে হতাহতের ঘটনায় ঐদিন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নিন্দা জানান এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬:০০ টা থেকে বেলা ২:০০ টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল কর্মসূচি দেওয়া হয়। ৭ মার্চ অপরাহ্নে রেসকোর্স ময়দানে জনসভা আহ্বান করা হয়। ৩ মার্চ সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন বিকেলে ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সভায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করা হয় (ইশতেহার নং-এক)। এতে তিনটি লক্ষ্য অর্জন করার জন্য স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করা হবে উল্লেখ করা হয়।[১৫] প্রস্তাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা নির্দেশ করা হয়। উক্ত ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা এবং "স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ- দীর্ঘজীবী হউক; স্বাধীন কর স্বাধীন কর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর; স্বাধীন বাংলার মহান নেতা- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব; গ্রামে গ্রামে দুর্গ কর- মুক্তিবাহিনী গঠন কর; বীর বাঙালি অস্ত্র ধর- বাংলাদেশ

---

১১. সুকুমার বিশ্বাস, *অসহযোগ আন্দোলন '৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৯-৬০

১২. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *মুক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধিজীবী*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১২

১৩. মোনায়েম সরকার, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২০৭

১৪. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৯ ও ২৬৫

১৫. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব, ইশতেহার এবং এতে উল্লেখিত লক্ষ্যসমুহ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা ১৯৮২, পৃ. ৬৬১-৬৬২ এবং ৬৬৬-৬৬৮

স্বাধীন কর; মুক্তি যদি পেতে চাও- বাঙালিরা এক হও।"- এ শ্লোগান উচ্চারণের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[১৬]

৩ মার্চ হরতালে চট্টগ্রামের পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। সেখানে বাঙালি অবাঙালিদের মধ্যে হামলা ও সংঘর্ষে একদিনে প্রায় ৪০০ লোক হতাহত হয়।[১৭] এ দিন যশোরে সারা দেশের মতো হরতাল পালিত হয়। এ বিক্ষোভ ও হরতাল কর্মসূচিতে অংশ নেন মমতাজ বেগম ও ফিরোজা খানম। মমতাজ বেগমসহ ছাত্রলীগের অপরাপর কর্মীরা যশোরের কালেক্টরেট ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের শপথ নেন। এ শপথ অনুষ্ঠানেও ফিরোজা খানম অংশ নেন। শপথ অনুষ্ঠান শেষে ফিরোজা খানম, মমতাজ বেগমসহ উপস্থিত ছাত্র নেতৃবৃন্দ গণমিছিল বের করেন। এ গণমিছিল টেলিফোন ভবনের কাছে আসতেই সামরিক বাহিনী গুলি করে এতে গৃহিণী চারুবালা কর নিহত এবং সুলতান মাহমুদ লাবলুসহ অনেকে আহত হন। এতে মিছিলটি আরো জঙ্গি রূপ ধারণ করে এবং মিছিল শেষে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। পরের দিন যে মিছিলটি বের হয়েছিল এতেও ফিরোজা খানম অংশ নিয়েছিলেন।[১৮] ৪ মার্চ ঢাকাসহ প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঐ দিনই সকাল ১০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়াম মাঠে এক ছাত্রী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও নারীদের করণীয় বিষয়ে মুনিরা আক্তার ও কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা বক্তব্য রাখেন। তারা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেন প্রয়োজনে অস্ত্রের বিরুদ্ধে নারীরাও অস্ত্র হাতে নিবে।[১৯] এ দিন শহীদ মিনারে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) আয়োজিত জনসভায় মতিয়া চৌধুরী বাংলার স্বাধিকারের সংগ্রামকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গঞ্জে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের জনগণকে আহ্বান জানান।[২০] টঙ্গীতে নিরস্ত্র শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ ও হত্যার তীব্র প্রতিবাদ করে মতিয়া চৌধুরী বলেন: "এক ফোঁটা রক্ত হবে জন্ম নিবে সংগ্রামের নতুন শপথ। জনতা আর বুলেটের ভয় পায় না।" তিনি আরো বলেন, "প্রেসিডেন্ট আজ কি ঘোষণা দেবেন জানি না, আমি জানতেও চাই না। আপনারা গণতন্ত্রের দরজা বন্ধ করেছেন, আপনারাই খুলবেন। আজ শুধু ছয় দফা, ১১ দফা দিলেই চলবে না। বাঙালিসহ প্রত্যেক জাতির স্বাধীন হবার অধিকারের কথা পরিষ্কারভাবে স্বীকার করতে হবে। আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার হতে চাই না।" তিনি বলেন, "আর এক জাতিতত্ত্বের নামে শোষণ নিপীড়ন নয় বাঙালিসহ প্রত্যেকটি বাংলা ভাষাভাষী জাতির জাতিসত্তা স্বীকার করতেই হবে।"[২১] উল্লেখ্য যে, শুধু এদিনই নয়, মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিদিনকার কর্মসূচিতে মতিয়া চৌধুরী সক্রিয়ভাবে অংশ

---

১৬. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৮

১৭. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ মার্চ, ১৯৭১

১৮. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *২য় খণ্ড*, পৃ. ২৪৬ ও ২৮০

১৯. সাক্ষাৎকার কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা, তারিখ ২১.০৬.২০১৯; আতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

২০. দৈনিক *সংবাদ*, ৭ মার্চ, ১৯৭১

২১. দ্রষ্টব্য শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৫১

নিয়েছিলেন।[২২] ৮ মার্চ বেতার টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের ২০ জন বিশিষ্ট শিল্পী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলবে এবং ছাত্র সমাজের সংগ্রাম অব্যহত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তারা বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না। উক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী নারী শিল্পীগণ ছিলেন, লায়লা আরজুমান্দ বানু, আফসারী খানম, ফেরদৌসী রহমান, রাহিজা খানম, বিলকিস নাসিরুদ্দিন, হাদিদা আতিক প্রমুখ।[২৩]

১৯৭১ সালের ৫ মার্চ শিল্পাঞ্চলে সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ডাকসু সহ-সভাপতি আ.স.ম আব্দুর রব এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুছ মাখন প্রমুখের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের যে লাঠি মিছিল বের হয়েছিল এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্রী অংশ নিয়েছিলেন।[২৪] ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হয়ে ঢাকার লেখক ও শিল্পীবৃন্দ জনতার সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করেন। একই দিনে পূর্ব পাকিস্তান সরকারি কলেজ শিক্ষিক সমিতি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং জনাব কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে এক সভায় পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির নাম পরিবর্তন করে "বাংলা শিক্ষক সমিতি" রাখা হয়। সভা শেষে শিক্ষক শিক্ষিকাদের মিছিল পরবর্তী সমাবেশে অন্যান্যদের সাথে বক্তৃতা করেন বাংলা শিক্ষক সমিতির সম্পাদক হেনা দাস।[২৫] নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির (আপওয়া, পূর্বাঞ্চল শাখা) পক্ষ থেকে সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র মানুষ হত্যার তীব্র নিন্দা জানানো হয় এবং কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়। বিবৃতিতে স্বাধিকার ও সম্মান রক্ষার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের নারীসমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[২৬]

পূর্ব পাকিস্তানে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের ঘোষণা দেন। ভাষণে তিনি পাকিস্তানের পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক সংহতির নিশ্চয়তা বিধানের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[২৭] এদিনই তিনি জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলার গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। কঠোর প্রকৃতির টিক্কা খানের এ নিয়োগ পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁকে শপথ পাঠ না করানোর জন্য প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করেছিলেন। ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের নতুন ঘোষণাকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাঁর এক নতুন ষড়যন্ত্র হিসেবেই বিবেচনায় নেয়। ফলে চলমান আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। ৬ মার্চ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে

---

২২. শাহানাজ পারভিনকে ৩ অক্টোবর ১৯৯৮ সালে প্রদত্ত মতিয়া চৌধুরীর সক্ষাৎকার, শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

২৩. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

২৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ মার্চ, ১৯৭১

২৫. আহমেদ ফারুক হাসান, *উত্তাল মার্চ* ১৯৭১ আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯; মুন্সী মুনজুরুল হক, '১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকা', *আই বি এস জার্নাল*, ষোড়শ সংখ্যা, ১৪১, পৃ. ১৫২

২৬. আতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

২৭. শ্যামলী ঘোষ, *আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৫১

আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার উদ্যোগে এক নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার আহবায়ক বদরুন্নেছা আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ২৫ মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে নারী সদস্যগণ যোগদান করবে না। এ সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে কবি বেগম সুফিয়া কামাল, ড. নীলিমা ইব্রাহিম ও জাতীয় পরিষদ সদস্য রাফিয়া আক্তার ডলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।[২৮] ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক সংহতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাধিকার আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন, নিরীহ ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার প্রতি গুলিবর্ষণ ও হত্যার নিন্দা এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বাধিকার আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সংগঠনের সহ-সভানেত্রী মিসেস সারা আলী, আহ্বায়ক মালেকা বেগম, অধ্যাপক সেলিনা, কণিকা ভট্টাচার্য এবং মনোয়ারা বিবি প্রমুখ এ সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তাগণ উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য শাসকগোষ্ঠীকেই দায়ী করেন। একই সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।[২৯]

৬ মার্চ কণ্ঠশিল্পী লায়লা আরজুমান্দ বানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বেতার, টিভি এবং চলচ্চিত্র শিল্পীদের এক প্রতিবাদ সমাবেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করা হয়। স্বাধিকার আন্দোলনের মূল কথাকে গানের সুরে জনতার মুখে তুলে দেওয়ার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত হয়। শিল্পী খান আতাউর রহমান পাড়ায় পাড়ায় গণসংগীত শিল্পী দল গঠন করে পথে পথে জাগরণের গান গাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন।[৩০] তাছাড়া এ দিন পূর্ব বাংলার ৩৩ জন চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও সংগীত পরিচালক এক যুক্ত বিবৃতিতে বাংলার ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত গণসংগ্রামে সম্পৃক্ত থাকার অঙ্গীকার করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল জব্বার, খান আতাউর রহমান, রোজী চৌধুরী, শবনম, রোজী সামাদ, কবরী সারওয়ার, সুজাতা, সুচন্দা ও সুলতানা জামান প্রমুখ।[৩১]

৯.২: বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, অসহযোগ আন্দোলন ও নারীসমাজ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের গণরায়কে অস্বীকার এবং বঙ্গবন্ধুকে সরকার গঠন করতে না দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা মূলত পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে স্বাধীনতার সংগ্রামের পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য করেন। এ স্বাধীনতার দিক-নির্দেশনা আসে ৭ মার্চ ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ভাষণ

---

২৮. *দৈনিক সংবাদ*, ৭ মার্চ, ১৯৭১
২৯. *দৈনিক সংবাদ*, ৭ মার্চ, ১৯৭১
৩০. নাজিমুদ্দিন মানিক, ৭১ *অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি*, ওয়ারি বুক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৪৩
৩১. আতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৫

থেকে।[৩২] বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটিকে বলা হয় এক অমর কবিতা। বঙ্গবন্ধু তাঁর এই ভাষণে গণতন্ত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাধিকার, মানবতা এবং নিপীড়িত সব মানুষের কথা বলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিকদের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন এ অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি জানান। পাকিস্তানি শাসক চক্রের অত্যাচার ও সামরিক আগ্রাসন মোকাবিলার জন্য তিনি বাঙালিদের আহ্বান জানান এবং দাবি আদায় না-হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে সার্বিক হরতাল চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর এই ভাষণে সেদিন সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও তিনি বলেছিলেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তিনি শত্রু সেনা মোকাবিলা করার জন্য ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে, মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব,তবু এদেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।"

সেদিন রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক যোগ দিয়েছিল। বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মতো জনতার মিছিলে শ্লোগান ছিল 'জয় বাংলা', বীর বাঙালি অস্ত্র ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর', ঘরে ঘরে দূর্গ গড়, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা- শেখ মুজিব, শেখ মুজিব', পিন্ডি না ঢাকা- ঢাকা ঢাকা।[৩৩] সরকারের সকল বাঁধা উপেক্ষা করে গ্রাম-বন্দর অলি গলি থেকে লাখো মানুষ ছুটে এসেছিল রেসকোর্স ময়দানে। এদের মধ্যে ছিল নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ। এদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক নারীও ছিলেন। এই সভায় অসংখ্য নারী এসেছিলেন বাঁশের লাঠি নিয়ে। নারীদের মধ্যে গৃহবধু, পেশাজীবী এবং ছাত্রী সবই ছিলেন।[৩৪] রেসকোর্সে ঐতিহাসিক জনসমুদ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের কয়েকশ ছাত্রী উপস্থিত ছিল বলে আভা মণ্ডল উল্লেখ করেন। তিনি নিজেও মিছিল যোগে জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন। মিছিল সহকারে গিয়ে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনেন ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপিকা মমতাজ বেগম। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি ছাত্র নেতাদের সাথে হলে ও পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে নারীদের

---

৩২. বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটির ব্যাপ্তিকাল ছিল মাত্র ১৮ মিনিট। বিকেল ২টা ৪৫ মিনিটে শুরু করে বিকেল ৩টা ৩ মিনিটে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণটি শেষ করেন। বাঙালির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের দিকনির্দেশনাই ছিল সে সময় বজ্রকঠিন জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্র|কালজয়ী এই ভাষণ বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত ও মুক্তিকামী মানুষকে সব সময় প্রেরণা যুগিয়ে চলছে। প্রখ্যাত লেখক ও ইতিহাসবিদ জ্যাকব এফ ফিল্ড-এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা *We Shall Fight on the Beaches: The Speech That Inspired History* গ্রন্থে এই ভাষণ স্থান পেয়েছে | এ যাবৎ অন্তত ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ অনূদিত হয়েছে| ২০১৭ সালের ৩০ শে অক্টোবরে ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে Documentary Heritage (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর এ কালজয়ী ঐতিহাসিক ভাষণটির পূর্ণরূপ দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ.৭০০-৭০২

৩৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ মার্চ, ১৯৭১

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *৭১-এর দশ মাস*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৮ ; রশীদ হায়দার, *অসহযোগ আন্দোলন: একাত্তর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২৪৫ ও ১৯৫

সংগঠিত করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ট্রেনিং- এর ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।[৩৫] উম্মে হানী খানম রেসকোর্সের জনসভায় নারীদের মিছিল নিয়ে যোগদান করেছিলেন। এই জনসভায় নারী স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ফোরকান বেগম।[৩৬] ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত ছিলেন ডাকসুর প্রাক্তন সহ-সভানেত্রী (১৯৬৬-৬৭) মাহফুজা খানম। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে যে দিক নির্দেশনা পান তাই বুকে ধারণ করে বিভিন্ন কর্মপন্থা স্থির করে পাড়ায় পাড়ায় ছেলেদের নিয়ে সভা করে এবং প্রতিদিন মিছিল মিটিং অংশগ্রহণ করে আন্দোলনকে বেগবান করেন।[৩৭] এই রকম নাম না জানা আরো অনেক নারী ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী ৮ মার্চ সারা প্রদেশে কালো পতাকা উত্তোলন ও ৯ মার্চের হরতাল পালন করা হয়। ৯ মার্চ মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দেন।[৩৮] এদিকে ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে ভাষণে পর থেকে নারীদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। তারাও আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেন। এই সময় আওয়ামী লীগ নেত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে তাঁর ইন্দিরা রোডের বাসভবনে নারীদের রাইফেল ট্রেনিং এবং সেই সাথে বিভিন্ন এলাকায় নারীদের ফার্স্ট এইড ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেন।[৩৯] কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদসহ অন্যান্য নারী সংগঠনগুলো মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ শুরু করে। ৯ মার্চ চট্টগ্রামে জে এম সেন হলে মহিলা আওয়ামী লীগের এক সভা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মেহেরুন্নেসা, বেগম সরাফত উল্লাহ, বেগম নাজনীন, বেগম কামরুন্নাহার, বেগম মুছা খান ও কুন্দপ্রভা সেন প্রমুখ। ১১ মার্চ চট্টগ্রামে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বিরাট মিছিল হয় এবং বিকেলে জে এম সেন হলে সভা হয় এতে বক্তব্য রাখেন ডা. নুরুন্নাহার জহুর, মিসেস সেলিনা রহমান, রিজিয়া সুলতানা, গুলশানা আরা, জাহানারা আঙ্গুর, সাবেরা শবনম, উম্মে সালমা, মর্জিয়া ইসলাম ও খালেদা খানম প্রমুখ। তাছাড়া এ পরিষদের উদ্যোগে ১২ মার্চ শহরে নারীরা লাঠি মিছিল বের করে।[৪০]

১৪ মার্চ বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে লেখক সংগ্রাম শিবিরের এক সভা হয়। এতে খোন্দকার ইলিয়াস, দাদা ভাই রোকনুজ্জামান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহান উদ্দিন খান

৩৫. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫ ও ১৯৫
৩৬. ফোরকান বেগম, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, সুমি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩০০
৩৭. সাক্ষাৎকার মাহফুজা খানম, তারিখ ২২.০৩.২০১৮
৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মার্চ, ১৯৭১
৩৯. মফিদা বেগম, *আওয়ামী লীগ রাজনীতি নারী-নেতৃত্ব (১৯৪৯-২০০৯)*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ.১৩১
৪০. মাহফুজুর রহমান, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রামঃ মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩, পৃ. ২৩১-৩২ ও ৩০৮

জাহাঙ্গীর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও লায়লা সামাদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।[৪১] এদিনই খুলনার হাদিস পার্কে মহিলা আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের উদ্যোগে এক সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় তারা দৃঢ় প্রত্যয়ে শপথ নেন যে, খুলনার মানুষের বুকে আর একটি গুলি চললে মা বোনেরা রান্নাঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়বে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের নারীসমাজের প্রতি সভা থেকে আহ্বান জানানো হয়।[৪২]

১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে দেশ পরিচালনার জন্য ৩৫ দফা বিধিনামা জারি করেন। জনসাধারণ ও সরকারি কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর নির্দেশনা পালন করতে থাকে।[৪৩] ১৫ মার্চ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মালেকা বেগম, ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না ও আয়েশা খানম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। মালেকা বেগম তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য দল মত নির্বিশেষে নারী পুরুষ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।"[৪৪] ঐদিন ঢাকা মেডিকেলের চিকিৎসকবৃন্দ এক সভা থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং নিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে জনসাধারণকে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করার জন্য সকল চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় অন্যান্যদের সাথে বক্তব্য রেখেছিলেন ডা. নাজমুন নাহার। তাছাড়া একই দিন টেলিভিশনের নাট্যশিল্পীরা আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে এক সভায় বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে গণআন্দোলনের পরিপন্থি কোনো অনুষ্ঠান টেলিভিশনে প্রচার না করার ঘোষণা দেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন নাট্যশিল্পী আলেয়া ফেরদৌসী ও অভিনেত্রী রওশন জামিল প্রমুখ।[৪৫] ১৫ মার্চ মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ফরিদা রহমানের সভাপতিত্বে ঢাকার শংকরে এক নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে শহীদ সন্তানের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বাংলার মায়েরা আজ কঠোর শপথ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। চূড়ান্ত লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত এ সংগ্রাম থামবে না। বেগম সাজেদা চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালিরা আজ ঐক্যবদ্ধ, তারা যে কোনো ত্যাগের মাধ্যমে তাদের স্বাধিকার অর্জন করবেই। বেগম ফরিদা রহমান বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনকে পরিপূর্ণভাবে সফল করতে মা বোনদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।[৪৬] খুলনার ছাত্রনেত্রী হাসিনা বানু শিরিন ১৫ মার্চ এক বিবৃতি প্রদান করেন।

---

৪১. রাবেয়া খাতুন, *একাত্তরের নয় মাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৫-৬
৪২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ মার্চ, ১৯৭১
৪৩. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *ছয় দফা থেকে বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭, ২৯৮, ৩০২
৪৪. আতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮
৪৫. *ঐ*, পৃ. ৬৮
৪৬. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৯ মার্চ, ১৯৭১

এতে স্বাধিকার অর্জনের জন্য বাংলাদেশের নারীগণ পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে যাবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[৪৭]

সংকট নিরসনে আলোচনার জন্য ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ভবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা শুরু হয়। সমগ্র বাংলাদেশ তথা বিশ্বের দৃষ্টি এ আলোচনার দিকে থাকলেও চলমান অসহযোগ আন্দোলন থেমে যায়নি। বিক্ষোভ মিছিল, সভা-সমাবেশ অব্যাহত থাকে। ১৬ মার্চ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংস্কৃত কর্মীরা এক সমাবেশ একত্রিত হয়। এ সমাবেশের অগ্রভাগে কয়েকজন বিশিষ্ট নারী উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের লেখক শিবিরের পক্ষে লায়লা সামাদ, কাজী রোজী ও রাবেয়া খাতুন প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল, কবি মেহেরুন্নেসা এবং লেখিকা সুফিয়া খাতুন প্রমুখ।[৪৮] ১৭ মার্চ মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদিকা সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে পল্টন ময়দানে কুচকাওয়াজ শেষে নারীসমাজ এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে।[৪৯] ১৮ মার্চ ঢাকা নার্সিং স্কুলের ছাত্র সংসদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংসদের সভানেত্রী বেগম শাহজাদী হারুনের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভা জাতীয় সংকটকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। সভায় ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্সিং সমিতির সভানেত্রী বেগম হোসনে আরা রশীদ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের খায়রুল আলম খান, রিজিয়া তরফদার, সুশীলা মহল দাস, মায়া বেগম, কণিকা ভট্টাচার্য প্রমুখ বক্তৃতা করেন।[৫০] শুধু ঢাকায় নয়, ঢাকার বাইরেও অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত ছিল এবং এসব কর্মসূচিতে নারীসমাজের অংশগ্রহণ ছিল। ১৮ মার্চ নোয়াখালীর মাইজদী টাউন হলে নারীদের একটি সমাবেশ হয়। সমাবেশে অংশ নেওয়া নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং চলমান সংকটে নারীদের করণীয় নির্দেশ করেন। সভা থেকে আরজুমান্দ বানুকে আহ্বায়ক করে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।[৫১] ঐ একই দিন চট্টগ্রামে জে এম সেন হলে মহিলা পরিষদ ও মহিলা আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে এক সভা হয়। উমরতুল ফজল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভার প্রধান অতিথি ছিলেন মালেকা বেগম। সভায় বক্তব্য রাখেন হান্নানা বেগম, সীমা চক্রবর্তী, দিল আফরোজ খানম, জাহানারা

---

৪৭. আতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
৪৮. রাবেয়া খাতুন , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬
৪৯. নাজিমুদ্দিন মানিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
৫০. আতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩
৫১. *ঐ*, পৃ. ১৪৪

আঙ্গুর, আরতি দত্ত, ননী রক্ষিত, নুরুন্নাহার জহুর, রমা দত্ত, কুন্দ প্রভা সেন ও বেগম মুশতারী শফী প্রমুখ। বক্তৃতা শেষে তারা স্বাধীনতার দাবির পক্ষে একটি মিছিল বের করেন।[৫২]

১৯ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়া খানের তৃতীয় দফা বৈঠক ছিল। এদিন ঢাকার জয়দেবপুর এবং গাজীপুরের ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সাথে বাঙালি সৈনিক ও জনসাধারণের সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটে। বঙ্গবন্ধু এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে বলেন, "তারা যদি মনে করে থাকেন যে, বুলেট ও শক্তির বলে জনগণের সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখা যায়, তাহলে তারা আহম্মকের স্বর্গে বাস করছে --- জনগণ যখন রক্ত দিতে তৈরি হয়, তখন তাদের দমন করতে পারে এমন শক্তি দুনিয়াতে নেই।" এ দিন ধানমন্ডি, গুলশান, হাজারিবাগ, আজিমপুর, সেন্ট্রাল রোড, নয়া পল্টন, জিগাতলা, রাজারবাগ ও পলাশীতে মহিলা পরিষদের উদ্যোগে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতির ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করা হয়।[৫৩] ২০ মার্চ ধানমন্ডিতে স্থানীয় নারীদের নিয়ে একটি সভায় অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং এ এলাকার নারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও কুচকাওয়াজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৫৪] এদিনই ঢাকার বাইরে রাজশাহীর *সাপ্তাহিক সোনার দেশ* পত্রিকা অফিসের অডিটোরিয়ামে এক মহিলা সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের সভানেত্রী মিসেস জাহানারা কামরুজ্জামান তাঁর ভাষণে বলেন, "যখন আমাদের পুত্র কন্যারা বুলেটের আঘাতে শাহাদাৎ বরণ করছে আমরা মা বোনেরা গৃহের চার দেয়ালে অকর্মণ্য বসে থাকতে পারি না।" সভায় বক্তারা স্বাধিকার আন্দোলনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য নারীসমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। সভা শেষে শহরে এক শোভাযাত্রা বের করা হয়।[৫৫]

২১ মার্চ আওয়ামী লীগের আজিমপুর মহিলা শাখার সভানেত্রী আনোয়ারা হকের উদ্যোগে বেগম সাজেদা চৌধুরীর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত সভা থেকে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য নারীদের অনুরোধ জানানো হয়।[৫৬] ২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে জেএম সেন হলের মাঠে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা করেন মহিলা পরিষদের সভানেত্রী কবি সুফিয়া কামাল ও সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম। বেগম সুফিয়া কামাল তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "বর্তমান সংগ্রামে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য মহিলাদেরকেও প্রস্তুত থাকতে হবে।--- লক্ষ্য অর্জনের জন্য সভা, শোভাযাত্রা করাই যথেষ্ট নহে। তজ্জন্য সাহস, মানসিক প্রস্তুতি এবং প্রেরণা থাকা প্রয়োজন। তিনি নারী জাতিকে চির অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে বৃহত্তম সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে

---

৫২. মাহফুজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২
৫৩. *সংবাদ*, ২৩ মার্চ, ১৯৭১
৫৪. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২১ মার্চ, ১৯৭১
৫৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মার্চ, ১৯৭১
৫৬. *সংবাদ*, ২৩ মার্চ, ১৯৭১

পড়ার এবং ট্রেনিং গ্রহণের আহ্বান জানান।"[৫৭] এ সভায় মালেকা বেগম বলেন, "এখন বাংলাদেশের জনগনের অধিকার, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারীসমাজকে জঙ্গি ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।" সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, হান্নানা বেগম, কুন্দু প্রভা সেন, সীমা চক্রবর্তী, মুশতারী শফী ও শিরীন শরাফতুল্লাহ প্রমুখ।[৫৮]

'স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে প্রতি ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানায়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ২৩ মার্চ সারাদেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ দিনের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল জয় বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পল্টন ময়দানে কুচকাওয়াজ শুরু হয় সকাল ৯-২০ মিনিট। এ অনুষ্ঠানে দশ প্লাটুন জয়বাংলা বাহিনীর এক প্লাটুন ছিল ছাত্রী ও নারী। এদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ছাত্রীরাও ছিলেন। ড্যামি রাইফেল হাতে নিয়ে এরা কুচকাওয়াজে অংশ নেন।[৫৯] উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা নুরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ.স.ম আব্দুর রব এবং আব্দুস কুদ্দুস মাখন কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন। কুচকাওয়াজের অগ্রভাগে ছিলেন পতাকা হাতে শামসুন্নাহার ইকো, ক্রমানুসারে ফোরকান বেগম, ফরিদা খানম সাকী, মমতাজ শেফালী, রাশেদা কাওসার, মিনারা বেগম ঝুনু, রুবী, শিরিন আখতার রোজী, নাজমা শাহীন বেবী, রাবেয়া, রাশেদা আমীনসহ অনেক ছাত্রী ও নারী।[৬০] পল্টনের কুচকাওয়াজ শেষে একটি মিছিল বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যায় এবং তাঁর হাতে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেয়। সে মিছিলে অন্যান্যদের সাথে ফোরকান বেগমও ছিলেন।[৬১]

ঢাকা বাইরে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে কিশোরগঞ্জ আর্ট কাউন্সিল হলে কিশোরগঞ্জ মহিলা আওয়ামী লীগের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মিসেস হাই হাবিবা ও নাসরিন খান প্রমুখ ৭ মার্চ সরকারকে দেওয়া শেখ মুজিবুর রহমানের ৪ দফা দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।[৬২] নবীগঞ্জ ইউনিয়ন আওয়ামী মহিলা লীগের সম্পাদিকা কানন বালা বিশ্বাসের আহ্বানে নারীদের এক বিক্ষোভ মিছিল হয়। এতে গ্রামের গৃহবধু থেকে শুরু করে ৯৫ বছর বয়স্ক গ্রামের নারীরা অংশ নেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক নারীর হাতেই বাঁশের লাঠি, ঝাড়ু, বটি, তলোয়ার ও বল্লাম ছিল। মিছিল শেষে কানন বালা বিশ্বাসের নেতৃত্বে আয়োজিত এক সভায় বাংলার স্বাধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।[৬৩]

---

৫৭. *সংবাদ*, ২৪ মার্চ, ১৯৭১; মাহফুজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩
৫৮. মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
৫৯. মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, পৃ. ৪৮
৬০. ফোরকান বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১
৬১. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৬
৬২. *সংবাদ*, ২৪ মার্চ, ১৯৭১
৬৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মার্চ, ১৯৭১

অসহযোগ আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে জাতীয় পরিষদ সদস্য রাফিয়া আক্তার ডলি নারী ও ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ, মিছিল মিটিং এর আয়োজন এবং পাড়ায় পাড়ায় নারী সংগঠন তৈরি করার কাজ করেন।[৬৪] অসহযোগ আন্দোলনে শুরু থেকেই সক্রিয় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বেবী মওদুদ। স্বাধীনতার পক্ষে জনমত তৈরি করার লক্ষ্যে ৯ জন বন্ধুকে নিয়ে *'রানার'* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বেগম সুফিয়া কামাল ও মালেকা বেগমের নেতৃত্বে মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় নারীদের আত্মরক্ষার জন্য ফার্স্ট এইড ও সাধারণ প্রশিক্ষণ দেবার কাজ করেন এবং সে সাথে অত্যন্ত গোপনে আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পোস্টার তৈরি করা, বাঁশ লাগানো, পোস্টার সাঁটানো, কাগজ পেন্সিল জোগার করার কাজ করেন।[৬৫] বরিশালের বেগম তাইবুন নাহার অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি স্বরূপ বেগম সাজেদা চৌধুরী ইন্দিরা বাসভবনে প্রায় দেড়শত মেয়েকে রাইফেল ট্রেনিং দেন। তিনি ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বাড়িতে গার্ড অব অনার প্রদান করেন।[৬৬]

১৬ মার্চ থেকে মুজিব-ইয়াহিয়া চলমান বৈঠকের এক পর্যায়ে পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৫ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিসহ ২১ মার্চ ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক ও ত্রি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত। বৈঠকের ঐক্যমত অনুসারে ২৫ মার্চের আহূত অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়।[৬৭] ২৪ মার্চ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর ঢাকার মিরপুরে পাকসেনা বাহিনীর মদদে অবাঙালিরা বাঙালি নিধন শুরু করে। সেনাবাহিনীর এ হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান সারা দেশে ২৭ মার্চ হরতাল আহ্বান করে। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা হয়েছিল সংকট নিরসনে সমঝোতা হবে। এ কারণেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ বলেন 'সুস্পষ্ট ঘোষণা' চাই। কিন্তু ইয়াহিয়া উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তাঁর লক্ষ্য ছিল আলোচনার নামে কালক্ষেপণ এবং সে সুযোগে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আর এ জন্যই আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে ঢাকা ত্যাগ করেন। এদিনই পাকিস্তান সেনাবাহিনী মধ্যরাতের পর অতর্কিতভাবে নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একইভাবে বর্বর এ বাহিনী ই.পি আর, পুলিশ ছাউনি ছাত্রাবাস, শ্রমিক কলোনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও বিভিন্ন বস্তিতে আক্রমণ চালায় এবং হাজার হাজার বাঙালি নর- নারীকে হত্যা করে। সংঘটিত হয় ইতিহাসের ভয়াবহ নৃশংস গণহত্যা।

২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁকে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়।

৬৪. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩
৬৫. তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, নিউ এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৪,
৬৬. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১০ জুন, ১৯৭৭
৬৭. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৭-'৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬৫

গ্রেপ্তারের পূর্বে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণা চট্টগ্রামের কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে ২৬ মার্চ প্রচার করেন এম. এ হান্নান এবং ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের বেতারের কালুর ঘাট ট্রান্সমিটার থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্বিতীয় অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।[৬৮] একজন বাঙালি মেজরের কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা বাঙালিকে তড়িৎস্পর্শে জাগিয়ে তুলেছিল।[৬৯] পাকিস্তানি হানাদারদের এ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে হতোদ্যম না হয়ে মুক্তিপাগল বাঙালি জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ।

৯.৩: মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য নারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে যখন নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মরণ-আঘাত শুরু হয় তখন তা প্রতিহত করার মতো প্রশিক্ষিত যোদ্ধা বাংলাদেশে ছিল না। বস্তুত রনাঙ্গণে শুধু দেশপ্রেম ও শারীরিক শক্তি হলে চলে না, প্রয়োজন হয় অস্ত্র এবং অস্ত্র পরিচালনা কৌশল। সীমিত সংখ্যক বাঙালি সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর পক্ষে পাকিস্তানি হানাদারদের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। তাই এ যুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন হয়। মার্চ মাসের প্রথম দিকেই পাকিস্তানিদের আচরণ একটি আসন্ন ও অনিবার্য যুদ্ধের ব্যাপারে বাঙালিরা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যায়। তাই এ যুদ্ধে পাকিস্তানিদের মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বেসামরিক লোকদের সংশ্লিষ্ট করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। আর এ লক্ষ্যে বেসামরিক লোকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।[৭০] ১৯৭১ সালের মার্চের শুরু থেকেই আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হতে থাকে। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও অনেক অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তরুণ প্রজন্মের নারী পুরুষ ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ পুরুষদের সাথে সাথে নারীরা ও প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। ১ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে চলে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে ছাত্রীদেরও ব্যাপক হারে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্রী প্রশিক্ষণ নেয় তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা, রোকেয়া কবীর, রোকেয়া খানম, মমতাজ শেফালী, আভা মণ্ডল, নাজমা শাহীন বেবী, ডা. মেহরোজ, ডা. নেলী চৌধুরী, নাজমুন আরা মিনু, তাজিন সুলতানা, নাজমিন সুলতানা, রতন হেলেন ও শামীমাসহ আরো অনেকে। প্রশিক্ষক ছিলেন পিয়ারু ও দুদু নামে সামরিক বাহিনীর দু'জন সদস্য।

---

৬৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, *৩য় খণ্ড*, পৃ. ১

৬৯. Rounaq Jahan, *op.cit*, p.198

৭০. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত) *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩১৫

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী মিয়া কাশেম।[৭১]

ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম মাঠে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের (বর্তমান জহুরুল হক হল) মাঠে ও কলাভবনের বারান্দায় বন্দুক দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অংশ নেওয়া নারীদের মধ্যে ছিলেন ফোরকান বেগম, ফরিদা খানম সাকী, মমতাজ বেগম, রাশেদা আমিন, হাসমত জাহান, রোজী বেবী, শামসুন্নাহার ইকো, মিনারা বেগম ঝুনু, রওশন আরা বেগম, বেগম শামসুন্নাহার, আফরোজা হক রীনা, বকুল মোস্তফা, নেলী চৌধুরী, রোকেয়া খাতুন রেখা, সালেহা বেগম, সালমা বেগম, সুরাইয়া ও রাফিয়া আক্তার ডলি প্রমুখ।[৭২] উল্লেখ্য যে, ফোরকান বেগম, ফরিদা বেগম সাকী, মমতাজ বেগম, রাশেদা আমিন, শামসুন্নাহার ইকো, রোজী বেবীসহ ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সুসাইড স্কোয়াড গঠন করেন। এর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মার্শাল মণি ও কাজী আরেফ আহমেদ।[৭৩] ছাত্র সংগঠন ছাড়া বিভিন্ন যুব ও নারী সংগঠন যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। পাড়ায় পাড়ায় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আজিমপুর স্কুলের মাঠে সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অনেক নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৭৪]

মহিলা পরিষদের উদ্যোগে সেগুনবাগিচায় নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সেখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে সালেহা আনোয়ার নারীদের গ্রীণ রোডে জাহানারা গার্ডেন আমতলার মাঠে প্যারেড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এতে অনেক নারী অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া জাহানারা আখতার আওয়ামী লীগ কর্মী আব্দুল মান্নানের বাড়ীতে নারীদের প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।[৭৫] সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর বাসা 'মরিচা হাউস' এর সামনে মিসেস টি.এন রশিদের (তাইরুন নাহার) পরিচালনায় প্রায় দু'শ নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ শেষে ২৩ মার্চ 'মরিচা হাউজ' থেকে মার্চ-পাস্ট করে একদল নারী ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে তাঁর হাতে মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকাটি তুলে দেন।[৭৬]

---

৭১. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ২১৩, ২১৭, ২৪৪, ২৬২, ২৬৫, এবং *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০, ২৩৪, ২৯৩

৭২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫, ২২৯, ২৫১, ২৫৬, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৬, ১৪৯, ২০২, ২২২

৭৩. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১

৭৪. *ঐ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬

৭৫. *ঐ* , ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯

৭৬. হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ৮ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫

ঢাকা বাইরে বরিশাল সদর গার্লস স্কুলে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে প্রশিক্ষণে অংশ নেন অঞ্জু গাঙ্গুলী। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি নিজেই অন্যদের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে বোমা তৈরি ও রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।[৭৭]

ঢাকা শহরে মোট ৫২টি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্রীরা ফার্স্ট এইড ট্রেনিংসহ সবাইকে সচেতন ও সংঘটিত করার দায়িত্বে ছিল। এর মধ্যে পলাশী ব্যারাকে নারীদের ট্রেনিং প্রদানের দায়িত্বে ছিলেন কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা।[৭৮] নারীদের ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রোকেয়া কবীর। উল্লেখ্য যে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পরিকল্পনা অনুসারে প্রশিক্ষণ ছাড়া ও তরুণসমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে ছাত্র ব্রিগেড তৈরি করা হয়েছিল। সকল ব্রিগেডের দায়িত্বে ছিলেন ডা. মিয়া আবুল কাশেম।[৭৯] ধানমন্ডি গার্লর্স স্কুল মাঠে নারীদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন তরু নামের একজন প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন হোসনে আরা ইসলাম বেবী, তাঁর কন্যা ডালিয়া নওশীন, নুরুন্নাহার ফয়জুননেসা ও তাঁর কন্যা সাদিয়া আফরীন মল্লিক। হোসনে আরা ইসলাম বেবী এবং নুরুন্নাহার ফয়জুননেসা নিজেরা শুধু প্রশিক্ষণ নেননি নীলক্ষেতের আশেপাশের অনেক মেয়েকে প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করতেন।[৮০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশিক্ষণরত রোকেয়া হলের ছাত্রীদের মধ্যে ২৫ মার্চ রাতে হলে কয়েকজন অবস্থান করছিলেন। এদের মধ্যে ৭ জন ছাত্রী হাউস টিউটরের বাসায় আশ্রয় নিয়ে পাকবাহিনীর হাত থেকে বেঁচে যান। এরা হলেন, মমতাজ বেগম, ফোরকান বেগম, রাশেদা খানম, শামসুন নাহার ইকো, মমতাজ শেফালী, রাবেয়া বেগম, সুলতানা ফেরদৌস আরা ডলি ও বেগম শামসুন্নাহার।[৮১]

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে নারীদের অংশগ্রহণ শুধু ঢাকাতে নয় ঢাকার বাইরেও ছিল। প্রসঙ্গত নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, সিলেট, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ইত্যাদির কথা উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গড়ে উঠে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ। এর বরিশাল শাখার নেতৃত্বে ছিলেন মনোরমা বসু। তাঁর সাথে ছিলেন পুষ্পনাগ, রানা ভট্টাচার্য, সুফিয়া ইসলাম, সাজেদা মতিন, কৃষ্ণাচন্দ, ইলাচন্দসহ আরো অনেকে। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ চট্টগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন উমরতুল ফজল। তাঁর সহযোগী ছিলেন মুশতারী শফী, নূরজাহান খান, হান্নানা বেগম, দিল আফরোজ দিলু, গীতা ঘোষ, চিত্রা বিশ্বাস, রমা দত্ত ও সীমা চক্রবর্তী প্রমুখ। সংগঠনটির

---

৭৭. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, *২য় খণ্ড*, পৃ. ১২৪
৭৮. সাক্ষাৎকার কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা তারিখ ২১.০৬.২০১৯; সেলিনা হোসেন, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫
৭৯. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ.১০৮
৮০. *ঐ*, পৃ. ১১০
৮১. হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ৮ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫

পাবনা শাখার নেতৃত্বে ছিলেন রকিবা খাতুন। ঈশ্বরদীতে মিসেস জসীম মণ্ডল, সিলেটে ঊষাদাশ পুরকায়স্থ, খোদেজা কিবরিয়া, ষোড়শী চক্রবর্তী, কুমিল্লায় সেলিনা বানু, ময়মনসিংহে সোফিয়া করিম, মজিরুন্নেসা, রাজিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, নুরুন্নাহার বেলী ও সুমিতা সাহা প্রমুখ। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ নারায়ণগঞ্জ শাখার নেতৃত্ব দেন হেনা দাস। তাঁর সাথে ছিলেন নাজমা রহমান, জোবেদা দীপা ও লক্ষ্মী চক্রবর্তী প্রমুখ। নরসিংদীতে যুথিকা চ্যাটার্জী, গৌরি সাহা ও ফওজিয়া পারভীন নিবেদিত হিসেবে কাজ করেন। সুফিয়া কামালের সাথে সে সময়ে বহু নারী নেত্রীরা বহু জেলায় ঝটিকা সফর করেন। প্রবীণ ও নবীন নারী ও ছাত্রীনেত্রীরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার ব্যাপক তৎপরতা জাগিয়েছেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বেগম বদরুন্নেছা, নূরজাহান মোর্শেদ, সাজেদা চৌধুরী, আইভি রহমান, মমতাজ বেগম, রাফিয়া আক্তার ডলি প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলাকালীন সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া ন্যাপনেত্রী মতিয়া চৌধুরী সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে অংশগ্রহণ করেন।[৮২]

সিরাজগঞ্জে গণআন্দোলনের শুরুতে স্থানীয় হৈমবালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, সভাপতি হন এলিজা নিরাজী, এবং সাধারণ সম্পাদক শামীমা পারভীন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের প্রস্তুতি গোপনে ট্রেনিং -এর ব্যবস্থা করেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বের হয়ে আসা কমান্ডার লুৎফুর রহমান। ছাত্রীরা এখানে রাইফেল চালানোসহ ফিল্ডে সেবামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।[৮৩] চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেত্রী জাহানারা আঙ্গুর নারীদের সশস্ত্রসংগ্রামে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য গোপনে ট্রেনিং -এর ব্যবস্থা করেন।[৮৪] তিনি ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী জাহানারা আক্তার জানু এবং ছাত্রলীগ কমী মনোয়ারা আক্তারসহ কলেজের বেশ কিছু ছাত্রীকে সংগঠিত করে প্রাক্তন পুলিশ সুপার দেলোয়ার হোসেনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় লালখান বাজারে পুলিশ লাইনের পিছনে পাহাড়ঘেরা জায়গায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।[৮৫] মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জাহানারা ও মনোয়ারা গ্রামে গিয়ে পাড়ার নারীদের সংগঠিত করে তাদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ (যেমন মরিচের গুঁড়া, গুলি মেরে আত্মরক্ষা, বোমা ছুঁড়ে মারা) দেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কলকাতার পদ্মপুকুর ও পার্ক সার্কাসের মধ্যবর্তী এলাকায় বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত একটি নারী মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। 'গোবরা ক্যাম্প' নামে পরিচিত এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি আওয়ামী লীগ নেত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী পরিচালনা করেন। এখানে ৩০০ তরুণী ও কিশোরীকে সিভিল ডিফেন্স, নার্সিং ও সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।[৮৬] আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দান অর্থাৎ ফার্স্ট এইড ট্রেনিং এবং দ্বিতীয় সশস্ত্র

---

৮২. মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৫

৮৩. *সাপ্তাহিক যমুনা বার্তা*, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

৮৪. বেগম মুশতারী শফি, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামে নারী*, প্রিয়ম প্রকাশনী, চট্টগাম, ১৯৯২, পৃ. ১৩৫

৮৫. *ঐ*, পৃ. ১০৫

৮৬. হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ৮ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭

যুদ্ধের ট্রেনিং- এ দু'পদ্ধতিতে এখানে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।[৮৭] ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ৩ জন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এখানে ট্রেনিং দিতেন। এ ক্যাম্পে সশস্ত্র ট্রেনিং নেওয়া নারীদের মধ্যে শিরিন বানু মিতিল (পাবনা), ইয়া কর, গীতা কর, মুক্তি (ফরিদপুর) সাজেদা তৈয়বা, শরীফী (যশোর) তৃপ্তি, মুক্তি (শৈলকুপা) লতা, রমা, ভক্তি, (যশোর) গীতা মজুমদার, বেলা, অনুপমা, (দিনাজপুর), জিন্নাতুননেছা তালুকদার, (রাজশাহী) প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।[৮৮] গোবরা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও উৎসাহিতকরণের জন্য রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন মীরা দে (লেডি ব্রেবোন কলেজের ভূগোলের শিক্ষক) এবং শিপ্রা সরকার ও মঞ্জু সরকার (উভয়েই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) প্রমুখ।[৮৯]

৯.৪: মুক্তিযুদ্ধের সুচনা

২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ ও নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের ওপর যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়, তা ছিল ইতিহাসের অন্যতম এক নারকীয় ঘটনা। অপ্রতিহতভাবে ৩৬ ঘণ্টা ধরে মানবেতর মহাতাণ্ডবলীলা চালানো হয়। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ১:৩০ টায় (২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর এ ঘোষণাটি চট্টগ্রাম অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হওয়ার পর স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতি আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। আর এভাবেই শুরু হয় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। তবে কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ, পূর্ব প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা না থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল অপরিকল্পিত, অবিন্যস্ত ও বিচ্ছিন্ন। এ অবিন্যস্ত মুক্তিযুদ্ধকে একটি সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার মধ্যে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শীর্ষস্থানীয় সামরিক অফিসারদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল ওসমানী, মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সালাহউদ্দিন, মোহাম্মদ রেজা, মেজর নূরুল ইসলাম, মেজর মঈনুল হাসান চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আঃ রব, পাক সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর কাজী নুরুজ্জামান প্রমুখ। উক্ত বৈঠকে কর্নেল ওসমানীকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[৯০]

গণহত্যার পর ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একত্রিত হয়ে ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন

---

৮৭. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

৮৮. শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৭৯

৮৯. শাহনাজ পারভিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৯০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *প্রাগুক্ত*, *নবম খণ্ড*, পৃ. ২৪৩-২৪৪

করেন। ইতিহাসে এই অস্থায়ী সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামেও পরিচিত। সরকার গঠন অনুষ্ঠানে জাতীয় পরিষদের নারী সদস্যদের মধ্যে শুধু মমতাজ বেগম উপস্থিত ছিলেন।[৯১] এছাড়া মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক এ অনুষ্ঠানে নাজিয়া ওসমান চৌধুরীও স্বামী লেফটেনেন্ট কর্নেল এম এ ওসমান চৌধুরীর সাথে উপস্থিত ছিলেন।[৯২] মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে দ্রুত দেশকে পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা, দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত তৈরি করা এবং মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করার লক্ষ্যে এ সরকার গঠন করা হয়। ১৩ এপ্রিল আগরতলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের এক সভায় স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন অনুমোদন করা হয় এবং ৬ সদস্যের মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ও তাদের দপ্তর ঘোষণা করা হয়। ১৭ এপ্রিল তদানিন্তন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় (বর্তমান মুজিবনগর) আনুষ্ঠানিকভাবে অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে। অস্থায়ী সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে সংগঠন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দেশে পরিকল্পিতভাবে মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ গঠন করা হয়। অস্থায়ী সরকারের সেনাপ্রধান জেনারেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেওয়া হয়।[৯৩]

অস্থায়ী সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে মুক্তিবাহিনী গঠন করেছিল, তা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল যথা- (ক) নিয়মিত বাহিনী ও (খ) অনিয়মিত বাহিনী। তৎকালীন ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস (ই.পি.আর), পুলিশ বাহিনী, আনসার এবং সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনাসদস্যদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছিল মুক্তিফৌজের নিয়মিত বাহিনী। নিয়মিত বাহিনী আবার দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা- (১) সেনা ব্যাটেলিয়ান এবং (২) সেক্টর ট্রুপস। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী হিসেবে সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীও গড়ে তোলে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র, যুবক, বিভিন্ন পেশাজীবী ও কৃষক শ্রমিক সাধারণ জনতার সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনী। এই বাহিনীর সরকারি নামকরণ করা হয়েছিল 'ফ্রিডম ফাইটার্স' (Freedom fighters) বা 'গণবাহিনী'। এই বাহিনীর সদস্যদের দু'সপ্তাহের প্রশিক্ষণ

---

৯১. সাক্ষাৎকার মমতাজ বেগম, ১৯.০৬.২০১৯; মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলার নারী*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৬২

৯২. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪০

৯৩. শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, বিজয় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭১

প্রদানের পর একজন কমান্ডারের অধীনে তাদের বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করা হতো। তারা প্রধানত গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতো বলে এরা 'গেরিলা বাহিনী' নামেও পরিচিত ছিল।

৯.৫: মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের বহুমাত্রিক ভূমিকা

বাংলাদেশের ১৯৭০ সালের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পরিকল্পনায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলেও সরকার কাঠামোতে কোনো নারী সাংসদ বা রাজনৈতিক নারী নেত্রীকে যুক্ত করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা কমিটিতেও নারীদের রাখা হয়নি, যদিও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে সকল কর্মকাণ্ডে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও দেশেপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক দলের নারীনেত্রীদের থেকে শুরু করে সর্বস্তরের নারী, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর এমনকি সাধারণ গৃহিণীরাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু'ভাবে মুক্তি সংগ্রামে সম্পৃক্ত হন। সরকারিভাবে সম্মুখ সমরে নারীদের অংশগ্রহণের নীতি না থাকলেও কেউ কেউ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। সশস্ত্রযুদ্ধ ছাড়াও নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান, যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ ও সরবরাহ, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না ও খাদ্য সরবরাহ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা দান, অর্থ, বস্ত্র, ঔষধ সংগ্রহ, বার্তা আদান-প্রদান, জনমত সংগঠন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাসহ বহুমাত্রিক দায়িত্ব পালন করেন। এ পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের এরূপ বহুমাত্রিক ভূমিকা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো:

৯.৫.ক: মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান এবং যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ ও সরবরাহ

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের (গেরিলা) দেশের অভ্যন্তরে আহার বিশ্রাম ও অতর্কিত শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আশ্রয়ের প্রযোজন হতো। গ্রামে-গঞ্জে নারীরা স্বপ্রণোদিত হয়ে এসব কাজ করেছেন। তাঁরা সম্ভাব্য বিপদের কথা উপেক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতেন, তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন। অনেক নারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র ও অন্যান্য রসদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছেন। তারা অতিযত্নে চালের ড্রামে, গমের পাত্রে, মুরগির খোঁয়াড়ে, রান্নাঘরে হাঁড়ি পাতিলের মধ্যে, মাটির তলায়, ম্যাট্রেসের নিচে, খাটের তলায় কাঠের সাথে বেঁধে ও বাথরুমে অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রসদ লুকিয়ে রেখে নির্দিষ্ট সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিতেন।

১৯৭১ সালের ২৯-৩০ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের মুখে জয় পাহাড়ে থাকা কয়েকজন ইপিআর সদস্য চট্টগ্রামের দিলারা ইসলাম ও ডা. মঈনুল ইসলাম দম্পতির ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়লে তারা তাদের আশ্রয় প্রদান করেন। তাদের অনুসরণ করে পাক সৈন্যরা তাদের ফ্ল্যাটে এলে দিলারা ইসলাম ও তার স্বামী ডা. মঈনুল

ইসলাম কৌশলে পাক সেনাদের সন্তুষ্ট করে বিদায় দেন এবং ইপিআর সদস্যদের জীবন রক্ষা করেন।[৯৪] চট্টগ্রামের পশ্চিম মাদার বাড়ির কবির তোরণ, কে.সি ৩, বাড়িটি ছিল মূলত একটি অস্ত্রাগার ও ট্রেনিং সেন্টার। চট্টগ্রামের এ বাড়িটি মুক্তিযোদ্ধাদের একটি প্রধান আশ্রয় কেন্দ্রও ছিল। মহিবুল্লাহ মাদবর, হাজেরা খাতুন ও গরীবুল্লাহর তত্ত্বাবধানে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা এখানে অবস্থান করে। ১৪ ডিসেম্বর পাকবাহিনী বাড়িটি ঘেরাও করে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাতাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তবে সৌভাগ্যবশত মুক্তিযোদ্ধারা যে ঘরটিতে থাকতো সেটা তারা আক্রমণ করেনি।[৯৫] নবাবগঞ্জ এলাকার স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় মরহুম চৌধুরী আশ্রাব আলী বেগের একমাত্র কন্যা ছিলেন বেগম গুল বাহার। তার বাড়িটিও মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অন্যতম আশ্রয় কেন্দ্র ও গোপন মন্ত্রণাগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[৯৬] চট্টগ্রামের চকবাজারের বাসিন্দা আয়েশা হায়দারের বাড়িটিও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল। এ বাড়িটি জিন্নাহ গ্রুপের প্রধান কার্যালয় ছিল। আয়েশা হায়দার এমন সুকৌশল ও গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন যে আশেপাশের লোকেরা পর্যন্ত কিছু টের পেতো না।[৯৭] চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে কাকলি নামে বাড়িটির মালিক ছিলেন আতিমা মাওলা। এ বাড়িটিও মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম আশ্রয় কেন্দ্র ছিল। এখানে আশ্রয়গ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি রান্না করেও খাওয়াতেন।[৯৮] চট্টগ্রামের পাথরঘাটার আবু তালেবের বাসাটিও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় কেন্দ্র ছিল। এ বাড়ির সব সদস্য তাদের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার-দাবারসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতেন। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গ বাজার বাপটিস্ট চার্চের এইচ আরা চৌধুরীর বাসা ও সুইপোড়া পাহাড়ে শাহজাহান ইসলামাবাদীর বাসাও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় কেন্দ্র ছিল। এসব বাসার নারী সদস্যগণ অত্যন্ত যত্নসহকারে মুক্তিযোদ্ধাদের তত্ত্বাবধান করতেন।[৯৯] চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা গরীবুল্লাহর মা হাজেরা খাতুন ও তাঁর ভাবী হাফিজা খাতুন পাকসেনাদের সামনে দিয়ে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে একটি লেদার সুটকেস ও দুটি মিষ্টির প্যাকেটে বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে জাম্বুরী পাওয়ার স্টেশনে কাছাকাছি একটি বাড়িতে পৌঁছে দেন। সেই অস্ত্র দিয়েই চট্টগ্রামের জাম্বুরী পাওয়ার স্টেশনে অপারেশন চালানো হয়।[১০০] এছাড়া আগ্রাবাদের রাবেয়া খাতুন পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা তার বাড়ি আক্রমণের সময়ে সন্তানের সঙ্গে বুকে চেপে কিছু বিস্ফোরক বহন করে নিয়ে যান।

প্রসঙ্গত ডা. মোহাম্মদ শফী এবং বেগম মুশতারী শফী দম্পতির কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ দম্পতির চট্টগ্রামস্থ 'মুশতারী লজ' ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অঘোষিত মিলনকেন্দ্র ও আশ্রয়স্থল। চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা

---

৯৪. বেগম মুশতারী শফী, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১১৯-১২১
৯৫. মাহফুজ রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩
৯৬. মীর মাহবুব আলী, *দুর্জয় ঘাঁটি*, লালন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৬-৩৭
৯৭. দৈনিক *জনকণ্ঠ*, ২৫ মার্চ, ১৯৯৭; তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৬
৯৮. বেগম মুশতারী শফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬-৮৩
৯৯. মাহফুজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪-৪৬৪
১০০. মেজর রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধের দু'শো রণাঙ্গন*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.২১৬

বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসহ মুক্তিযুদ্ধের অনেক কর্মপরিকল্পনা এ বাড়িতে বসেই হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ সংরক্ষণের জন্য এ বাসায় ট্রাকভর্তি অস্ত্র এসেছিল। ভয়াবহ বিপদ মাথায় নিয়েই বেগম শফী মুশতারী এ অস্ত্র রেখেছিলেন এবং এজন্য তাঁকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। পাক হানাদারদের হাতে জীবন দিতে হয়েছে তাঁর স্বামী ও ভাইকে।[১০১]

বীর নারী শহীদ জননী জাহানারা ইমাম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র বহন ও লুকিয়ে রাখতেন। শত্রু কবলিত রাজধানী ঢাকায় একজন নারীর জন্য এটি কতটা ঝুঁকির কাজ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। জাহানারা ইমাম তাঁর ছেলে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রুমির সহযোদ্ধাদের রান্না করে খাওয়াতেন।[১০২] ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহফুজা খানম মুক্তিযুদ্ধকালে বিভিন্ন সময়ে নির্দেশ মোতাবেক অস্ত্র বহন করে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতেন। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র তিনি নিজের বাড়ি ও আত্মীয় স্বজনের বাড়িসহ রাজনৈতিক সহকর্মীদের বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করতেন।[১০৩] ২ নং সেক্টরের অধীনে ঢাকাকে শত্রু মুক্ত করার জন্য দুঃসাহসী যুবকদের নিয়ে যে ক্রাক প্লাটুন বাহিনী তৈরি হয়েছিল, এর সদস্য ছিলেন আসমা আলম, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী), রেশমা আলম (কলেজ ছাত্রী) ও সায়মা আলম নামক তিন সাহসী বোন। এরা নিজের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণের কাজ করতেন।[১০৪] ঢাকার সৈয়দা জিনাত আরা বেগম ২ নং সেক্টরের মেজর হায়দার (বীর উত্তম) এবং সাব কমান্ডার ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরীর অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এ সাহসী নারীর দায়িত্ব ছিল তার গ্রুপের যোদ্ধাদের অস্ত্র-শস্ত্র (গ্রেনেড, বোমা ইত্যাদি) ও রসদ সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে সরবরাহ করা। তাদের গেন্ডারিয়ার বাসাটি মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[১০৫] নালাপাড়ার দেওয়ান শামসুন্নাহার বেগম ও পাঠানটুলির নুরুন্নাহার বেগমও অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতেন। ঢাকার মালিবাগের রহিমা চৌধুরাণীর যার বাসা ছিল বিপ্লবীদের আলোচনার কেন্দ্র এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অস্ত্র সংরক্ষণাগার। এ নারী নিজের লাইসেন্স করা রিভলবারটিও একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দিয়েছিলেন।[১০৬]

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ কারফিউ ভাঙার পর ঢাকা-চট্টগ্রাম আশেপাশের মিল কারখানার মানুষ গ্রামে আসতে শুরু করলে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের গুটিনা গ্রামের মিসেস কেয়া বেগম নিজের বাড়িতে অনেক মানুষকে আশ্রয় দান ও সামর্থ্য অনুযায়ী খাবার যোগান দেন। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের মিসেস রোকেয়া বেগম কালিগঞ্জ, ডাঙ্গী পাঁচদোনা,

---

১০১. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬

১০২. *আজকের কাগজ*, ২৬ জুন, ১৯৯৭

১০৩. মাহফুজা খানমের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ, ২২.০৩.২০১৮

১০৪. সাইদুজ্জামান রওশন, তুষার আব্দুল্লাহ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩৩; তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২ ; ফরিদা আখতার সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

১০৫. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

১০৬. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯-৫০

নরসিংদী অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহ কাজ করতেন। তিনি নৌকা করে ধর্মীয় ছদ্মবেশে কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে পাকসেনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের কাজ করতেন।[১০৭] যশোরের রওশন জাহান সাথী মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিববাহিনীর অধীনে কাজ করতেন। তিনি বি এলএফ'র অফিস থেকে লিফলেট ও অস্ত্র বহন করে ৮ নং সেক্টরের যশোর সীমান্তে পৌঁছে দিতেন।[১০৮] ময়মনসিংহের মজিরণ নেছা তার দল বল নিয়ে পুলিশের গোডাউন ভেঙ্গে রাইফেল লুট করে মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করেছিলেন। [১০৯]

চট্টগ্রামের আকিলা খাতুন, মুক্তিযোদ্ধা গরীবুল্লাহর বোন নুরুন্নাহার বেগম ছিলেন,[১১০] পাবনার দীপ্তি লোহানী[১১১], শুকরী বেগম, টাঙ্গাইলের রহিতুন, নারায়ণগঞ্জের হাসিনা পারভিন, যশোরের বেগম লিলি হাই, ভোলার চরণাবাদের রিজিয়া বেগমসহ সালমা খাতুন, লায়লা খাতুন, ওসমান আরা বেগম, দিল আফরোজ রহমান, হাসনা রহমান শ্রীমতি মিনতি দাস, নুরুন্নাহার বেগম, আমেনা বেগম প্রমুখ এবং নাম না জানা শত সহ সহস্র নারী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরোক্ষভাবে আশ্রয়দাত্রী হিসেবে কাজ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলার নারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অসমসাহসিকতার সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, অস্ত্র ও রসদ সংরক্ষণ ও সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি মিলেনি।

৯.৫.খ: মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না ও খাদ্য সরবরাহ

যুদ্ধের সময় দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হয় গ্রামগঞ্জের অনেক পরিবারের ওপর। এক্ষেত্রে এদেশের নারীরা প্রতিনিয়ত পাকসেনা, রাজাকার, আলবদর, আল শামসদের হুমকি উপক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করতেন। অনেকে মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পেও রান্না করতেন। নবাবগঞ্জের আলেয়া বেগম অসুস্থতা সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্নার কাজ করতেন। সিঙ্গাইরের রহিমা খাতুন পারিল ইউনিয়নের গলদবা গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে রান্না করতেন।[১১২] গোপালগঞ্জের আনোয়ারা বেগম প্রতি রাতেই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাত তরকারিসহ অন্যান্য শুকনো খাবার সরবরাহ করতেন।[১১৩] গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি থানার ওড়াকান্দি ৮নং সেক্টরের অধীনে উজির ভবন নামে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল। এখানে জনাব মোকসেদ আলী উজির ও তাঁর স্ত্রী রহিমা বেগম এ

---

১০৭. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৬

১০৮. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯

১০৯. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

১১০. মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা '৭১, অন্যন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২১২

১১১. দীপ্তি লোহানী এর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য ১৩-৬-৯৮; ফরিদা আক্তার (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯১,পৃ. ৪৫ ও ৯৫

১১২. ফরিদা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

১১৩. *দৈনিক সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৬

ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়া খরচ পরিচালনা ও রান্নার সমস্ত দায়িত্ব পালন করতেন।[114] চট্টগ্রামের রিজিয়া বেগম এলাকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-ডাল ও সব্জি সংগ্রহ করে খিচুরি রান্না করে নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধাদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন। এমনকি মুক্তিযোদ্ধারা রাতে তাঁর বাড়িতে এলে তিনি তাদের সযত্নে রান্না করে খাওয়াতেন।[115]

সিরাজগঞ্জের মিসেস আমেনা বেগম মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তরুণ ও যুবকদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি তাদের খাবার সংগ্রহ ও সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মার্চ **১৯৭১** থেকে আগস্ট **১৯৭১** সাল পর্যন্ত কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ, তাড়াশ ও রায়গঞ্জের বিভিন্ন এলাকার যুদ্ধে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।[116] টাঙ্গাইলের জামেলা বেগম মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা দানসহ তাদের রান্না-বান্না করে খাওয়াতেন। এই অপরাধে পাকসেনা ও রাজাকার বাহিনী তার ভাইকে হত্যা করেন এবং তার নিজের হাত ভেঙ্গে দিয়েছিল।[117] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুর্শিদা মুর্শেদ অনেকদিন ধরে ইপিআর বাহিনীর জন্য রুটি তৈরি করে তা সরবরাহ করেছেন। বরিশালের উজিরপুরের ধামুরার রুনু দাস মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে গিয়ে নয় নম্বর সেক্টর টাকীতে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম লেখান। তিনি বাকুন্দিয়া ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ফিরে এসে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাওয়াতেন।[118] নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার শামসুল আলমের উদ্যোগে নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া অঞ্চলে যে শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠে তার মধ্যে এগারো জন নারীও ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা এবং যুদ্ধের সময় আহতদের সেবা শুশ্রূষা করাই ছিল তাদের কাজ। [119]

চট্টগ্রামের বেগম মুশতারী শফী আগরতলা ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করে ক্যাম্পে রুটিনমাফিক ভাগ করা কাজের মধ্যে রুটি তৈরি কাজ তাঁর দায়িত্ব ছিল। তার সাথে ছিলেন আয়েশা খানম (ভিপি, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) রোকেয়া (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মিনি মর্জিনা প্রমুখ।[120] মেহেরুন্নেসা মীরা, মনজেদা খাতুন (ভোলা), রব্বতুন্নেসা (চকরিয়া, কক্সবাজার), নসুবা খাতুন, জোহরা খাতুন (চট্টগ্রাম)[121] জাহানারা আক্তার ও মনোয়ারা আক্তার (চট্টগ্রাম), সাহানা বেগম, নবাবগঞ্জ, সৈয়দা ইসাবেলা সিরাজী, (সিরাজগঞ্জ) বেগম মোমেনা হোসাইন, মিসেস শামসুন্নাহার রশিদ, (গৌরনদী, বরিশাল), শুকর জান ও সনকারনী প্রমুখসহ

---

১১৪. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০
১১৫. বেগম মুশতারী শফী, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৮৯-৯৮*
১১৬. আমেনা বেগম এর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, উদ্ধৃত শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
১১৭ . শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০
১১৮. রুনু দাস- এর সাক্ষাৎকার ;উদ্বৃত শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
১১৯. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, নবম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১; ফরিদা আক্তার (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
১২০. বেগম মুশতারী শফী, *স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিন*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৪৫
১২১. ফরিদা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭; মাহফুজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৯

আরও অনেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষভাবে রান্নাবান্না, খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহকারী হিসেবে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৯.৫.গ: চিকিৎসা ও সেবাদান

যুদ্ধ মানেই হতাহত হওয়া। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও তাই হয়েছে। তাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা যুদ্ধ পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সেবা প্রদানের জন্য কয়েকটি ফিল্ড হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হাসপাতাল ছিল ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী এলাকাস্থ 'বাংলাদেশ হাসপাতাল'। এটি স্থাপিত হয় দুই নম্বর সেক্টরের অধীনে ত্রিপুরায়।[১২২] ভারতীয় সামরিক হাসপাতাল গুলিতেও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করানো হতো। এছাড়া আগরতলা জি বি হাসপাতাল ও ভি এস হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন শরণার্থী শিবির এবং ভারতে ও দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পেও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। দেশের হাসপাতালগুলোতেও যথাসম্ভব মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এসব হাসপাতাল ও ক্যাম্পের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সেবা প্রদানে পুরুষ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি নারীসমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নারী চিকিৎসকগণ নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে দেশের ভেতর এবং ভারতের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্যাম্প হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম মুক্তিযুদ্ধের সময় কুমিল্লা সিএমএইচ-এ কর্মরত ছিলেন। ২ নং সেক্টরের অধীনে ত্রিপুরার বিশ্রামগঞ্জে ফিল্ড হাসপাতাল তৈরি হলে তিনি সেখানে যোগদেন এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হাসপাতালটির উন্নয়নে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর সাথে মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের (৮/১০) ছাত্র সেখানে কাজ করতেন। বাঁশের ও প্লাস্টিক ক্লথ দিয়ে তৈরি চারশ বেডের হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা করতেন তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা। তিনি আগরতলা হাসপাতাল থেকে ওষুধ জোগাড়সহ রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির সংগ্রহের কাজও করতেন। বাংলাদেশ হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য তিনি বীর প্রতীক খেতাব লাভ করেন।[১২৩]

ডা. রেনু কণা বড়ুয়া পূর্ব পাকিস্তান চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার স্বামী সুপতিরঞ্জন পাকসেনাদের হাতে নিহত হওয়ার পর তিনি বাবার বাড়ি রাউজানে এসে পূর্ণোদ্যমে গ্রামের কিছু মেয়েদের নিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষার কাজে নিয়োজিত হন। অনেক সময় তিনি

---

১২২. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯৫

১২৩. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬

গভীর জঙ্গলে গিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেছেন।[১২৪] চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালের চীফ মেডিকেল অফিসার ডা. শামসুন্নাহার আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দিতেন। বন্দর এলাকায় যত শ্রমিক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন তিনি তাদের সহযোগী ও সহমর্মী হয়ে উঠেন। তাঁর তিন ছেলেও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ঝুঁকি নিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাধারণ রোগী হিসেবে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দিতেন। হাসপাতালে চিকিৎসা ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলোতে ওষুধ-পত্র পাঠাতেন। তাছাড়া অনেক সময় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাকবাহিনীদের গোপন সংবাদও প্রেরণ করতেন। রাজাকার আলবদরদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও তিনি নিজ বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দিতেন।[১২৫]

অপর একজন সাহসী চিকিৎসক হলেন চট্টগ্রামে ডা. নুরুন্নাহার জহুর। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার কাজের সাথে সাথে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রেও কাজ করতেন। তিনি দেশের অভ্যন্তরেই মহিলা মুক্তিযোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন। ৬ মাস দেশে কাজ করে পরবর্তীতে ভারতের জি বি হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের ওয়ার্ডে চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি শরণার্থী শিবিরে শিশু ও প্রসূতিদের চিকিৎসা দিতেন।[১২৬]

ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ডা. ফৌজিয়া মোসলেম, ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না ও ফরিদা রহমানও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তারা আগরতলা ক্র্যাপ্স হোস্টেলে (এটি ছিল মূলত ছাত্র ইউনিয়ন সিপিবি ও ন্যাপের ক্যাম্প) থেকে মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে চিকিৎসকের ও চিকিৎসা ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তারা ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত শরণার্থী শিবিরে ও ট্রেনিং ক্যাম্পে চিকিৎসা ও সেবা দিতেন।[১২৭] কুমিল্লার নারী চিকিৎসক ডা. যোবায়দা তাঁর ক্লিনিকে সব সময় আহত মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতেন ও চিকিৎসা করতেন।[১২৮] অস্থায়ী সরকার প্রদত্ত চাকরি নিয়ে ডা. কাজী তামান্না কলকাতার আশেপাশে সকল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নাটক করতেন।[১২৯] এছাড়া ডা. ফাতেমা চৌধুরী, ডা. নূরজাহান ও প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে ভূমিকা রাখেন।

শুধু নারী চিকিৎসকগণ নন, মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা দেশের অভ্যন্তরে এমনকি অনেকে ভারতে গিয়ে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প, শরণার্থী শিবির ও হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা ও নার্সিং সেবা প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ডা. লায়লা পারভীন বানু। তাঁর পিতা ও পিতামহকে পাক হানাদাররা হত্যা করেছিলেন। তিনি কলকাতায় সাজেদা চৌধুরী পরিচালিত গোবরা মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং সেন্টারে যোগ দিয়ে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল

---

১২৪. বেগম মুশতারী শফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৯; শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭ ; *দৈনিক সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর , ১৯৯৬
১২৫. বেগম মুশতারী শফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮, তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২
১২৬. বেগম মুশতারী শফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
১২৭. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬
১২৮. *দৈনিক সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৬
১২৯. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

কলেজের ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী বেবীও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী পদ্মা রানী সরকার ও তার বোন কল্পনা রাণী সরকার প্রথমে মেলাঘরস্থ দারোগা টিলার ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালে পরে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে এসে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচর্যার দায়িত্ব নেন।[১৩০] এছাড়াও নাম না জানা আরো অনেক মেডিকেল ছাত্রী এ দায়িত্ব পালন করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীসমাজের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

নারী চিকিৎসক ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের অভ্যন্তরে ও ভারতে স্কুল কলেজের ছাত্রীদের ফার্স্ট এইড ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকায় বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বেবী মওদুদ ও উৎসাহী আরো কতিপয় নারীর সহায়তায় মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় নারীদের ফাস্ট´এইড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১৩১] একই উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদ সদস্য বদরুন্নেছা আহমেদ, রাফিয়া আক্তার ডলি, বেগম সাজেদা চৌধুরী এবং মমতাজ বেগমকে সদস্য করে ভারতে বাংলাদেশ নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়।[১৩২] সাজেদা চৌধুরীর পরিচালনাধীন কলকাতার গোবরা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারীদের সশস্ত্র ট্রেনিং- এর পাশাপাশি ফার্স্ট এইড প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ত্রিপুরার বিশ্রামগঞ্জের বাংলাদেশ ফিল্ড হাসাপতালসহ বিভিন্ন শরণার্থী শিবির, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ও হাসপাতালে চিকিৎসা সেবায় সহযোগিতার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নার্সিং সেবা প্রদানকারী নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছিলেন রাজবাড়ির গীতা কর, ফরিদপুরের গীতা মজুমদার, গোপালগঞ্জের কাশিয়ানির শেফালিকা দাস, অনিলা, জাকিয়া খাতুন, রেশমা আলম, আসমা আলম, নীলিমা বৈদ্য, শোভারাণী মণ্ডল, অঞ্জলী, লক্ষ্মী চক্রবর্তী, বাসনা গুণ, আলোরাণী, অনুপমা দেবনাথ, যুথিকা, মিনু বিল্লাহ, শ্যামা ও মধুমতি প্রমুখ।[১৩৩] এ ছাড়াও মেঘালয়, ত্রিপুরা, করিমগঞ্জ এবং মুর্শিদাবাদসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালে নার্সিং সেবাদানকারী হিসেবে বিভিন্ন সূত্রে আরো যাদের নাম পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে রয়েছেন, মালেকা বেগম, শান্তি দত্ত, রাহেলা, সুরাইয়া, বীথিকা, নাজমা, সাজেদা বেগম, মুশতারী শফী, রোকেয়া বেগম, আয়েশা খানম, ঊষাদাশ পুরকায়স্থ, মুনিরা আক্তার, রাখীদাস পুরকায়স্থ, আন্না, খুকু আকতার, ডালিয়া সালাহউদ্দিন, জিনাতুন্নেসা তালুকদার, প্রীতিকণা দাস, প্রতিভা ভাট্টাচার্য, রমা মজুমদার, সীমা চৌধুরী, মীরা রায়, দীপাঞ্জলি আইচ, শিখা চক্রবর্তী, আভা মণ্ডল, সুফিয়া

১৩০. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
১৩১. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৬
১৩২. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯
১৩৩. *ঐ*, পৃ. ১১০-১১১; তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫১

আক্তার, কমলা লক্ষ্মী কর, ঝুনু সরকার ও পদ্মা প্রমুখ।[১৩৪] এদের কেউ কেউ গোবরা ট্রেনিং ক্যাম্প এবং কেউ কেউ জি বি হাসপাতাল নার্সিং সেন্ট্রারে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলো।

কবি সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে সাঈদা কামাল ও সুলতানা কামাল কোনো প্রকার নার্সিং- ট্রেনিং ছাড়াই যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাসপাতালে নার্সিং এর কাজ করেন।[১৩৫] সাঈদা কামাল মেডিকেল ওয়ার্ডে এবং সুলতানা কামাল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ডিউটি করতেন। রোগীদের সময় মতো ওষুধ খাওয়ানো, মাথা ধোয়ানো, স্পঞ্জ করানো, ড্রেসিং করা, অপারেশনের এ্যাসিস্ট করা তাদের কাজ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে তাদের এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তীতে সুলতানা কামাল ও সাঈদা কামাল প্রধান সেনাপতির সনদ প্রাপ্ত হন।[১৩৬] মালদহের আমবাগানের মোহতীপুর সোনা মসজিদের ধারে তাঁবু খাটিয়ে ডাক্তার মোয়াজ্জেম হোসেন যে ৬০ বেডের ক্যাম্প হাসপাতাল করেছিলেন এতে সেবিকা হিসেবে কাজ করেন কর্নেল নুরুজ্জামানের (৭নং সেক্টরের যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে) স্ত্রী সুলতানা এস জামান ও তার দুই কন্যা লায়লা জামান খান ও লুবনা জামান।[১৩৭] কনক প্রভা সরকার (রংপুর) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর ভারতের কোচ বিহার জেলার হলদি বাড়িতে গমন করে মুজিবনগরের বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ (Memo No Hs/ 259(5) dated 21.10.71 মোতাবেক) ৬ নং সেক্টরের নার্স হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে বুড়িমারী, চেংরাবান্দা, পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট, তিস্তা, এবং সর্বশেষ রংপুরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দান ও সুস্থ করে তোলার দায়িত্বে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।[১৩৮]

খাদিজা সিদ্দিকী টাঙ্গাইলে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছেন। স্বামী ডাক্তার হওয়ায় স্বামীকে সহযোগিতার পাশাপাশি তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দিতেন, তাদের বাসায় নিয়ে আসতেন এবং অনেক সময় ছোটোখাটো অপারেশন তারা বাসায় করতেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ওষুধ সরবরাহ করতেন।[১৩৯] বরিশাল অক্সফোর্ড মিশনে আশ্রয় নিয়ে বরিশাল শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা প্রদান করেন রাণী সরকার। শিয়ালদহ রেলওয়ে হাসপাতালে কিছুদিন নার্সিং সেবা দেন রোকেয়া বেগম। পরে তিনি তার বোনসহ ৬ জনের একটি টীম মালদহ সাগরদীঘি হাসপাতালে ক্যাম্পে আহত

১৩৪. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭; শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১৪
১৩৫. *দৈনিক সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৬
১৩৬. *ত্রৈমাসিক বনলতা*, ডিসেম্বর ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৬
১৩৭. লতিফা আকন্দ, জাহানারা ও নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা (সম্পাদিত), *একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ*, ঢাকা উইমেন ফর উইমেন, এ রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডি গ্রুপ, ১৯৮৭, পৃ.৪৭
১৩৮. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮
১৩৯. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০

মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।[১৪০] মমতা রায় ও শেফালি রায় ঠাকুরনগর শরণার্থী ক্যাম্পে সেবার কাজ করেন। এ ক্যাম্প থেকে কিছু দিন নার্সিং প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা আহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সেবা করেন।[১৪১]

আহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের খোঁজখবর এবং সকল শরণার্থী শিবির ও যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা কাজ করার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ জুলাই আগরতলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনেত্রী ফোরকান বেগমের নেতৃত্বে মিনারা বেগম ও অন্যান্যদের সহায়তায় 'মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'একতা (বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শে) সংগ্রাম ও সেবা' এ আদর্শে উজ্জীবিত মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলাদেশের নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা। জাহানারা হককে সভাপতি, ফোরকান বেগমকে সাধারণ সম্পাদক, আম্বিয়া আজম ও সুচিত্রা গাঙ্গুলীকে সহ-সভানেত্রী, রিজিয়া চৌধুরীকে কোষাধ্যক্ষ, মিনারা বেগম ঝুনুকে দপ্তর সম্পাদিকা এবং ফিরোজা আতিক, নাসিমুন্নাহার হুদা ও সাজেদা চৌধুরীকে সদস্য করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালনা পর্ষদে যুক্ত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মিসেস জাহানারা হক, মিসেস ফরিদা মহিউদ্দিন, মিসেস নুরুন্নাহার জহুর, মিসেস আলী আজম, মিসেস আফরোজা আতিক প্রমুখ। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বিভিন্ন শাখা কমিটির মাধ্যমে তাদের কাজ করতেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল নার্সিং শাখা কমিটি। এ কমিটির উদ্যোগে নার্সিং প্রশিক্ষণ দিয়ে আগরতলার জি বি ও ভি এম হাসপাতাল এবং হাফানিয়া শরণার্থী শিবিরে সেবাদানের জন্য পাঠানো হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নার্সিং ট্রেনিং শাখায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে সেবাদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন মাফছুরা খাতুন, আমিরা খাতুন রওশন, শর্মিলা চৌধুরী, তাহরিমা চৌধুরী, খোরশেদ আরা বেগম, শামসেদ আরা বেগম, কাজী হেলেন, গৌরী রাণী দাস ও পরিণিতি পাল চৌধুরী প্রমুখ। ফোরকান বেগম, মিনারা বেগম ঝুনু ও রিজিয়া বেগম প্রমুখ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠকগণ সেবিকাদের কার্যক্রমের সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতেন।[১৪২]

নারীদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নার্সিং কাজও করেছেন। এদের মধ্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে হেমায়েত বাহিনীর বীরযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য, সুনামগঞ্জের পেয়ারাচাঁদ এবং বগুড়ার ফেরদৌসী পারভীন ডলির নাম উল্লেখযোগ্য।[১৪৩]

---

১৪০. *ঐ*, পৃ. ২৮৯

১৪১. বীণা রাণী রায়, *জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাংলার নারী*, ১৯৪৭-১৯৭১ অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৭১

১৪২. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১-১১২

১৪৩. *ঐ*, পৃ. ১১৪-১১৫

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে চিকিৎসা বিশেষ করে নার্সিং কাজে নারীসমাজ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। এদের কেউ কেউ স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং আবার অনেকেই কোনোরকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই সহজাত সেবার গুণাবলীকে সম্বল করে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করে দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে নিজেদের উজ্জ্বল ভূমিকায় অবতীর্ণ করে ইতিহাসের অংশ হয়ে যান।

৯.৫.ঘ: অর্থ, বস্ত্র ও অন্যান্য রসদ সংগ্রহ ও সরবরাহ

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন জেলা ও পাড়াতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, বস্ত্র ও ওষুধসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারীদের অন্যতম ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। পাকবাহিনীর কঠোর নজরবন্দিতে থেকেও তিনি গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখ। সুফিয়া কামাল তাঁর আশেপাশে প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন যারা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন, তাদের রেশনকার্ড নিজের সংগ্রহে রেখে তা দিয়ে রেশনের মালামাল তুলে তা পাঠাতেন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। এসব কাজে তাঁকে ইডেন কলেজের কয়েকজন ছাত্রী সহযোগিতা করতেন। রাজাকাররা তাঁকে বারবার প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছিলেন। [১৪৪] ফরিদপুরের নুরুন্নাহার বেলী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাড়িবাড়ি ঘুরে অর্থ ও কাপড়সহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে নিজ দায়িত্বে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পাঠাতেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী সৈয়দা জিনাত আরা বেগম হাসপাতাল থেকে গোপনে বিভিন্ন ওষুধপত্র ও সার্জিকেল সামগ্রী সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।[১৪৫]

নোয়াখালীর রামগতির স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক শিবানী দাসও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার, কাপড় চোপড়, টাকা-পয়সা সংগ্রহসহ হালকা অস্ত্র সংগ্রহ করে সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১৪৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসুর প্রাক্তন ভিপি মাহফুজা খানম শহীদ জননী জাহানারা ইমামের পরামর্শ অনুসারে বিভিন্ন সময় টাকা ও ওষুধ সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।[১৪৭] ঢাকায় অবস্থান করে পরিচিতজনদের সাথে যোগাযোগ করে অর্থ ও পোশাক সংগ্রহ করে সেগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাঠাতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী বেবী মওদুদ। তিনি বেগম সুফিয়া কামালের নির্দেশে নির্যাতিত নারীদের খোঁজখবর, খাবার ও পুনর্বাসনের মতো গুরুদায়িত্বও পালন

---

১৪৪. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯
১৪৫. সাইদুজ্জামান রওশন, তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
১৪৬. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১
১৪৭. মাহফুজা খানমের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২২.০৩.২০১৮

করেছিলেন।[১৪৮] চট্টগ্রামের পাহাড়তলী মহিলা সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদিকা সালেহা চৌধুরী প্রথমদিকে গোপনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলতেন এবং ইশতেহার বিলি করতেন। তাঁর বড় ছেলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ায় তিনি এখান থেকে পরিবার নিয়ে ফেনীর সোনাগাজী চলে যান। সেখানেও তিনি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে খাবার ও কাপড় সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।[১৪৯] পূর্ব পাকিস্তান মহিলা আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর শাখার সম্পাদিকা ফরিদা রহমানের স্যালাইন ও ওষুধ যোগাড় করে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পাঠাতেন। যুদ্ধের শেষ দিকে তিনি কম্বল, মোজা, সোয়েটার, শালসহ গরম কাপড় সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাঠাতেন।[১৫০] লে. কর্নেল এম এ ওসমান চৌধুরীর স্ত্রী নাজিয়া ওসমান চৌধুরী স্বামীর সাথে তাঁর ট্যাকটিক্যাল হেডকোয়ার্টারে অবস্থান করে স্থানীয় সেনাদের খাবার ও পানীয় সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ও তাঁর মেয়ে চম্পা রণাঙ্গনে যেসব সেনাদের স্ত্রী পরিবার থাকতেন তাদের খাবার পানি, টাকা পয়সা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন।[১৫১] নাজিয়া ওসমান চৌধুরী তাঁর স্বামীর সাথে যশোর, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সম্মুখ সমরে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রঞণ করেন। তেজস্বিনী এ নারী স্বামীর পাশে থেকে তাঁর শক্তি যোগাতেন অন্যদিকে বিডিআর, জওয়ান ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করতেন। যুদ্ধের শেষ দিকে ৬ এপ্রিল পাকসেনাদের গুলিতে তিনি শহীদ হন।[১৫২]

পূর্বোক্ত নারীদের ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ, খাবার, বস্ত্র ও ওষুধ সংগ্রহ ও সরবরাহের দায়িত্বপালনকারী নারীদের মধ্যে ঢাকার ড. নীলিমা ইব্রাহিম, জাহানারা ইমাম, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, নার্গিস জাফর, মিসেস সেলিনা খালেক, নাজনীন সুলতানা, বেগম মালেকা আশরাফ, আনোয়ারা বেগম, ডা. হালিমা খাতুন, লায়লা সামাদ, রাজিয়া খাতুন, যশোরের সৈয়দা হালিমা রহমান, নেত্রকোণার মায়া ধর চৌধুরী, নারায়ণগঞ্জের মিসেস খায়রুন্নেসা ও কিশোরগঞ্জের রওশন আরা খাতুনসহ রওশন হাসিনা, প্রণতি দস্তিদার, সোফিয়া করিম, খোদেজা কিবরিয়া এবং বেবী কাসেম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৫৩]

৯.৫. ঙ: বার্তা ও সংবাদ আদান-প্রদান

যুদ্ধ চলাকালে বার্তা ও সংবাদ আদান-প্রদান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। মুক্তিযুদ্ধের সময় পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সাফল্যের সাথে এ কাজটি করেছেন। পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক এদেশের জনগণের ওপর হত্যাযজ্ঞের খবর সর্বস্তরের জনগণের সামনে ও বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য এ দেশের

---

১৪৮. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১

১৪৯. বেগম মুশতারী শফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫- ৫৭

১৫০. *ভোরের কাগজ*, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৬; তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

১৫১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭০-২৭১; রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১

১৫২. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯-৪০

১৫৩. তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯; সেলিনা হোসেন সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১, ১৫৪; শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

বুদ্ধিজীবীমহল চিঠি, লিফলেট বিতরণ, পত্রিকা প্রকাশ ও বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এসব চিঠি, লিফলেট, পত্রিকা বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্নজনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন অনেক নারী। তাদের কেউ কেউ ভিখারী, ফেরিওয়ালা বা পাগলের বেশে দুর্গম ও সমস্যাসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকটও শত্রুপক্ষের সংবাদ প্রেরণ করেছেন। আবার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ও প্রয়োজনীয় সংবাদ সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

মাহফুজা খানম মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তার নির্দেশ মোতাবেক কাজ করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সাইক্লোস্টাইল মেশিনে লিফলেট সাইক্লোস্টাইল করে তিনি তা বিলি করতেন অথবা নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দিতেন। তাছাড়া নটরডেম কলেজ থেকে কখনও কখনও লিফলেট সাইক্লোস্টাইল করে আনতেন।[১৫৪] *'মুক্তিযুদ্ধ'* নামক যে পত্রিকাটি ঢাকার কলাবাগানের একটি বাড়িতে ডুপ্লিকেটিং মেশিনে ছাপা হতো, সেটি আরেকজন পুরুষ মুক্তিযোদ্ধার সাথে বাসে করে নারায়ণগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিতেন।[১৫৫] বার্তাবহনের দায়িত্ব পালন করেছেন বেবী মওদুদও। ঢাকায় লিফলেট বিতরণ ও বিভিন্ন জরুরি কাগজ ও চিঠি সরবরাহের কাজে জড়িত অন্যান্যদের মধ্যে পিউ, মিরো, মীরা, আর্জু, ঊর্মি, সালমা, রোকয়া মাহবুব, পারভিন চৌধুরী রীণা প্রমুখের নামও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।[১৫৬]

ছদ্মবেশে অনেক নারী পাকসেনাদের ক্যাম্প, রাজাকার ও আলবদরদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের গোপন পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কাছে পৌঁছে দিতেন। এদের মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজার থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামের কাঁকন বিবি ওরফে নূরজাহান বেগমের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি একজন রণাঙ্গনের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন। পাকবাহিনীর চরম নির্যাতনের শিকার কাঁকন বিবি ভিক্ষুক সেজে পাকিস্তানিদের গোপন খবরাখবর, গতিবিধি মুক্তিবাহিনীকে সরবরাহ করতেন।[১৫৭] তার সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মুক্তিযোদ্ধারা অনেক সফল আক্রমণ চালিয়েছিল। ভিখারী সেজে তথ্য সরবরাহ করতেন, বাগেরহাটে মেহেরুন্নেসা মীরা [১৫৮] নোয়াখালি জেলার ধর্মপুর গ্রামের জায়েদা খাতুন প্রমুখ।[১৫৯]

---

১৫৪. মাহফুজা খানমের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২২.০৩.২০১৮
১৫৫. *দৈনিক সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৬
১৫৬. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬
১৫৭. *সংবাদ*, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
১৫৮. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৪; আ.ম.বাবর.আলী. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০-৩১
১৫৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে, ১৯৭২

পাবনা জেলার সাধুপাড়া গ্রামের হাসিনা বেগম, (বাবা ছিলেন, ডি এস পি, ২৮ মার্চ ১৯৭১) তার স্বামীকে পাকসেনারা হত্যা করলে তিনি বাবার পরিচয় দিয়ে দু'বছরের ছেলেকে নিয়ে যশোর, কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, শৈলকুপা ইত্যাদি থানায় থাকেন এবং বিভিন্ন থানার বর্তমান কি পরিমাণ ফোর্স, কি পরিমাণ অস্ত্র আছে ইত্যাদি সংবাদ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌঁছাতেন। ফলে মুক্তিবাহিনী ঐ থানাগুলো আক্রমণ করে সাফল্য লাভ করে।[১৬০] ৭ নং সেক্টরে অংশগ্রহণকারী হামিদা বেগম (তিনি সিরাগঞ্জের মেটারনিটি হাসপাতালে নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন) তার সাথে আরও ৩ জন নার্স আলো, কণা ও দীপালি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পাকবাহিনীদের ক্যাম্প শনাক্ত করে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর প্রদান করেন।[১৬১]

তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে অকথ্য নির্যাতন ও নির্মমতার শিকার হয়েছিলেন বরিশাল জেলার পিরোজপুর থানার বাঘমারা কদমতলীর ভাগিরথী। পাকহানাদার বাহিনী তার গ্রাম আক্রমণ করে ভাগিরথীকে ধরে নিয়ে যায়। ভাগিরথী কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি কৌশলে ইয়াহিয়া বাহিনীর আস্থা অর্জন করে তাদের গোপন তথ্য জেনে নিতেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গোপনে যোগাযোগ গড়ে তুলে তথ্য প্রদান করেন। তার কৌশলে ৪৫ জন খান সেনার মধ্যে ৪/৫ জন ছাড়া বাকি সবাই মারা যায়। পরবর্তীতে তাকে গুপ্তচর বৃত্তির সন্দেহে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়।[১৬২]
এভাবে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার পুঠিয়া গ্রামের রোকেয়া বেগম[১৬৩] ডা. শামসুন্নাহার কামাল (চট্টগ্রাম), চট্টগ্রামের হান্নানা বেগম, দিল আফরোজ, হাসিনা বেগম, ফরিদা আক্তার বুলি, জামালপুরের ফেরদৌস আরা রুনু, সিরাজগঞ্জের মতিকা মতিন, কিশোরগঞ্জের ঊষা রাণী, মরিয়ম বেগম, মেহেরুন্নেসা মেরী, টাঙ্গাইলের হাজেরা সুলতানা প্রমুখসহ এ দেশের বহু নাম না জানা নারী নিজের এবং পরিবারের বিপদ ও এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্নমুখী তথ্য ও সংবাদ আদান-প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন।[১৬৪] তাদের এ দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কারণে মুক্তিযোদ্ধারা অনেক সফল অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৯.৫. চ: জনমত সংগঠনকারীর ভূমিকায় নারী

মহান মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে দেশের ভেতরে এবং বহির্বিশ্বে জনমত সংগঠনে বাংলার নারীসমাজের অনেকে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন রাজনীতিবিদ নারী, প্রবাসী বাঙালি, প্রবাসী ভারতীয়

---

১৬০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, *৮ম খণ্ড*, পৃ. ১৮৭
১৬১. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯
১৬২. *দৈনিক আজাদ*, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮১
১৬৩. ফোরকান বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
১৬৪. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

নারী এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন নারী সংগঠন।

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও এর সপক্ষে জনমত সৃষ্টিতে যাঁর ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধুর সহধর্মীনী ও রাজনৈতিক জীবনের বিশ্বস্ত ও একান্ত সঙ্গী বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ কারাজীবনে সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ বন্দি জীবনযাপন করেন। এরূপ সংকটময় অবস্থার মধ্যেও তিনি তাঁর দুই পুত্র শেখ কামাল ও শেখ জামালকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিবনগর সরকারের নিকট তথ্য আদান প্রদান করতেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। এভাবে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম থেকে শুরু করে বিজয় অর্জন পর্যন্ত তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৬৫]

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের অধীনে গঠিত পার্লামেন্টারি দলের সাথে যুক্ত হয়ে অনেকে নারী দেশ এবং দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত তৈরিতে কাজ করেন। জাতীয় পরিষদ সদস্য বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ ১৯৭১ পরে এপ্রিল মাসে সপরিবারে আগরতলায় পৌঁছান। সেখান থেকে মুজিব নগর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ করে স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারীর হাজার বাঙালির মধ্যে পাকবাহিনীদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি পত্রিকায় লেখা দিয়ে এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ ও আবেগময় আবেদনে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংবেদনশীল করে তোলেন।[১৬৬] জাতীয় পরিষদ সদস্য নূরজাহান মোর্শেদ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পার্লামেন্টারি দলের সাথে যুক্ত হয়ে দিল্লিতে গিয়ে ভারত সরকার ও বিরোধী দলগুলোর কাছে স্বাধীন বাংলাদেশ ও মুজিবনগর সরকারকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করেন। এর বাইরে নূরজাহান মোর্শেদ মুক্তিযুদ্ধকালে বিশ্বজনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন সভায় জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের ভ্রাম্যমাণ দূত হিসেবে দিল্লিতে পার্লামেন্টের জয়েন্ট সেশনে লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া সরকারের সামরিক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বক্তৃতা প্রদান করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালেও তিনি একই বক্তব্য তুলে ধরেন। এতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁর অনুপস্থিতিতেই দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাঁকে ১৪ বছরের জেল ও তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের দণ্ড প্রদান করে। নূরজাহান মোর্শেদই একমাত্র নারী যার বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া সরকার এ

---

১৬৫. হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ৮ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

১৬৬. ফরিদা আক্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

দণ্ডাদেশ জারি করেছিল।[১৬৭] জাতীয় পরিষদের রাফিয়া আক্তার ডলি মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথমদিকেই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা ও আশেপাশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মধ্যে প্রচারণা, মিটিং-মিছিল ও সভা-সমাবেশের আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করেন।[১৬৮]

জাতীয় পরিষদ সদস্য মমতাজ বেগম Bangladesh Liberation Front (BLF) বা মুজিব বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। আগরতলার বিশালগড়ে একটি ভাড়া বাড়ি থেকে মুজিব বাহিনীর যাবতীয় গোপন কার্যক্রম বৈঠক পরিচালিত হতো। মমতাজ বেগম এর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। রিভলবার চালনা, সামরিক কৌশল রপ্ত, তথ্য সরবরাহসহ বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর কাজে তিনি সহযোগিতা করতেন। এ সময়ে সারদা সেবা সংঘের সহযোগী সংগঠন হিসেবে মহিলা সংঘ নামে একটি সেবা সংগঠনের মাধ্যমে তিনি শরণার্থী ক্যাম্পে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও মোটিভেশনের কাজে অংশগ্রহণ করতেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রেরণা যোগাতেন। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহীদের তালিকাভুক্ত এবং যোদ্ধাদের সুবিধা অসুবিধা সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে জনমত গঠন করেছেন। [১৬৯]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজনীতিবিদ মতিয়া চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। তিনি আগরতলা ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের মুক্তিবাহিনীতে যোগদানে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে মতিয়া চৌধুরী মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বেগমকে নিয়ে প্রচার কাজে নিয়োজিত হন। ভারতীয় নারী ফেডারেশনের আমন্ত্রণে কলকাতা, দিল্লি ও পাঞ্জাবে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বক্তৃতা দেন। দিল্লিতে আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে যোগ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীসমাজের বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভে সহযোগিতা চান।[১৭০] এর মধ্য দিয়ে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও ব্রিটেনের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নারীসমাজের মধ্যে সংহতিমূলক সম্পর্ক গড়ে উঠে।[১৭১] মালেকা বেগম বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধের দাবিতে অনশনরত অস্ট্রেলীয় যুবকদের কাছে গিয়ে বিশ্ববাসীর সমর্থন প্রার্থনা করেন।[১৭২] বিশ্ব

১৬৭. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, ১২৪

১৬৮. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

১৬৯. মমতাজ বেগমের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ ১৯.০৬.২০১৯; মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬৫

১৭০. মেজর রফিকুল ইসলাম পি. এস. সি, *নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা* '৭১; অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৯

১৭১. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ১৮৯

১৭২. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১

জনমত গঠনের লক্ষ্যে তিনি মুক্তিযুদ্ধে মেয়েদের অবস্থা ও ভূমিকা নিয়ে বুলেটিনও প্রকাশ করেছিলেন।[১৭৩] মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর পাশবিক নির্যাতন ও গণহত্যা বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে ১৯৭১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর একটি আবেদন জানিয়েছিল।[১৭৪] এ আবেদনটি বিশ্বজনমত গঠনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। ঢাকার ডা. ফৌজিয়া মোসলেম মে মাসে আগরতলা গিয়ে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও অন্যান্য দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীদের মধ্যে কাজ করেছেন।[১৭৫] ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্নাও আগরতলা ও ত্রিপুরাতে অবস্থানরত নারী ও শরণার্থীদের মধ্যে মনোবলবৃদ্ধি ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখেন।[১৭৬]

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সংসদের সদস্যবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সফরে গিয়েছিলেন। শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক নেত্রী হেনা দাস ও মালা চৌধুরী প্রমুখ।[১৭৭] আয়েশা খানম আগরতলা ক্যাম্পে মতিয়া চৌধুরীর সাথে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতেন। তাছাড়া ঐ সময়ে শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সব সময় যোগাযোগ রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেছেন মনিরা আক্তার, সেলিনা বানু, রোকয়া কবীর প্রমুখ।[১৭৮] পাবনার শিরিন বানু মিতিল, চট্টগ্রামের বেগম মুশতারী শফী, সুনামগঞ্জের দীপালী চক্রবর্তী, পাবনার রেখা সাহা এবং কুমিল্লার এ্যারোমা গুন প্রমুখ ভারতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত সৃষ্টিতে বিভিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১৭৯]

যশোরের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক রওশন জাহান সাথী ২৭ মার্চ পাক আর্মির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে ছাত্র যুবকদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন।[১৮০] বরিশালের চারু বালা গাঙ্গুলী ও জীবন প্রভা বিশ্বাস জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধকরণে কাজ করতেন। জীবন প্রভা ভারতে না গিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন। তিনি নারীদের আত্মরক্ষার কৌশল ও

---

১৭৩. মেজর রফিকুল ইসলাম পি. এস. সি, *নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা '৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

১৭৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৩

১৭৫. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫: সাক্ষাৎকার ফৌজিয়া

১৭৬. সাইফুজ্জামান তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৬

১৭৭. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *'৭১ এর দশমাস*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ: ২৩৪

১৭৮. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫

১৭৯. এ বিষয়ে বিশদ দ্রষ্টব্য শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬-১২৭

১৮০. সেলিনা হোসেন, (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ১৫৪

পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় সভা করতেন।[১৮১] কৃষ্ণা রহমান জুন মাসে কলকাতার গোবরা ক্যাম্পে গিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি নার্সিং ও সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তিনি মুজিবনগর সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যেতেন। ক্যাম্পের ৪০০ জন মেয়ের নিয়মিত বাজার ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করতেন।[১৮২] কুপার্স এ আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে অনিমা সিংহ, শান্তি দত্ত, হেনা দাস, দীপা দাস, কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকাসহ পার্টি কমরেডরা অবস্থান করতেন। কমরেড ইলা মিত্র কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা, হেনা দাস, ও দীপা দাস কে নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন করার লক্ষ্যে সর্বভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন। [১৮৩]

রাখী দাশ পুরকায়স্থ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে দেশের স্কুল কলেজসহ বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশে বক্তৃতা করতেন। এছাড়া তিনি বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রছাত্রীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা করতেন। ডা. নুরুন্নাহার জহুর, আইভি রহমান, আজাদী হাই, হোসেনে আরা মান্নান প্রমুখ শরণার্থী শিবিরের দেখাশোনার দায়িত্ব ছাড়া ও জনমত গঠন, অর্থ সংগ্রহ, রিলিফ দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বণ্টন এবং মেয়েদের জন্য নার্সিং প্রশিক্ষণের মত বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন।[১৮৪]

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন লন্ডন ও আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি নারীরা। প্রবাসে যেসব নারী মুক্তিযোদ্ধা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে মিসেস লুলু বিলকিস বানু, মিসেস জেবুন্নেসা বখস, আসমা কিবরিয়া ও আশালতা সেন প্রমুখ অন্যতম ছিলেন। ২৮ মার্চে লন্ডনে বসবাসরত নেতৃস্থানীয় বাঙালি নারীরা পশ্চিম লন্ডনের লেডবেরী রোডে মিসেস জেবুন্নেসার বাড়িতে সমবেত হয়ে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি গঠন করে জেবুন্নেসাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। মিসেস ফেরদৌস রহমান, আনোয়ারা জাহান ও মুন্নি রহমানের ওপর জনসংযোগের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[১৮৫] সমিতির সাথে যুক্ত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মিসেস সোফিয়া রহমান, জেবুন্নেসা খায়ের, ড. হালিমা আলম, মিসেস সুরাইয়া ইসলাম, মিসেস সেলিনা মোল্লা, মিসেস রাজিয়া চৌধুরী, মিস সুরাইয়া বেগম, মিসেস লুলু বিলকিস বানু, মিসেস ওয়ালী আশরাফ, মিসেস শাহেদা খাতুন, মিসেস বিলকিস আক্তার হোসেন, মিসেস খন্দকার মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।[১৮৬]

---

১৮১. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২ ও ২৯

১৮২. *ঐ*, পৃ. ১৯০-৯১

১৮৩. কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকার সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২১ জুন, ২০১৯

১৮৪. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, *২য় খণ্ড*, পৃ. ২১১

১৮৫. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৮৮

১৮৬. ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৮

সমিতির প্রায় সার্বক্ষণিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন সাবেতা চৌধুরী, কুলসুম উল্লাহ, তাহেরা কাজী শেফালি হক ও বেগম রকিব প্রমুখ।[১৮৭] মহিলা সমিতি বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ করে। সমিতির স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারপত্র বিলি, দেয়াল পত্র প্রকাশ করে। সমিতির উদ্যোগে একটি শোভাযাত্রা 'সেভ দ্য চিলড্রেন' অফিসে গিয়ে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাংলাদেশের শিশুদের দুর্বিষহ জীবন ও হৃদয়বিদারক মৃত্যুর বিবরণ দিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ৪ জুন মিসেস জেবুন্নেসার নেতৃত্বে প্রায় দুইশত নারী ও শিশু সেন্ট জেমস পার্ক থেকে মিছিল করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এওয়ার্ড হীথের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এতে ইয়াহিয়ার সরকারকে সাহায্যের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়। লুলু বিলকিস বানু বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও পার্লামেন্ট সদস্যদের সাথে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তাছাড়া তিনি 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' ও ক্রিশ্চিয়ান এইচ এর কার্যালয়ে গিয়ে বাংলাদেশের নির্যাতিত গণমানুষের জন্য সাহায্যের আবেদন জানান। বাংলাদেশ মহিলা সমিতি ৩ হাজার পাউন্ড অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে পাঠায়। ১ আগস্ট ১৯৭১ লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পল বানেটের নেতৃত্বে গঠিত এ্যাকশান বাংলাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০ হাজারের বেশি বাঙালি যোগ দেয়। সভায় বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীসহ অন্যান্যদের মাঝে বক্তৃতা করেন লুলু বিলকিস বানু।[১৮৮] সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও লবিং ইত্যাদি আয়োজনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিস্তার এবং জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়েছিল। এ লক্ষ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতির কিছু নেতা ও কর্মী সেখানকার প্রবাসী লেখক, কবি, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করে সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতে মিসেস মুন্নি রহমান, (সাধারণ সম্পাদিকা) লুলু বিলকিস বানু ও জেবুন্নেসা খায়ের (সাধারণ সদস্যা) প্রমুখ নারীরা যুক্ত ছিলেন। এ সংগঠনটি বিভিন্ন সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্য প্রচার ও বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনমত তৈরির কাজ করে।[১৮৯]

কেবল ইংল্যান্ড নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংগঠনের লক্ষ্যে প্রবাসী বাঙারি নারীরা কাজ করেন। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আমেনা পন্নী। তিনি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন গঠন করে বহুমুখী তৎপরতার মধ্য দিয়ে মার্কিন জনগণকে বাংলাদেশের আন্দোলনের যৌক্তিকতা বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি পত্র পত্রিকায় লেখালেখি, রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা দেওয়া, ছাত্রদের নিয়ে মিছিল ও সভা

---

১৮৭. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

১৮৮. শেখ আব্দুল মান্নান, *মুক্তিযুদ্ধের যুক্তরাজ্যের বাঙালির অবদান*, জোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ৩২ ৩৩, ৬২, ৩৫-৩৬

১৮৯. ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২-৪৩

সমিতির আয়োজন প্রভৃতি নানাভাবে জনমত গঠনে তৎপরতা চালিয়েছিলেন। তিনি কনসার্ট শোর আয়োজন করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সহায়ক তহবিল গঠন করেন। সর্বোপরি মার্কিন সরকার পাকিস্তানের সহায়তার জন্য সানফ্রান্সিসকো বন্দরে অস্ত্র বোঝাই শুরু করলে আমেনা পন্নী তা প্রতিরোধের লক্ষ্যে বন্দর শ্রমিক বালং শারম্যান নেতাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের ন্যায্যতা বোঝাতে সক্ষম হন। ফলে বন্দর শ্রমিকেরা পাকিস্তানি জাহাজে অস্ত্র তুলতে অসম্মতিজ্ঞাপন করলে পরে সরকার সেনাবাহিনী নিয়োগ করে অস্ত্র বোঝাই করে। আমেনা পন্নী ছাড়া সানফ্রান্সিসকো শহরে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন- এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন জামিল আখতার মিনু। তিনিও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জোরালোভাবে কাজ করেন।[১৯০]

১৯৭১ সালের জুন জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে 'ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন আদায় ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা। ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল-এর সংগঠকদের মধ্যে হোসনা করিম, ফরিদা হক, সুলতানা আলম, রওশন আরা চৌধুরী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া খাদিজা হক ও নাজমা পুতুলও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কাজ করেন। বাংলাদেশের সংগ্রামী নেত্রী আশালতা সেন নিউইয়র্কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবাসীদের সংগঠিত করার কাজ করেন। তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ভবনে প্রতিবাদ জানান এবং অনশনে অংশ নেন।[১৯১]

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পরম বন্ধুর ভূমিকা পালন করেছিল ভারত সরকার ও জনগণ। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সরকার বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি হিসেবে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি ও যুদ্ধের শেষ দিকে সরাসরি সামরিক সহায়তাদানের পাশাপাশি বিশ্বজনমত গঠনেও সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জামার্নি, অস্ট্রিয়া ও বেলজিয়াম সফর করেন। তাঁর এ সফর বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমতকে প্রভাবিত করতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ভারতের বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদ ও নারী সংগঠনসমূহও এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির কথা বলা যায়। সংগঠন দুটি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবলভাবে অনুপ্রাণিতকরাসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংগঠনে বিশেষভাবে কাজ করেছিল। ফেডারেশনের শ্রীমতি রেনু চক্রবর্তী, শ্রীমতি বিমলা ফারুকী এবং মহিলা সমিতির শ্রীমতি গীতা মুখার্জী এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। ফেডারেশন ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের সহযোগিতার জন্য সর্বভারতীয় পর্যায়ে প্রচারণা চালিয়েছিল।[১৯২] এ প্রসঙ্গে ভারতীয় স্যোসালিস্ট পার্টির নেত্রী মিসেস অরুণা

---

১৯০. সাঈদা জামান, *বাংলাদেশের নারী চরিতাভিধান*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪
১৯১. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান* ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩-৩৬
১৯২. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

আসফ আলীর বলিষ্ঠ ভূমিকার কথাও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক হিসেবে নিজ দেশ ভারতীয়দের ছাড়াও তিনি ইংল্যান্ড ও বিদেশে জনমত সংগঠনে কাজ করেছিলেন।[১৯৩]

উপরিউল্লেখিত নারীরা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ও জনমত গঠনে বিদেশি কয়েকজন নারীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন আলবেনীয় বংশোদ্ভূত ভারতে বসবাসকারী মাদার তেরেসা, যুক্তরাজ্যের মেরিয়েটা প্রকোপ, ব্রিটিশ নাগরিক পল কানেট -এর স্ত্রী এলেন কানেট, আইরিশ বংশোদ্ভূত ব্যারিস্টার নোভা শরীফ, যুক্তরাষ্ট্রের ফোক গায়িকা জোয়ান বায়েজ, আর্জেন্টিনার খ্যাতনামা কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পে প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে মাদার তেরেসা শরণার্থীদের জন্য বেসরকারি সংস্থার সাহায্যে ত্রাণকার্য চালিয়েছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ত্রাণসামগ্রী বাংলাদেশে পৌঁছাতে গিয়ে বন্দি হন এলেন কানেট, মেরিয়েট প্রকোপ মুক্তিযুদ্ধের প্রচারকাজে ব্যবহারের জন্য নিজের বাড়ি দিয়েছিলেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন জোয়ান বায়েজ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পে।[১৯৪]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গঠনে নারীসমাজের পূর্বোক্ত গৌরবময় ভূমিকার বিপরীত ধারায় কতিপয় নারী মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অপপ্রচার ও বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান, রাজিয়া ফয়েজ এবং ড. ফাতিমা সাদেক প্রমুখ অন্যতম ছিলেন। এদের মধ্যে রাজিয়া ফয়েজ পাকিস্তান সরকারের প্রেরিত প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন।[১৯৫]

৯.৫.ছ: স্বাধীন বাংলা বেতার ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারী

মুক্তিযুদ্ধোর সময় মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধকরণে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আর এসব মাধ্যমেও বাংলার নারীসমাজের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং দেশবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিতকরণে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের[১৯৬] ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। এটি মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট লাইন হিসেবে কাজ করেছিল বলা যায়। এই ঐতিহাসিক বেতার কেন্দ্রটি পরিচালনার সাথে প্রথম

১৯৩. *ঐ*, পৃ. ১২৮-১২৯

১৯৪. হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ৮ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

১৯৫. বিশদ বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য শেখ আবদুল মান্নান, *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালির অবদান*, জোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫২-৫৩; বাসন্তীগুহ ঠাকতুরতা, *একাত্তরের স্মৃতি*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৬৬ এবং প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ্ ও অন্যান্যা (সম্পা.), বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৯৩

১৯৬. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি অস্থায়ী বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ বেতার।

থেকেই বিভিন্নভাবে নারীরা জড়িত ছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশন সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন ডা. মঞ্জুলা আনোয়ার এবং কাজী হোসনে আরা। এই বেতার কন্দ্রে হতে সম্প্রচারিত সঙ্গীত, নাটক, কথিকা ও ধর্মীয় আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থাপনায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ বেতার থেকে জল্লাদের দরবার, কাঠগড়ার আসামি, রণাঙ্গনে চিঠি, ইয়াহিয়া জবাব দাও ও সোনার বাংলা ইত্যাদি বিখ্যাত ও বিপুল জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো। সোনার বাংলা অনুষ্ঠানে মা-এর ভূমিকায় অভিনয় করতেন মাধুরী চট্টোপাধ্যায়। নিয়মিত কলা কুশলী ছাড়াও কিছু বুদ্ধিজীবী এবং সুধী জ্ঞানীজন অনিয়মিতভাবে কথিকা উপস্থাপক ও ছোট গল্পকার হিসেবে অংশ নিতেন। এসব অনুষ্ঠানাদিতে বলিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিলেন বেগম মুশতারী শফী, ডা. নুরুন্নাহার জহুর, আইভি রহমান, কুলসুম আসাদ, নূরজাহান মাজহার, রাফিয়া আক্তার ডলি, মাহমুদা খাতুন, বাসনা গুণ, রেখা আক্তার, ডলি জাহানুর, দীপা ব্যানার্জী, শওকত আরা আজিজ ও পারভীন আক্তার প্রমুখ।[১৯৭] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পরিকল্পনা করা হয় বেগম মুশতারী শফীর চট্টগ্রামস্থ নিজস্ব বাসভবনে। ট্রানজিস্টারের মাধ্যমে গোপনে ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি, আকাশ বাণী ও অন্যান্য দেশের বাংলা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সংবাদ, মতামত ও পর্যালোচনা শুনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে, প্রচারের ম্যাটেরিয়াল, সংবাদ বুলেটিন ইত্যাদি তৈরি করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন বেগম মুশতারী শফী। তিনি আগস্ট মাসে কলকাতায় গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শব্দ সৈনিক ও নাট্য শিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি উম্মে কুলসুম ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। বেতারের নিয়মিত নাটিকায় অংশগ্রহণ ছাড়াও 'জল্লাদের দরবার' নাটকে অংশগ্রহণ এবং 'অগ্নিশিখা' অনুষ্ঠানে গাজীউল হক রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'এহিয়া বধ কাব্য' আবৃত্তিকরা এবং প্রতি সপ্তাহে বাংলার রণাঙ্গনে নারী স্বরচিত কথিকা পাঠ করা ছিল বেগম মুশতারী শফীর প্রধান কাজ।[১৯৮] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে মুক্তিযুদ্ধের উপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন কাজী রোজী।[১৯৯]

যাদের প্রচেষ্টায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগ সমৃদ্ধ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জারিন আহমেদ ও পারভীন হোসেন।[২০০] উল্লেখ্য যে, জারিন আহমেদ এর প্রকৃত নাম নাসরিন আহমেদ শিলু। তিনি জাতীয় পরিষদ সদস্য বদরুন্নেছা আহমেদ এর কন্যা এবং পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

১৯৭. মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০০ পৃ. ৮৪-৮৭ ; বেগম মুশতারী শফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫ ; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মার্চ, ১৯৯৯

১৯৮. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ১৬৫; বেগম মুশতারী শফী, *স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০ ও ২২৮

১৯৯. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ২৩৫

২০০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৩

অধ্যাপক ও প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) হিসেবে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। নাসরিন আহমেদ শিলুর আত্মীয় পরিজনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তাঁ ছদ্মনাম রাখা হয়েছিল জারিন আহমেদ। ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ নামেই প্রতিদিন সংবাদ পাঠ করতেন।[২০১] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সংবাদ পর্যালোচনা করতেন শেফালি দাস। তিনি বিপ্লবী কবিতার অংশ বিশেষসহ শ্লোগানও পাঠ করতেন।[২০২]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যেসব কণ্ঠশিল্পী তাদের গানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাসহ মুক্তিকামী আপামর জনসাধারণকে উজ্জীবিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন সন্‌জিদা খাতুন, কল্যাণী ঘোষ, শেফালি ঘোষ, হেনা বেগম, লাকী আকন্দ, স্বপ্না রায়, রূপা খান, মাধুরী আচার্য, নমিতা ঘোষ, রমা ভৌমিক, লায়লা জামান, মনজুলা দাস গুপ্ত, উমা চৌধুরী, ঝর্ণা ব্যানার্জী, দীপা ব্যানার্জী, কল্যাণী মিত্র, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, লীনা দাস, সকিনা বেগম, অনিতা বসু, মিনু রায়, রীতা চ্যাটার্জী, শান্তি মুখার্জী, ভারতী ঘোষ, শেফালি স্যানাল, শিখা দাস, মিহির লালা, গীতশ্রী সেন, মলিনা দাস, বুলবুল মহালনবিশ, মিতালী মুখার্জী ও আফরোজা মামুনসহ আরও অনেকে। [২০৩] উল্লেখ্য, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম নারী শিল্পী ছিলেন নমিতা ঘোষ।[২০৪] কল্যাণী ঘোষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন। 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, নোঙ্গর তোল তোল, তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিবসহ অসংখ্য গানের কণ্ঠ দিয়ে তিনি মুক্তিবাহিনী এবং স্বাধীনতার পক্ষে জনসাধারণকে প্রেরণা যুগিয়েছেন।[২০৫] শাহনাজ রহমতুল্লাহ বেতার কেন্দ্রে যাননি, কিন্তু তার গান (সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা-স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হলে মুক্তিযোদ্ধাসহ দেশবাসী ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত হয়। যন্ত্র সঙ্গীতেও অন্যান্যদের সাথে নারীরা অংশ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রুমু খান।[২০৬]

চলচ্চিত্র ও বেতারের নাট্য ও অভিনয় শিল্পীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বিভিন্ন নাটক উপস্থাপনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে সজীব করে তোলে। এরা হলেন, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা দেবী, করুণা রায়, নন্দিতা

---

২০১. ফরিদা আক্তার (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

২০২. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড , পৃ. ১৫০

২০৩. মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি, *মুক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধিজীবী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩; রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, মুক্ত ধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২৫; তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.১৬২

২০৪. *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬

২০৫. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪

২০৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মার্চ, ১৯৯৯

চট্টোপাধ্যায়, কাজী তামান্না, উম্মে কুলসুম, সুফিয়া খাতুন, তাজিন শাহনাজ মুর্শিদা ও দিলশাদ বেগম প্রমুখ।[২০৭]

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের নিরস্ত্র সংস্কৃতিজীবীরা তাঁদের কণ্ঠ, অভিনয় প্রতিভা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক গুণাবলি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত রাখার জন্য বিভিন্ন সংস্কৃতিজীবীগণ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও দলের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেন। এসব সংগঠনের মধ্যে অন্যতম ছিল 'মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'। এর উদ্যোক্তা ও সভানেত্রী ছিলেন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সন্‌জিদা খাতুন এবং সম্পাদক ছিলেন মাহমুদুর রহমান। অনুপ্রেরণা মূলক গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করা ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। শিল্পী সংস্থার সদস্যগণ বেশ কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ট্রাকে করে বিভিন্ন ক্যাম্প ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনতার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতেন। এ সংস্থাটি দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশের নিপীড়নের কথা জানায়। মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার নারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ডালিয়া নওশীন, কল্যাণী ঘোষ, উমা চৌধুরী, শীলা দাস, শর্মিলা দাস, বুলা ওসমান, শাহীন সামাদ, দীপা বন্দোপাধ্যায়, সুমিতা নাহা, লায়লা খান, মিলিয়া গণি, মিঠু চক্রবর্তী ও মোমেনসহ আরও অনেকে।[২০৮] বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা ২৫০টিরও বেশি অনুষ্ঠান করেছিল বলে জানা যায়। সংস্থাটির আংশিক কার্যক্রমের ওপর ভিত্তির করে যুদ্ধ চলাকালেই 'মুক্তির গান' নামে যে চলচ্চিত্রটি তৈরি করা হয়েছিল এতে নারী অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন লায়লা জামান, লুবনা জামান, শাহীন মাহমুদ, শারমিন সোনিয়া মোর্শেদ ও তাজিন শাহনাজ মোর্শেদ প্রমুখ।[২০৯]

বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠা 'বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী'র প্রধান উপদেষ্টা জাতীয় পরিষদ সদস্য নূরজাহান মোর্শেদ। এই শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্যোগে শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ১২ ডিসেম্বর কলকাতায় 'বিক্ষুব্ধ' নামে একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশন করা হয়। এতে অন্যান্য শিল্পীদের সাথে নমিতা ঘোষ অংশ নিয়েছিলেন।[২১০] মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শিল্পী কল্যাণী ঘোষের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী'। এ সংগঠনের সদস্য শিল্পী মিতালী মুখার্জী, পূর্ণিমা দাস চৌধুরী, উমা ঘোষ, জয়ন্তী লালা ও দেবী চৌধুরী প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠান করে অর্থ সংগ্রহ করেন।[২১১] স্বাধীন বাংলা বেতার

---

২০৭. মেহেরুন্নেসা মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪-৮৭

২০৮. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

২০৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

২১০. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

২১১. কল্যাণী ঘোষের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পরিবেশিত তথ্য, শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

কেন্দ্রের শিল্পী স্বপ্না রায়, মাধুরী আচার্য, নমিতা ঘোষ, অরুণা সাহা ও রমা এবং তাঁদের নয়জন পুরুষ সহশিল্পী মিলে ১৪ সদস্যের একটি সাংস্কৃতিক দল গঠন করেছিলেন। এ দলটি ভারতের কানপুর, বোম্বে ও গোয়া প্রভৃতি স্থানে সংগীতানুষ্ঠান করে শরণার্থীদের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।[২১২] ভারতের মেঘালয়ে নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থের উদ্যোগে গঠিত সাংস্কৃতিক দলের মূল দায়িত্বে ছিলেন মনীষা চক্রবর্তী। এ সাংস্কৃতিক দলটি ঘরোয়া পরিসরে নিবেদিতা দাশের লেখা কয়েকটি গীতি নকশা পরিবেশন করে শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিল।[২১৩] ভারতের শিবচরে 'বাংলাদেশ গণমুক্তি শিল্পী সংস্থা' নামে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতি সংগঠনের সাথে ভারতী ভৌমিক, আরতি ধরও নাসরিন প্রমুখ শিল্পীগণ যুক্ত ছিলেন। হাইলাকান্দিতে শিবু ভট্টাচার্য ও সজেয় শ্যামের উদ্যোগে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক দলের সাথে যুক্ত নারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রণতী শ্যাম, অবনী চৌধুরী, ছবি দত্ত, মুনমুন সোম, মহুয়া দেব ও মধুমিতা দেব প্রমুখ।

সদ্য প্রয়াত চলচ্চিত্র অভিনয়শিল্পী কবরী সারোয়ার মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন সময়ে ভারতে গিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে বাংলাদেশের দুঃস্থ মানুষদের সাহায্য করেন। কলকাতায় হাইকমিশনার হোসেন আলীর সাথে পরামর্শক্রমে 'জয় জোয়ান নাইট' নামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে শ্রীমতি নার্গিস, সুনীল দত্ত, ধর্মেন্দ্র সিনহা অংশুমান রায় ও সলিল চৌধুরী প্রমুখ প্রখ্যাত ভারতীয় শিল্পীগণ অংশ নিয়েছিলেন।[২১৪] বোম্বেতে সর্বদল সংহতি সম্মেলনে (All party Bangladesh solidarity communication) একটি ভিন্নধর্মী অভিনয়ের মাধ্যমে কবরী বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থার কথা বুঝিয়ে দেন। এই ছবিটি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর বাংলাদেশের ওপর বিশ্ববাসীর দৃষ্টি পড়ে এবং তারা বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা জানার চেষ্টা করে।[২১৫]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত করে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনে জীবনপণ যুদ্ধ করার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং এর বাইরে সংস্কৃতিজীবীদের উদ্যোগে গড়ে উঠা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে নারী শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এভাবে তারাও হয়ে যান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাসের গর্বিত অংশীদার।

৯.৫.জঃ মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে সশস্ত্র ভূমিকায়

---

২১২. আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সেই মেয়েটি*, ত্রিভুজ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৩০-৩২

২১৩. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২

২১৪. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬

২১৫. মেহেরুন্নেসা মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪-৮৭

বাংলাদেশের নারীসমাজ মুক্তিযুদ্ধের সময় কেবল সহায়ক শক্তির হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন, এমনটা নয়। মুক্তিযুদ্ধে নারীরা রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে নিয়েও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশপ্রেমিক নারীরা যে যেখানে সুযোগ পেয়েছেন যেমন ব্যক্তিগত গেরিলা বাহিনীর অধীনে, সাব সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে, নিয়মিত সেনাবাহিনী ও সুইসাইড স্কোয়াডের অধীনে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অতঃপর তাদের অনেকেই বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে সরাসরি রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। জীবনের মায়া ত্যাগ করে শত্রু সেনাদের ছাউনি অথবা গাড়িতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের ধ্বংস সাধনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। শুধু রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত নারীরাই নয়, গ্রামগঞ্জের অসংখ্য নারী দেশপ্রেম, প্রতিশোধ ও শত্রু হননের অদম্য ইচ্ছায় পুরুষের সঙ্গে এক কাতারে শামিল রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন। এমনকি সামাজিক বাস্তবতার কারণে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে অনেক নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে যুদ্ধ করেছেন। সশস্ত্রযুদ্ধে নারীদের তুলনায় পুরুষদের অংশগ্রহণ ও কৃতিত্বের পাল্লা ভারি হলেও রণাঙ্গনে নারীদের সশস্ত্রযুদ্ধে অংশগ্রহণকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আলোচ্য অধ্যায়ে সন্নিবেশন করা সম্ভব নয় এবং এটি বেশি প্রাসঙ্গিকও নয়। তাই দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকজন সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হলো।

রওশন আরা বেগম একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী রওশন আরা ছিলেন স্বেচ্ছামৃত্যুকে বেছে নেয়া অন্যতম নারী মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের সূচনা পর্বে নিজ জীবন বিসর্জন দিয়ে প্রতিরোধের প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তিনি। পাকিস্তানিদের আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্দীপ্ত হয়ে রওশন আরা বেগম বুকে মাইন বেঁধে পাকিস্তানি বাহিনীর ট্যাংকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নিজের দেহকে ছিন্ন ভিন্ন করে ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছিলেন একটি পুরো প্ল্যাটন ট্যাংক।[২১৬] দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গকারী এ বীর নারীর নাম শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নেই।

পাবনার রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য ছিলেন শিরিন বানু মিতিল (১৯৫০-২০১৬ খ্রি.)।[২১৭] মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্রী এবং ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ২৬ মার্চের পূর্বেই প্রতিরোধের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২৭ মার্চ রাতেই পাবনা পুলিশ লাইনে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে নারীরা অংশ নিতে এগিয়ে আসে। ২৮ মার্চ পাবনা টেলিফোন একচেঞ্জে দখল নেওয়ার জন্য সংগঠিত যুদ্ধে অংশ নেওয়া একমাত্র নারী যোদ্ধা ছিলেন শিরিন বানু মিতিল। এ যুদ্ধে ৩৬ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ২ জন শহীদ হন। এভাবে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে ৩০ মার্চ পাবনা শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের

---

২১৬. রোকেয়া বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১-১৪২

২১৭. শিরিন বানুর বাবা শাহজাহান মোহাম্মদ কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি পাবনা জেলা ন্যাপ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত এমপি ছিলেন তিনি।

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২১৮] ৩১ মার্চ পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমে শিরিন বানু মিতিল পুরুষের ছদ্মবেশে কাজ করেন।[২১৯] এক পর্যায়ে ভারতীয় স্টেটস্ম্যান পত্রিকার সাংবাদিক মানস ঘোষের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি তার ছবিসহ সাক্ষাৎকার টি পত্রিকায় প্রকাশ করলে একদিকে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে এক ধরনের চেতনা জাগ্রত হয়। তবে এর ফলে পুরুষবেশে যুদ্ধ করার সুযোগ তিনি হারিয়ে ফেলেন।[২২০] পাবনায় পাকবাহিনীর আধিপত্য পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে মিতিল বানু অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভারত যান এবং সেখানে নারীদের একমাত্র সশস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গোবরা ক্যাম্পে যুক্ত হন। ২০ এপ্রিল তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[২২১] তাছাড়া তিনি শরণার্থী ক্যাম্পে সেবাদান, মুজিব নগর সরকারের সাথে যোগাযোগ ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবেও কাজ করেন।

কুমিল্লার বকুল মোস্তফা ছিলেন একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ইডেন কলেজের স্নাতক শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেই বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ) এর উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল) মাঠে আয়োজিত সামরিক প্রশিক্ষণে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে যে মিছিলের ছবি প্রায়ই দেখা যায়, সেই মিছিলে বকুল মোস্তফাও ছিলেন। ২৫ মার্চের পর তিনি গ্রামের বাড়ি কুমিল্লাতে গিয়ে স্থানীয় লোকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি কুমিল্লা নগর ছাত্রলীগের সভাপতি ও বিএলএফ'র সক্রিয় সদস্য মনিরুল হকের সহযোগিতায় আরও অনেক মেয়েসহ ৪২ জনের একটি দল দিয়ে আগরতলা চলে যান এবং লেম্বুছড়া ক্যাম্পে ১৫ দিন ভারী ও হালকা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেন। এরপর আগরতলা বিমান বন্দরে, গেরিলা প্রশিক্ষণের স্পেশাল স্কোয়াড গঠন করার জন্য ৭ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর বিশালগড় এলাকা দিয়ে একটি ট্রুপের সাথে যুদ্ধে তিনি অংশ নেন এবং এ যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর বাংকারে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন।[২২২]

মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনের অন্যতম সশস্ত্র সাহসী বীরযোদ্ধা ছিলেন বাগেরহাটের বেসরগতি গ্রামের হালিমা খাতুন। দেশপ্রেমিক এ নারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাগেরহাটের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলামের অধীনে যুদ্ধে যোগ

---

২১৮. মেজর রফিকুল ইসলাম, *নরহত্যা ও নারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

২১৯. *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৯৬; ফরিদা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

২২০. মেজর রফিকুল ইসলাম পি. এস. সি, *নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা '৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪; আমিরুল ইসলাম, আহমাদ, মাযহার আসলাম সামী (সম্পাদিত), '*শত মুক্তিযোদ্ধার কথা*, অনুপম প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৮

২২১. *আজকের কাগজ*, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৯৬; হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ৯ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৭-২৮

২২২. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২১ মার্চ, ২০০০; আসমা পারভীন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ*, বিশ্বসাহিত্যভবন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৯৭

দেন। হালিমা খাতুন প্রথমাবস্থায় ক্যাম্পে রান্না ও অস্ত্র সংরক্ষণের কাজ করতেন। পরবর্তীতে কমান্ডারের কাছ থেকে অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ নিয়ে শত্রু অধিকৃত বাংলাদেশের দশমহল, মাহুতকান্দা, বরইগুনা, খালিশপুর, বেসরগতি, ভুটাপুর, সন্তোষপুর ইত্যাদি এলাকায় সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন বীর নারী হালিমা খাতুন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্র স্থানান্তরের কাজও করতেন।[২২৩]

যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার দোহাকুলার ইউনিয়নের ইন্দ্রগ্রামের সাহসী ও প্রাণোচ্ছল কিশোরী হালিমা পারভীন। ইসরাইল বিশ্বাসের কন্যা হালিমা পারভীন একই গ্রামের কিশোরী ফাতেমা বেগম এবং নারিকেলবাড়ীয়া ইউনিয়নের মালঞ্চী গ্রামের রোকেয়া খাতুনসহ মুক্তিবাহিনীর ৮ নং সেক্টরের বাঘারপাড়া সাব সেক্টরের কমান্ডার কাওসার আলীর তত্ত্বাবধানে যুদ্ধে অংশ নেন। হালিমা পারভীন প্রথমে মালঞ্চী ক্যাম্পে বাঙালি সৈনিক আকমল হোসেনের নিকট গ্রেনেড ব্যবহার ও থ্রি নট রাইফেল চালনার প্রশিক্ষণ নেন। পরবর্তীতে তিনি রোকেয়া খাতুন ও ফাতেমা বেগমকে নিয়ে এপ্রিল মাসে ৮ নং সেক্টরের কমান্ডারের প্রদত্ত ১৬ টি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। হালিমা পারভীন যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি বাঘারপাড়া বাজার ও সড়কের দুটি ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়াসহ বেশ কয়েকটি সফল অপারেশনে সম্মুখভাগে থেকে অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়াও হালিমা পারভীন ও তাঁর পূর্বোক্ত দুই সহযোদ্ধা ছদ্মবেশে গোয়েন্দা কাজ করতেন। তারা তথ্য আদান-প্রদানসহ মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার সংগ্রহপূর্বক তা ক্যাম্পে ক্যাম্পে পৌঁছে দিতেন।[২২৪]

মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রহাতে রণাঙ্গনের বীর নারীযোদ্ধাদের একজন ছিলেন বরিশালের স্বরূপকাঠি থানার গণকপতিকাঠি গ্রামের কুলবধু শোভা রাণী মণ্ডল। পাক হানাদার বাহিনী গণকপতিকাঠি গ্রামে হামলা চালিয়ে শোভা রাণীর স্বামী রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাসসহ অনেককে হত্যা করায় তাঁর মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠে এবং পাক হানাদারদের নিধন করে দেশ স্বাধীনের লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি কমান্ডার তারিকের অধীনে ইন্দুকাঠি অপারেশনে অংশ নেন। এ যুদ্ধে বেশ কযেকজন শত্রু সেনা নিহত হয়েছিল। এক পর্যায়ে শোভা সিরাজ শিকদারের 'পূর্ব বাংলা জাতীয় মুক্তিবাহিনীর' সাথে যুক্ত হন এবং কুরিয়ানা পেয়ারা বাগান যুদ্ধে অংশ নেন। তবে শক্তিশালী পাকবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে তাদের গুলি শেষ হয়ে গেলে শোভা রাণী ও তার কয়েকজন সহযোদ্ধা পাকসেনাদের হাতে গ্রেপ্তার হন। ১৪ দিন ধরে তার ওপর চলে পাশবিক নির্যাতন তবে এতে তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। মুক্তি পেয়ে আবারো যুদ্ধে যোগ দেন। শোভা অস্ত্র চালনায় এতই পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যে, তিনি দুহাতে দুটো অস্ত্র চালাতে পারতেন। তিনি লুঙ্গি ও শার্ট পরে পুরুষবেশে অনেক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। মাঝিরা, শর্ষিনা, নেছারাবাদ, কাউখালিসহ অসংখ্য মরণপণ যুদ্ধে অংশ নেন শোভা। লাশের ওপর

---

২২৩. মেহেরুন্নেসা মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩- ২৩৪

২২৪. দৈনিক *যুগান্তর*, ১৯ ডিসেম্বর, ২০০৪; আসমা পারভীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

ভর দিয়ে নদী সাঁতরে গিয়ে পার হয়ে যেতেন তিনি।[২২৫] শ্রীমন্তকাঠি গ্রামে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর ১২৮ জন নিহত হলে মুক্তিবাহিনী প্রচুর অস্ত্র ও রসদ করায়ত্ত করে নেয়। এভাবে শোভা রাণী মণ্ডল একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ইতিহাসে নিজের স্থান করে নেন।[২২৬] তবে যুদ্ধ শেষে এ বীর নারী আত্মীয় পরিজনদের কাছে আশ্রয় না পেয়ে ঝালকাঠি নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে আশ্রয় নেন। ১৯৮২ সালে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে শাহানা পারভীন শোভা নাম ধারণ করেন।

যশোরের পুলিশ কর্মকর্তা ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী আবদুল জব্বার ও মমতাজ বেগম দম্পতির কন্যা সালেহা বেগম। বাবা মায়ের উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণে জন্য যুদ্ধের ১৫ দিন পূর্বে তিনি ক্যাপ্টেন জাহিদ কর্তৃক ট্রেনিং গ্রহণ করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ভারতের কলকাতায় নেতাজি সুভাষ বোসের বাসভবনে ফরওয়ার্ড ব্লক- এর অফিসে স্পায়োনেজ, নার্সিং কোর্স, ব্লক আয়োজনে তিনি ৭ দিন স্পায়োনেজ ট্রেনিং গ্রহণ করেন। বি এস এফ ক্যাম্প দত্ত ফুলিয়া। এছাড়া তিনি আরও ১৩/১৪ জন মেয়ে নিয়ে বনগাঁয় ক্যাম্প গঠন করে দত্তফুলিয়া থেকে বর্ডার বেল্টে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র হাতে যশোরের বিভিন্ন এলাকা যেমন বারান্দীপাড়া, লক্ষ্মণপুর, বাহাদুরপুর, সারসা, মহেশপুর, ৯ নং সেক্টরের অধীনে মার্চ-এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ করেন।[২২৭]

বরিশালের মুলাদী থানার অন্তর্ভুক্ত পাতারচর গ্রামের শাহ আলী আহমদের মেয়ে করুণা বেগমও একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর স্বামী শহীদুল হাসান ছিলেন কাজীর চর আওয়ামী লীগের সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধে তার স্বামী শহীদুল হাসান শহীদ হলে করুণা বেগম তিন বছরের শিশু সন্তানকে রেখে নিজেও দেশকে শত্রুমুক্ত করতে অস্ত্র হাতে তুলে নেন।[২২৮] তিনি অন্যান্য নারীদের সঙ্গে বরিশালের মুলাদী থানার কুতুববাহিনীর কাছে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। একটি গেরিলা দলের কমান্ডার হিসেবে তিনি ছদ্মবেশে শত্রু ছাউনির ওপর গোলা নিক্ষেপ করে কখনও ভিখারীর বেশে, কখনও গ্রাম্য কুলবধুর বেশে শত্রুশিবিরে অপারেশন চালাতেন। বরিশাল জেলার বাসবা, কাশিমাবাদ বাটাজোর, নন্দিবাজার ও টরকীতে তিনি খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।[২২৯] করুণা বেগমের সবচেয়ে বড় অপারেশন ছিল পাকবাহিনীর মাহিলারায় ঘাঁটি আক্রমণ। পরিকল্পনা অনুসারে করুণা বেগম তাঁর অনুসারী ৫ জন নারী ও ১০ জন পুরুষ নিয়ে ঐ ঘাঁটি আক্রমণ করেন। অপারেশন

---

২২৫. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৭ মার্চ, ২০০০

২২৬. নীলকমল বিশ্বাস, *যুদ্ধে যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ*, বাণীমহল প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩০০; শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১-৮২

২২৭. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

২২৮. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৬; *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৪ জুন, ১৯৭২

২২৯. *ঐ*

চলাকালে তিনি নিজে শত্রু সেনাদের ওপর ৫ টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছিলেন। ৪ ঘণ্টাব্যাপী এ যুদ্ধে ১০ জন পাক সেনা হতাহত হয়। করুণা বেগমের নিজেও ডান পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন।[২৩০]

রণাঙ্গনে সশস্ত্রযুদ্ধে অংশ নেওয়া আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বরিশালের আটঘর কুড়িয়ানা ইউনিয়নের স্বরূপকাঠি গ্রামের বীথিকা বিশ্বাস। গণেশচন্দ্র বিশ্বাস ও মা যামিনী বিশ্বাসের কন্যা বীথিকা ফজলুল হক কলেজের ছাত্রী এবং ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এপ্রিল মাসে ভাই সমীরণসহ তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।[২৩১] তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন আরেক সাহসী তরুণী শিশির কণা। পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা ক্যাপ্টেন মাহমুদ আলম বেগ স্থানীয় মানুষকে সংগঠিত করে কুড়িয়ানায় যে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করেন, বীথিকা ও শিশির কণা এতে যোগ দিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাদের দেখাদেখি শোভা, শাহানা, পারভীন, কণা প্রমুখ আরো কয়েকজন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর তারা যুদ্ধে অংশ নেন। এ সময় বীথিকা বেয়নেট চার্জ করে দু'জন রাজাকারকে হত্যা করেছিলেন। এ ঘটনার পর ক্যাপ্টেন বেগ তাকে প্রথম শ্রেণির যোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ফ্রন্টলাইনে থেকে তিনি একের পর এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করেন। তবে বীথিকার সবচেয়ে বড় অপারেশন ছিল ১৯৭১ সালের ১১ জুলাই স্বরূপকাঠি নদীতে নোঙ্গর করা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি গানবোটে গ্রেনেড চার্জ। ক্যাপ্টেন বেগের নির্দেশে কোমর সমান পানিতে নেমে কচুরি পানার আড়ালে থেকে তিনি ও সহযোদ্ধা শিশির কণা শত্রু পক্ষের ঘাঁটি ও তিনটি লঞ্চে গ্রেনেড ছুঁড়েন। পাক বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের মুখে বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল প্রয়োগে তাঁরা প্রাণে বেঁচে যান।[২৩২]

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পটুয়াখালী মহিলা কলেজে যে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল সেখানে নেন মেহেরুন্নেসা রুনু, মমতাজ বেগম, এস এম আনোয়ারা আনু ও এস এম মনোয়ারা বেগম মনু। এদের মধ্যে আনোয়ারা ও মনোয়ারা ছিলেন সহোদর।[২৩৩] তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। দু'বোনের কর্মতৎপরতার কারণে পাকবাহিনী তাদের দু'বোনকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করায় তারা সুন্দরবন এলাকায় চলে যান। সেখান থেকে মেজর জিয়াউদ্দিনের সহায়তায় শরণখোলা ক্যাম্পে গিয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন পরিতোষ ও মেজর জিয়াউদ্দিনের কাছে অধিকতর প্রশিক্ষণ নেন। অতঃপর সাহসী এ দু'যোদ্ধা বাগেরহাট জেলার বিখ্যাত রায়েন্দা

---

২৩০. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৪ জুন, ১৯৭২; আতোয়ার রহমান, *একাত্তর: নির্যাতনের কড়চা*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৫৯-৬০

২৩১. দৈনিক *ভোরের কাগজ*, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৮; শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২-৮৩

২৩২. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-৩১

২৩৩. আনোয়ারা ও মনোয়ারা ছিলেন রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। তাঁদের বাবা শরীফ হোসেন সরদার একে ফজলুল হকের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। তাদের ভাই সরদার আবদুর রশীদ আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তাদের মা প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে যুক্ত না থাকলেও রাজনীতি সচেতন ছিলেন।

অপারেশনসহ ফুলতলা, কচুয়া, মংলা মোড়লগঞ্জ, তুষখালি, মাছুয়া প্রভৃতি স্থানে সশস্ত্রযুদ্ধে অংশ নেন। মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে আনোয়ারা ও মনোয়ারাসহ ১০ জন নারী সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে সালেহা তাসলিমা, বীথি, মিষ্টি, বকুল ও সবিতার নাম উল্লেখযোগ্য।[২৩৪]

মুক্তিযুদ্ধের সময় ঝালকাঠির কেওতা গ্রামের হাবিবুর রহমানের মেয়ে আলমতাজ বেগম ছবি দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী দু'ভাই শহীদ হুমায়ুন কবীর ও মেজো ভাই শহীদ ফিরোজ কবীরের অনুপ্রেরণা এবং ভাইয়ের বন্ধু পরবর্তীকালে তাঁর স্বামী সেলিম শাহনেওয়াজের অনুপ্রেরণা ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তারা কমান্ডার সিরাজ সিকদারের তত্ত্বাবধানে ছিল। ৯ নং সেক্টরের যোদ্ধা আলমতাজ বেগম কয়েকটি অপারেশনে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গাবখান অপারেশন। গাবখান নদীতে পাকিস্তান বাহিনীর গানবোটে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি গ্রেনেড চার্জ করেছিলেন। এতে শত্রুপক্ষের ৩ জন মারা যায়। কাজের স্বার্থে ছেলেদের মতো লুঙ্গি ও শার্ট পরে অনেক অপারেশনে অংশ নিয়েছেন তিনি। এছাড়া তিনি স্বরূপকাঠি অপারেশনে অংশ নেন। তাঁর সাথে সুভাষিনী, শোভা, মনজু, বীথিকা, মনিকা, শিখা, কনিকা রায়, রেবা, সন্ধ্যা, নিভা, লাল বিবিসহ আরও অনেক নারী রণাঙ্গণে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছেন।[২৩৫] মুক্তিযুদ্ধের কারণে তাঁকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর বাবা মাকে হত্যা করা হয়। যুদ্ধের ৬ মাসের ব্যবধানে রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসীরা তার স্বামীকেও হত্যা করে।[২৩৬] নবম সেক্টরে অস্ত্র ট্রেনিং ও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বরিশালের সুভাষিনী শোভা। তিনি ৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে সুসাইড স্কোয়াড গড়ে তুলেছিলেন। বেনীলাল গুপ্তের অধীনে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেন তিনি। কুড়িয়ানা খালের মধ্যে পাকবাহিনীর স্পীড বোটে গ্রেনেড ছুঁড়ে তা ধ্বংস করেন শোভা। একবার তিনি ধরা পড়ে বরিশাল জেলখানায় হাজত বাস করেন। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে ভারতে চলে যান এবং সেখানে ট্রেনিং নিয়ে এসে আবার যুদ্ধে অংশ নেন। বরিশালের আরেক সাহসী অস্ত্রযোদ্ধা রোজিনা আনছারী। তিনি পটুয়াখালী, আমতলী, পাথরঘাটা, বামনা প্রভৃতি স্থানে পাকিস্তান সেনাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন।[২৩৭] আমতলী অপারেশনে অংশ নেওয়া ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধাদের দলে তিনিও ছিলেন। এ যুদ্ধে ১৫০ জন পাকসেনার মধ্যে ২০ জন নিহত এবং অনেকে আহত হয়। রোজিনা আনছারী নভেম্বর মাসে বুকাবুনিয়ার মেজর মেহেদী আলী ইমামের সেকেন্ড ইন কমান্ড আলমগীর হোসেনের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ

---

২৩৪. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-৩৫; সেলিনা হোসেন, (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, *২য় খণ্ড*, পৃ. ২৮৫-৮৬

২৩৫. শচীন কর্মকার, (সম্পাদিত), *মুক্তিযোদ্ধা বিজয় মিলন, ২০০০ স্মরণিকা*, মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টর স্মরণিকা, ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউট মিলনায়তন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৩

২৩৬. মেহেরুন্নেসা মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১৩

২৩৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত* ১০ম খণ্ড ,পৃ.৬৩২-৩৩

গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি বুকাবুনিয়া ক্যাম্পে সেবিকা ও ইনফর্মার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে আলমগীরের নেতৃত্বে বেশ কিছু প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেন।[২৩৮]

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার আশালতা বৈদ্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। এ সাহসী তরুণী এলাকার ৪৫ জন নারীকে নিয়ে গড়ে তোলেছিলেন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা দল। তিনি হেরেকান্দি হাইস্কুল ও লেবুরবাড়ী প্রাইমারি স্কুলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অস্ত্র চালনা, গেরিলাযুদ্ধের কৌশল ও নার্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ৩০০ জন নারীর একটি দলের নেতৃত্ব লাভ করেন। তিনি ১৯৭১ সালের ২৪ জুন হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে হরিনাটি, কোটালিপাড়া শিকের বাজার, রামশীল ও ঘাঘর বাজারে যুদ্ধে সম্মুখ সারিতে অংশ নেন। যুদ্ধে পাকিস্তানিদের বেশ কয়েকজন হতাহত হয় এবং ২৫ জনকে বন্দি করা হয়। শহীদ হন ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা। আশালতা ২২ টি যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়া আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাও করতেন।[২৩৯] দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিনের সাথে ঢাকায় এসে আশালতা বৈদ্য বঙ্গবন্ধুর নিকট তার অস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন। কাশিয়ানির মেহেরুন্নেসা মেরী ও একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। দেশপ্রেম ও পারিবারিক অনুপ্রেরণায় তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিকে তিনি অস্ত্র সরবরাহ, ছদ্মবেশে তথ্য আদান প্রদান ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাযত্ন করতেন। তিনি ওড়াকান্দি ধাম ক্যাম্প রাতইল স্কুল প্রাঙ্গণে চাপ্তা সাব অস্ত্র ও গেরিলা যুদ্ধ কৌশলের ট্রেনিং নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ১৯৭১ সালের আগস্ট মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৮ নং সেক্টরের কমল সিদ্দিকী ও ইসমত কাদির গামার অধীনে ভাটিয়াপাড়া ও গোপালগঞ্জ রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন।[২৪০]
সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের নালিউরি গ্রামের নারীযোদ্ধা ছিলেন ছায়ারুন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে দেশপ্রেমিক এ সাহসী নারীর দেওয়া এক বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর উৎসাহে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি ঐ অঞ্চলের কমান্ডার মাহবুব হোসেনের অস্ত্র চালানোসহ গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। যুদ্ধের সময় অস্ত্র বহনসহ কখনো কখনো সহযোদ্ধাদের সাথে শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করতেন। ভাদেশ্বর বাজারের কাছে রাস্তায় পাকিস্তানি আর্মির সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর বন্দুক যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে দু'জন পাকিস্তানি আর্মি নিহত হয়েছিল। যুদ্ধের সময় ছায়ারুনদের বাড়িটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। যুদ্ধের সময় বাড়িতে ৪৩ টি অস্ত্র ছিল যা পরে সরকারের কাছে জমা দেয়া হয়।[২৪১]

২৩৮. মেহেরুন্নেসা মেরী , *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৮, রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৮-৩৯
২৩৯. তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮-৪৮
২৪০. শাহনাজ পারভিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭-৮৮
২৪১. আসমা পারভীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের আয়া ছিলেন পেয়ারচাঁদ। টেকেরহাট সীমান্তের বালাট সেক্টরে মেজর সালাউদ্দিন ও মেজর মোতালেবের অধীনে ৩ মাস গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি দু'সন্তানকে নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধে যোগ দেবার অপরাধে তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়। তিনি সুনামগঞ্জ প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। পলাশ ইউনিয়নের নারায়ণতলায় অপারেশনে অংশ নিয়ে তিনি দু' তিন জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেছিলেন। এর আগে তিনি কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সহায়তায় সুনামগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা একজন পাকিস্তানি আর্মিকে নৌকায় তুলে নদীতে নিয়ে রাইফেলের বাট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেন। বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেয়ার পাশাপাশি পেয়ারচাঁদ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আহত যোদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষার কাজ করতেন।[২৪২]

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তারামন বিবির (১৯৫৭-২০১৮) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বীর নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি কুড়িগ্রাম জেলার রাজীবপুর থানার কোদাল কাঠি ইউনিয়নের শঙ্করমাধবপুর গ্রামের দিনমজুর আবদুস সোবহান ও কুলসুম বিবি দম্পতির কন্যা।[২৪৩] তাঁর স্বামীর নাম আবদুল মজিদ। তিনি রাজীবপুরের দুই নম্বর প্লাটুন কমান্ডার মুহিব হাবিলদারের উৎসাহে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৩/১৪ বছর। তারামনকে প্রথমে ক্যাম্পে রান্নাবান্নার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তারামনের সাহস ও শক্তির পরিচয় পেয়ে মুহিব হাবিলদার তাকে অস্ত্র চালনা শেখান। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি কর্ণেল আবু তাহেরের নেতৃত্বাধীন ১১ নং সেক্টরের অধীনে চিলমারী থানা এলাকায় দুই নম্বর এফ এফ কোম্পানির রাজীবপুর অংশে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেন। তারামন বিবি কয়েকটি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেন। তার মধ্যে ১৯৭১ সালের ৭ আগস্ট চর নেওয়াজী স্কুলের নিকট যুদ্ধটি উল্লেখযোগ্য। বার তের ঘণ্টা ব্যাপী এ যুদ্ধে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তেরজন পাকহানাদার ও রাজাকারের মৃত্যু ঘটে।[২৪৪] এছাড়া তারামন বিবি কোদালকাটি, রাজীবপুর, তারা বিরসাজাই ও গাইবান্ধা অঞ্চলে কয়েকটি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়ে বিশেষ সাহসিকতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মুক্তিযুদ্ধে তারামন বিবির অসীম বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৩ সালে সরকার তাঁকে 'বীর প্রতীক' খেতাবে ভূষিত করে।[২৪৫]

কিংবদন্তি মুক্তিযোদ্ধা বীরঙ্গনা কাঁকন বিবি। সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার লীপুর ইউনিয়নের ঝিরাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা কাকন বিবির জন্ম ত্রিপুরার আদিবাসী খাসিয়া পরিবারে। তাঁর আদি নাম কাঁকাত হেনিনচিতা। পরে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে বাংলা বাজারের শহীদ আলীকে বিয়ে করেন এবং নূরজাহান নাম ধারণ

---

২৪২. মেহেরুন্নেসা মেরী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ-১১৭
২৪৩. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৫, *দৈনিক বাংলা*, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৫
২৪৪. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ২২২
২৪৫. রোকয়া কবীর ও মুজিব মেহদী , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

করেন। তবে তিনি কাঁকন বিবি নামে সমাধিক পরিচিত। কন্যা সন্তান জন্মদানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার পর তিনি সিলেটে কর্মরত ইফআর সৈনিক আবদুল মজিদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আবদুল মজিদ অন্যত্র বদলি হয়ে যান। স্বামীর সন্ধান করতে দোয়ারাবাজারের টেংরাটিলা ক্যাম্পে গেলে তিনি পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হন এবং তাঁর উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। তিনি সেখানে আটক বাঙালি নারীদের ওপর নৃশংস নির্যাতন ও গণহত্যা প্রত্যক্ষ করে প্রতিশোধ স্পৃহায় জেগে উঠেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলীর মাধ্যমে তিনি ৫নং সেক্টরের কমান্ডার মীর শওকত আলী ও সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন হেলাল উদ্দিনের নিকট আসেন। তাঁকে গুপ্তচর হিসেবে তথ্য আদান প্রদানের দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয়। তিনি লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচর্যার কাজও করতেন। ছদ্মবেশে তথ্য আদান, অস্ত্র বহন, খাবার ও ঔষধপত্র বহন ও সরবরাহ করতেন।[২৪৬] গুপ্তচরের কাজ করতে গিয়ে পাকবাহিনীর হাতে ধারা পড়লে তাঁর ওপর নির্মম নির্যাতন করা হয়। কিন্তু তিনি হতোদ্যম হননি। তিনি সুনামগঞ্জ মুক্তকরণে ভয়াবহ খণ্ডযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে অংশ নিয়ে ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা অপারেশনগুলোতে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে থাকতেন। তিনি মহব্বতপুর, কান্দাগাঁও, বসরাই, টেংরাটিলা, বেটিরগাঁও, নূরপুর, দোয়ারা বাজার, টেবলাইং, সিলাইরপাড়, পূর্ব বাংলা বাজারের যুদ্ধসহ প্রায় ২০ টি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[২৪৭] টেংরাটিলার যুদ্ধে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। তারামন বিবির মতো তিনিও দীর্ঘ ২৮ বছর বিস্মৃত ছিলেন। এসময় এ বীর নারী মুক্তিযোদ্ধা অর্থাভাবে এক রকমের মানবেতর জীবনযাপন করেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৬ সালে সরকার তাঁকে বীর প্রতীক খেতাব প্রদান করলেও সেটি গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়নি। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেই অনেকটা বিনা চিকিৎসাতেই ২০১৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন 'মুক্তিবেটি' নামে খ্যাত বীর যোদ্ধা কাঁকন বিবি।

নেত্রকোনার বীরযোদ্ধা মিরাসি বেগম। মদন থানায় রাঁধুনি হিসেবে কর্মরত এ বীর নারী মদন থানার ওসি এবং কমান্ডার বাচ্চু মিয়ার কাছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ নেন। প্রথম দিকে ছদ্মবেশে (পাগলিনী, গৃহবধূ ভিক্ষুক) অস্ত্র ও বার্তাবাহক হিসেবে আটপাড়া, কেন্দুয়া, মোহনগঞ্জ, ইটনা, প্রভৃতি এলাকায় দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি রণাঙ্গনের সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে মদন, কান্দাহার, বাজিতপুর ও কাপাসাটিয়ার বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[২৪৮]

টাঙ্গাইলের সশস্ত্র নারীযোদ্ধা হাজেরা সুলতানা। টাঙ্গাইলের যমুনা নদীর চরে কমান্ডার আব্দুল হালিমের নেতৃত্বে কমিউনিটি বিপ্লবীদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র ঘাঁটি থেকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন হাজেরা খাতুন। এ অঞ্চলে পাকবাহিনীর সাথে ৬ টি বড় ধরনের যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধে তিনি সহযোগীর ভূমিকা

২৪৬. *দৈনিক সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯০
২৪৭. *দৈনিক সংবাদ*, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
২৪৮. রোকয়া কবীর ও মুজিব মেহদী , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

পালন করেন। এ সশস্ত্র গ্রুপটি পরবর্তীতে কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে একীভূত হয়। হাজেরা খাতুন টাঙ্গাইলের চরাঞ্চল ও নরসিংদী জেলার শিবপুরে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন একটি সশস্ত্র ঘাঁটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তাছাড়া তিনি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা প্রদান, ঔষধ সরবরাহ এবং তথ্য বাহকের ভূমিকায় কাজ করতেন।[২৪৯]

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গায় গড়চাপড়া গ্রামের কিশোরী মুক্তিযোদ্ধা আলেয়া। বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান মন্টু আলেয়াকে ভারতের বাঙালজি চাপড়া ক্যাম্পে নিয়ে অস্ত্র হাতে দিয়ে যুদ্ধের দীক্ষা দেন। পরে আলেয়া ৮নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।[২৫০] এ সেক্টরে ১১ সদস্যের ইউনিট কমান্ডার ছিলেন মতিয়ার রহমান মন্টু। মন্টু বাহিনীর সঙ্গে আলেয়া অপারেশনে যেতেন। তিনি নারীদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণসহ ভারতের নদীয়া, বাঙালজি চাপড়া ও হাটখোলা, বিহারের চাকুলিরাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে নারীদের অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ দিতেন। তিনি আলমডাঙ্গা, কাপাসডাঙ্গা, মুন্সিপুর, খোরশেদপুর, দামুড়াসহ অনেকগুলো সম্মুখসমরেও অংশ নেন। তার সহযোদ্ধা ছিলেন হীরা, লতা, সুফিয়া, পারুল হালিমাসহ আরও অনেক নারী। [২৫১]

কুমিল্লার গীতশ্রী চৌধুরীও একজন রণাঙ্গণের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী গীতশ্রী যুদ্ধ শুরুর আগেই প্রাক্তন স্কাউট গোলাম মোস্তফার নিকট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তিনি আ. স. ম আব্দুর রব, রিজিয়া চৌধুরী ও মমতাজ বেগমের সহাযতায় লেম্বুছড়া ক্যাম্পে মেজর কে বি সিংয়ের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ নেন। দু'সপ্তাহ প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আগস্টের মাঝামাঝি দেড়শ জন মুক্তযোদ্ধার একটি দলের সঙ্গে গীতশ্রী ও নাজমা শাহীন বেবী দেশে প্রবেশ করেন। হাতিমারা ক্যাম্প থেকে কুমিল্লার দিঘীরপাড় বাজারে পৌঁছে দলটি ৫০ জন করে ৩ ভাগ হয়ে গেলে একটি দলের নেতৃত্ব দেন শিবনারয়ণ দাশ এবং গীতশ্রী চৌধুরীকে এ দলের সাথেই যুক্ত করা হয়। এ দলটি মুরাদনগর, নবীনগর, চন্দনাইল, আন্দিকুট, শহীদনগর, যসাতুয়া, রতনপুর, শ্যামগ্রাম, বিদ্যাকোট এলাকায় পাক আর্মি ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। গীতশ্রী এসব অভিযানে অংশ নেন। তিনি একজন গুপ্তচর রাজাকারকে বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করেছিলেন।[২৫২]

নারায়ণগঞ্জের মিনারা বেগম ঝুনু ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলেন। একাত্তরে তিনি প্রত্যক্ষ যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি কাজী আরিফ আহমেদ ও মার্শাল শেখ ফজলুল হক মনির কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেন। এরপর শেখ ফজলুল হক মনির নির্দেশে তিনি আগরতলায় যান এবং বিটগড়ে

২৪৯. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ২৪১-৪২
২৫০. ৮ নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী পরে মেজর এম. এ. মঞ্জুর এ দায়িত্ব লাভ করেন।
২৫১. *প্রথম আলো*, নারী মঞ্চ , ১ জুন ২০০5
২৫২. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

কয়েকটি গেরিলা অপারেশনে অংশ নেন। তিনি লেম্বুছড়া প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে বিএলএফের সশস্ত্র প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর পূর্বাঞ্চল শাখার অফিস সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। শামসুন্নাহার ইকোও একজন সশস্ত্রযোদ্ধা ছিলেন। নরসিংদী জেলার রূপগঞ্জ থানার পেরাবো ক্যাম্পে অবস্থান কালে পাকিস্তানি আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করলে শামসুন্নাহার ইকো ও আরও কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এতে পাক সেনারা হতাহত ও পিছু হটতে বাধ্য হয়। এরপর ইকো আগরতলা যান এবং সেখানে বেশ কিছু অপারেশনে অংশ নেন। এছাড়া তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসার কাজও করতেন। সরাসরি সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণকারী আরেক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার তেঁতুলিয়া গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের গৃহবধু ভানু শেখ। ৭ ডিসেম্বর সাঁথিয়ায় পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি শেষ হয়ে গেলে ভানু শেখ তিন কিলোমিটার দুরবর্তী সাঁথিয়া থানা থেকে প্রায় ২ মণ ওজনের গুলির ব্যাগ ও বাক্স ঘাড়ে ও মাথায় করে মুক্তিযোদ্ধাদের বাংকারে নিয়ে যান। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাংকারে বাংকারে গুলি ও খাদ্য পৌঁছে দেন। এ সময় হঠাৎ শত্রুপক্ষের ছুড়া গুলিতে তিনি আহত হন।[২৫৩]

মুক্তিযুদ্ধে যেসব নারী পাকসেনাদের সাথে অস্ত্র হাতে লড়াই করেন তাদের নারায়নগঞ্জের ফোরকান বেগম। শেখ ফজলুল হক মনি ও আ. স. ম আব্দুর রব আগরতলা লেম্বুচোরা ক্যাম্পে ছাত্রলীগের তরুণ নেত্রীদের গেরিলা ও সুসাইড স্কোয়াডের আধুনিক উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। মহিলা গেরিলা স্কোয়াড সাব-কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে ফোরকান বেগমের নেতৃত্বে ৮ সদস্যবিশিষ্ট নারী গেরিলা স্কোয়াড এখানে ট্রেনিং গ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণে সব ধরনের আধুনিক অস্ত্র চেনা, পরিচালনা ও ধ্বংস করার কলাকৌশল, শত্রুপক্ষকে ডিটেক্ট করা, তাদের ব্যবহৃত কোড বুঝতে পারা, বিমান বন্দরসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনাসমূহে আক্রমণ করে শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করার ব্যবস্থা ইত্যাদি পূর্ণ সামরিক উচ্চতর বিষয়াবলি শেখানো হয়। প্রথম দলে ফোরকান বেগম ছাড়াও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণ ছিলেন ফরিদা খানম সাকী, মমতাজ বেগম, মিনারা বেগম ঝুনু, শামসুন্নাহার ইকো, আলেয়া বেগম, স্বপ্না চৌধুরী, আমেনা সুলতানা বকুল। উল্লেখ্য যে, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সক্রিয় সদস্য ফোরকান বেগম মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে পনের বিশজন ছাত্রীবন্ধুসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তিনি আগরতলায় বেশ কিছু গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেন। ছাত্রনেতা নিখিল দাসের নেতৃত্বে বিটগড়ে একটি অপারেশনে অংশ নিয়ে ফোরকান বেগম ও তাঁর সহযোদ্ধা মিনারা বেগম ঝুনুর নিক্ষেপ্ত গ্রেনেডে কয়েকজন পাকসেনা হতাহত হয়েছিলেন।[২৫৪]

---

২৫৩. *দৈনিক সংবাদ*, ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬; *সংবাদ* ,২৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
২৫৪. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত) , *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ.২২২

উপর্যুক্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও আরো অনেক নারী রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করায় প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছেন। এদের মধ্যে এভাবে গোপালগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা মো: হেমায়েত উদ্দিনের দ্বিতীয় স্ত্রী সোনেকা রাণী রায় ও তার দু'বোন আমেনা বেগম ও মোমেনা বেগম,[২৫৫] রশিদা বেগম, আকলিমা খন্দকার, মাহমুদা ইয়াসমিন, পারভীন মমতাজ, রংপুরের গীনি[২৫৬]ও ফরিদপুরের নগরকান্দার মইফুল[২৫৭] প্রমুখ নারীগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্রযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া অনেক নারী সশস্ত্র যুদ্ধের অদম্য ইচ্ছা নিয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিলেও দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এদের মধ্যে ছিলেন ফরিদা খানম সাকী, রাশেদা আমীন, স্বপ্না দত্ত চৌধুরী, শিরিন জাহান দিলরুবা, নাজমা শাহীন বেবী ও গীতা মজুমদার প্রমুখ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীরা কেবল সহযোগীর ভূমিকা পালন করেননি, অসংখ্য রাজনীতিবিদ নারী, কিশোরী, তরুণী এমনকি সাধারণ গৃহবধু অস্ত্র হাতে রণাঙ্গনে সাহাসী বীরযোদ্ধা হিসেবে শত্রুর মোকাবিলা করেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা পুরুষ যোদ্ধাদের তুলনায় সফলভাবে দায়িত্বপালন করেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারী মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় ভূমিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

৯.৫.ঝ: নির্যাতনের শিকার নারী

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় সহযোগী রাজকার ও আলবদর বাহিনী গণহত্যার পাশাপাশি চরম নারী নির্যাতন চালিয়েছিল। নির্যাতির নারীর সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা দুরুহ। তবে তথ্য সূত্র থেকে জানা যায় মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে প্রায় ১৪ লক্ষ নারী বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহীত এবং স্বামী পুত্র কন্যা বা অভিভাবক হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন।[২৫৮] অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত নিউজ ম্যাগাজিন পিক্স-এর তথ্যানুযায়ী স্বাধীনতাযুদ্ধে বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা এদেশের ৩ লক্ষ নারী ধর্ষিতা হয়েছেন।[২৫৯] ২ নভেম্বর ১৯৭২ যুদ্ধ অপরাধ তদন্ত এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, পাকিস্তানিদের নয়মাসব্যাপী ত্রাসের রাজত্বকালে বাংলাদেশে দুই লক্ষাধিক নারী নির্যাতিতা হয়েছেন।[২৬০] মানবতাবাদী গবেষক ড. জিওফ্রে ডেভিস বলেছেন, বাংলাদেশে ধর্ষণের ফলে প্রায় দু'লক্ষ অন্তঃসত্ত্বা নারীর মধ্যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার গর্ভপাত ঘটিয়েছেন।[২৬১] স্বাধীনতার জন্য অপরিসীম মূল্য দিতে হয়েছে নারীসমাজকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা কতটা বর্বর ছিল, কতটা

২৫৫. মোঃ আবদুল হান্নান, *স্বাধীনতা যুদ্ধে খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা*, পূর্বা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ.২৯-৩০
২৫৬. *ভোরের কাগজ*, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৬
২৫৭. *সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তা*, *১ম বর্ষ*, *১ম সংখ্যা*, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭
২৫৮. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮
২৫৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ জুলাই, ১৯৭২
২৬০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ নভেম্বর, ১৯৭২
২৬১. *সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন প্রবাহ*, ৬ নভেম্বর, ১৯৯৭

পাশবিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল, কী পরিমাণ বিজাতীয় ক্রোধ ও জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে বাংলাদেশের অসহায় নারীদের প্রতি নির্দয় ও নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল, বর্বরোচিতভাবে ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল তার কোনো পরিমাপ নেই।[২৬২] এ নির্যাতন হয়েছে সমগ্র দেশে। আগেই উল্লেখ করা হয়ে যে, শুধু পাকবাহিনী নয়, বাঙালি রাজাকার এবং অবাঙালি বিহারী সম্প্রদায়ের লোকেরাও এ নির্যাতনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। শহর-গ্রাম, ধনী-গরীব, উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্ত সকল শ্রেণি পরিবারের মেয়েরা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে সমগ্র দেশে যে নারী নির্যাতনের চিত্র পাওয়া যায় তা রীতিমত ভীতিপ্রদ। নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থে বেশ কিছু নারীর নির্যাতনের মর্মস্পর্শী কাহিনী তুলে ধরেছেন দেখিয়েছেন পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিতা একটি মেয়ে মুক্তি পাবার পরে কেমন করে তার পরিবারে সমাজে নিগৃহীত হয় অপাংক্তেয় হয়ে যায়। তাঁর গ্রন্থের প্রতিটি লাইনে প্রকাশিত হয়েছে নির্যাতিতা নারীর মর্মন্তুদ জীবনের প্রতিচ্ছবি।[২৬৩]

৯.৫.এঃ শহীদ নারী

মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সফল জনযুদ্ধ। এ যুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শহীদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্য নারীরও ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও শহীদ নারীদের তালিকা তৈরি হয়নি। এমনকি যে সকল নারীদের নৃশংস বর্বরতা ও পাশবিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে, তাদের আত্মত্যাগের কারণে তারাও শহীদদের মর্যাদা পাওয়া প্রত্যাশিত। কিন্তু তা করা হয়নি। জাতীয় পর্যায়ে সংকলিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নারীদের নির্যাতনের চিত্র উপস্থাপন করা হলেও তাদের শহীদ হিসেবে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। এসব কারণে মহানমুক্তিযুদ্ধে নারী শহীদদের তথ্য ও সংখ্যা পরিবেশন করা দুরূহ। জুবাইদা নাসরীনের *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ নারী* (অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮) গ্রন্থে ২৬জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বিবরণী দিয়েছেন। তাঁর তথ্য উদ্ধৃত করে আসমা পারভীন তাঁর গ্রন্থে কয়েকজন শহীদ নারী মুক্তিযোদ্ধার নামোল্লেখ করেছেন। এরা হলেন- যশোরের চারুবালা বিশ্বাস, বিক্রমপুরের যোগমায়া দে, মুন্সিগঞ্জের ব্রজযোগিনীর রীনা রাণী দে, রংপুরের আওয়ামী লীগ কর্মী মিলি চৌধুরী, পাবনার শাহাজাদপুরের সুরবালা সরকার, রাজবাড়ি পাংশার সুফিয়া খাতুন, সৈয়দপুরের টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারী ভ্রমর, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের হোসনে আরা, নীলফামারী সৈয়দপুরের সরোজিনী মল্লিক, পাত্রখোলা চা বাগান শ্রমিক বাবনী রাজগৌর, মৌলভী বাজারের কমলগঞ্জের ধলই চা বাগানের শ্রমিক রাঙ্গামা কুর্মী, সিলেট দোয়ারা বাজারের কাকেট, পটুয়াখালীর গলাচিপার কনকপ্রভা গাঙ্গুলী, পিরোজপুর কাঠালিয়ার সানাই রাণী সমাদ্দার, পারুল বালা সমাদ্দার বাসন্তী রাণী, সৈয়দপুরের শান্তি দেবী ও ফরিদপুরের পাংশার কিরণ রাণী সাহা প্রমুখ।[২৬৪]

---

২৬২. মেজর রফিকুল ইসলাম পি. এস. সি, *নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা'৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৫

২৬৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য নীলিমা ইব্রাহিম, *আমি বীরঙ্গনা বলছি*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

২৬৪. আসমা পারভীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১-৯৩

স্মর্তব্য যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি জাতিকে বুদ্ধিভিত্তিকভাবে পঙ্গু করার দুরভিসন্ধী নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যার পাশাপাশি পাকহানাদাররা তালিকা করে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। পাক হানাদারদের হাতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় ৪ জন নারীর নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন: কবি মেহেরুন্নেসা, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, ডা. আয়েশা বেদৌরী চৌধুরী এবং শিক্ষক ও রাজনীতিবিদ লুৎফুন নাহার হেলেন। কবি মেহেরুন্নেসা জন্ম পশ্চিমবঙ্গে হলেও পরবর্তীতে পরিবারের সাথে ঢাকার মিরপুরে বসবাস করতেন। একাডেমিক লেখাপড়া না থাকলেও তিনি ছিলেন সশিক্ষিত।[২৬৫] তিনি গীতিকার ছিলেন এবং বাংলা গীতি কবিতার প্রবাহমান ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে কবিতা লিখতেন। তিনি ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে, সত্তরের মিছিলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অনেক কবিতা স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। উত্তাল মার্চে তিনি স্বাধীনতার দাবিতে নারীদের সংগঠিত করেন। ৭ মার্চ তিনি নারীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন। ২৩ মার্চ মিরপুর এলাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙালি-অবাঙালি বিরোধে মেহেরুন্নেসা অসীম সাহস নিয়ে বাঙালি জনতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলার সাহিত্য সভায় তাঁর স্বরচিত জাগরণী কবিতা 'জনতা জেগেছে' আবৃত্তি করেছিলেন। এসব কারণে অবাঙালি বিহারীর ২৭ মার্চ বৃদ্ধা মায়ের সামনে মেহেরুন্নেসা ও তার দু ভাইকে খুঁচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে। এ নির্মম মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে মা ও আর্তনাদ করতে করতে মারা যান। মেহেরুন্নেসা ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম নারী শহীদ।[২৬৬]

শহীদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীনের পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জের কল্যাণ নগরে। তাঁর বাবা মোঃ আব্দুর রহমান টিচার্স ট্রেনিং স্কুলের হেড মাস্টার এবং মা সাজেদা খাতুন প্রাইমারি বোর্ড স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন।[২৬৭] সেলিনা পারভীন ছিলেন 'শিলালিপি' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। তিনি বেগম পত্রিকায় চাকরি, ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানা ও আজিমপুর বেবি হোমে শিক্ষকতা, মিটফোর্ট হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের মেট্রনরূপে কর্মরত ছিলেন। তিনি শিলালিপি ছাড়াও 'সাপ্তাহিক ললনায়' কর্মরত ছিলেন।[২৬৮] কোনো সক্রিয় রাজনীতিতে তার অংশগ্রহণ না থাকলে তিনি রাজনীতি সচেতন এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।[২৬৯] তাঁর শিলালিপি পত্রিকায় স্বাধীনতার পক্ষে নিবন্ধ ও মতামত প্রকাশ করা হতো। এতে তদানিন্তন প্রথম শ্রেণির লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের লেখা প্রকাশিত হতো। পাক

---

২৬৫ . রশীদ হায়দার সম্পাদিত, *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫ পৃ. ৬৯

২৬৬. রশীদ হায়দার সম্পাদিত, *স্মৃতি ১৯৭১*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৩৮, ফরিদা আক্তার (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১-১৫২

২৬৭. রশীদ হায়দার (সম্পাদিত), স্মৃতি ১৯৭১, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৯৮

২৬৮. দৈনিক সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৬

২৬৯. রশীদ হায়দার (সম্পাদিত), শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

সেনাপ্রধান রাও ফরমান আলী তার পত্রিকায় লেখক কবি এবং বাংলার লোকশিল্পের অলংকার নিয়ে আঁকা পছন্দ না করে পাকিস্তানি ভাবধারায় লেখা ও ছবি দিয়ে শিলালিপি প্রকাশ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু সেলিনা পারভীন তা করেনি। বরং তার পত্রিকার সর্বশেষ প্রচ্ছদ ছিল বাংলাদেশের পতাকার ছবি। এ কারণে শিলালিপি পত্রিকাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। তদুপরি তিনি পাক দোসর আলবদর ও রাজাকারদের শৈণদৃষ্টিতে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৩ ডিসেম্বর একটি জীপ এসে চোখ বেঁধে তাকে নিয়ে যায় এবং ১৪ ডিসেম্বর অন্যান্য বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের সাথে রায়ের বাজারে বধ্য ভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় সাংবাদিক সেলিনা পারভীনকে।[২৭০]

শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. আয়েশা বেদৌরা চৌধুরী একজন রাজনৈতিক পরিবারের কন্যা ছিল।[২৭১] কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল থেকে এমবিবিএস পাস করেন। ১৯৬৪ সালে কিছুদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজে এবং পরে ঢাকাস্থ স্টেট ব্যাংকে মেডিকেলে অফিসার হিসেবে কাজ করেন তিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তিনি এক মনেপ্রাণে সমর্থন দেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রদান এবং তাদের আশ্রয় দিতেন।[২৭২] ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন তিনি ধানমন্ডি-১৮ এ শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত বাসভবন যান। এই বাড়িতে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব তাদের দু'কন্যা শেখ রেহানা ও শেখ হাসিনাসহ বাস করতেন। যখন ডা. আয়েশার গাড়ি বাসার গেটে যায়, তখন সেখানে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনী তার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। এতে ডা. আয়েশা বেদৌরা চৌধুরীর মৃত্যু হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবী লুৎফুন্নাহার হেলেনার জন্ম (১৯৪৭-১৯৭১) মাগুরায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হেলেনার পিতা ফজলুল হক মাগুরার ন্যাপ ও কৃষক সমিতির নেতৃস্থানীয় ছিলেন। হেলেনা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯ গণঅভ্যুত্থানসহ পাকিস্তানবিরোধী মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। মাগুরা গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষক লুৎফুন্নাহার হেলেনা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। তিনি স্থানীয় যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতেন। তিনি এবং তার পুরো পরিবার যখন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন তখন হেলেন ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা স্বাধীনতা বিরোধীদের (রাজাকার, আলবদর) মূল লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন।[২৭৩] ৫ অক্টোবর পাবিত্র শবে বরাতের রাতে মাগুরার মুক্তাঞ্চল মোহাম্মদপুর থেকে পাকবাহিনীর দোসররা তাঁকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

---

২৭০. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৮-২৮০

২৭১. তাঁর বাবা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ও নানা সৈয়দ নওশের আলী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। আর তাই স্বভাবতই তিনি রাজনীতিতে সচেতন হয়ে উঠেন। তাঁর স্বামী ড. আবুল বাশার কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

২৭২. রশীদ হায়দার, স্মৃতি ১৯৭১, ৫ম খণ্ড পৃ-৩৬; হাসান হাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত,৮ম খণ্ড, পৃ. ৬১৯

২৭৩. *দৈনিক সংবাদ*, ১১ অক্টোবর, ১৯৯৬; হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ৯ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭২-২৭৩

পাকবাহিনীর দোসররা তাঁকে জীপের সাথে বেঁধে শহর থেকে টেনে দেড় মাইল দূরে ওয়াপদা সংযোগ খালপাড়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।[২৭৪]

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের বহুমাত্রিক অংশগ্রহণ ছিল। এ জনযুদ্ধে নারীরা নানাভাবে, নানা স্তর ও আঙ্গিকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের অংশগ্রহণের বিষয়টি কোনো আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। এটি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীসমাজের অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতারই অংশ। বাংলাদেশের নারী সমাজ **১৯৭১** সালের মার্চ-ডিসেম্বর কালপর্বে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে প্রশিক্ষণ, জনমত সংগঠন, উদ্বদ্ধকরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান, খাদ্য সংস্থান, অর্থ সংগ্রহ, তথ্য-আদান প্রদান, অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিতকরণ এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা দান ইত্যাদি নানাভাবে দায়িত্ব পালন করেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন মূহুর্তে অস্ত্র হাতে নিয়ে রণাঙ্গনে সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের নেত্রীরা নয়, সর্বস্তরের নারী, স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এমনকি সাধারণ গৃহিনীরাও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের উপর্যুক্ত বহুমাত্রিক ক্ষেত্রগুলোতে অবদান রাখেন। মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের এ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। তবে দুঃখজন হলেও সত্য যে, মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের এ বহুমুখী সম্পৃক্ততা ও অবদান ইতিহাসে যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায়নি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্রে নারীসমাজের এ উপেক্ষা ও অনুল্লেখের পিছনে পুরুষতান্ত্রিক অনুদার মানসিকতাও দায়ী বলে অনেকের ধারণা ও মত। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অর্জন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গরূপ দান ও নারীসমাজকে জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতি দান অপরিহার্য।

২৭৪. তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯-৪১

উপসংহার

'বিশ্বে যা- কিছু মহান সৃষ্টি চির- কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার এই পংক্তির মধ্যে জগৎ সংসারে পুরুষের পাশাপাশি নারীসমাজের ভূমিকা ও অবদানের কথা উচ্চারিত হয়েছে। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী সব সময় তাঁর অবদানের স্বীকৃতি পেয়েছে এমনটা নয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীর অবস্থার ও পরিবর্তন হয়। এক সময় মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর কর্তৃত্ব বিদ্যমান ছিল, কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজব্যবস্থায়ও পরিবর্তন সূচিত হয়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ রূপান্তরিত হয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, নারী হারায় তার কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য এবং সমাজে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করে পুরুষরা। আর সমাজব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন এনে বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ করে নারীসমাজকে পুরুষের অধঃস্থনে পরিণত করা হয়। সামাজিক নিয়মবিধি ছাড়াও ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে তাঁর প্রাপ্য আর্থ-সামাজিক এমনকি মানবিক মর্যাদা ও অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। যেখানে মানবিক অধিকার ছিল না সেখানে রাজনৈতিক অধিকারের প্রসঙ্গ তো সুদূর পরাহত ছিল। গণতন্ত্রের প্রাচীনতম ভিত্তিভূমি গ্রিসেও নারীদের রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো নারী-পুরুষের সমান মর্যাদার কথা বললেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। বঙ্গ-ভারতের বাস্তবতাও ছিল একই রকমের।

বাংলার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, আঠারো শতক অব্দি এখানকার সমাজব্যবস্থায় নারীর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। প্রাচীনকাল থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসে কিছু মহীয়সী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। এদের কেউ কেউ সমকালে রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছেন। তবে এসব ছিল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত, সমাজে নারীর অবস্থানের সাধারণ চিত্র নয়। প্রধানত রাজপরিবার বা অভিজাতদের মধ্যে কয়েকজন নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ দেখা যায়। তবে উনিশ শতক থেকে অবস্থার ক্রম পরিবতন ঘটতে থাকে। উনিশ শতকে ইউরোপে নারী জাগরণের যে ঢেউ শুরু হয়, এর তরঙ্গায়িত প্রভাব বঙ্গ-ভারতীয় সমাজেও অনুভূত হয়। উনিশ শতকে খানিকটা নতুন সেক্যুলার মূল্যবোধের উন্মেষ ও বিকাশ এবং সাথে পাশ্চাত্যের জীবনধারার ও নগরায়ণের প্রভাবে বাংলায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ক্ষয়িষ্ণু ও রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে এ যুগেই এক নবজাগরণের সূচনা হয়। ইউরোপীয় যুক্তিবাদী ধ্যান-ধারণা ও উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের ফলে বাংলায় নারী মুক্তি বিষয়টি আলোচনায় আসে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বঙ্গীয় ভদ্রলোক সমাজের পুরুষগণ

নিজেদের যোগ্য সহধর্মিনী ও তাদের সন্তানদের যোগ্য মাতা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীদের জীবনমানে কিছু পরিবর্তন সাধনের পদক্ষেপ নেন। এর সূত্রেই বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসার ঘটে। নারী শিক্ষার প্রসারের ফলে বাঙালি নারীসমাজের মনোজগতে রূপান্তর শুরু হয়। তারা উপলব্ধি করেন যে, গৃহাভ্যন্তরে সংসার-ধর্মপালনের বাইরেও এক বৃহৎ জগত রয়েছে। সে জগতে বিচরণ করার অধিকারও তাদের আছে। এ উপলব্ধি বাঙালি নারীসমাজের একটি অংশকে জনজীবনে প্রবেশে উদ্বুদ্ধ করে।

উনিশ শতকে ইউরোপে নারীবাদী মতাবাদের বিকাশ ঘটে। ইউরোপীয় নারী জাগরণের দৃষ্টান্ত বাঙালি নারীসমাজকে উদ্বুদ্ধ করলেও ইউরোপের নারীবাদী চিন্তনের সর্বাত্মক প্রভাব বাঙালি নারীসমাজে দেখা যায় না। ফলে ইউরোপে লিঙ্গ ও শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারীসমাজ যে সোচ্চার প্রতিবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছিল বঙ্গ-ভারতীয় সমাজে উনিশ শতকের শেষাবধি এমনকি বিশ শতকের সূচনাতেও তেমনটি হয়নি। তবে নারীসমাজ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় ক্রমশ পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে তাদের অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয়। শিক্ষিত নারীগণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্রমশ স্বদেশ চেতনায়ও উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে বৃহত্তর জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটায় তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও নিজেদের যুক্ত করে। বাঙালি নারীরা ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত হয়। বিশ শতকের সূচনায় বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নারীসমাজ রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ আন্দোলনে নারীদের সম্পৃক্ততার পেছনে তাদের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ভূমিকা রেখেছিল সত্য, তবে এ আন্দোলনে নারীসমাজকে সম্পৃক্ত করায় পুরুষদের স্বার্থ চিন্তাও ছিল। তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিদেশি পণ্য বয়কট ও স্বদেশি পণ্যের প্রচার ও প্রসারের আন্দোলনে নারীদের অন্তর্ভুক্তি বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই নারীসমাজকে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা হয়। আর নারীসমাজও স্বদেশপ্রেমের চেতনা থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে ক্রমশ অধিকমাত্রায় সক্রিয় হতে থাকে।

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী সময় থেকে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার রাজনীতি বহুমাত্রিক জটিল অভিজ্ঞতা ও সমীকরণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। স্বদেশি আন্দোলন পরবর্তী সময়ে একদিকে খিলাফত ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, ত্রিশের দশকে গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের অনুসারীদের ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন-সংগ্রাম বাংলার রাজনীতিকে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেছে। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের উল্লেখিত প্রতিটি ধারাতেই নারীসমাজ

সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এতদবিষয়ে সবিস্তার আলোচনা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাঙালি নারীসমাজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিল। এ সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীদের একটি বড় অংশ রাজনৈতিক অঙ্গনে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ অবস্থান তাদের নারী সম্পর্কিত ভাবনাতেও পরিবর্তন আনে। বলা হয় যে, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন ও বিশ শতকের সূচনায় বাংলায় নারীবাদী যে ধ্যান-ধারণা প্রচলিত তা উদারনৈতিক নারীবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। নারীসমাজের একটি মার্কসীয় দর্শন বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই পর্বে কমিউনিস্ট বিপ্লবী দলের সাথে সম্পৃক্ত নারীরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজমানসকে অস্বীকার করে নিজেদের অধিকার ও ভূমিকা নিশ্চিতকরণে তৎপর হয়। ১৯৩৫ সালে নারীদের ভোটাধিকার অর্জন এ ক্রমিক তৎপরতারই ফসল।

বিশ শতকের শুরুতে রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয় তৎপরতায় মুসলিম নারীর উপস্থিতি খুবই কম ছিল। এ সময় যখন হিন্দু নারীরা জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত হয়ে স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, তখন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুসলিম নারীদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন সামাজিক বেড়াজাল ভেঙ্গে আলোর পথে এগিয়ে আসতে। তবে সংখ্যায় সীমিত হলেও ত্রিশের দশকের রাজনীতিতে মুসলিম নারী সমাজের উপস্থিতি দেখা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, জোবায়েদা খাতুন চৌধুরাণী, হোসনে আরা, দৌলতননেছা খাতুন প্রমুখ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলিম নারীদের সরব উপস্থিতি এবং তাদের কারাবরণের ঘটনায় ঐতিহ্যগত সনাতন ভূমিকার বাইরে তাদের নিয়ে আসে। চল্লিশের দশকের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মতো প্রতিষ্ঠায়ও তাদের সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত ছাড় আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল। এমনকি ব্রিটিশ শাসনামলে শেষের দিকে অবিভক্ত বাংলায় তেভাগা আন্দোলন, টংক আন্দোলন, নানকার আন্দোলন এবং নাচোলের কৃষক আন্দোলনেও নারীসমাজের ব্যাপক ও বিস্তৃত অংশগ্রহণ ছিল। পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, রাজনীতি চর্চা পুরুষের একান্ত অধিকার অতীতে প্রচলিত এ ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি নারীসমাজ রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলে বাংলার রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের গৌরবময় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। এ পর্যায়ে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ নিয়ে ভারতের মানচিত্রে পাকিস্তান নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ সময় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলাও বিভক্ত হয় এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে

যুক্ত হয়। পূর্ব বাংলার সাথে পাকিস্তানের ভৌগোলিক দূরত্ব এবং তাদের সাথে এতদঞ্চলের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও কেবল ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই পাকিস্তান সম্পর্কে বাঙালি জাতির মোহমুক্তি ঘটে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর অপচেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার সাথে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধ বাঁধে। পশ্চিমাদের এ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল পকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদী আন্দোলন। বিশ শতকের সুচনা থেকে বাঙালি নারীসমাজের মধ্যে যে রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ তৈরি হয়েছিল এবং বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীসমাজের অংশগ্রহণের যে ঐতিহ্য তৈরি করেছিলেন এর ধারাবাহিকতায় স্বাধীন পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার নারীসমাজ সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তথা মুসলিম লীগ সরকারের রক্ষণশীলতা, উগ্র মৌলবাদ এবং কুসংস্কারের বেড়াজালে নারীদের আবদ্ধ করার চেষ্টা করা হলেও তাদের সে অপচেষ্টা সফল হয়নি। শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু ও দমননীতি উপেক্ষা করে নারীসমাজ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান যুগে পূর্ব বাংলায় নারীসমাজের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে লেখনী প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বৌদ্ধিক পটভূমি বিনির্মাণ শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হলেও এর জের চলে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। আন্দোলনের বৌদ্ধিক পটভূমি বিনির্মাণ থেকে শুরু করে এর প্রতিটি স্তরে নারীসমাজের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ইতোপূর্বে বাংলায় পরিচালিত আর কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে নারীসমাজের এরূপ ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখা যায়নি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদে সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালন ছাড়াও আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতে নারীরা বিভিন্নভাবে দায়িত্বপালন করেছিলেন। প্রথমে এ আন্দোলন ঢাকায় সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা শহরসহ মফঃস্বল এলাকাতেও আন্দোলনের বিস্তার ঘটে এবং এসব আন্দোলন কর্মসূচিতে নারীরা অংশগ্রহণ করেন। নারীসমাজ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে আয়োজিত বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, মিছিল, মিটিং-এ সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে গিয়ে ছাত্রীদের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণা, পোস্টার লিখন ও অর্থ সংগ্রহের কাজে নারীরা জোরালো ভূমিকা রাখেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পরিচালিত মিছিলের অগ্রভাগেও ছিলেন নারীরা।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীদের অধিকাংশই ছিলেন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এ আন্দোলনে অংশ নেওয়াদের মধ্যে নারী রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিজীবী এমনকি সাধারণ গৃহবধুরাও ছিলেন। সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণি থেকে আগত। সংখ্যায় কম হলেও উচ্চবিত্ত শ্রেণির নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণও ছিল এতে। তবে অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত শ্রেণির বা শ্রমজীবী নারীদের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। এ আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীদের মধ্যে উদার ও প্রগতিমনস্ক নারী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন রক্ষণশীল পরিবারের নারীরাও। আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীরা নিজের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষায় যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে যুক্ত হয়েছিলেন, তেমনি অনেকেই আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, সহপাঠী-বন্ধুবান্ধব, রাজনৈতিক কর্মী ও রাজনৈতিক দলের ছাত্রী শাখার নেতৃবৃন্দ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বাঙালির জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। তৎকালীন রক্ষণশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারীদের ব্যাপকমাত্রায় অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এ আন্দোলনের প্রেরণা তাদের স্বাধিকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং এ চেতনা শেষপর্যন্ত তাদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানি নব্য ঔপনিবেশিক স্বৈরশাসকচক্রের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাঙালি নারীসমাজ যে রাজনৈতিক সচেতনতাবোধে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন, তাতে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের পরবর্তী প্রতিটি ধাপে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার প্রেরণা যোগায়।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন। এ নির্বাচন ছিল সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত প্রথম অবাধ নির্বাচন। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য এ অঞ্চলের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলামী 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনি জোট গঠন করেছিল। আর এ কারণেই ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচনটি 'যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন' নামেও পরিচিতি লাভ করে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে ১২টি সংরক্ষিত নারী আসন রাখা হয়েছিল। এর বাইরে সাধারণ আসনেও নারীদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ অবারিত রাখা হয়। পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অধিকহারে তাদের রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ তৈরি হয়। এর প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে। এ নির্বাচনের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো এতে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও

সক্রিয় অংশগ্রহণ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, স্বাধিকার অর্জন, রাজবন্দিদের মুক্তি, দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করা এবং মুসলিম লীগ সরকারের নারী জাগরণ বিরোধী দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে পূর্ব বাংলার নারীরা এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, এ নির্বাচনে ১২ টি সংরক্ষিত নারী আসন ছিল। এসব আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। তাই ১২টি আসনের বিপরীতে ৩৫ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এর বাইরে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন রাজশাহী সদর (পূর্ব) থেকে একজন স্বতন্ত্র নারী প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এ নির্বাচনে যেসব নারীরা প্রার্থী হয়েছিলেন, তাদের অধিকাংশ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং কেউ কেউ রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। সমকালীন সমাজে শিক্ষাবিদ, কবি ও সাহিত্যিক হিসেবেও কেউ কেউ সুপরিচিত ছিলেন। পেশাগত জীবনে একজন প্রার্থী আইন পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি পূর্ব বাংলার প্রথম মহিলা আইনজীবী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। এ নির্বাচনে নারীরা প্রার্থিতা গ্রহণ ছাড়াও নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা, ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন। সামাজিক রক্ষণশীলতা এবং কঠোর পর্দার মধ্যে থেকে এ নির্বাচনে নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের হার প্রত্যাশিত মাত্রায় না হলেও, এর গুরুত্ব উপেক্ষা করার মতো ছিল না।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট ভূমিধ্বস বিজয় অর্জন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ নির্বাচনি বিজয় ছিল বাঙালির ব্যালট বিপ্লব। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় বাঙালি জাতিকে নতুন রাজনৈতিক প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছিল। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারীদের যে ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়, বাংলার রাজনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এ নির্বাচন বাঙালি নারীদের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলে। ফলে তারা সামাজিক বিধি-নিষেধ, প্রথা-সংস্কার ভেঙ্গে জাতীয় রাজনীতি ও নিজেদের অধিকার আন্দোলনে যুক্ত হয়ে একধাপ এগিয়ে যায়।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করলেও তা বেশি দিন টিকতে পারেনি। ১৯৫৪ সালের ২৯ মে কেন্দ্রীয় সরকার গণরায়কে উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সংবিধানের ৯২ (ক) ধারা অনুযায়ী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করে। এর প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল এতে পুরুষদের পাশাপশি নারীদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এ আন্দোলন দমনে সরকারের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার তৎরপরতা শিকার হয়েছিলেন অনেক নারীনেত্রী ও ছাত্রী।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। তবে এ সংবিধান প্রণয়নে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুসরণের প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল এতেও নারীসমাজের অংশগ্রহণ ছিল। পূর্ব বাংলায় ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন একত্রে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি “সর্বদলীয় কর্ম

পরিষদ” গঠন করে। এ পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রী সংসদও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিসেস আমেনা খাতুন ছিলেন এ কর্ম পরিষদের অন্যতম একজন প্রভাবশালী সংগঠক।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সাংবিধানিক সরকারকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন জারি করেন। আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করে নিজ চিন্তা-চেতনাপ্রসূত রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো নির্মাণের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দ্রুত কতগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সামরিক শাসনের গণভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেন। তাই আইয়ুব খানের সময়কালে প্রথম দিকে প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময় আইয়ুব সরকারের রোমান হরফে বাংলা লেখার অপচেষ্টা, নজরুলের কবিতার শব্দ পরিবর্তন এবং রবীন্দ্র বিদ্বেষ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের পরোক্ষ প্রতিবাদ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এসব কর্মযজ্ঞে নারীদেরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এ সময়ে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে সরকার বাঁধা প্রদান করলে নারীরা তা পালনে এগিয়ে আসে। তাছাড়া এ সময়ে সন্‌জীদা খাতুনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ছায়ানট।

বাংলার ইতিহাসে ১৯৬২-৬৫ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময় পূর্ব বাংলায় আইয়ুবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধান জারি, জাতীয় নির্বাচন, শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যালোচনাধীন সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে বাঙালি নারীসমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৬২ সালের সংবিধানের জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদে নারীদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা হ্রাস এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়ন প্রথা চালুর বিধান নারীদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এতে তারা দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ হন। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৬২ সালে শরীফ কমিশন কর্তৃক প্রণীত গণবিরোধী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি নারী শিক্ষার্থীরাও ব্যাপকহারে অংশ নেন। এ আন্দোলনে ছাত্রীসমাজ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গাসহ মিছিল মিটিং-এ অংশগ্রহণ, আন্দোলনে অন্যান্যদের উদ্বুদ্ধকরণে প্রচার-প্রচারণা চালানো, পোস্টার-দেয়াল লিখন এবং আন্দোলনের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের জের হিসেবে ১৯৬৪ পরিচালিত ছাত্র আন্দোলনেও নারীসমাজের লক্ষণীয় অংশগ্রহণ ছিল। তাছাড়া এ সময়ে পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে নারীসমাজও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে বিবৃতি প্রদানসহ ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে সহায়তা

প্রদানে নারীসমাজ ভূমিকা রাখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে পূর্ব বাংলার নারীসমাজ রাজনৈতিক সংগঠনের বাইরে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক নারী সংগঠনের মাধ্যমেও সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। এ সময়ে গড়ে ওঠা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নারী সংগঠনের মধ্যে ছিল গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, শিশুরক্ষা সমিতি, ওয়ারী মহিলা সমিতি এবং বেগম ক্লাব ইত্যাদি। এ সংগঠনগুলো দেশের রাজনৈতিক সংকটময় অবস্থায় যেমন বিভিন্নভাবে আন্দোলনে সক্রিয় থাকে তেমনি সেবামূলক কাজ ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও তৎপর ছিল।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল 'কপ' পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে তাদের প্রার্থী করেছিল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্যোগে যে সর্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তাতে নারীসমাজ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। তারা ফাতেমা জিন্নাহকে ব্যাপকহারে সমর্থন করেন। অবশ্য কপের নির্বাচনি ম্যানিফেস্টোয় ৮ নং ধারায় নারী অধিকার সংকোচন বিষয়ে নারীরা প্রতিবাদও করেন। নারীসমাজ এ ধারাটি প্রত্যাহারের দাবিতে সারাদেশে সভা মিছিল করেছিল। আপওয়া, শিশুরক্ষা সমিতি, নারিন্দা মহিলা সমিতি, গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংসদ, বেগম ক্লাব, লেডিস ক্লাব প্রভৃতি সংগঠনের উদ্যোগে বহু প্রতিবাদ সভা হয়। ফাতিমা জিন্নাহ নির্বাচন প্রচারণায় পূর্ব পাকিস্তানে আসলে একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি উপস্থাপন করলে তিনি এ নিয়ে কপ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা ও নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে নারী শিক্ষার্থী ও রাজনীতিবিদগণ সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধী দলীয় প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি হলেও মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পরোক্ষ নির্বাচনে তিনি আইয়ুব খানের কাছে পরাজিত হন। যদিও ফাতেমা জিন্নাহ জয়লাভ করতে পারেনি, তথাপি এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন আরো জোরালো রূপ পরিগ্রহ করে। পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব বাংলায় পরিচালিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মেও নারীসমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। এ সময় নারীসমাজ উপলব্ধি করেছিল যে, তাদের সার্বিক মুক্তি ও অধিকার অর্জনের বিষয়টিও গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে যুক্ত। তাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং রাজনীতিতে নিজেদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা বেশি করে আন্দোলন ও সংগ্রামে যুক্ত হয়। কেবল কর্মী-সমর্থক হিসেবে নয়, ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় সংগঠকের ভূমিকাও পালন করে। দীর্ঘ

প্রায় দুই দশকের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তী ধাপের স্বাধিকার সংগ্রামে নারীসমাজ আরো জোরালো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

১৯৬৬ সাল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক বছর। এ বছর আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান তাঁর বিখ্যাত ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেছিলেন। 'আমাদের বাঁচার দাবি' খ্যাত ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির মহাসনদ। এটি বাঙালির জাতীয় মুক্তির 'ম্যাগনাকার্টা' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। মূলত ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ও পরিণতির ইঙ্গিতবহ একটি প্রামাণ্য দলিল। এক ঔপনিবেশিক প্রভুর বিদায়ের মধ্য দিয়ে যে নব্য ঔপনিবেশিক শক্তি বাঙালির ওপর জগদ্দল পাথরের মতো বসেছিল তাদের বৈষম্যমূলক নীতি ও শোষণের ফলে বাঙালির জীবনে যে বঞ্চনা, দুর্দশা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি, রাষ্ট্রীয় সম্পদের ন্যায্য অংশ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাসহ প্রাদেশিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন মূর্তরূপে প্রকাশ পায়। অবিভক্ত পাকিস্তানের সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জোরালো ও খোলাখুলি প্রস্তাবনা এ ছয় দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের প্রচেষ্টায় পূর্ব বাংলায় ছয় দফা ব্যাপক জনসমর্থন ধন্য গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ছয় দফা দাবিকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এতে কেবল পুরুষ নেতা-কর্মী নয়, নারীদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সরকারি দমননীতির ফলে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার ও কারান্তরীণ হওয়ার ফলে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমেনা বেগম, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, বেগম মতিয়া চৌধুরীসহ নারীসমাজের একটি অংশ ছয় দফা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা কেবল ছয় দফা কর্মসূচির প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ নয়, বরং আন্দোলনে সংগঠকের ভূমিকা পালনসহ এর পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এমনকি প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আমেনা বেগম দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলনে অন্যতম পুরোধার ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতার ফলে এ আন্দোলন কেবল অব্যাহত থাকেনি; বরং আরো বেগবান হয়েছিল।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে অত্যন্ত ঘটনাবহুল। এ সময় কালে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' এবং এর প্রতিক্রিয়ায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের ৮ দফাভিত্তিক এবং সংগ্রামী ছাত্রসমাজের ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন সংগ্রামের রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালে পূর্ব বাংলায় সরকারবিরোধী এক গণঅভ্যুত্থান ঘটে। ইতিহাসে এটি 'উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান' নামে পরিচিত। বাঙালির স্বাধিকার ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এক সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে আইয়ুবী স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। গণঅভ্যুত্থানে বাঙালি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। ষাটের দশকের পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারীদের যে অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়েছিল গণঅভ্যুত্থানে তা আরো ব্যাপক ও সর্বাত্মক রূপ লাভ করে। দীর্ঘ দিন আন্দোলন সংগ্রামের সাথে যুক্ত থাকার ফলে নারীসমাজের মধ্যে যে রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয়েছিল, তা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে তাদের শামিল হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। গণঅভ্যুত্থানের সংগঠক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নেতৃত্বদান থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী হিসেবে রাজনৈতিক সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ–সর্বত্রই নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় নারীসমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ'। সরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক, পারিবারিক ও সামাজিক চাপ ও ক্ষেত্র বিশেষে নিপীড়ন ও নির্যাতন উপেক্ষা করে নারীরা গণঅভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছেন। স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য অনেক ছাত্রী বহিষ্কৃত হয়েছেন, তাদের জরিমানাও দিতে হয়েছিল এমনকি পুলিশি নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু তাতেও তারা দমে যাননি, আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াননি। সামাজিক রাজনৈতিক ও সরকারি সবধরনের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ রেখে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। নারীসমাজের এ স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সফলতার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রভাবক ভূমিকা রেখেছিল। এ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা একদিকে পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে নারীসমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছিল, তেমনি পরবর্তীকালে নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের আন্দোলনের ক্ষেত্রও প্রসারিত করেছিল।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো ১৯৭০ সালের নির্বাচন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে পরোক্ষ ভোটের পরিবর্তে 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এ নীতির ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন এবং নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের বিধি 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal frame work order) এর মূলধারাগুলো ঘোষণা করেন। আইনগত কাঠামো আদেশে বলা হয় যে, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ১৩টি সংরক্ষিত নারী আসনসহ মোট ৩১৩ টি আসন সমন্বয়ে গঠিত হবে। সংরক্ষিত ১৩ টি আসন ছাড়াও নারীরা সাধারণ আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে

পারবেন। ১৩ টি সংরক্ষিত নারী আসনের মধ্যে পূর্ব বাংলার জন্য নির্ধারিত আসন ছিল ৭টি। আইনগত কাঠামো আদেশে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। সে মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে ১০টি সংরক্ষিত নারী আসনসহ মোট ৩১০টি আসন নির্ধারণ করা হয়। এ নির্বাচনেও জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনসমূহে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পরিবর্তে পরোক্ষ মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধান করা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন প্রথা বহাল রাখাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার নারীসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তারা মনোনয়ন প্রথা বাতিল করে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবি জানায়। এ নির্বাচনে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ আসনে নারীদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়নি বললেই চলে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে মাত্র ৩জন নারী প্রার্থী ছিলেন। এসব বিষয়ে নারীসমাজের মধ্যে অসন্তোষ ছিল বটে, তবে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে পূর্ববর্তী আন্দোলন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় প্রচার-প্রচারণাসহ সার্বিক নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে বাঙালি নারীসমাজও উল্লেখযোগ্যহারে অংশ নেয়। সংরক্ষিত নারী আসনে প্রার্থীরা ছাড়াও নারীরা এ নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা, সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ, জনসভায় যোগদান, পোলিং এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এ বিজয়কে *দৈনিক ইত্তেফাকে* 'ভূমিধ্বস বিজয়' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি না হওয়ায় পাকিস্তানে এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর ডাকে পূর্ব বাংলায় শুরু হয় ইয়াহিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত চলমান এ আন্দোলনে রাজনৈতিক দল মত ও আদর্শের উর্ধ্বে সকল শ্রেণি ও স্তরের নারীসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। নারীরা একদিকে বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে বিক্ষোভ মিছিল করে অন্যদিকে জনসভা ও জনমত সৃষ্টির জন্য পথসভা করে অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষে বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধকরণে নিয়োজিত হন। পাড়ায় পাড়ায় মহিলাদের সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হয়। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য ভেবে এ সময় অনেক নারী সামরিক প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে সংকট নিরসনে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা শুরু হয়। তবে এতে রাজনৈতিক সংকটের কোনো সমাধান হয়নি। এক পর্যায়ে ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। এ রাতেই তার পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। অপারেশন সার্চ লাইটের নামে চলে নির্মম ও বর্বর হত্যাযজ্ঞ। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এর পূর্বে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এভাবেই শুরু হয় বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। বাঙালি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এ জনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান। মুক্তিযুদ্ধের (মার্চ-ডিসেম্বর ১৯৭১) দীর্ঘ পটভূমি থেকে শুরু করে এর প্রতিটি পর্যায়ে নারীসমাজের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত নারীসমাজ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে অসহযোগ আন্দোলন, ট্রেনিংগ্রহণ, শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ এবং পরবর্তীতে রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ যুদ্ধসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন সেক্টরে সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি দেশের ভেতর ও বাইরে জনমত গঠন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি, বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা প্রশিক্ষণ শিবিরে অস্ত্র পরিচালনা, প্রশিক্ষণ গ্রহণ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষা প্রদান, গোপনে সংবাদ সরবরাহকরণ ইত্যাদি বহুবিধ ভূমিকা পালনে এদেশের নারীসমাজ সক্রিয় ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা (বিশেষ করে গেরিলা বাহিনী) দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে পাকবাহিনীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন তখন তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিল এ দেশের মুক্তিকামী গ্রামগঞ্জের নারীরা। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী প্রচার মাধ্যম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর বর্বর শারিরীক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন অসংখ্য নারী। স্বামী-সন্তান হারিয়ে অনেকেই নিঃস্ব মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের নারীনেত্রী ও কর্মিরাই ছিলেন না, সর্বস্তরের নারী, স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এমনকি সাধারণ গৃহিণীরাও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের উপর্যুক্ত বহুমাত্রিক ক্ষেত্রগুলোতে অবদান রাখেন। মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের এ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। তবে দুঃখজন হলেও সত্য যে, মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের এ বহুমুখী সম্পৃক্ততা ও অবদান ইতিহাসে যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায়নি। পুরুষতান্ত্রিক অনুদার মানসিকতা ও অন্য নানাবিদ কারণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্রে নারীসমাজের

অবদানের কথা উপেক্ষিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রেও তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এটি কোনোভাবে কাঙ্ক্ষিত নয়।

বর্তমান সময়কে বলা হয় নারীর ক্ষমতায়নের যুগ। বর্তমান সময়ে নারীদের বিচরণ ক্ষেত্র কেবল শিক্ষা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাজনীতিতেও তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। এটি কেবল বৈশ্বিক বাস্তবতা নয়, বাংলাদেশেও বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে নারীসমাজের দীপ্ত পদচারণা দেখা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী, সংসদ উপনেতা, প্রধান বিরোধী দলের চেয়ারপার্সন ও জাতীয় সংসদের স্পীকার সকলেই নারী। মন্ত্রী পরিষদ এবং জাতীয় সংসদেও নারীদের উপস্থিতি উল্লেখ করার মতো। প্রশাসনের উচ্চপর্যায় থেকে শুরু করে সর্বত্রই পেশাজীবী হিসেবে নারীর সাফল্য আশাব্যঞ্জক। তবে আজকের এ অবস্থানে আসতে নারীসমাজকে অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। নানা-সংকট প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীসমাজের যে পদচারণা শুরু হয়েছিল এ ঐতিহ্য চেতনাকে ধারণ করে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়লগ্ন থেকেই রাজনীতিতে পূর্ব বাংলার নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়েছিল। তবে ব্রিটিশ যুগে রাজনীতিতে অংশ নেওয়া নারীদের বেশিরভাগই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও অভিজাত পরিবার থেকে আগত। পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটির রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে বাঙালি নারীসমাজ গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারীসমাজের বহুমুখী তৎপরতা ও ভূমিকা পালন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছিল। এসময় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে যেমন উচ্চশিক্ষিত অভিজাত পরিবারের নারী ছিলেন, একই সাথে মধ্যবিত্ত এমনকি সাধারণ পরিবারের নারীরাও ছিলেন। মুক্তিসংগ্রাম বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ পরিবারের গৃহিণীরাও অংশ নিয়েছিলেন। সর্বস্তরের নারীর এ অংশগ্রহণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে কেবল ত্বরান্বিত নয়, গৌরবময়ও করেছে। বাংলার স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনে নারীসমাজের এ আত্মত্যাগ স্বাধীন বাংলাদেশের নারীসমাজের জন্যও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১৯৪৭-১৯৭১ সাল-এ কালপর্বে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী নারীসমাজ যেমন তাদের পূর্বসূরি বাঙালি নারীদের সংগ্রামী ভূমিকা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তেমনি তাদের উত্তরসূরি নারীদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দানের জন্য পাকিস্তান যুগে পূর্ব বাংলার রাজনীতি ও মুক্তিসংগ্রামে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে আরো বেশি অধ্যয়ন ও গবেষণা প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

১. প্রাথমিক উৎস

সরকারি/আধা সরকারি দলিলপত্র:

Government of East Bengal, Legislative Assembly, Debates, Dacca, Government of East Bengal Press, 1948-52, Vols. 1-8.

East Bengal Assembly Proceedings, 1948

East Bengal Assembly Proceedings, Offical Report of the Eight Session, Vol. VIII, March 24, 1952

The East Bengal State Acquisition and Tenkay Act, 1950, Decca, East Bengal Government Press, 1951.

Government of East Pakistan, Assembly Proceedings, Decca, Government of East Pakistan Press, 1955-57, Vol. 9.

Assembly Proceedings, official Report, East Pakistan Assembly, third session, 1956.

One year of popular Government in East Pakistan, Decca, Government of East Pakistan, 1958.

Bangladesh Docoments, Vols. I & II , Ministry of External Affairs, New Delhi, 1971 and 1972.

Lok Sabha Debates, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.

White Paper, The Crisis in East Pakistan, Government of Pakistan, 5 August 1971.

Goverment of Pakistan, Constitutional Documents (Pakistan) Volume IV-B, Karachi, Ministry of Law and Parliamentary Affairs (Law Division),1964.

Government of Pakistan, Ministrs of Economic Affairs, *Twenty Years of Pakistan in Statistics 1847-67,* Karachi Central Statistical Office, 1968.

Government of Pakistan, Ministry of Law, *The Constitution of the Republic of Pakistan, 1962*

Government of Pakistan, *Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan, Vol. 1* Islamabad

Government of Pakistan, *Twenty Years of Pakistan in Statistics 1947-67,* Karachi , Ministry of Economic Affairs, Central Statistical Office, 1969.

Report On Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954, Dhaka, (Secretary, Bangladesh Election Commission), May, 1977,

Report On General Elections Pakistan 1970-71 Vol-11, Election Commission, Islamabad, 1972

Report of the Commission on the Students problem and welfare, Ministry of Education, Pakistan, 1966.

Report of the Commission on National Education, 1959, Government Pakistan, Ministry of Education, Karachi, 1961

Government of Pakistan, *Pakistan, 1948-49,* Karachi: Government of Pakistan Publications, 1949

Pakistan, 1954-55, Karachi: Pakistan Publications, 1955

Pakistan, 1959-60, Karachi, Pakistan Publications, 1960
Twenty years of Pakistan, in Statistics, Karachi, Manager of Publications, 1968
The Dacca Gazette Extraordinary, Dacca,The East Pakistan Government, 1962
The Dacca Gazette Extraordinary, Dacca,The East Pakistan Government, 1970
হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, মোট ১৫ খণ্ড, তথ্য মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২

২. দ্বৈতায়িক উৎস

ক. ইংরেজি ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাদি

Ahmed, A. F. Salahuddin, *Bengali Nationalism and the Emergence of Bangladesh: An Introductory Outline,* International Centre fo Bengal Studies, Dhaka, 1994
Ayoob, A.K.M., *Bangladesh: Struggle for Freedom*, Varanashi, Indian Press, 1971
Ahamed, Emajuddin (ed.), *Society and Politics in Bangladesh*, Academic Publishers, Dhaka, 1989
Ahmed, Kamruddin, *Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh*, Inside Library, Dhaka,1975.
The Social History of East Pakistan, Crescent Book Center, Dacca, 1967.
Afzal, M. Rafique, *Political Parties in Pakistan 1947-1958 vol.1,* National Institute of Historical and Cultural Research Islamabad, Islamabad, 1986
Azad, M. Abul Kalam, *India wins Freedom*, Orient Longman Limited, Madras, 1988
Ahmed, Moudud, *Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy*, University Press Ltd., Dhaka, 1979
Ayoob, Mohammad, *Background and Development: Bangladesh a struggle for nationhood*, Vikas Publishing House, Delhi, 1971
Ahmed, Sharif Uddin (ed.), *Dhaka Past Present Future*, The Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1991
Ali, Tariq, *Pakistan: Military Rule of People's Power*, Vikas Publications, Delhi, 1970
Bhattacharjee, Ajit, *Dateline: Bangladesh,* Jaico Publishing house, Bomba, 1971
Bhattacharjee, Arun, *Dateline Mujibnagar*, Vikas, Delhi, 1973
Banerjee, D.N., *East Pakistan: A Case Study in Muslim Politics*, Vikas Pub. House Ltd., Delhi, 1969
Bhattacharia, J.P, *Ranaisance and Freedom Movement in Bangladesh*, Minarva Associates, Calcutta 1973
Bahadur, Kalim , *Bangladesh Politics : Problems and Issues*, University Press limited., Dhaka,1987
Bhuiyan, Md. Abdul Wadud, *The Emergence of Bangladesh and Role of the Awami League*, Vikas Publishing House Pvt Ltd, New Delhi,1982

Bose, Nemai Sadhan, *The Indian Movement an out line*, D.N. Basa at Ananda Press Publication, Calcutta, 1974
Brands, W. J., *India, Pakistan and the Great Powers,* New York, 1972
Chakrabarty, Usha, *Condition of Bengali Women Around the 2nd Half of the 19th Century*, Calcutta, Published by the Author, 1961
Choudhury, G. W., *The last Days of United Pakistan*, C. Hurst & Company, London, 1974
Constitutional Development in Pakistan, 2nd ed., Longmans, london
Democracy in Pakistan, Green Book House, Dacca, 1963
Documents and Speeches on the Constitution of Pakistan, Green Book , Dacca, 1967
Choudhury, Kalyan, *Genocide of Bangladesh*, Orient Longman, Bombay, 1972
Callard, Keith., *Pakistan: A Political Study,* London: George Allen & Unwin Ltd. 1958
Chowdhury, Mustafa, *Pakistan its Politics and Bureaucracy,* Associated Pub. House, New Delhi, 1972
Chowdhury, Najma, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*, The University of Dhaka, Dhaka, 1980
Chowdhury, Subrata Roy, *The Geneses of Bangladesh: A study in international legal Norms and Permissive Conscience*, Asia Publishing House, New York, 1972
Drora, M.S., *India and the freedom struggle of Bangladesh,* New Delhi, 1995
Das, Tapan, *Pakistan Politic*, Peoples Publishing House. New Delhi, 1969
Elahi, Moudood (compilation), *Assignment Bangladesh '71*, Momin Publications, Dhaka, 1999
Friden, Betty, *The Fiminine Mystique*, Dall, New York, 1999
Feldman, Herbert, *The end and the Beginning Pakistan, 1969-71*, Oxford University Press, London, 1975
From crisis to crisis Pakistan, 1962-69: A study of martial Law, Oxford University Press, London, 1972
A Constitution For Pakistan, Oxford University Press, London, 1956
Gauhar, Altaf, *Ayub Khan Pakistan's First Military Ruler*, University Press Limited, Dhaka, 1996
Gupta, Anirudha, *Forms of Struggle: Bangladesh- A struggle for Nationhood,* Delhi, 1971
Gupta, Jyoti Sen, *History Of Freedom Movement in Bangladesh, 1943-1973,* Naya Prokash, Calcutta, 1974
Ghose, Shyamali, *The Awami League 1949-1971,* Academic publishers, Dhaka, 1990
Hossain, Kamal (Dr.), *Bangabandhu and Bangladesh*, Radical Asia Books, London, 1977
Huq, Mahfuzul M., *Electoral Problems in Pakistan*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1966
Humme, Maggi, *The Dictionary of Feminist* Theory, Ohio State University Press , 1995

Haq, Mahbub ul, *The strategy of Economic Planning A Case study of Pakistan*, Oxford University Press, Lahore, 1963

Husain, Shawkat Ara, *Politics and Society in Bengal*, Bengla Academy, Dhaka, 1991

Hussain, Shahanara, *The Social Life of Women in Early Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1985

Humayan, Syed, *Sheikh Mujib's 6- point Formula An Analytical study of the Breakup of Pakistan*, Royal Book Company, Karachi, 1995

Imam, Jahanara, *Of Blood and Fire*, (Translated by Mustafizur Rahman), *The Untold story of Bangladesh's War of Independence*, Academic Publishers, Dhaka, 1990

Ikramullah, Shaista , *From Pardah to Parliament*, Crescent Press, London

Islam, Sirajul (ed.), *History of Bangladesh. 1704-1991*, 3 Vols, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1992

Jaggar, Alison M, *Feminist Politics and Human Nature*, Rowman and Allanheld, New Jersey, 1983

Jahan, Rounaq, *Pakistan:Failure in National Integration*, USA, 1972

Karim, Nehal, *The Emergence of Nationalism in Bangladesh*, University of Dhaka, Dhaka, 1992

Khan, Bazlur Rahman, *Politics in Bengal, 1927-1936*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987

Kabir, Humayun, *Muslim Politics 1906-1947 and other Essays*, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1969

Kamal, Ahmed, *State Against the Nation, The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54*, The University Press Limited, Dhaka, 2016

Kamal, Kazi, Ahmed., *Sheikh Mujibur Rahman and Birth of Bangladesh*, Dhaka, 1972

Khan Mohammad Ayub, *Friends Not Masters A Political Autobiography*, Oxford University Press, Karachi, 1967

Khan, Tamijuddin, *The Test of Time*, University Press Limiterd, Dhaka, 1989

Khan, Zillur R., *Martial Law: Leadership Crisis in Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka, 1984

The Third World Charismat Sheikh Mujib and The Struggle for freedom, The University Press, Dhaka, 1996

Lawrence, Ziring, *The Ayub Khan Era Politics in Pakistan, 1958-1969*, Syracuse University Press, New York, 1971

Mahtab, Nazmunnessa, *Women, Gender and Development Contemporary Issues*, A H Development Publishing House, Dhaka, 2012

Maitra, Jayanti, *Muslim Politics in Bengal, 1855-1906: Collaboration and confrontation*, K.P. Bagchi, Calcutta, 1984

Muhith, A .M .A, *Bangladesh: Emergence of a Nation*, Bangladesh Books Int. Ltd., Dacca, 1978

Mukherjee, Kanak, *Women's Emancipation Movement in India*, New Delhi: National Book Centre, 1989

Mannan, Mohammad Siraj, *The Muslim Political Parties in Bengal 1936-1947 A Study of their Activities and Struggle for Freedom*, Islamic Foundation, 1987

Mamoon, Muntassir, *Media and the Liberation war of Bangladesh*, Vol. 2, Dhaka, 2002

Misra , Rekha, *Women in Mughal India*, Munshiram Monoharlal, Allahabad, 1967

Mukharji, Soma, *Royal Mughal Ladies and Their Contribution*, Gyan Publishing House, New Delhi, 2001.

Mahmood, Shaukat, *The Constitution of Pakistan, 1962, Pakistan Law Times*, Lahore, 1965

Maniruzzaman, Talukder, *The Politics of Development The Case of Pakistan (1947-1958)*, Green Book House Ltd., Dhaka, 1971

The Bangaldesh Revolution and its aftermath, Bangladesh Books international ltd, Dhaka,1988.

Radical Politics and the emergence of Bangladesh, Bangladesh, Books international ltd, Dhaka, 1975

Mary.Wollstonecraft, *A Vindication of the Right of Woman*, W.W. Norton, New York, 1975

Nanda, B. R, *Indian Women from Purdah to Modernity*, New Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1975

Patwari, A.B.M. Mafizul Islam, *Protection of the Constitution and Fundamental Rights Under the Martial Law in Pakistan 1958-1962*, university of Dhaka, Dhaka, 1988

Paul, Drefus, Du. *Pakistan and Bangladesh (From Pakistan to Bangladesh)*, Arhould, Paris, 1972

Pirzada, Syed Sharif Uddin, *Fundamental Right and Constitutional Remedies in Pakistan*, Lahore, 1966

Qureshi, Anwar Iqbal, *Mr. Mujib's Six Point: An Economic Appraisal*, Lahore, 1970

Rahim, Aminur, *Politics and National Formation in Bangladesh*, University of Dhaka, Dhaka,1997

Rich, Adrienne, *Of Woman Born*, W.W. Norton, New York, 1979

Rashid, Harun-or, *The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987

Rashiduzzaman, M, *Pakistan : A study of Government and Politics*, Ideal Library, Dhaka,1967

Rahman (ed.), Matiur, *Bangladesh Genocide and world Press*, Dhaka, 1972

Rowbotham, Sheila, *Woman in Movement: Feminism and Social Action*, Routledge, New York and London, 1992

S.A.Karim, *Sheikh Mujib Triump and Tragedy*, The University Press Limited, 2005

Sarkar, Kamla, *Bengal Politics 1937-1947*, A, Mukherjee Co Pvt Ltd., Calcutta, 1990

Singh, Khushwant, *War and Peace in India Pakistan Bangladesh*, UBS Publisher, Delhi, 1976

Shelly, Mizanur Rahman, *The Emergence of a New Nation in a Multipolar World: Bangladesh,* Dhaka, 1979
Sen, Rogalal, *Political Ethics in Bangaldesh*, Unviersity Press Limited, 1986
Sobhan, Rehman, *From Two Economies to Two Nations: My Journey to Bangladesh*, Dhaka, 2015
Sarkar, Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal*, New Delhi: Peoples' Publishing House, 1977
Tierrey, Helen (ed.), *Womens studies encyclopedia*,(Revised and Expanded Edition), vol-1 New Delhi, Rawat publications, 2008
Umar, Badruddin, *Politics and Society in East Pakistan and Bangladesh,* Mowla Brothers, Decca, 1973
Wheeler, Richard S., *The Politics of Pakistan A Constitutional Quest*, Cornel University Press, New York, 1970
Zamal, Hasan, (ed.), *East Pakistan Crisis and India*, Pakistan Academy, Dhaka, 1971
Zaheer, Hasan, *The Separation of East Pakistan: The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism,* University Press Ltd., Dhaka, 1994

খ. বাংলা গ্রন্থাবলী

আহাদ, অলি *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৭-'৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৭
আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮২
আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩
আসাদ, আসাদুজ্জামান, *একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২
আহমদ, এ এফ সালাউদ্দিন, সুকুমার বিশ্বাস, ডঃ নরুল ইসলাম মঞ্জুর, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ*, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৬
আহমেদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা, ১ম ও ২য় খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩
আহমদ, কামরুদ্দীন, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮২
পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা, ১৯৭৬
আলম, তাহমিনা, *বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮
আবদুলাহ, তুষার, (সম্পাদিত), *বাহান্নর ভাষাকন্যা*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৭
আখতার, ফরিদা (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯১
আহমদ, মওদুদ, *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, ১৯৯২
আহমদ, রফিক, *মুক্তিসংগ্রামে বাংলাদেশ*, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৭
আজাদ, লেলিন, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭
আহমদ, সালাহউদ্দীন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, (১৯৪৭-১৯৭১)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭
ইকবাল, শাহরিয়ার, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫
ইনাম, আখতার, *রোকেয়া হলে বিশ বছর*, হরপ্পা মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৮৬
ইমাম, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি*, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬

ইসলাম, তসিকুল, *রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন*, একতা মুদ্রায়ণ, রাজশাহী, ১৯৯৬

ইব্রাহীম, নীলিমা, *বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব*, জাগ্রতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫

ইসলাম মাহমুদা, *নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২

ইসলাম, রফিকুল পিএসসি (সম্পাদিত), *দুশো রণাঙ্গন*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

মুক্তিযুদ্ধ বুদ্ধিজীবী, অনন্যা প্রকাশনী , ঢাকা, ১৯৯২

নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা, ১৯৭১, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪

ইসলাম, রফিকুল (সম্পাদিত), *সম্মুখ সমরে বাঙালি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

উমর, বদরুদ্দীন, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১-৩ খণ্ড, সূবর্ণ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২

উল্লাহ, মাহফুজ, *অভ্যুত্থানের উনসত্তর*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩

কবির শাহরিয়ার (সম্পাদিত), *সেক্টর কমাণ্ডাররা বলছেন, মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯২

কামাল, মেজবাহ, *আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, বিবর্তন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬

কামাল, মোস্তফা, *ভাষা আন্দোলনঃ সাতচলিশ থেকে বায়ান্ন*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৭

কামাল, সুফিয়া, *একাত্তরের ডায়েরী*, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯

কাশেম,আবুল, *মুক্তির পরম্পরা, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রেক্ষাপট ও প্রস্তুতিপর্ব*, কথা প্রকাশ, ঢাকা,২০২০

খান, আতাউর রহমান, *ওজারতির দুই বছর*, স্ট্যান্ডার্স পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৬৪

স্বৈরাচারের দশ বছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭০

খান, আহমদ মনসুর (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

খানম, আক্তার রাশিদা, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

খান, রাও ফরমান আলী, *বাংলাদেশের জন্ম*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১৭

চক্রবর্তী, ডঃ রতন লাল, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৭-১৯৭১*, ২খণ্ড, দি ইউনিভার্সেল একাডেমী, ঢাকা, ২০১৫

চৌধুরী, আবু সাইদ, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধ দিনগুলি*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০

চৌধুরী, নিগার, *উনসত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলো*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

চৌধুরী, মতিয়া, *দেয়াল দিয়ে ঘেরা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫

চৌধুরী, মানিক, *অন্তর্ঘাত, ১৯৭১*, উন্মেষ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫

চৌধুরী, শামছুল হুদা, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, বিজয় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭

চৌধুরী, চিন্ময়., *স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারী*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮

স্বাধীনতা আন্দোলনে সহিংস নারী, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১

ছিদ্দিকী, মোঃ খায়েরুল আহসান, *বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৫৩-১৯৬৬*, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

জামান, সাঈদা, *বাংলাদেশের নারী চরিতাভিধান*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

জাহান মোঃ এমরান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

তায়েফ, সৈয়দা শায়লা, *নির্বাচন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন*, সূবর্ণ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯

দত্ত, শেখর *ষাটের দশকের গণজাগরণ, ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা, প্রভাব*, সমাজ বিকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

দাশগুপ্ত, কমলা, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, জয়শ্রী প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৯৬

দাশ পুরকায়স্থ, ড. নিবেদিতা, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, প্রিপট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৯

দাস, হেনা, *নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

একাত্তরের স্মৃতি, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

স্মৃতিময় দিনগুলো, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭

দে, তপন কুমার, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৯৮

ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ, *একাত্তরের দশ মাস*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

ছয় দফা থেকে বাংলাদেশ, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮

নাসরীন, জোবাইদা, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ নারী*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮

নুরজাহান, বেগম (সম্পাদিত), *একাত্তরের কথামালা*, নিসা প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৯৬

পারভীন, আসমা, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১২

পারভিন, শাহনাজ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭

পিনু, গোলাম কিবরিয়া, *দৌলতননেছা খাতুন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

ফাল্গুনী, অদিতি, *বাংলার নারী সংগ্রামী*, স্টেশন টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৭

বেগম, ফোরকান, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, সুমি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ১৯৯৮

বেগম, মফিদা, *আওয়ামী লীগ রাজনীতি নারী -নেতৃত্ব (১৯৪৯-২০০৯)*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০

বেগম, মমতাজ ও মফিদা বেগম, *স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলার নারী*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮

বেগম, মালেকা, *নারী মুক্তি আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

বাংলার নারী আন্দোলন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, মতিঝিল, ১৯৮৯

একাত্তরের নারী, গাজীপুর, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনষ্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১

অগ্নিযুগের দুই বিপ্লবী মৃত্যুঞ্জয়ী রোকেয়া ও প্রীতিলতা, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৮

ইলা মিত্র, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭.

মুক্তিযুদ্ধে নারী, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১

নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২

আত্মকথা ও স্মৃতিকথায় নারী, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৯

বেগম, মালেকা (সম্পাদিত ও সংকলিত), *নির্বাচিত বেগম: অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০*, তিন খণ্ড পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬

বেগম ,মালেকা ও সৈয়দ আজিজুল হক রচিত *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস* ,দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৪

বেগম, মমতাজ বেগম ও মফিদা পযড়স, *স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলার নারী*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮

বেগম, রোজিনা, *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-৪৭)*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ২০১৬

বেগম, সাহিদা, *যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৩

ভূইয়া, মেজর কামরুল হাসান, *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

একাত্তরের কন্যা জায়া জননীরা, অনন্যা প্রকাশনী, ২০১২

মকসুদ, সৈয়দ আবুল, *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রুন্নেসা খাতুন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২

মতিন, আব্দুল, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙ্গালী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৯

মামুন, মুনতাসির ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫

মামুন, মুনতাসীর, *সেই সব দিন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

(সম্পাদিত), একাত্তরের বিজয় গাঁথা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩

মান্না, মাহমুদুর রহমান, *বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*, সূর্যভান প্রকাশন,ঢাকা,২০১১

মাসুদুজ্জামান, সেলিনা হোসেন ও (সম্পাদিত) *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২

মুহিত, আবুল মাল আব্দুল, *বাংলাদেশ ঃ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা, ২০০০

মুকুল, এম. আর. আখতার, *একুশের দলিল*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯০

আমি বিজয় দেখেছি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৩৯১

পঞ্চাশ দশকে আমরাও ভাষা আন্দোলন, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯১

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

মুরশিদ, গোলাম, *নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০১

রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া: নারী প্রগতির একশো বছর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

মোহাম্মদ, তাজুল, *হেনা দাস: জীবন নিবেদিত মুক্তির প্রয়াসে*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

ভাষা আন্দোলনে সিলেট, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪

জোবায়দা খাতুন চৌধুরী: সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

মোহান্ত, দীপংকর, *লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯

লীলা রায়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

মেহদী, রোকেয়া কবীর, মুজিব, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

মেরী, মেহেরুন্নেসা, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও নারী*: মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকা ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০০

মওদুদ, বেবী, *বাংলাদেশের নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪

মানিক, নাজিমুদ্দিন *'৭১ অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি*, ওয়ারি বুক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯২

মুখোপাধ্যায়, অসীম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ তথ্য ও তত্ত্ব*, রঞ্জন প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭২

রনো, হায়দার আকবর খান, উত্তাল ষাটের দশক, পুথিনিলয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২০

রফিক, শেখ,(সম্পাদিত), শত নারী বিপ্লবী, বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৪

রফিক রোখশানা, *রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারী অধিকার আন্দোলন*, নন্দিতা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫

রহমান, আতাউর, লেলিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন ঃ প্রেক্ষিত ও বিচার*, ঢাকা, ১৯৯০

রহমান, আতোয়ার *একাত্তর: নির্যাতনের কড়চা*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯২

রহমান, আতিউর, *অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮

মুক্তিযুদ্ধের মানুষ, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭

রহমান, এম. আব্দুর, স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা, প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৭

রহমান, মোঃ মাহবুবর, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯

রহমান, *শেখ মুজিবুর, কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৬

রহমান, হামিদা, *অধিকার আন্দোলনে নারী সমাজ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৬

রওশন, সাইদুজ্জামান, তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *একাত্তরের অগ্নি কন্যা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

রায়, খোকা, *সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮-১৯৬৮)*, জাতীয় সাহিত্য

রশিদ, হারুন-অর, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, বাংলা একাডেমি, ২০১৭

'আমাদের বাঁচার দাবী' ৬ দফা'র ৫০ বছর, বাংলা একাডেমি, ২০১৬

রশিদ, হারুন-অর- (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ১-১০ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০২০

সিদ্দিকী, কাদের, *স্বাধীনতা ৭১*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৫

শফী, বেগম মুশতারী, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামে নারী*, প্রিয়ম প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯২

স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯২

সাঈদ, আবু আল, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩

সাতচল্লিশের অখণ্ড বাংলা আন্দোলন- পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

হক, জাহানারা, লতিফা আকন্দ, নুরুন নাহার, ফয়জন নেসা (সম্পাদিত), *একাত্তরের প্রচ্ছন্ন*, উইমেন ফর উইমেনঃ এ রিসার্স এন্ড স্টাডিজ গ্রুপ, ১৯৮৭

হক, মফিদুল, *নারীমুক্তির পথিকৃৎ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৭

হান্নান, মোঃ আব্দুল, *স্বাধীনতা যুদ্ধে খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা*, পূর্বা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪

হান্নান, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ১৮৩০ থেকে ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

হেলাল, বশীর আল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী,

হোসেন, আমজাদ, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, ঢাকা, ১৯৯৭

হোসেন, তফাজ্জল (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানের রাজনীতির বিশ বছর*, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৪

হোসেন, ড. খন্দকার মোশাররফ, *মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯০

হোসেন শাহানারা, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী, রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪

হোসেন, সেলিনা (সম্পাদিত), *জেন্ডার বিশ্বকোষ ১ম ও ২য় খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হোসেন, সেলিনা ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম ও ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৯

মামুন, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৯৬

সরকার, মোনায়েম, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

হায়দার, রশীদ, *অসহযোগ আন্দোলনঃ একাত্তর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯

৩. প্রবন্ধাবলি

Al- Mujahid, Sharif, “Pakistan’s Presidential Elections”. *Asian Survey, vol.5 (6), June, 1963*

Chitta Ranjan Misra, “Genesis of the concept of a Sovereign Independent state for undivided Bengal,’’*Rajshahi University Studies, Part A, Vol. 23-24,*

G. Morshed, Pakistan 1970 Elections and the Liberation of Bangladesh: A Political Analysis’, *The Journal of Bangladesh Studies, Vol.Xl, 1988*

Khalid B Sayeed, 1965, An Epoch, Making Year in Pakistan, General Election and War with India, *Aisan Servey vol. 6 No. 2, Feb 1966*

S.A.Akand, “Was Parliamentary system of Government a Failure in Pakistan ? A Case Study of a Constitutional Debate in Pakistan during Martial Law, 1958-62” *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. V1, 1982-83*

“The Bengal Boundary Commission and the Radcliff Award 1947,” *Bangladesh Histirical Studies, VoL. V11 1982-83*

The 1962 constitution of Pakistan and the reaction of the People of Bangladesh, *The Journal of the Institute of Bangladesh studies, Vol. III,* 1978

The Working of the Ayub Constitution and the people of Bangladesh', *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, vol. IV 1979-80*

Sharit al-Mujahid, Pakistan's first Presidential Elections, *Asian Servey, vol. 5, No. 6 (Jan-1965)*

মুন্সী মুনজুরুল হক, *১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকা, আই বি এস জার্নাল, ষোড়শ সংখ্যা, ১৪১৫,*

মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও আলো আরজুমান বানু, *নবাবী বাংলার সরকার ও রাজনীতি: কয়েকজন বিশিষ্ট নারীর ভূমিকা*, *Journal of Sociology, Vol. 4,* ISSU-2, July-December,

পলাশ মন্ডল, *ঢাকার ‘দীপালি সংঘ থেকে ‘শ্রী সংঘ’: লীলা রায়ের (১৯০০-৭০ খ্রিস্টাব্দ) চিন্তা ও কর্মের বিবর্তন*, *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা সংখ্যা ৩৫-৩৬*, ১৪১৯-২১ ,বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪. অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

Ahmed Kamal, The Decline of the Muslim League and Ascendancy of the Bureucracy in East Pakistan 1947-54, Ph. D. Thesis, Austalian, National University, Canberra, 1998

Abul Fazl Huq, Constitution & Politics in Bangladesh (1972-1982) : Conflict change & stability (Unpublished Ph.D thesis), Rajshahi University, 1985,

আক্তার, দিল আরা, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন- ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার, এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১

কাদের, রোজিনা, ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৫৮-৭১, এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খাতুন, মোছাঃ খোদেজা, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০

চৌধুরী, সুলতানা নিগার, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চিন্তা (১৯৪৭-১৯৭১), পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬

জাহান, সৈয়দা খালেদা, বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা (১৯৫২-১৯৭২), পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১

সিদ্দিকা, নাজমুন নাহার, আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সামাজিক অবস্থা, এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯

সিদ্দিকী, রেজোয়ান হোসেন, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১), পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৩

হোসেন, দেলোয়ার আবু মোঃ, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক, ১৯৭১-১৯৮১, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২

৫. সমসাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র

ইংরেজী পত্রিকা

Dawn; *Hindustan Standard* ,(India); *Hindustan Times,* (India); *The Statesman* (Calcutta edition India); *Times of India,* (India); *The Morning News; The Pakistan Observer*; *The Pakistan time*

বাংলা পত্রিকা

অমৃতবাজার পত্রিকা, (কলিকাতা); *আনন্দবাজার* পত্রিকা, (কলিকাতা); *বেগম* পত্রিকা, (ঢাকা); *সওগাত* পত্রিকা, (ঢাকা), *দৈনিক ইত্তেফাক*, (ঢাকা); *দৈনিক জনকণ্ঠ*, (ঢাকা) ; *দৈনিক সংবাদ*, (ঢাকা); *দৈনিক আজাদ*; *দৈনিক পূর্বদেশ*; *দৈনিক সংবাদ*।

পরিশিষ্ট-১
বাংলা (১৯০৫-১৯১১)

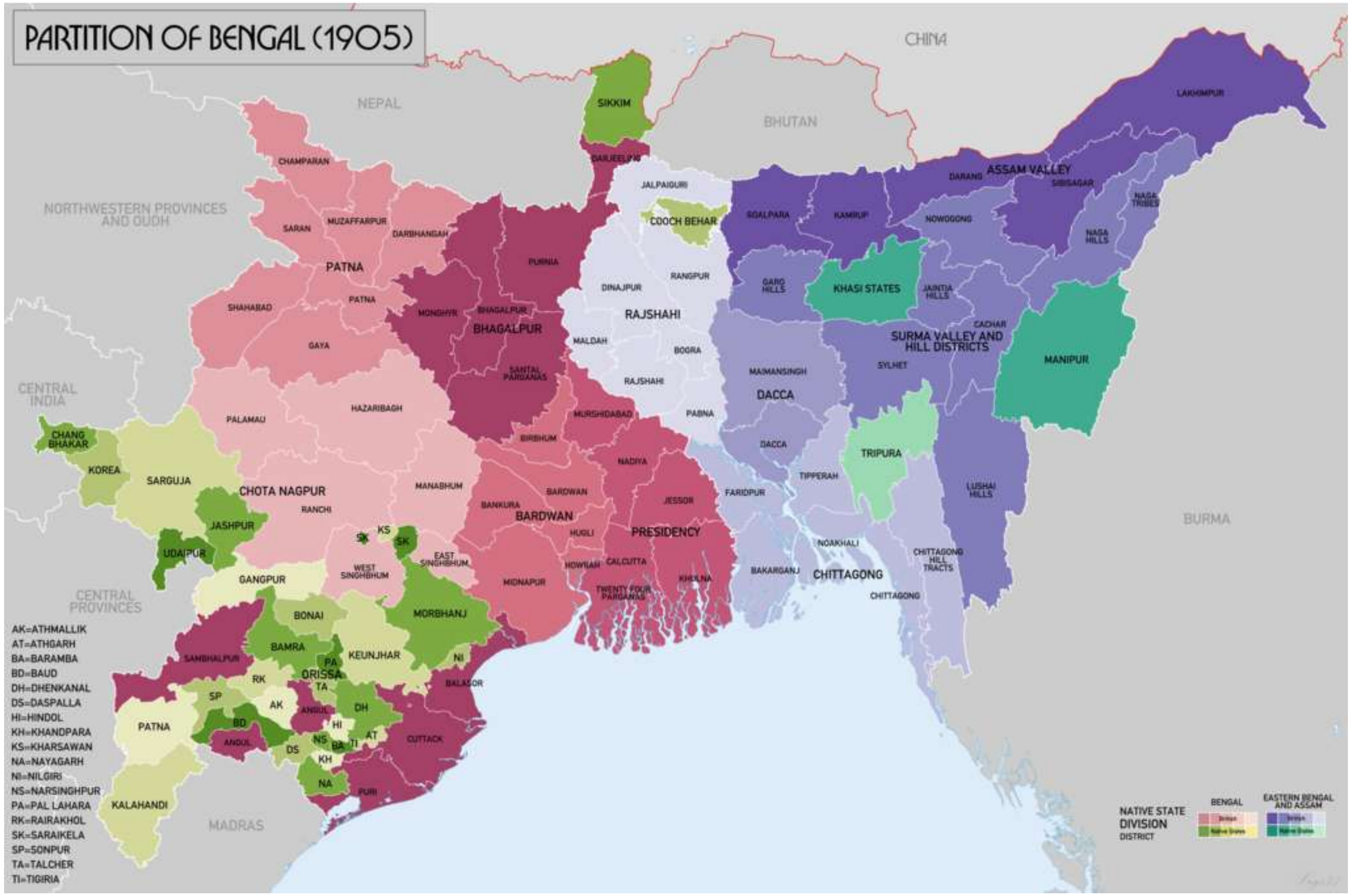

Source: https://roar.media/bangla/main/history/partition-of-legal-the-background history.

পরিশিষ্ট-২

বাংলা বিভক্তি ১৯৪৭

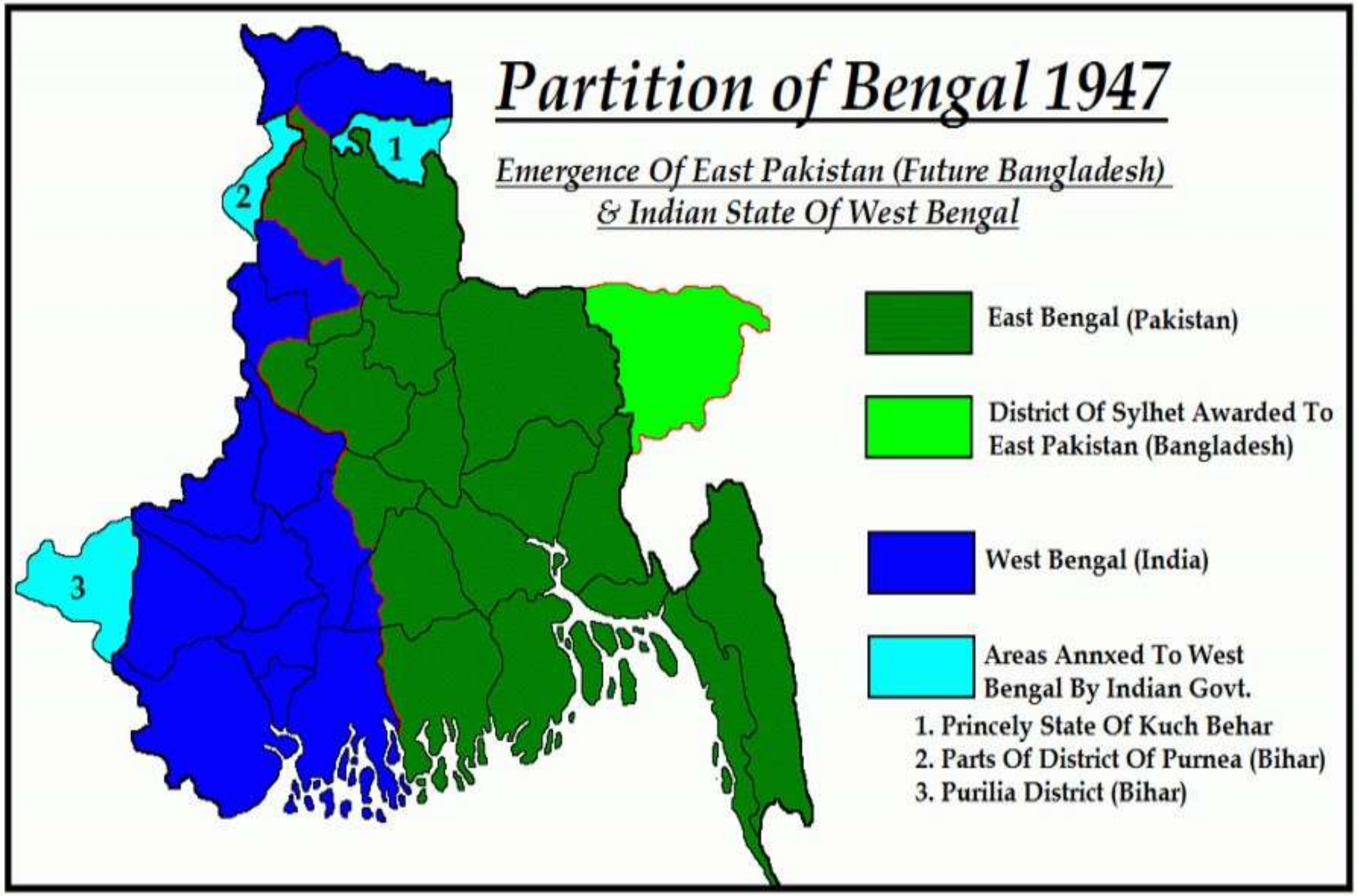

Source: https://www.google.com/search

পরিশিষ্ট-৩

গবেষণার শিরোনামঃ পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারীঃ (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রীঃ)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা

১. নামঃ

২. স্থায় ঠিকানাঃ

৩. বর্তমান ঠিকানাঃ

৪. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

৫. আপনার পারিবারিক বিবরণ (পরিবারের রাজনৈতিক পটভূমি যদি থাকে) :

৬. আপনার রাজনৈতিক জীবনের বিবরণঃ

৭. আপনি কোনো ছাত্রস ংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা?

৮. পরবর্তীতে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত হয়েছেন কিনা?

৯. নারীদের আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ বিষয়ে পাকিস্তান আমলে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছিল এবং আপনারা তা কীভাবে overcome করেছেন?

১০. সাধারণ ছাত্রী/নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে সেসময় চিন্তাভাবনা কেমন ছিল?

১১. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আপনার ভূমিকা (যদি থাকে):

১২. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ, তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই। বিশেষ করে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা ছাড়াও যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের নাম ও অন্যন্য বিবরণ (যদি আপনার জানা থাকে):

১৩. ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনে আপনার ভূমিকাকী ছিল?

১৪. ‘৬৪ র দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনে আপনার কীধরনের ভূমিকা ছিল?

১৫. বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনে আপনার কী ভূমিকা ছিল?

১৬. ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় বাংলাকে অরক্ষিত রাখা হয়েছিল এর বিরুদ্ধে কি নারীরা কোনে াপ্রতিবাদ আন্দোলন করেছিল?

১৭. ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে মিস ফাতেমা জিন্নাহ প্রতিদন্দ্বিতা করেন এ সময় আপনার অবস্থান কি ছিল?

১৮. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আপনার কি ভূমিক াছিল?

১৯. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আপনি নির্বাচিত সংসদ সদস্য। এ নির্বাচনে সরাসরি কোনো নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কিনা? করে থাকলে কারা করেছিল? তাদের সম্পর্কে বলুন। এ নির্বাচনে আপনার ভূমিকাসহ অন্যান্য নারীদের কীভূমিকা ছিল তার বিস্তারিত বিবরণঃ

২০.আপনি কি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন? ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ আপনি কোথায় ছিলেন?

২১.আপনি মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে যুক্ত হলেন?

২২.আপনি কোথায় এবং কতদিন ট্রেনিং নিয়েছেন?

২৩. কত নং সেক্টরে এবং কোন কোন জায়গায় যুদ্ধ করেছেন?

২৪.আপনার সঙ্গে আর কোনো নারী মুক্তিযোদ্ধা ছিল কিনা? তাদের নাম?

২৫. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে নারী হিসেবে আপনি কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলে নকি না?

২৬.একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি সমাজ, দেশ এবং রাষ্ট্রের / সরকারের কাছে কীভাবে মূল্যায়িত হয়েছেন?

২৭. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কতটুকু মূল্যায়ন করা হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

২৮.আপনার রচিত গ্রন্থসমূহের তালিকা (যদি থাকে):

২৯.পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে (১৯৪৭-৭১) নারীদের অবস্থা, অবস্থান ও ভূমিকাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর স্বাক্ষর **গবেষকের স্বাক্ষর**

পরিশিষ্ট-৪

ঢাকায় গুলিবর্ষণে বিভিন্ন মহলের মতামত : ঢাকায় মহিলাদের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ

ঢাকার নিরীহ ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ১২নং অভয় দাস লেনে মহিলাদের এক বিরাট সভা হয়। সভার বিশেষত্ব ছিল এই যে, শহরে রিক্সা ও ঘোড়ার গাড়ী বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বহুদূর হতে পায়ে হেঁটে বৃদ্ধা ও বর্ষিয়সী মহিলারা পর্য্যন্ত এই সভায় যোগদান করেন। সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে ২১শে ফেব্রুয়ারী ও পরবর্ত্তী দুইদিনে ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশ ও মিলিটারীর "নিষ্ঠুর" গুলিবর্ষণ, লাঠিচার্জ্জ ও টিয়ার গ্যাস বর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং শহীদদের রুহের মাগফেরাত ও তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং হাসপাতালে আহতদের দ্রুত নিরাময় কামনা করা হয়। সভায় ঢাকার হত্যাকাণ্ডের তদন্তের পর দোষী কর্ম্মচারীদের প্রকাশ্য বিচার ও উপযুক্ত শাস্তি দাবী করা হয়। শহরে অকারণে ১৪৪ ধারা জারী করার তীব্র নিন্দা করে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৫:৬ (২ মার্চ ১৯৫২)

উৎস: মালেকা বেগম (সংকলিত ও সম্পাদিত) *নির্বাচিত বেগম: অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০*,পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৮৯

পরিশিষ্ট-৫

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ আগষ্ট, ১৯৬২

নয়া শিক্ষা কমিশন নিয়োগের দাবী

ঢাকার ৮ জন নেত্রীস্থানীয়া মহিলার যুক্ত বিবৃতি

জাতীয় পরিষদের অন্যতম সদস্যা সহ ঢাকার ৮ জন নেত্রীস্থানীয়া মহিলা গতকল্য (শনিবার) এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট পুনর্বিবেচনা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের চাহিদার সহিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সংগতি বিধানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, সার্বজনীনভাবে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার পরিবর্তে শুধু মাত্র সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইলে শিক্ষার অঙ্গন আরও অধিকতর নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত হইয়া পড়িবে। তাঁহারা বলেন যে, জাতির ভবিষ্যৎ অপরিহার্যভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা নব-পর্যায়ে সমস্যার মূলানুসন্ধান এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ও জাতীয় স্বার্থের আলোকে গ্রহণ-

(শেষ পৃঃ ৭ম কঃ দ্রঃ

নয়া শিক্ষা কমিশন নিয়োগের দাবী

(১ম পৃঃ পর)

যোগ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি নয়া শিক্ষা কমিশন নিয়োগের দাবী জানান।

এ. পি. পি পরিবেশিত উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয় নাই এবং রিপোর্টে শিক্ষা কি যে ভাবে বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, উহাতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহে ছেলে-মেয়েদের প্রেরণের সুযোগ হইতে জনসাধারণের এক বিরাট অংশকে বঞ্চিত করা হইবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান করেন:

জাতীয় পরিষদের সদস্যা বেগম রোকাইয়া আনোয়ার, বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম হাজেরা মাহমুদ, বেগম নূরজাহান মুর্শেদ, মিসেস আমেনা বেগম, বেগম কামরুন-নাহার লায়লী, বেগম রাবেয়া হারুন ও বেগম বদরুন্নেসা আহমদ।

পরিশিষ্ট-৬

১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নারী নেত্রীবৃন্দের বিবৃতি

আজাদ

The Azad

মহিলা নেত্রীবৃন্দের বিবৃতি

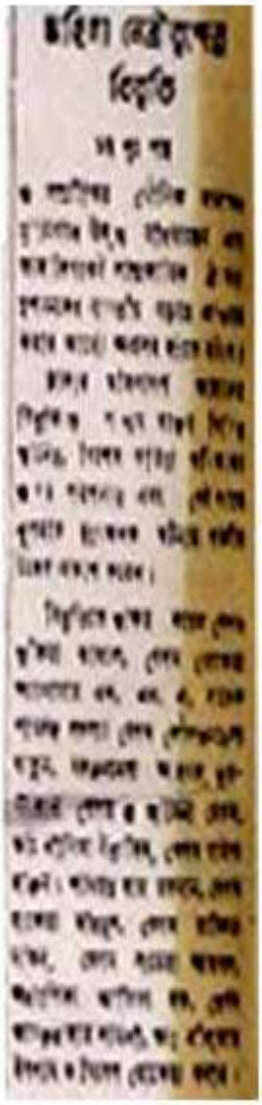
মহিলা নেত্রীবৃন্দের বিবৃতি

পরিশিষ্ট-৭

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ডাক-

এগার দফার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘদিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসনে-শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্রজনতা ছাত্র-গণ আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন।

আমরা ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফার দাবীতে ব্যাপক ছাত্র-গণ আন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি।

(১)

(ক) স্বচ্ছল কলেজ সমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজ সমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ সমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজ সমূহে দ্বিতীয় "শিফটে" নৈশ আই. এ; আই. এস. সি; আই. কম ও বি. এ; বি. এস. সি; বি কম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজ সমূহে নৈশ এম, এ ও এম. কম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও ষ্টাইপেণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও ষ্টাইপেণ্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

(ঙ) হল হোষ্টেলের ডাইনিংহল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) হল ও হোষ্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে।

(জ) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতনবৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(ঝ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(ঞ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তী প্রথা বন্ধ, মেডিক্যাল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ট) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন', প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫%রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষেও ক্লাশ দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঠ) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্সড কোর্সের' সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনালে পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিষ্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।
টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবী অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে।

(ড) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্সড কোর্সের' দাবী সহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে ছাত্রদের 'আইডেনটিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কনসেশনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও এই 'কনসেশন' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ 'কনসেশন' দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী ও আধা সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কনসেশন' দিতে হইবে।

(ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

(২) প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত দাবী সমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিতে হইবে।

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেল শাসনভিত্তিক রাষ্ট্র সংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে, দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহের উপর বাধ্যতা মূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমান ভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী রপ্তানী চলিবে। এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী রপ্তানী করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌ বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু সহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতঃ সাব-ফেডারেশন গঠন।

(৫) ব্যাঙ্ক-বীমা ইনস্যুরেন্স ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

(৬) কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মন প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

(৭) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(৮) পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৯) জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন, ও অন্যান্য নিবর্তন মূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(১০) সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

(১১) দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষে,

সাইফউদ্দিন আহমেদ সভাপতি,	আবদুর রউফ সভাপতি,	মোস্তফা জামাল হায়দার সভাপতি,	তোফায়েল আহমেদ সহ-সভাপতি,
সামসুদ্দোহা সাধারণ সম্পাদক,	খালেদ মোহাম্মদ আলী সাধারণ সম্পাদক,	দীপা দত্ত সহ-সম্পাদিকা,	নাজিম কামরান চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।	'ডাকসু'

শ্রেণীর গণবিরোধী সাম্প্রদায়িক চক্রান্তকে প্রতিহত করুন

বন্ধুগণ,

গত কয়েকদিন যাবত ঢাকা শহরতলী ও তার উপকণ্ঠে যে মর্মান্তিক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার সূচনা হয় দলমত নির্বিশেষে তা প্রত্যেকটি সচেতন শান্তিকামী মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ জনসাধারনের জান মালের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলেছে। আমরা এই ধরনের ঘৃণ্য ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি।

ঠিক এমন এক সময়ে এই দাঙ্গার সূচনা করা হয়েছে যখন সমগ্র পূর্ব-বাংলা এক নিদারুন খাদ্য সঙ্কটের সম্মুখীন, শস্যশ্যামলা গ্রাম-বাংলার কুটিরে কুটিরে দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া। জাতি, ধর্ম, ভাষা ও বর্ণ নির্বিশেষে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র মধ্যবিত্ত জনতার জীবনে সঙ্কট একদিকে যেমন ঘনীভূত হচ্ছে—অন্যদিকে তেমনি এই নিদারুন শোষনের বিরুদ্ধে সচেতন জনতার এক দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে উঠছে।

গ্রামে গ্রামে জোতদার মহাজনের নিষ্ঠুর শোষনের বিরুদ্ধে ভূমিহীন গরীব কৃষকের সংগ্রাম, মিল মালিকের অমানুষিক শোষনের বিরুদ্ধে শ্রমিকের রুটি রুজির সংগ্রাম, ধর্ম নিরপেক্ষ, বিজ্ঞান ভিত্তিক, গণমুখী শিক্ষার দাবীতে ছাত্রদের সংগ্রাম ক্রমশ: তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠছে। শ্রমিক, কৃষক ছাত্রজনতার এই সম্মিলিত আন্দোলনের প্রচণ্ড আঘাতে শোষক শ্রেণীর শাসন ও শোষনের ভিত কেঁপে উঠছে। আর তাই জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ভীত সন্ত্রস্ত শোষক গোষ্ঠি একতা বিনষ্ট করে গণ-আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য গ্রহণ করেছে এই সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিতে জাতিতে দাঙ্গা প্রতিক্রিয়াশীল শোষক গোষ্ঠির অমোঘ হাতিয়ার।

বন্ধুগণ, শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও শোষক গোষ্ঠিই তার শাসন ও শোষনের ইমারতকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিবিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়িয়ে সমস্ত মানবিক গুণাবলীকে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞে আহুতি দেয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া পুজির শোষনে জর্জরিত আয়ারল্যাণ্ডের জনগণের শোষণ মুক্তির সংগ্রামকে বানচাল করে দেবার মানসে শাসক শ্রেণী ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টান্টদের মধ্যে বেলফাষ্ট ও আলষ্টারে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সূচনা করে।

আমেরিকার নিগ্রো জনগনকে সকল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের শোষন মুক্তির সংগ্রামকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এই সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ারই ব্যবহার করে থাকে।

আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই-১৯৫০ সালে যখন এদেশের সামন্ত শোষনে জর্জরিত কৃষক জনগণ জমি দখল ও তেভাগা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের শাসক গোষ্ঠিই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশ্রয় নিয়ে কৃষক জনতার শোষনমুক্তির দুর্ব্বার আন্দোলনকে বানচাল করার প্রচেষ্টা চালায়।

১৯৫৪ সালে পূর্ব-বাংলার জাতীয় অধিকার আদায়ের আন্দোলন যখন তীব্রতর হয়ে উঠে—শাসক শ্রেণী তখন আদমজী ও চন্দ্রঘোনা সহ কয়েকটি শিল্প এলাকায় বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা বাধিয়ে দেয় ও সেই সুযোগে ৯২ (ক) ধারা জারী করে।

১৯৬২ সনের সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলনের পর যখন জনগণ শোষন ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত করার জন্য বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং ভারতীয় জনগনের বিক্ষোভের সামনে ভারতীয় শোষক গোষ্ঠির পতন আসন্ন হয়ে উঠেছিল—তখন উভয় দেশের শোষক গোষ্ঠি আপন শ্রেণী স্বার্থে ১৯৬৪ সালে উভয় দেশেই বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়।

এই ১৯৬৪ সালেই জুটমিল শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের আন্দোলন বানচাল করার জন্য শোষক শ্রেণী খুলনা-খালিশপুর শিল্প এলাকায় জেলা ভিত্তিক এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাধিয়ে নারী শিশু নির্ব্বিশেষে শতশত লোককে হত্যার ব্যবস্থা করে।

ভারত এবং পূর্ব-বাংলায় সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত [illegible]
গোয়েন্দা সংস্থা সি, আই, এ এর গোপন হাত সর্বজনবিদিত।
গোয়েন্দা সংস্থা সি, আই, এ এর পূর্ব-বাংলার বিপ্লবী [illegible]
সতর্ক থাকতে অনুরোধ করি।

আমরা লক্ষ্য করেছি, এবছর ১১ দফা ভিত্তিক জানুয়ারী, [illegible] আন্দোলনকেও নস্যাৎ করার জন্য শাসকগোষ্ঠির বিভেদাত্মক ও চরম বিভ্রান্তিকর [illegible] করেছিল। তারা বিভিন্ন জায়গায় ধর্ম, ভাষা ও জাতিতে জাতিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চেষ্টা ক[illegible] কিন্তু শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রজনতার যৌথ প্রতিরোধের সম্মুখে তারা বেশীদূর অগ্রসর হতে পা[illegible]

অতি সম্প্রতিকালে যখন ভারতীয় জনগণ বৃহৎ পূঁজি সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে তখন সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শ্রেণী জনগণের এই সশস্ত্র সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য আহমেদাবাদে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাধায়।

এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব বাংলার সচেতন শ্রমিক কৃষক ছাত্র জনতাকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই যে, তাঁরা গণ-দুষমন জামাত প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীলদের এদেশেও আহমেদাবাদের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার সকল প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করেছেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের চক্রান্তে ব্যর্থ হওয়ায় শুরু করেছে এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা।

একথা আমরা সুস্পষ্ট ও দ্বার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই যে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে আমাদের বর্তমান শত্রু সামন্তবাদ বড়পুঁজি, সাম্রাজ্যবাদী বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষকগোষ্ঠি। জাতি, ধর্ম, ভাষা ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল নির্যাতিত মানুষ আমাদের বন্ধু। নির্যাতিত মানুষের মধ্যে আত্মঘাতী দাংগা বাধিয়ে দিয়ে আসল শত্রুকে নিরাপদে থাকতে আমরা কিছুতেই দিবনা, দিতে পারিনা।

বন্ধুগণ,

একথা আমাদের সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন যে—অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সামন্তবাদী শ্রেণীগুলি তাদের অবলুপ্তির শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে তাদের এই ঘুনে ধরা ভগ্ন প্রায় সমাজ ব্যবস্থাকে বাচাতে ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েমের মধ্য দিয়ে শোষণের ইমারত অটুট রাখতে। এই জন্য তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়, ভাষাভাষি জাতি ও অঞ্চলের মধ্যে বিরোধগুলিকে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে কাজে লাগায় এবং সংগ্রামী শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির ঐক্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করে।

পূর্ববাংলায় বৃহৎপুঁজি, সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মিলিত শোষণকে উৎখাত করার আজিকার মহান সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা এই সাম্প্রদায়িকতা, জাতিতে জাতিতে দাঙ্গার সকল সম্ভাবনাকে প্রতিহত করে—ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে সমগ্র মেহনতী শোষিত নির্যাতীত জনতার সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলে, আসুন আমরা জনতার শোষণমুক্তির সংগ্রামকে দূর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাই।

নির্যাতীত ভাইসব, শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভের সংগ্রাম, পূর্ব বাংলার জনগণের সার্বিক মুক্তির সংগ্রাম, আপনাদেরও মুক্তির সংগ্রাম, আসুন এই মহান সংগ্রামে আমরা একাত্ম হয়ে সামপ্রদায়িকতা, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষের হলাহলকে দূরীভূত করে শোষণ মুক্তির সংগ্রামের দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

সংগ্রামী শুভেচ্ছান্তে

পূর্ব্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

দিলীপ বড়ুয়া—সভাপতি জগন্নাথ হল শাখা
ওদুদ নওয়াজ— „ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
নার্গিস বেগম—সভানেত্রী রোকেয়া হল শাখা
হাসান মাহমুদ—সভাপতি ইকবাল হল শাখা
রফিকুল হাসান জিন্না—সমাজসেবা সম্পাদক
মেডিকেল কলেজ সংসদ

জহুর আহমদ সাজু—সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় শাখা
আজাদুর রহমান—সাধারণ সম্পাদক
প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয় শাখা
সুধীর গুন—সাধারণ সম্পাদক
জগন্নাথ হল শাখা
সিরাজুল হোসেন কুতুব
সাধারণ সম্পাদক জিন্না হল শাখা

পরিশিষ্ট-৯

মহিলাদের জন্য দশ ভাগ আসন সংরক্ষণ দাবি

আপওয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট বেগম রানা লিয়াকত আলী খান নয়া গণপরিষদে কমপক্ষে শতকরা দশ ভাগ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মহিলা জগত
২৩:১১ (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০)

মহিলাদের প্রত্যক্ষ ভোট দাবি

রাজধানী ঢাকার ১০৬ জন নেতৃস্থানীয় মহিলা এক যুক্ত বিবৃতিতে আসন্ন নির্বাচনে মহিলাদের প্রত্যক্ষ ভোটে মহিলা সদস্য নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে। পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, মহিলাদের প্রত্যক্ষ ভোটেই মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে এবং এটাই গণতান্ত্রিক স্বাভাবিক রীতি। তাঁরা মহিলাদের পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অবিলম্বে বাতিল করার

দাবি জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন : বেগম সুফিয়া কামাল, মিসেস আমিনা বেগম, বেগম ফিরোজা বারী, বেগম মতিয়া, বেগম খালেদা হাবিব, বেগম আনোয়ারা খাতুন, কামরুন নাহার লায়লী, মালেকা বেগম প্রমুখ।

মজিলা জগত
২৩:২১ (২৬ এপ্রিল ১৯৭০)

উৎসঃ মালেকা বেগম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *নির্বাচিত বেগমঃ অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০, ১ম খণ্ড*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪২৫

পরিশিষ্ট-১০

আলোকচিত্রে উল্লেখযোগ্য নারীরাজনীতিবিদ (১৯০৫-১৯৪৭)

 প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (৫মে. ১৯১১- ২ সে.১৯৩২)	 বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ (১৮৯৬-১৯৭৯)
 বেগম শায়েস্তা সোহরাওয়ার্দী ইকরামউল্লাহ (২২ জুলাই ১৯১৫-১১ ডিসেম্বর ২০০০)	 লীলা রায় (জন্মঃ ১৯০০ সালের ২১ অক্টোবর, মৃত্যুঃ ১৯৭০ সালের ১১ জুন)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১১

আলোকচিত্রে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারী

কালো বই হাতে এ নারী হলেন খালেদা খানম ফেন্সী, ছবিটি তাঁর কন্যা নাসরিন মেহের-ই-খুদা থেকে প্রাপ্ত।

উৎস: দৈনিক যুগান্তর, ৩১ মার্চ ২০২১ইং

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১২

আলোক চিত্রে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে নারী

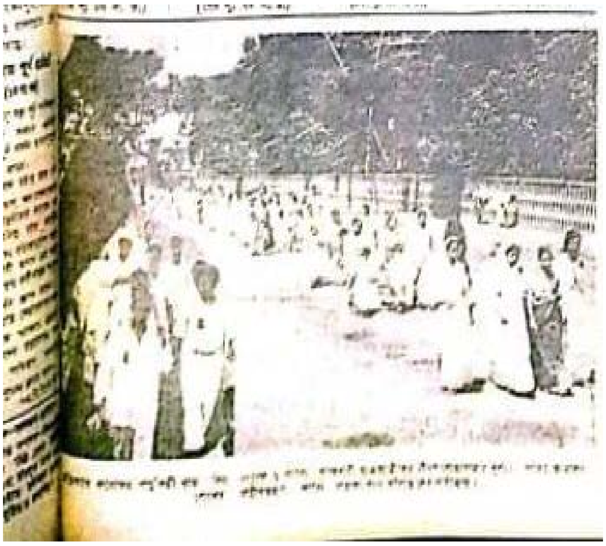

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২, পাকিস্তান অবজারভার ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২, পাকিস্তান অবজারভার

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৩

আলোকচিত্রে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনে নারী

উইকিপিডিয়া

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৪

আলোকচিত্রে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে নারী

প্রকাশিত হয়েছে!
মহাচক্রান্ত
ক্রাউন বুক ষ্টল

সংবাদ

SANGBAD

Regd. No. DA, 166 Po. Box No. 1228
Gram : SANGBAD Dacca, Phone : 17911
Sunday January 19, 1969

পাগল চিকিৎসায় যুগান্তর
ডাঃ আর, কে, সিংহ এণ্ড কোং

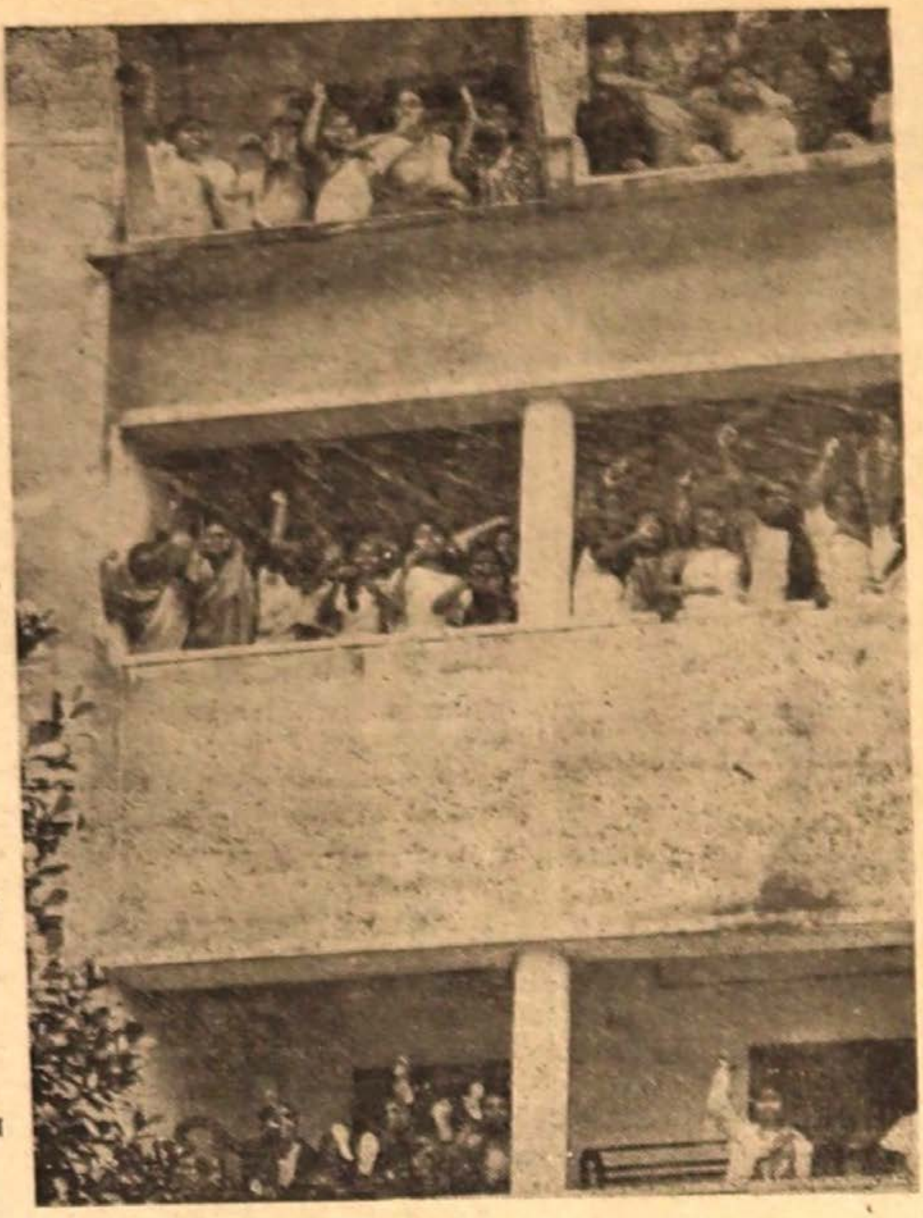

রোকেয়া হলের অভ্যন্তরে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের প্রতিবাদে ছাত্রীদিগকে পুলিসী জুলুমের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দেখা যাইতেছে।
—'সংবাদ'

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৫

আলোকচিত্রে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে নারী

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৬

আলোকচিত্রে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে নারী

সংবাদ

SANGBAD

গতকল্য (বুধবার) ঢাকায় ছাত্রীদের শোক মিছিলের একাংশ : 'সংবাদ'

আজাদ

আজ হরতাল

আসাদ সিটি

ল' কলেজের

ছাত্র ছিল

সোমবার

মহিলা

সমাবেশ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৭

আলোকচিত্রে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ

গত বৃহস্পতিবার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ভোটদানের জন্য আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও বেগম মুজিবর রহমানকে ভোট কেন্দ্রের দিকে যাইতে দেখা যাইতেছে।

গত বৃহস্পতিবার পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে রাওয়ালপিণ্ডি এলাকার দুইটি ভোট কেন্দ্রের সাধারণ দৃশ্য: ছবিতে (উপরে) মহিলা ভোটার এবং (নীচে) পুরুষ ভোটারদের ভোটদানের জন্য সারি বাঁধিয়া প্রতীক্ষা করিতে দেখা যাইতেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৮

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে নারীদের প্রশিক্ষণ

সংবাদ

SANGBAD

মহিলা পরিষদ কর্মীদের কুচকাওয়াজের দৃশ্য। —সংবাদ

পরিশিষ্ট-১৯

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ
SANGBAD

AL-KARIM PAINTS

বটতলার ছাত্রসভায় রোকেয়া হলের সহ-সভানেত্রী আয়েশা খানম বক্তৃতা করিতেছেন—'সংবাদ'।

বটতলার ছাত্র সভায় ঘোষণা

১১-দফার শাসনতন্ত্র না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে

সংবাদ
SANGBAD

বটতলায় সভাশেষে মিছিল। —'সংবাদ'

ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভা

জনগণের ভোটের রায় বানচালের চক্রান্ত প্রতিহত করুন

রবিবার শহীদ মিনারে ন্যাপের জনসভা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)